শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

বিশ্বপরিব্রাজক ও জিবিসি
শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী
গুরুমহারাজ

বিশ্বপরিব্রাজক ও জিবিসি
শ্রীমৎ ভক্তিচারু স্বামী
গুরুমহারাজ

বিশ্বপরিব্রাজক ও জিবিসি
শ্রীমৎ সুভগ স্বামী
গুরুমহারাজ

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য
কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি

শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের
শিষ্যগণ কর্তৃক প্রদত্ত প্রবচন থেকে সংগৃহীত

নিত্য আনন্দের
পথ নির্দেশ

ইসকন গুরুবর্গের প্রদত্ত প্রবচন থেকে সংগৃহীত

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নিত্য আনন্দের পথনির্দেশ

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি

শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের

শিষ্যগণ কর্তৃক প্রদত্ত প্রবচন থেকে সংগৃহীত

ভক্তিবেদান্ত পাবলিশিং হাউস

শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ

প্রকাশক ঃ
ভক্তিবেদান্ত পাবলিশিং হাউসের পক্ষে
তেজোগৌরাঙ্গ দাস ব্রহ্মচারী

প্রথম প্রকাশ ঃ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা জয়ন্তী, মোক্ষদা একাদশী
৯ ডিসেম্বর ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ
২৩ অগ্রহায়ণ ১৪১৫ বঙ্গাব্দ
২৬ কেশব ৫২২ গৌরাব্দ
৩০০০ কপি।

কম্পোজ ঃ কৃষ্ণপরমপুরুষ দাস ব্রহ্মচারী
পৃষ্ঠাসজ্জা ঃ রাধিকেশ দাস ব্রহ্মচারী
প্রচ্ছদপট ঃ অপূর্বগোবিন্দ দাস ব্রহ্মচারী

মুদ্রণ ঃ
শ্রীমায়াপুর চন্দ্র প্রেস
বৃহৎ মৃদঙ্গ ভবন
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
পশ্চিমবঙ্গ, ৭৪১৩১৩
☎ (০৩৪৭২) ২৪৫-২১৭, ২৪৫-২৪৫, ২৪৫-৫৭৮

সূচীপত্র

শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী মহারাজের প্রদত্ত প্রবচন

শ্রীমৎ ভক্তিচারু স্বামী মহারাজের প্রদত্ত প্রবচন

শ্রীমৎ সুভগ স্বামী মহারাজের প্রদত্ত প্রবচন

ভূমিকা

ইসকন শ্রীমায়াপুর চন্দ্রোদয় মন্দির কক্ষে প্রত্যহ সকাল ৮টার সময় শ্রীমদ্ভাগবত ও রাত্রি ৮টার সময় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা প্রবচন হয়। মাঝে মধ্যে গুরুমহারাজগণও প্রবচন দিয়ে থাকেন। সেই প্রবচনগুলোকে রেকর্ডিং করে ভগবৎ-দর্শন পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়। বহু ভক্তের অনুরোধে প্রকাশিত প্রবচনগুলোকে একত্রিত করে গ্রন্থ আকারে লিপিবদ্ধ করা হল।

আপনি হয়ত প্রবচন শোনেন, তারপর কিছুদিন পর ভুলে যান, কিন্তু গ্রন্থের মধ্যে লিপিবদ্ধ থাকলে আপনি যখন খুশি প্রবচনগুলো অধ্যয়ন করতে পারবেন। ভগবৎ-দর্শন পত্রিকার ১২শ বর্ষ থেকে ৩১তম বর্ষ পর্যন্ত প্রবচনগুলো নিয়ে 'নিত্য আনন্দের পথনির্দেশ' নামে গ্রন্থটি প্রকাশ করা হল। আশাকরি আপনাদের কাছে গ্রন্থটি সমাদৃত হবে।

—প্রকাশক

শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী মহারাজের প্রদত্ত প্রবচন

ভক্তিরত্নকে রক্ষা করুন

আমরা যখন মায়ার কবলে পড়ি, যখন আমাদের মাথা নিচু করে চলতে হয়, যখন আমরা নিদ্রাগ্রস্ত হয়ে থাকি, অবসন্ন হই, বহু উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় মন ভরে থাকে, তখন যদি আমরা যাচাই করে দেখি, তা হলে দেখতে পাব এর মূল কারণটা কি—কারণটা হল আমাদের জীবনে ভবিষ্যতের আশা হারিয়ে ফেলেছি। আমরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সম্পর্কে আমাদের স্বচ্ছদৃষ্টি হারিয়ে ফেলেছি।

এছাড়া আর কোনই কারণ নেই। কৃষ্ণভাবনার মধ্যে কোনও কিছুরই অভাব নেই। কোনও ঘাটতি নেই। যদি কোন কিছুর অভাব থাকে তো সেটা হল কৃষ্ণভাবনার পথ অনুসরণ করে চলায় আমাদের সামর্থ্যের অভাব। আর সেই অভাবটাও ঘটে আমাদের মনকে বিভ্রান্ত হতে সুযোগ দিই বলে—শ্রীবাস আচার্য ঠিক তাই বলেছেন।

যখন আমরা একটা রত্ন লাভ করি, শুদ্ধ ভক্তির রত্নটিকে যখন অর্জন করি, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপারত্নটি পাই, তখন তাকে সযত্নে রক্ষা করা চাই আমাদের।

আমি যখন বিশ্বপরিক্রমায় যাই, আমি দেখেছি, অনেক জায়গায়, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার আয়োজন করা হয়ে থাকে। একটা জনসমাবেশে তো আমাদের জীবন বিপন্ন হয়ে উঠেছিল। অনেকেই জানে না, কিছু লোকের হাতে অস্ত্রশস্ত্র থাকেই, কারণ অসুর সম্প্রদায়ের লোকেরা এখন খুব জাহির করে বেড়ায়। তাই তারাই বেশি করে নিজের প্রতিরক্ষার কথা ভাবে।

তবে সেটা তো এক ধরনের আত্মরক্ষার ব্যাপার। কিন্তু আমাদের চিন্তা করা উচিত ভগবদ্ভক্তির রত্নটিকে রক্ষা করতে পারি কিভাবে। বৈষ্ণব অপরাধ থেকে, জড়-জাগতিক বাসনা থেকে কিভাবে সেই রত্নটিকে বাঁচাতে পারি।

শ্রীবাস আচার্য প্রভু জল্পনা-কল্পনাকারীদের সঙ্গে বারবনিতাদের তুলনা করেছেন। তারা এসে আমাদের দু'কান ভরিয়ে তোলে অনেক মিষ্টি কথায়, তাদের প্রজল্প দিয়ে আমাদের মোহিত করে যেন ডাক দেয়, 'এস আমাদের সাথে'। আর আমরা ঐ সব প্রজল্পকারীদের কথায় কান দিলেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছ থেকে দূরে সরে যেতে থাকব এবং তৎক্ষণাৎ অমৃতের আস্বাদন ভুলে যাব। বৃথা মানমর্যাদার মধ্যে তখন আমরা মগ্ন হতে চাইব। নাম-যশ, প্রভাব-প্রতিপত্তি, প্রশংসাবাদ—এই সমস্ত জড়জাগতিক পর্যায়ের প্রলোভনে আমরা তখন বড় বেশি আকাঙ্ক্ষা বোধ করব।

তখন যেন ঠিক ডাকাত-পড়ার অবস্থা হয়। বাড়িতে যেন ডাকাত পড়েছে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আর আমাদের ভক্তিরত্ন লুটেপুটে নিয়ে ভাগছে। তাই, এমনি অবস্থায় আমাদের আত্মরক্ষা তথা প্রতিরক্ষার ব্যাপারে খুব অভিজ্ঞ হতেই হবে। প্রতিরক্ষার সব চেয়ে ভাল ব্যবস্থাটা কি হতে পারে?

আক্রমণ করাই হল প্রতিরক্ষার সব চেয়ে ভাল পন্থা। দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলতে হবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচারকার্যে। সংকীর্তন প্রচার করতে হবে। যতক্ষণ আপনারা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপা বিতরণ করতে থাকবেন এবং সেই সাথে কৃষ্ণনাম প্রচার করতে থাকবেন, আপনাদের গুরুবাক্য অনুসরণের পথে অবিচল থাকবেন, ততক্ষণ ঐসব অশুভ প্রভাবে চঞ্চল হবার কোন অবকাশই পাবেন না—ঐ ভক্তিরত্ন চুরি হয়ে যাবার কোন ভয়ই আর থাকবে না। তা না হলে, কেবল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতেই থাকবেন, চোখের সামনে রত্ন চুরি হয়ে যাবে।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এসেছিলেন, তিনি আমাদের কৃপা করেছিলেন এই পবিত্র ধামে এবং আমাদের পথপ্রদর্শক কোন সূত্রই ছিলনা। আমরা শুনেছি শ্রীল সৎস্বরূপ গোস্বামীর কাছ থেকে, সেই কথা প্রচারের উদ্দেশ্যে শ্রীল প্রভুপাদ কি কষ্টটাই না করেছিলেন আমেরিকায় যাওয়ার জন্য, সেখানে যাওয়ার অনুমতি সংগ্রহের জন্য, তাকে 'স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া'তে যেতে হয়েছিল, সেখানে দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ গিয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে, বারে বারে ফিরে আসতে হয়েছে আর কর্মচারী-কেরাণিরা তাঁকে কত হেনস্তা করেছিল, তাঁকে প্রতীক্ষা করে থাকতে হত, এই ফর্ম সেই ফর্মের জন্য তাঁকে হন্যে হয়ে ঘুরতে হয়েছিল, জাহাজ কোম্পানীর কাছে ভিক্ষা প্রার্থনা করতে হয়েছিল তাঁকে, তাঁরা বলতেন, "যাবেন না, পশ্চিমীদেশে যাবেন না, খুব কঠিন জায়গা, আপনার এখন বেশ বয়স হয়ে গিয়েছে, ওখানে গিয়ে মারা পড়বেন। ওখানকার লোকজন সুবিধের নয়, ওদের খুব একটা দয়ামায়া নেই। ভারতবর্ষে সাদাসিধে একটা সাধু হয়ে থাকাটা এক ধরনের ব্যাপার, কিন্তু যদি আপনি পশ্চিমীদেশে যান তো ওরা আপনার সঙ্গে এমন বিশ্রী আচরণ করবে—বিশেষ করে যদি আপনার টাকাপয়সা আর বন্ধুবান্ধব না থাকে তো কথাই নেই। ওসব মতলব ছেড়ে দিন।"

প্রত্যেকে এমনিভাবে হতাশ করে দিয়েছিল। তিনি রাষ্ট্রদূতের কাছে ছুটতেন, চারিদিকে হন্যে হয়ে ঘুরতেন, কত ঝঞ্ঝাট পোয়াতেন—ধারণা করা একেবারেই অসম্ভব যে, অতখানি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা কেমন করে একটা মানুষের

মনের মধ্যে থাকতে পারে—শুধু মাত্র সেই একটি বাণী বহন করার উদ্দেশ্যে এবং কেবল একটি চিন্তা মনের মধ্যে ধারণ করে যে, "আমার গুরুদেবের জন্য এটুকু আমাকে করতেই হবে।"

প্রত্যেকেই তাঁকে বলেছিল, "যাবেন না। আপনার সিদ্ধান্তটা মোটেই পাকাপোক্ত নয়।" তিনি কে কি বলছে, কারও কথা শোনেননি। শুধুই ছিল তাঁর এক চিন্তা—"আমার গুরুদেব চেয়েছেন, আমাকে যেতেই হবে।"

যদি শ্রীল প্রভুপাদ না যেতেন—এই কথাটা আমি কখনই না ভেবে থাকতে পারি না—এমন কাজটি তিনি না করলে—আমাদের কি অবস্থা হত আজ? আর যেহেতু তিনি আমেরিকায় গিয়েছিলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শুদ্ধ উপদেশ-বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে, তাই আজ পৃথিবীর সর্বত্র সবাই এই পরম মূল্যবান রত্নলাভের সুযোগ পেয়েছি।

ঠিক এই ধরনের চিন্তার আলোকে যে কেউ ব্যাপারটিকে যদি মন দিয়ে ভাবেন তো এই উপলব্ধি হবেই। মনে হবে "আমাদের গুরুদেবের মাধ্যমে কেবলই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী গ্রহণ করে চলি"—আর কোনই কথা নেই—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যে কী অমূল্য রত্ন দিয়েছেন, তার মূল্যের কোনও হিসাব-নিকাশ নেই। তাই সেটিকে লাভ করার জন্য কি না করা যায়। তবে মাঝপথে আমাদের সামনে দাঁড়ানো মায়াজটজালে বিভ্রান্ত হলে চলবে না।

কুয়াশার মধ্যে কিছু দেখা যায় না। নিজের হাতটাও ঘন অন্ধকারের মাঝে দেখা যায় না। সূর্য উঠলে তবে সব কিছু দেখা যায়। ঠিক তেমনি, আমাদের এই আন্দোলনের সামনে যে সব প্রবল বাধা বিপত্তি রয়েছে, সেই সমস্তই অবলীলাক্রমে ধ্বংস করে ফেলা যাবে যদি শুধুমাত্র শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শুদ্ধ রূপটুকু হৃদয়ে ধারণ করে থাকি। তিনি আমাদের যাচাই করছেন, ঠিক যেমনভাবে শ্রীল প্রভুপাদকে শ্রীকৃষ্ণ যাচাই করেছিলেন। অমন পরীক্ষায় কে পাশ করতে পারত! আমাদের সামর্থ্য মতোই অবশ্য পরীক্ষা হয়। আন্তরিকতা যদি আমাদের থাকে, যদি বিপরীত পন্থার সাথে কোনও রফা না করি, তবে আমাদের আর ভয়টা কীসের। কেবল কঠোরভাবে বিধিবদ্ধ নিয়মগুলি মেনে চলতে হবে।

হিমালয়ের দেশ নেপালে অনেকে যায় পর্বতে উঠে কৃতিত্ব অর্জনের জন্য। সেখানে অনেক সময় হঠাৎ পর্বতে বরফপাত শুরু হয়। তুষারধ্বস নেমে আসে। এই তুষারধ্বসের কারণ জানতে গিয়ে দেখা যায়—আকাশ থেকে রাতে শিশির পড়ে সেগুলি জমে গিয়ে গড়িয়ে নামতে থাকে এবং ক্রমশ বড় হতে থাকে। তারপরে একটা বিরাট বাড়ির মতো বড় হতে থাকে। গড়াতে গড়াতে সেটি নিচে নামতে থাকে। শেষে একটা পর্বতের মতো হয়ে তার পতন ঘটে।

ঠিক এইভাবেই আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করে চলেছে। কৃপার মহাখণ্ড আমাদের হাতে। এমন আশ্চর্য সেবা অধিকার আর কীসেই বা হতে পারে?

এমন সুযোগ কেউ ছাড়বেন না। এর থেকে বড় কাজ আর কি আছে? এর চেয়ে বড় বিস্ময়কর ব্যাপার আর কি হতে পারে? এই পরোপকার সেবায় কেউ অবহেলা করবেন না। মহাপ্রভুর অশেষ কৃপা রয়েছে এই মহাযজ্ঞে।

তুষার পর্বতে তুষারের পিণ্ড ক্রমশ বড় হয়ে দ্রুতগতিতে নেমে আসতে থাকে। ঠিক তেমনিভাবে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনও এগিয়ে চলেছে আর ক্রমশ বড় হচ্ছে এবং একদিন বিশালাকার ধারণ করে সমাজের ওপরে নেমে আসবে।

তাই আমাদের সকলকে এই আন্দোলনের মধ্যে দৃঢ়ভাবে থেকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করে যেতে হবে, এই হোক আজ আমাদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা।

পারমার্থিক বোনাস 'কৃপা'

শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন, দেবীধাম, হরিধাম, মহেশধাম ও গোলোকধাম—এই চারটি ধামই আমরা মায়াপুরে দেখতে পাই। ভাগবতে (৪/৬/৮-৪২) মহেশধামের বিশদ বর্ণনা দেওয়া আছে। কৈলাস হল শিবের আবাসস্থল। স্বর্গীয় গ্রহলোকগুলি থেকে দেবতারা যখন কৈলাসে আসেন, তাঁরা চমৎকৃত হয়ে যান। ব্রহ্মলোকেরও ঊর্ধ্বে শিবের এই আবাসস্থল এই কৈলাস। হিমালয়ে কৈলাস নামে একটা জায়গা আছে, সেই এই কৈলাসেরই বিস্তার।

কৈলাসের প্রাকৃতিক বর্ণনা ভারি সুন্দর—বিভিন্ন রকমের ফলের গাছ, ফুলের গাছ, ওষধি গাছ-গাছড়া, জলপ্রপাতের মাঝে বিভিন্ন প্রজাতির পশুপাখিও বাস করে সেখানে। সে যেন প্রাকৃতিক শিল্পকলার এক নিদর্শন। এ সবই শিবের পরিকল্পনায় সৃষ্ট।

ভগবান বিষ্ণু যখন তাঁর ত্রিবিক্রমরূপে ব্রহ্মাণ্ডের আচ্ছাদন ভেদ করেন, তখন কারণ সমুদ্রের জল গঙ্গা রূপে বাহিত হয়ে ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করে, এবং শিব সেই জলরাশি তাঁর মস্তকে ধারণ করেন। সেইখান থেকে গঙ্গা বিভিন্ন গ্রহলোকে প্রবাহিত হয়। অতএব গঙ্গা কারণসমুদ্র থেকে মহেশধাম হয়ে দেবলোক—আদি চৌদ্দ ভুবন বয়ে চলছে—যেটি এখন আমাদের মায়াপুর চন্দ্রোদয় মন্দিরের এত কাছ দিয়ে বঙ্গোপসাগরে, এবং সেখান থেকে আরও অন্যান্য স্থানে বয়ে চলেছে।

এটা শুধুই জল নয়; এটা পারমার্থিক জলের ধারা, দিব্য বারি। আমরা দেখি গঙ্গার একাংশের জল বাংলাদেশে পদ্মা নদীতে চলে গেছে, কিন্তু শাস্ত্র বলে গঙ্গার পবিত্র জল পদ্মায় যাচ্ছে না, তা এই ভাগীরথী দিয়ে বইছে।

যেসব লোকেরা বৈষ্ণবদের সম্মান করে চলেন, তাঁরাই এই জগতের সবচেয়ে ভক্তিমান শ্রেণী। সেই রকমই প্রত্যেক নদী, প্রত্যেক উৎসব, প্রত্যেক জায়গার ভিন্ন ভিন্ন প্রভাব আছে। গঙ্গায় স্নান করা মাহাত্ম্যপূর্ণ যেহেতু অন্য কোথাও স্নানের চেয়ে এখানকার স্নানের ভিন্ন প্রভাব পাওয়া যায়। এখানে উল্লেখ করা রয়েছে যে, বিশেষ কয়েকটি দিনে (যেমন গৌরপূর্ণিমা) গঙ্গাদেবী বিশেষ কৃপা প্রদায়িনী হন।

ভীষ্মপঞ্চক বলে একটি অনুষ্ঠান—কার্তিক মাসের উত্থান একাদশী থেকে শুরু হয়ে পাঁচদিন চলতে থাকে। এই পাঁচদিন যাঁরা অনুকল্প বা শস্য গ্রহণ বর্জন পালন করেন, তারপর অন্যান্য যজ্ঞাদির সাথে রাধাকৃষ্ণের পূজা করেন, তাঁরা অতি বিশেষ কৃপালাভে সমর্থ হন; এই পাঁচদিন তাঁদের জন্য থাকে বিশেষ অতিরিক্ত আশীর্বাদ।

এক দেশে খুব সাদাসিধে একটি লোক ছিল। সে নানা স্থানে ভ্রমণ করত। কুসঙ্গে পড়ে তার পতন হয়েছিল। আমিষ আহার, বিভিন্ন আসব পান ইত্যাদি নানা ভোগ্যবস্তুর প্রতি সে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল—যেসব কাজে পতিত লোকেরাই অভ্যস্ত। অতএব তার সঙ্গীরা তার সঙ্গ ত্যাগ করে চলে গেল, এবং সে যত রাজ্যের জঘন্য ক্রিয়াকলাপে মেতে উঠল।

একদিন সকালে অভুক্ত অবস্থায় ঘুরতে ঘুরতে সে কিছু ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবগণের দেখা পেল, তাঁরা যজ্ঞ করছিলেন। সে গিয়ে বলল, আমি ক্ষুধার্ত, কিছু খাবার পেতে পারি? অনেক দূর থেকে আসছি।

তাঁরা বললেন, তুমি কে? এখন খেতে চাইছ কেন? জান না আমরা আজ সবে ভীষ্মপঞ্চক ব্রত শুরু করেছি? আমাদের সাথে তুমি পাঁচদিন উপবাস

পালন কর—পাঁচদিন শস্যাদি বর্জন করে ফলমূল আহার গ্রহণ করে শ্রীকৃষ্ণের পূজা করলে তুমি কত আশীর্বাদ পাবে!

সে তখন সিদ্ধান্ত করল, ঠিক আছে, আমাকে আপনাদের সঙ্গে এই যজ্ঞে অংশগ্রহণ করতে অনুমতি দিন এবং আমার এই পতিত অবস্থা থেকে আমাকে কৃপা করে উদ্ধার করুন।

এইভাবে সে ব্রাহ্মণদের সেবা করে শুদ্ধ হয়ে ভগবানের ভক্ত হয়ে গেল এবং তার জীবনের শেষে বিষ্ণুদূতরা বিশেষ আকাশযানে চড়ে এসে তাকে দিব্য শরীর দান করে সোজা গোলোকধামে নিয়ে চলে গেল। তো, এইরকমই, ভক্তদের গোলোকধামে ফিরে যাবার জন্য সেই ভাবে ভাবতে হয় না; তাদের যা করণীয় তা হল সর্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণকে খুশি করার চেষ্টা করা। সব একাদশী পালন, জন্মাষ্টমী, গৌরপূর্ণিমা উদ্‌যাপন, গুরুপূজায় অংশগ্রহণ, গুরুর আদেশ পালন, ভগবানের পূজা করা—এইগুলি বছরে ৩৬৫ দিন পালন করলে ভক্ত আপনিই সব যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হতে পারে।

কিন্তু লোকে সহজে উপরি পাওনা পেতে চায়—রাসপূর্ণিমায় তারা দল বেঁধে মায়াপুরে আসে, এলাহাবাদের কুম্ভ মেলায় লক্ষ লোক সমাগম হয় কারণ ঐ সময়ে ত্রিবেণী সঙ্গমে স্নান করতে পারলে একটু বেশি কৃপা লাভ করা যায়। ভক্তরা কিন্তু সেখানে যান সাধুসঙ্গ করার উদ্দেশ্যে। ঋষিতুল্য ভক্তদের সঙ্গ করার জন্য এবং প্রচার করার জন্য এটা একটা বড় সুযোগ।

শ্রীকৃষ্ণ যেহেতু সকলের পিতা, মায়াপুর ধামও সকলের বাড়ি। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের স্বপ্নে দেখা এক দিব্য নগরীর একটা বিবরণ আছে—বিশাল মন্দির, অপূর্ব সব গাছপালা, বাগান ইত্যাদি রয়েছে সেখানে। দিব্য নগরীকে দিব্য পর্যায় থেকে আমাদের কাছে দৃশ্যমান পর্যায়ে পুনঃপ্রকাশ করতে হবে। অস্তিত্ব তার রয়েছেই—উচ্চ মাত্রায় রয়েছে। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তার দর্শন পেয়েছিলেন; নিত্যানন্দ প্রভু তা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। তার অস্তিত্ব রয়েছে, এখন আমাদের তা প্রকাশিত করে তুলতে হবে—তার সুবর্ণ সুযোগ আমাদের রয়েছে।

অবশ্য সকলের সহযোগিতাও আমাদের দরকার। এখানে কৈলাসের বর্ণনায় আমরা দেখছি দিব্য নগরীতে কত গাছপালা বাগান রয়েছে। আমাদেরও ঐ রকম নগরী বানাতে হবে। ভক্তরা গাছ লাগাবে—ফলের গাছ, ফুল গাছ—ইঁটকাঠের বাড়ি দিয়ে ভিড় করলে চলবে না। এটা হবে শ্রীশ্রীরাধামাধবের কাছে আমাদের নিবেদন। তাঁরা হলেন 'কুঞ্জবিহারী'—বনে

বসে থাকতে তাঁরা আনন্দ পান। তাই আমরা এই গুপ্ত-বৃন্দাবনে (মায়াপুরে) সুসজ্জিত বন তৈরি করতে চাই যাতে তাঁরা এইসব কুঞ্জে এসে উপভোগ করতে পারেন।

শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর শিষ্য ও অনুগামীদের শুধু ভক্তিমূলক চিন্তা করতেই বলতেন না, তিনি উৎসাহ দিতেন কিভাবে বাস্তবে আমাদের চিন্তাভাবনা, বাক্য, কাজকর্ম সবকিছু ভক্তিমূলক কাজে লাগাতে পারি। গুরুদেবের, পূর্ববর্তী আচার্যদের, গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর ও তাঁর পার্ষদদের এবং শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মনোগ্রাহী ভক্তিমূলক কাজে আমাদের বুদ্ধিমত্তার ব্যবহারই তার উপযুক্ত সদ্ব্যবহার।

ভগবানের আশ্চর্য সৃষ্টি, তাঁর এবং তাঁর ভক্তদের অপ্রাকৃত উপস্থিতি—এইসব সম্বন্ধে সবাইকে বই পড়তে হবে। আমাদের কাজকর্ম অনেক সময় জাগতিক মনে হলেও শ্রীল রূপগোস্বামী বলেছেন, যা-কিছুই কৃষ্ণচেতনা বৃদ্ধি করবে তা-ই উন্নতি বৃদ্ধি করবে। তা হবে বিষ্ণুর জন্য কর্ম। এখানে মায়াপুরে আমরা ছাপাখানায় প্রভুপাদের গ্রন্থ প্রকাশ করছি—এই পারমার্থিক কাজ প্রভুপাদের খুব প্রিয়। এখন বাংলা ভাষায় শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হওয়ায় আরও বহুজন আধ্যাত্মিক সত্য উপলব্ধি করার সুযোগ পাবে। কত লোক এখানে আসছে। তারা এবং মন্দিরের ভক্তরাও সকালের সাধনায় জপক্লাসে, পাঠে অংশগ্রহণ করে, পুরাণের কাহিনী শুনে আধ্যাত্মিক লাভ পাচ্ছে। এইভাবে ভক্ত এবং অতিথিরাও ভগবৎ-কথা শ্রবণ করে। মন্দির দর্শন করে আপনা-আপনিই বিশেষ উপরি কৃপা লাভ করে ফিরছে।

পাপ-পুণ্যের জমা খরচের হিসাব

আমরা যখনই সুখ ভোগ করি, তখনই উপলব্ধি করা উচিত যে, আমাদের প্রারব্ধ শুভ কর্মফলের পরিণামেই সেই সুখ ভোগের সুযোগ দিয়েছেন ভগবান। তবে সুখ ভোগ করার সঙ্গে সঙ্গেই সেই সঞ্চিত পুণ্যফল ক্ষয় হতে থাকে। ধ্রুব মহারাজের মতো মহাত্মাও ভগবানের এই আইনের বাইরে যেতে পারেননি।

অধিকাংশ লোকেই যখন সুখ উপভোগ করে, তখন মনে করে, এমনটাই চলতে থাকলে বেশ ভাল হয়। কিন্তু জমানো টাকা খরচ করতে করতে যেমন

এক সময়ে তা ফুরিয়েই যায়, পুণ্যকর্মের ফল স্বরূপ সঞ্চিত সুখ উপভোগও এক সময়ে শেষ হয়ে যায়। তখন দুঃখ আসে।

এই জমা-খরচের হিসাব ঠিক রাখার জন্যই সুখ ভোগের সাথে সাথেই পুণ্য কর্মফলের হিসাবে কিছু কিছু জমা করার জন্য তপশ্চর্যা নিয়মিতভাবে পালন করে চলতে হয়। এই তপশ্চর্যাগুলির মধ্যে প্রধান চারটি হল—যৌন সংযম, মাছ মাংস বর্জন করে শুধু প্রসাদ আহার, দ্যূতক্রীড়া বর্জন এবং আসবাদি নেশা পরিহার।

এ ছাড়া অন্যান্য তপশ্চর্যা হল প্রতিমাসে দু'বার একাদশী তিথিতে শুদ্ধ সাত্ত্বিকভাবে উপবাস ব্রত উদ্‌যাপন এবং চাতুর্মাস্যে (আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র এবং আশ্বিন এই চার মাসে) যথাক্রমে শাক, দই, দুধ এবং বিউলি ডাল ভোজন বর্জন করতে হয়। এইগুলির মাধ্যমে মানব দেহে অত্যধিক পরিমাণে প্রোটিন সঞ্চয় নিয়ন্ত্রণের বিধি বৈদিক যুগ থেকেই প্রচলিত রয়েছে। তার ফলে মানুষ সুস্থ নীরোগ দীর্ঘ জীবন যাপনের সৌভাগ্য অর্জন করতে পারে এবং তার পুণ্যকর্মফল সঞ্চিত হয়। তবে সাধারণ মানুষ দান ধ্যান আর তীর্থ ভ্রমণের মাধ্যমে পুণ্য সঞ্চয়ের যে চেষ্টা করে থাকে, সেটাই সব নয়।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টিবিধানের জন্য যা করা হয়, তার মাধ্যমেই যথার্থ পুণ্য সঞ্চয় হয়ে থাকে। এই জন্য ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন নিয়মিতভাবে করা উচিত। শ্রেষ্ঠ পুণ্য সঞ্চয়ের সেটাই সহজতম পদ্ধতি। কেবলমাত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবার অনুকূল কাজ করতে থাকলেই নিরন্তর পুণ্য সঞ্চিত হতে থাকে।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই কারণেই আমাদের উপহার দিয়েছেন ভক্তি, যার মাধ্যমে চিন্ময় আনন্দ লাভ হয়। ধ্রুব মহারাজ ছত্রিশ হাজার বছর সার্থকভাবে পৃথিবী শাসন করেছিলেন, কেবলই ভগবানের সন্তুষ্টিবিধানের জন্য এবং জনগণকে ভগবদ্‌ মুখী করে তোলার জন্য। কলিযুগে ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য আমাদের চাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপাশীর্বাদ। তাঁর কৃপায় সামান্য মাত্র ভগবদ্ভক্তির চর্চা করলেই দিব্য আনন্দ লাভের পথ প্রশস্ত হতে থাকে এবং সর্বপ্রকার অশুভ কর্মের কুফল নাশ হতে থাকে।

যারা এই সব সদুপদেশ মানে না, তারা নিজেদের বড়ই বাস্তববাদী মনে করে বড়াই করে থাকে। তারা মনে করে, জীবনটাকে যেমন-তেমনভাবে উপভোগ করে নেওয়াটাই মানবধর্ম। তাই তারা তপশ্চর্যা করতে চায় না। তাই প্রকৃতপক্ষে তারা মোটেই বাস্তববাদী নয়, তারা মায়াবাদী—জগতের

মায়ামোহে আচ্ছন্ন হয়ে তারা যা খুশি খায়, যেমন খুশি চলে, যা মুখে আসে তাই বলে চলে। তাদের দুঃখ-দুর্দশার হিসাবের বোঝা সেই জন্য বাড়তেই থাকে।

এই প্রসঙ্গে অঙ্গুলিমালের কাহিনীটি যথার্থই তাৎপর্যপূর্ণ। এক দস্যু সমস্ত গৃহস্থের সর্বস্ব অপহরণ করে নিয়ে তাতেও সন্তুষ্ট হত না—অপহরণের শেষে গৃহস্থের কনিষ্ঠাঙ্গুলিটি নিষ্ঠুরভাবে কেটে নিয়ে আসত এবং সেই আঙ্গুলটিকে মালায় গেঁথে গলায় ঝুলিয়ে রাখত। ঐ দস্যুটির দলের সকলেই ঐভাবে গৃহস্থের সর্বস্ব অপহরণ করার পরে, তার কনিষ্ঠাঙ্গুলিটিকে নিয়ে গলায় মালার মতো ঝুলিয়ে রাখত কৃতিত্বের নিদর্শন স্বরূপ। যে-দস্যুর গলার অঙ্গুলিমালা যত দীর্ঘ হত, তার নিষ্ঠুরতা আর পাপকর্মের কৃতিত্ব তত বেশি বলে দস্যুদলে পরিগণিত হত।

ঘটনাক্রমে সেই দস্যুদলপতি অঙ্গুলিমালা একদা ভগবান বুদ্ধদেবের সান্নিধ্য লাভ করেছিল এবং তার ফলে সে তার জঘন্য পাপকর্মের ভয়াবহ কুফল সম্পর্কে উপলব্ধি অর্জনে সক্ষম হয়, অতঃপর দস্যুবৃত্তি পরিহার করে বৌদ্ধ ভিক্ষুরূপে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনের মাধ্যমে জীবিকা অর্জন করাই শ্রেয় মনে করেছিল।

এইভাবে দস্যু অঙ্গুলিমাল পাপজনিত কর্মফল থেকে অব্যাহতি পাওয়ার বাসনায় যখন গৃহস্থদের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষাবৃত্তির মাধ্যমে পুণ্যসঞ্চয়ের প্রয়াসী হয়, তখন একদিন সে কোনও এক গৃহস্থের বাড়িতে গিয়ে ভিক্ষা গ্রহণের সময়ে লক্ষ্য করে যে, সেই গৃহস্থটির হাতের কনিষ্ঠাঙ্গুলিটি নেই।

তখন সহসা অঙ্গুলিমালের বিচলিতভাব জাগে এবং সে বুঝতে পারে, অতীতে তার পাপ অনুশীলনের জীবনে সে নিশ্চয়ই এই গৃহস্থ বেচারির হাতের আঙুল কেটে নিয়েছিল।

ইতিমধ্যে সেই গৃহস্থটিও ভিক্ষুকে ভিক্ষা দানের সময়ে চিনতে পারল যে, সেই ভিক্ষুটিই একদা দস্যুরূপে তার সর্বস্ব অপহরণ করে তাকে নিঃস্ব করে দিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল।

সুতরাং চকিতের মধ্যে ভিক্ষুর প্রতি গৃহস্থটির মনোভাবের পরিবর্তন দেখা দিল। প্রতিশোধের অদম্য স্পৃহা এবং পূর্বস্মৃতিজনিত ভয়াবহ ভীতি তার মনে এক প্রবল হিংস্রভাব জাগিয়ে তুলল। ফলে, সেই গৃহস্থ তৎক্ষণাৎ সেই ভিক্ষুবেশী পুরাণো পাপী দস্যু অঙ্গুলিমালকে বেদম প্রহার করতে শুরু করে দেয় এবং এইভাবে সে তাকে বধ করে।

এই ঘটনার পরে অন্যান্য বৌদ্ধ ভিক্ষুরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে ভগবান বুদ্ধের সমীপবর্তী হয়ে বিনীতভাবে জানতে চায়, অঙ্গুলিমাল তার পূর্বকৃত পাপকর্ম সমস্ত পরিহার করে সম্পূর্ণভাবে ভিক্ষুজীবন যাপন করা সত্ত্বেও তাকে ঐভাবে নিগৃহীত হতে হল কেন? তবে কি ভিক্ষুজীবনের সঞ্চিত পুণ্যকর্মের কোনই মূল্য নেই?

এই তাৎপর্যপূর্ণ চিরন্তন প্রশ্নটির উত্তর প্রদান প্রসঙ্গে ভগবান বুদ্ধ তখন যে উপদেশ প্রদান করেছিলেন, তার সারমর্ম ছিল এই যে, পুণ্যকর্ম করে প্রারব্ধ পাপকর্মের ফলভোগ থেকে রক্ষা বিন্দুমাত্রও পাওয়া যায় না। পুণ্য কর্ম করলে তার সুফল যেমন সঞ্চিত থাকে, পাপকর্মের কুফলও তেমনই যথাযথভাবে সঞ্চিত হয়ে থাকে—তা ক্রমান্বয়ে জীবমাত্রেরই ভোগ করার বিধি চিরন্তন।

কেউ যদি মনে করে, জন্মে-জন্মে এবং ইহজন্মে যত পাপকর্ম সে করেছে, তার কুফল ভোগ থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য প্রচুর পরিমাণে পুণ্যকর্ম করতে থাকলেই পাপকর্মের কুফল কমতে থাকবে, তা হলে তাকে এই অঙ্গুলিমালের কাহিনী স্মরণ করতে হবে।

জীবনে যে কোনও পাপকর্ম করলেই তার পরিণামগত কুফল সঞ্চিত হয়ে থেকে যায় এবং পাপীকে তা কোনও না কোনও প্রকারে ভোগ করতেই হয়—তা থেকে কোনও মুক্তিলাভের অবকাশ থাকে না। পুণ্যকর্ম দিয়ে পাপকর্মের কাটাকুটি খেলা করা চলে না। এটাই জড়া প্রকৃতির কঠোর নিয়ম। কিন্তু শুদ্ধ ভক্তিমূলক সেবা পাপ ও পুণ্য ফলকে সম্পূর্ণ ক্ষয় করে দিতে পারে।

সুতরাং পাপকর্ম থেকে সম্পূর্ণভাবে বিরত থাকার মতো জীবনধারা অনুসরণ করাই সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমানের কাজ বলে শাস্ত্রসমূহে নির্দেশিত হয়েছে, এবং তাই হচ্ছে শুদ্ধ ভক্তির অনুশীলন। যারা শাস্ত্রীয় অনুশীলনাদি জানে না কিংবা জানলেও জড়জাগতিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের অহঙ্কারে শাস্ত্রীয় অনুশাসন মানে না, তারা বুক ফুলিয়ে প্রকাশ্যে পাপকর্ম করে থাকে এবং অবধারিতভাবেই একদিন দস্যু অঙ্গুলিমালের মতোই সর্বজনসমক্ষে পাপের ফল ভোগ করে। তার কোনরকম অন্যথা হয় না। ইহজন্মে না হোক, পরজন্মেও এমন কি বহু জন্ম-জন্মান্তর ধরেও, সঞ্চিত পাপকর্মফল ভোগ করে চলতে হয়।

তেমনি পুণ্যকর্মের ফলও সঞ্চিত থাকে এবং ইহজন্মে ও জন্মজন্মান্তর ধরে তার সুফল ভোগ করা চলে। এই পুণ্য ফলও এক শক্ত বন্ধন। তাই বুদ্ধিমান মানুষমাত্রেই এই বিবেচনায় ভক্তি-জীবন যাপন করে সর্বদাই পাপ এবং পুণ্য উভয় প্রকার ফলের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়। অঙ্গুলিমাল ভিক্ষু-জীবন গ্রহণ করে

পুণ্য সঞ্চয় করছিলেন, কিন্তু তিনি শুদ্ধ ভক্তিজীবন গ্রহণ করেননি বলে তাঁকে শাস্তি ভোগ করতে হয়েছিল। পাপ এবং পুণ্যের ফল যদিও পরস্পরকে প্রভাবিত করে না, কিন্তু শুদ্ধ ভক্তি মূলক সেবায় নিযুক্ত হলে উভয় প্রকার কর্ম-বন্ধনই ক্রমে ক্রমে নিঃশেষিত হয়ে যায়।

পুণ্যনামের বন্যায় ভাসবে সবাই

একজন আসুরিক ব্যক্তি বলতে পারে—আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না, আমি ঈশ্বরের সামনে প্রণাম করব না। কারোর সামনে আমি কখনই প্রণাম করব না। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন যারা অসুর তাদের জন্য মৃত্যু রূপে ভগবান বিরাজ করেন। তারা যদি স্বেচ্ছায় ভগবানকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম না করে, তা হলে মৃত্যুকালে চিৎ হয়ে ঠাকুরের সামনে শুয়ে পড়তে হবে, প্রণাম করতে হবে—তা ইচ্ছাকৃতভাবেই হোক বা অনিচ্ছাকৃতভাবেই হোক।

আর দেহের মৃত্যুর পর আত্মা তো চিরকাল বেঁচে থাকে। পরের জন্ম কোন্ জায়গায় হবে তা বলার আমাদের অধিকার থাকে না। যেমন পাশ্চাত্য দেশে একটা ব্যবস্থা আছে যে, যারা ঘর থেকে বেরুতে চায় না, তাদের জন্য টেলিফোন গাইডের মতো একটা মোটা বইতে সমস্ত রকম জিনিসের নাম দাম বিবরণ দেওয়া আছে—জামাকাপড়, গাড়ি, খেলনা, বাড়ির কাজের জিনিস ইত্যাদি। তার থেকে পছন্দ করে ফোন করে দিলে বাড়িতে এসে দিয়ে যায়।

সেই রকম পরের জন্মে কি হব—দেবতা হব, না, অসুর হব—এই রকম একটা জনমত নেওয়া হয়েছিল ইয়োরোপিয়ান সব ছেলে-মেয়েদের কাছে—কে কি হতে চান। তাতে অনেকে বলেছে, আমি বাঘ হতে চাই, বিড়াল হতে চায় ইত্যাদি। ওদের কাছে এটা খেলার মতো।

তবে দৈব প্রভাবে সেই রকম কিছু ইচ্ছা থাকলে—হতে পারে! পশু হতে পারে, গাছ হতে পারে—তার ওপর কোনও বিচার নেই, বিচার ভগবানের হাতে।

তাই যদি কেউ স্পর্ধা দেখায়, আমি যা ইচ্ছা করব, সে তো চিরকাল বেঁচে থাকতে পারবে না এই দেহ মধ্যে, মৃত্যুর পর ভগবান বিচার করবেন।

তবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায়—

"পাপী তাপি যত ছিল
হরিনামে উদ্ধারিল
তার সাক্ষী জগাই মাধাইরে।"

শ্রীমায়াপুরে যখন বন্যা হয়েছিল, তখন চারিদিকে শুধু জল আর জল, নবদ্বীপ মায়াপুর সব ডুবে গিয়েছিল। সেই রকম, মহাপ্রভু বলছেন, সমস্ত জগত আমি ভগবৎ প্রেমে প্লাবিত করে দেব।

জগৎকে প্রেমে প্লাবিত করা—আমাদের একটা অনুমান রয়েছে, প্লাবনটা কি জিনিস। প্লাবন মানে, পালাবার কোনও উপায় নেই। দু'এক জনের দোতলা চারতলা বাড়ি থাকলে তারা পালিয়ে থাকতে পারে। তেমনই মহাপ্রভু দেখলেন তিনি যেখানে যেখানে গেছেন উড়িষ্যা, বিহার, বাংলা—সেই সব জায়গার সমস্ত লোক কৃষ্ণপ্রেমের জোয়ারে প্লাবিত হলেও কয়েকজন নির্বিশেষবাদী তখনও পালিয়ে রয়েছে, তারা এখনও প্রেম বন্যায় ডুবে যায়নি।

তখন মহাপ্রভু বললেন, ঠিক আছে, ওরা পালাতে চায় পালাক কিন্তু আমার একটা পরিকল্পনা নিচ্ছি ওদের উদ্ধার করবার জন্য। তখন প্রকাশানন্দ সরস্বতী যিনি মায়াবাদী আচার্য ছিলেন বেনারসে কাশীতে তাঁর কাছে গেলেন। সেখানে অনেক আচার্য সন্ন্যাসীরা এসেছেন। মহাপ্রভু দরজার কাছে যেখানে সব সন্ন্যাসীরা খালি পায়ে এসে পা ধুয়েছে—ঐ পা ধোয়া জলের মধ্যে উনি বসেছেন। প্রকাশানন্দ বলছেন—আপনি ওখানে কেন? তখন মহাপ্রভু শরীর থেকে জ্যোতি প্রকাশ করছিলেন এবং মায়াবাদীরা জ্যোতিটা খুব ভালোবাসে। তারা জ্যোতি দেখে তার প্রভাব দেখে বলছে, আপনি এরকম নোংরা জায়গায় বসেছেন কেন?

মহাপ্রভু বলছেন, আপনারা তো সব উঁচু স্তরের সন্ন্যাসী, আপনাদের সাথে কি বসতে পারি? আমি এখানেই বসি। তখন প্রকাশানন্দ তাঁকে তাঁদের মাঝখানে নিয়ে গিয়ে বসালেন।

কেউ নিজে সেখানে বসতে চাইলে কি বসতে দিত? মহাপ্রভুর বিনয় ছিল একটা অস্ত্র। ঐ বিনয় দ্বারা তিনি একেবারে মাঝখানে পৌঁছেছিলেন। তখন ওরা সকলে মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করল, আপনি তো আমাদের মতো একজন সন্ন্যাসী, তবে আপনি জনসাধারণের সঙ্গে মিশে এরকম লীলা করেন কেন? কেন বেদান্ত পাঠ করেন না সন্ন্যাসীর মতো?

মহাপ্রভু তখন কিছু বলার অনুমতি চেয়ে বললেন, আমি কি করব, আমার গুরুদেব আদেশ দিয়েছেন, কলিযুগে হরেকৃষ্ণ নামই একমাত্র উপায়—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্ ।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

হরিনামই হচ্ছে এই যুগের গতি। তাই আমি সকলের সাথে সংকীর্তন আন্দোলন করি। আর হরিনাম করতে করতে আমি পাগলের মতো হয়ে যাই, কথা আটকিয়ে যায়, কখনও হাসি, কখনও জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যাই। এই অবস্থায় আমি গুরুদেবের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করেছি, আপনি কি মন্ত্র আমাকে দিয়েছেন—আমার মাথা ঘুরে যায়। এই হরিনাম করতে কি আমি ভুল করছি?

গুরুদেব বলেছেন, ভুল করবে কেন? এ সব তো হচ্ছে প্রেমের লক্ষণ। তোমার মধ্যে ভক্তি আছে বলে নাম করতে করতে তোমার মধ্যে এই ভাবগুলি প্রকাশিত হচ্ছে।

মহাপ্রভু বললেন, তাই আমি হরিনাম করছি। বলুন, এতে কোনও দোষ আছে?

তখন তারা বলল, হরিনাম তো ভাল, কিন্তু বেদান্তসূত্র তো পাঠ করতে হবে সন্ন্যাসীদের। এই সুযোগ যখন মহাপ্রভু পেয়েছেন তখন আবার বিনয় প্রদর্শন করে তাদের অনুমতি চেয়ে নিলেন কিছু বলার জন্য এবং মহাভারত থেকে ব্যাখ্যা করে এমন সুন্দর বেদান্তসূত্র পাঠ করলেন যে, সমস্ত বেদান্তিক সন্ন্যাসীরা মহাপ্রভুর শরণাপন্ন হয়ে পড়ল।

এইভাবে মহাপ্রভু সমস্ত জগৎকে ভগবৎ-প্রেমে প্লাবিত করেছেন।

যেখানে শুদ্ধ ভক্তি, সেখানে হয় না অগতি

শ্রীমদ্ভাগবতে কপিল মুনি দেবহূতিদেবীর কাছে বর্ণনা করছেন ভক্তিসেবা বিষয়ে। 'ভক্তি'কে বিশ্লেষণ করে তিনি বলছেন যে, দু'প্রকার ভক্তি আছে—শুদ্ধ ভক্তি ও মিশ্র ভক্তি। সাধারণ মানুষ এটা বুঝতে পারে না। দেখা যায় লোকে এর কাছে তার কাছে প্রার্থনা করছে, মনে করছে সেটাই ভক্তি। কিন্তু কি ভক্তি? —শুদ্ধ, না, কর্মমিশ্রিত? এখানে কপিল মুনি তাঁর মায়ের কাছে ব্যাখ্যা করছেন আমরা কি করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করতে পারি।

শুদ্ধ ভক্তি থাকলে তবেই ভগবানকে সহজে লাভ করা যায়। কিন্তু ভক্তি যদি মিশ্রিত থাকে, তা হলে বিভিন্ন ফল পাবে, ভগবানকে পেতে দেরি হবে।

তারপর, কপিল মুনি তমোগুণ মিশ্রিত ভক্তি, রজোগুণ মিশ্রিত ভক্তি বিশ্লেষণ করে এখন সত্ত্বগুণ মিশ্রিত ভক্তির কথা বলছেন। 'আমি পাপ করলাম' 'আমি কষ্ট পাচ্ছি', 'আমি ভগবানকে পূজো করব', 'আমি সেই কষ্ট থেকে মুক্ত হব,'—এই ধরনের পূজো হচ্ছে সত্ত্বগুণে যারা আছে তাদের। রজোগুণে যে ভক্তি আছে, তাতে লোকে কোনও ফল চায়, স্বর্গে যেতে চায়, কিন্তু ভগবানের আশীর্বাদ চায় না; শত্রুকে নষ্ট করতে চায় কিংবা অভিমান করে দেখায় যে, আমি ভক্তি করতে পারি—এসবে ভগবানকে সন্তুষ্ট করার কোনও উদ্দেশ্য নেই। শুদ্ধ ভক্তি মানে হচ্ছে ভগবানকে খুশি করা, শুদ্ধ ভক্তি হচ্ছে প্রেমের বস্তু।

দোকানে কাজ করছে কোনও কর্মচারী; মালিক দেখছে খুব কাজ করছে। মালিক যদি মাইনে বাদ দেয়, সে কি আর কাজ করবে? মালিককে সে খুশি করতে চায় ভাল মাইনে পাবে বলে, পদের উন্নতি হবে এই আশায়।

শুদ্ধ ভক্তি হচ্ছে, ভগবান আমাকে অপমান করুন, আমাকে দুর্বিপাকের মধ্যে রাখুন—আমার কিছু যায় আসে না, আমি ভগবানকে সেবা করেই যাব।

শ্রীচৈতন্যদেব শিক্ষাষ্টকের অষ্টম শ্লোকে তাই বলেছেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গান করেছেন—

"মানস দেহ গেহ যো কিছু মোর।
অর্পিলুঁ তুয়া পদে, নন্দকিশোর ॥
সম্পদে বিপদে জীবনে মরণে।
দায় মম গেলা তুয়া ও পদ বরণে ॥"

অর্থাৎ "তুমি আমাকে সম্পদে রাখ, কি বিপদে রাখ, আমার মন প্রাণ সব তোমার পদে অর্পণ করলাম। তোমার সেবা ছাড়া আর আমার কোনও উদ্দেশ্য নেই।" এই হচ্ছে শুদ্ধ ভক্তি।

কেউ যদি প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী হয়ে গাড়ির সামনে লাল বাতি রাখতে পারে, সে খুব গর্বিত হয়ে যায়। একজন প্রধানমন্ত্রী বললেন, 'যখন ঐ লাল বাতি জ্বলত, তখন সব গাড়ি পাশ করে রাস্তা করে দিত। খুব ভাল লেগেছিল।' কিন্তু কিছুদিনের মন্ত্রী হয়, তারপর লোকে খবরের কাগজে বদনাম দেয় আর অন্য কাউকে নির্বাচন করে। আবার ব্রহ্মা হলে অনেক কাল সম্মানের পদে থাকা যায়। অভক্ত তা চাইতে পারে। তার চেয়ে ভক্তের পেটের যদি একটা কৃমি হতে পারতাম, তা হলে সেটাই ভাল। ভক্তের গৃহে আমি থাকতে চাইছি,

কৃমি হলে আমি মহাপ্রসাদ উচ্ছিষ্ট পাব। এই কথা আমরা চিন্তা করি না। এই হচ্ছে শুদ্ধ ভক্তি। আমি যেভাবে দীনহীন হয়ে থেকেও ভগবানকে সন্তুষ্ট করব।

ভগবানকে সন্তুষ্ট করলে লাভ কি?—শ্রীকৃষ্ণ অর্জুন এবং দুর্যোধনকে বলেছিলেন তোমরা সিদ্ধান্ত কর, কে আমার সৈন্যকে চাও, আর কে আমাকে চাও। আমি যাকে প্রথম দেখব বিশ্রাম থেকে উঠে তাকে আগে বলার সুযোগ দেব।

তখন দুর্যোধন চিন্তা করছে, এখন একলা কৃষ্ণ তো নিজে যুদ্ধ করবে না, তাকে নিলে আর লাভ কি? আমি চাই কৃষ্ণের সৈন্য, তা হলে আমি তার শক্তিশালী সৈন্য দিয়ে ভাল যুদ্ধ করতে পারব।

অর্জুন চিন্তা করছে, শ্রীকৃষ্ণ না এলে তার সৈন্য আর কি করবে? শ্রীকৃষ্ণ থাকলে সবই আছে, উনি থাকলে সবই মঙ্গল হয়ে যাবে। ওনার সৈন্যদের আমার দরকার নেই, শ্রীকৃষ্ণকে আমাদের দরকার।

দুর্যোধন মনে করছে, আমি কৃষ্ণের মাথার কাছে বসব, উনি যখন বিশ্রাম থেকে উঠবেন তখন আমাকে আগে দেখবেন। কিন্তু অর্জুন ভেবেছে, আমি শ্রীকৃষ্ণের চরণের কাছে বসব, আমি শ্রীকৃষ্ণের চরণের ধুলায় থাকতে চাইছি। শ্রীকৃষ্ণ যখন বিশ্রাম থেকে উঠলেন, মাথা বেঁকিয়ে দুর্যোধনের দিকে ফিরে বললেন, ও, আমি অর্জুনকে দেখছিলাম, বলো, তোমার কি চাই।

অর্জুন যখন বলল, কৃষ্ণ, আমি তোমাকে চাই তা হলেই আমার সব সঙ্কট মিটে যাবে, তখন দুর্যোধন ভাবছে অর্জুনের কি মতিভ্রম হল!

জড় জগতের মানুষ বোঝে না যে, শ্রীকৃষ্ণকে যদি পাই সবই তো পাওয়া হয়ে গেল। শ্রীকৃষ্ণকে বাদ দিয়ে তার পরিবর্তে কি চাইছে? —পয়সা দাও, এটা দাও, ওটা দাও। কিন্তু সমস্যা তার থেকেই যাবে। যারা শ্রীকৃষ্ণকে পাচ্ছে, তাদের হৃদয় নির্মল হয়ে প্রেম লাভ করে—তখন তাদের জীবন এমনি আনন্দময়। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, যেটা তোমার আছে আমি রক্ষা করব, আর যেটা তোমার লাগবে আমি দিয়ে দেব। কিন্তু সেটা কাকে? —যারা শুদ্ধ ভক্ত, শ্রীকৃষ্ণের ওপর নির্ভর করছে। যারা পূজা করে—ওটা দাও, ওটা দিলে খালাস হয়ে যাবে, আমি এতটুকু পূজা করলাম এতটুকু চাইলাম—শ্রীকৃষ্ণ দেবেন, কিন্তু এখন দিতে পারেন, পরে দিতে পারেন, নাও দিতে পারেন।

আবার অনেক সময়ে দেখা গেছে শ্রীকৃষ্ণের পূজা করলে, কতটা দেবেন শ্রীকৃষ্ণ বুঝে দেবেন, শ্রীকৃষ্ণ তো ভক্তকে নষ্ট হতে দিতে চান না—যেমন যদি মাকে বল, আমাকে চাকু দাও, আমি খেলা করব, মা চাকু কি দেবে খেলা করতে? কখনো দেবে না।

যেমন, ধ্রুব মহারাজ চেয়েছেন রাজা হতে। শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে রাজা করে দিলেন, কিন্তু যখন সব পেলেন ধ্রুব মহারাজ দুঃখিত হলেন, তিনি ভাবলেন, শ্রীকৃষ্ণকেই কেন চাইলাম না?

এইভাবে প্রথমে ধ্রুব মহারাজের হয়তো একটা উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু পরে শ্রীকৃষ্ণের সাথে মিলন হওয়ায় সেই চাওয়াটা ভুল চাওয়া মনে হল।

যাদের কর্মমিশ্রিত ভক্তি তা শুদ্ধ হয়ে যায়। শুদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা আছে, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আসক্তি ক্রমশ বাড়ে। যারা দীক্ষিত হতে চাইছে, এই জীবনে শ্রীকৃষ্ণের কাছে ফিরে যেতে চাইছে তারা চেষ্টা করতে পারে মিশ্র ভক্তি না করে শুদ্ধ ভক্তি করতে। এটা অবশ্যই আমাদের প্রয়োজন আছে।

অনেক সময়ে মন অনেক আবোল তাবোল চিন্তা করে ফেলে, তখন যুক্তি দিয়ে মনকে শাসাতে হবে—আমি চাই কৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করতে—এ ছাড়া অন্য চিন্তা করো না। তা হলেই শুদ্ধ ভক্ত যে প্রেম আনন্দ লাভ করছে তুমিও তা লাভ করবে।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই প্রেম সহজে দিচ্ছেন সবাইকে। কিন্তু শুদ্ধ ভক্তি থাকলে তবেই সে প্রেম আনন্দকে রাখতে পারবে। তার ভক্তির মধ্যে যদি অন্য কামনা থাকে, তখন ঐ প্রেম আনন্দ আস্বাদন করা স্থায়ী থাকে না।

আমরা কৃষ্ণের কাছে গেলাম—ক্ষণিকের জিনিস নিলে কি হবে? স্টক মার্কেটে বাজার মন্দা করে দিল, যে অনেক পুঁজি রেখেছে স্টক মার্কেটে তার আর কিছুই নেই। এই জন্য আমাদের জীবনে মরণে বিপদে সম্পদে একমাত্র ভরসা হচ্ছেন—শ্রীকৃষ্ণ! এছাড়া তো আমাদের আশ্রয় নেই।

গৃহীরা ভাবে আমি গৃহী, আমি ভগবানের কাছে টাকা চাইব না তো কার কাছে চাইব? এটারও শ্রীল প্রভুপাদ সুন্দর ব্যাখ্যা করেছেন যে, ছোট শিশুকে কি মা বাবার কাছে চাইতে হয়—আমায় খেতে দাও আজকে? বাচ্চা তো খেয়াল করে না কখন খেতে হয়, ওরা খেলাধুলা নিয়ে ব্যস্ত। মা-বাবা তাদের ডেকে আনে।

এইভাবে আমরা ভগবানকে সেবা করলে চাইবার কি দরকার? আমরা নিজেদের ভাল-মন্দ ভবিষ্যৎ কতটুকু আর বুঝতে পারি? কেউ মনে করছে—আমার ছেলে হলে খুব খুশি হব, ভগবানের কাছে সন্তানের বর চাইল, বর পেল, কিন্তু ছেলে হল বদমাইশ চোর ডাকাত। তখন ভাবল, আরে বাবা, ছেলেহীন থাকা অনেক ভাল ছিল।

মালেশিয়াতে এক পরিবারের ছেলে চাইছে—আমি ভক্ত হব; বাবা-মা বলছেন, আর দু'বছর শিক্ষা দেব, তারপর বিয়ে। তখন তোমাদের সাথে

থাকতে পারবে। কিন্তু, এখন দেখছে ছেলে বাইরে গিয়ে এমন দুঃসঙ্গ শিখেছে, নেশা করছে, ব্যবসা করছে, বিভিন্ন রকম কালোবাজারি করছে। এখন ওরা জোড়হাত করছে—'হে ভগবান, আমাদের ছেলেকে গ্রহণ কর।' এখন ছেলে আর আসতে চায় নাকি?

এই জন্য ভক্তি যখন এই তিনটি গুণের সাথে মিশে থাকে, তখন সহজে অগতি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। শুদ্ধভক্তি যেখানে, সেখানে অগতি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তখন ভগবানের দিকে মনটা চলে যায়, ভবিষ্যতে ভগবানের কাছেই ফিরে যায়।

প্রকৃত ভগবদ্ভক্ত নির্লোভ হন

নারদ মুনি এতই কৃপালু যে, তিনি ধ্রুব মহারাজকে দীক্ষা দেবার পর শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিয়োজিত হবার পথও নির্দিষ্ট করে দিলেন—ভক্তি সেবা অনুশীলনের জন্য তিনি ধ্রুব মহারাজকে বৃন্দাবনের মধুবন নামক বনে যেতে নির্দেশ দিলেন। তাঁর ধ্রুব মহারাজের পিতার কথা মনে আসছিল, ভাবছিলেন—ছেলেকে হারিয়ে এক রকম বনবাসে পাঠিয়ে তাঁর পিতা হয়তো উদ্বেগে রয়েছেন। তাই তিনি বাবার সাথে দেখা করতে গেলেন, জানতে চাইলেন রাজকার্য কেমন চলছে, তাঁর দুঃখের কারণ কি? —ধর্মে, অর্থে, অর্থনৈতিক প্রগতিতে অথবা তাঁর ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনে কোনও বিঘ্ন দেখা দিয়েছে কি না।

এই জগতে সকলেরই প্রাথমিকভাবে ধর্মক্রিয়ায় নিযুক্ত থাকা প্রয়োজন। স্বাভাবিক নিয়মে ধর্মকর্ম করলে অর্থনৈতিক সচ্ছলতা আপনি আসে এবং অর্থনৈতিক সচ্ছলতা থাকলে ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজনগুলি মেটানো যায়। শ্রীল প্রভুপাদ বলতেন, এখন যেহেতু আধুনিক পদ্ধতিতে লোকে সহজেই ইন্দ্রিয়তৃপ্তির উপায়গুলি পেয়ে যাচ্ছে, তাই বহু লোকে ধর্মনীতি ত্যাগ করছে। এর ফলে চরমে খুবই ভয়াবহ কর্মফলের শিকার হতে হয় এবং উপর্যুপরি দুঃখ-দুর্দশা নেমে আসে। সাধারণত মানুষ হতাশার শেষ পর্যায়ে পৌঁছে নির্লিপ্ত হয়ে পড়ে। তাকে বলে বিরক্তি মার্গ; সেটা ত্যাগ নয়। পূর্ববর্তী আচার্যগণ একটা উদাহরণ দিয়েছেন—

একজন অতি কৃপণ লোক ছিল। তার এক সুন্দরী কন্যা ছিল এবং লোকটি তার বিবাহ দিতে চাইছিল। কিন্তু বিবাহে দান সামগ্রীতে সে মোটেই বেশি খরচা করতে রাজী ছিল না। তাই একটা মতলব করল—অতি সাধারণ জঙ্গুলে কাঠ দিয়ে একটা পালঙ্ক বানিয়ে এমনভাবে পালিশ করাল যাতে মনে হয় সেটা খুব সৌখীন এবং সেগুন কাঠ বা মেহগানী দিয়ে তৈরি। যারা আসত তাদের সে বলত যে, যদি আমার মেয়েকে বিয়ে কর তা হলে এই সুন্দর নতুন পালঙ্কটি তোমায় উপহার দেব। গ্রামের দিকে এই রকম রীতি আছে যে, বিবাহের সময়ে ছেলেকে রোজগার করে জীবনধারণের উপযোগী কিছু সামগ্রী উপহার দেওয়া হয়, যেমন শহরে মোটা অঙ্কের চেক্ বা গহনা দেওয়া হয়।

তাই একটি গরিব লোক ভাবল, বেশ তো, একটা সুন্দর খাটই যদি পাওয়া যায় তো বিবাহ করি না কেন। তারপর কয়েক মাস পরে সস্তার খাটটা বেঁকে উঠতে উঠতে শেষে ভেঙেই পড়ল। এই লোকটি তখন ভাবল, আসবাব পত্র কেবল মিছা ভোগবিলাস, আমার চ্যাটাইটাই ভাল। যেহেতু তার খাট ভেঙে গেছে তাই সে নতুন নীতি খাড়া করল যে, আসবাবপত্র ফালতু।

সেই জন্য শ্রীল প্রভুপাদ বলতেন, এটা কি ধরনের ত্যাগ? এই জগতে কেউই সুখী নয়। তারা তাদের ক্লেশকে ত্যাগ করছে। দুঃখ কষ্টকে ত্যাগ করতে অসুবিধা কোথায়? অর্থাৎ এই জড় জগতে লোকে হতাশ হয়ে গেলে তখন ত্যাগ আসে, সেটা স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু বলী মহারাজের মুক্তির সময়ে শ্রীকৃষ্ণ বামনদেবকে বলেছিলেন যে, সব কিছু হারানোটা কোনও বিশেষ কৃপা নয়।

যার অগাধ ধনসম্পদ রয়েছে তার সব কিছুই আছে, কিন্তু তবুও সেই সব থেকে সে অনাসক্ত হয়ে কৃষ্ণভাবনায় মগ্ন হয়ে থাকে—সেটাই ভগবানের পরম আশীর্বাদ।

কৃষ্ণভক্ত সুদামা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এতই আসক্ত ছিলেন যে, জড়জাগতিক সুখ প্রদায়ক কোনও বরদানের প্রতি তার স্পৃহা ছিল না। তবু শ্রীকৃষ্ণের কৃপাশীর্বাদে সুদামা সব রকম জাগতিক সম্পদের অধিকারী হয়েছিলেন। তখন সেইগুলি কেবলই শ্রীকৃষ্ণের সেবার কাজে তিনি লাগিয়েছিলেন।

যুধিষ্ঠির মহারাজ সমগ্র পৃথিবীর সম্রাট ছিলেন। কিন্তু তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আসক্ত ছিলেন। কৃষ্ণ বিনা তাঁর সাম্রাজ্য ছিল শূন্য। এটাই হল সত্যিকারের ভক্তি।

এখানে রাজা উত্তানপাদকে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে তাঁর ক্লেশাদির কারণ কি। যেহেতু তিনি তাঁর পুত্র ধ্রুবকে দূরে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন তাই তার খুবই খারাপ লাগছিল।

একসময়ে বাজশ্রবা নামে এক মহান রাজা ছিলেন, তাঁর পুত্র ছিল নচিকেতা। রাজা ধনসম্পদ লাভের জন্য যজ্ঞ করছিলেন এবং যজ্ঞের শেষে ব্রাহ্মণদের মুক্ত হস্তে দান করছিলেন। কিন্তু তিনি সেই সব গরু দান করছিলেন যেগুলি রোগা এবং দুধ দিতে পারে না। সেই দেখে নচিকেতা চিন্তিত হল, সে ভাবল, আমার বাবা যদি এই অকর্মা গাভীগুলি দান করে যান তাতে তাঁর কোন লাভ হবে না, ব্রাহ্মণরা তাঁকে অভিশাপ দেবেন। তখন সে বাবাকে বলল, বাবা আমাকে একটা দান দেবে?

রাজা কর্ণপাত করলেন না। এইভাবে বারবার বলায় রাজা রেগে গেলেন। লোকে যখন রেগে যায়, বলে 'যমের বাড়ি পাঠাব'। রাজা নচিকেতাকে বললেন, তোকে আমি যমের কাছে দান করলাম।

অতএব নচিকেতা স্থির করল সে যমরাজের খোঁজে যাবে। যমরাজের বাড়ি পৌছে সে তিন দিন তিন রাত্রি অপেক্ষা করে রইল। যমরাজ ফিরে এসে দেখলেন, একি! একজন অতিথি অনাদরে আমার দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে! এতে যে আমার অপরাধ হবে!

এখানে রাজা উত্তানপাদ নারদ মুনিকে অভ্যর্থনা সহ ঘরে এনে বসার আসন দিয়ে প্রণাম জানিয়েছিলেন। বৈদিক রীতি অনুসারে এইভাবে অতিথির সেবা করতে হয়। হঠাৎ কেউ বাড়িতে এসে পড়লে তাকে অতিথি-নারায়ণ বলা হয়, যেন নারায়ণ এসেছেন।

অতএব ধর্মরাজ হয়ে যমরাজ বুঝতে পারলেন যে, তাঁর অপরাধ হতে চলেছে। তখন তিনি নচিকেতাকে তিনটি বর দিতে চাইলেন। ছেলেটি বলল, প্রথমে এই বর প্রদান করুন যাতে বাড়ি ফিরে আমি দেখি আমার বাবা খুশির মেজাজে এবং সঠিক চিন্তাধারায় রয়েছেন, তিনি যেন আমার কাজে সন্তুষ্ট হন এবং জীবনে সিদ্ধি লাভের উপযুক্ত অবস্থায় থাকেন। যমরাজ বললেন, তথাস্তু।

আমার পরের ইচ্ছা হল, আমি সেই স্থানে যেতে চাই যেখানে সুখ-দুঃখ, ব্যাধি, মৃত্যু, সংগ্রাম ইত্যাদি কোনও রকম দ্বন্দ্ব নেই, যেখানে আলো বা অন্য কোনও জড় বস্তুর ওপর নির্ভর করতে হয় না, দিব্য জ্যোতি যে স্থান সর্বদা আলোকিত থাকে এবং সেখানে অপ্রাকৃত আনন্দানুভূতির সর্বোচ্চ স্তর সব সময়ে অনুভব করা যায়।

যমরাজ বললেন, দেখ, এই জড় জগতে ঐরকম জায়গা কোথাও নেই। একমাত্র বিষ্ণুলোকে তা পাওয়া যায়। সেখানে পৌছতে হলে তোমাকে জপ করতে হবে, শুধুমাত্র জ্ঞানের দ্বারা বা তপস্যার বরে সেখানে যাওয়া যাবে না, একমাত্র রাস্তা হল নিরন্তর ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করা।

ওঁ অথবা হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রের শব্দ তরঙ্গের দ্বারা ভগবান তুষ্ট হন—এই পথ আমি তোমাকে বলে দিলাম। তোমার তৃতীয় ইচ্ছাটি কি?

নচিকেতা বলল, শোনা যায় কেউ বলে আত্মা আছে, আবার কেউ বলে আত্মা নেই; আমি সত্যটা জানতে চাই, জীবনের আসল উদ্দেশ্যটা কি?

যমরাজ বললেন, এই প্রশ্নটা আমাকে কোরো না, আত্মা আছে, কি, নেই। তুমি একটা ছোট ছেলে এসব দ্বন্দ্বের মধ্যে তোমাকে যেতে হবে না। আমি তোমাকে ধনসম্পদ, গৃহ, বাহন, দাস-দাসী, দীর্ঘ আয়ু, রাজত্ব, যা খুশি দিতে রাজী আছি, বল কি চাও।

নচিকেতা বলল, যে সবের শুরু আছে শেষ আছে তা নিয়ে কি লাভ; এর থেকে যে সুখ পাবো তাও তো ফুরিয়ে যাবে। লক্ষ বছর বাঁচলেও একদিন তো মরবই।

যমরাজ বললেন, তুমি তো দেখছি সাধারণ ছেলে নও, তুমি আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভের যোগ্য।

নচিকেতা বলল, আমি কোনও প্রশংসাও চাই না, আমি শুধু আত্মা-সম্বন্ধীয় সত্যটা জানতে চাই।

যমরাজ বললেন, সত্য জানতে হলে তোমাকে প্রকৃত গুরুর কাছে যেতে হবে। তাঁর কাছ থেকে তুমি জানবে যে, তুমি একটি চিরন্তন আত্মা পরম পুরুষ ভগবানের নিত্য সেবক, যিনি আমাদের হৃদয়ে পরমাত্মারূপে বিরাজ করছেন এবং অনাদিকাল আমরা তাঁর সেবা করে যেতে পারি।

এখানে আমরা দেখছি বাবা তাঁর ছেলেকে বললেন—যমের বাড়ি যাও, অবশ্য তিনি নির্দিষ্ট করে বলেছিলেন—যমরাজের কাছে যাও, বলেননি—উচ্ছন্নে যাও। ছেলে সোজা মৃত্যুরাজের কাছে পৌছে আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করে জড় জগৎ থেকে উদ্ধার পেয়ে গেল।

সমাজকে হতে হবে কৃষ্ণমুখী

মাঝে মাঝে দেখা যায় পিতা-মাতারা তাঁদের সন্তানদের ভুল পথে চালিত করছেন। নচিকেতার বাবা তাকে বলেছিলেন, 'যমের বাড়ি যাও।' আবার ধ্রুব মহারাজের মা তাকে বনে যেতে বলেছিলেন। কিন্তু যে বাবা-মা তাঁদের সন্তানকে শ্রীকৃষ্ণের কাছে যেতে বলেন, তাঁরাই প্রকৃত বাবা-মা। যে গুরু আমাদের শ্রীকৃষ্ণের কাছে নিয়ে যেতে পারেন, তিনিই প্রকৃত গুরু। তেমনই যে রাজা, নেতা বা শিক্ষক শ্রীকৃষ্ণের সন্ধান দিতে পারবেন তিনিই প্রকৃতপক্ষে সম্মানীয়। শ্রীমদ্ভাগবত অনুসারে তাই শ্রীল জীব গোস্বামী বলেছেন যে, যাঁরা শ্রীকৃষ্ণের কাছে আমাদের নিয়ে যেতে পারেন না, তাঁরা বাবা নন, মা নন, গুরু নন বা নেতা বা শিক্ষক নন। তাই শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধের অষ্টম অধ্যায়ে আমরা দেখি যে, রাজা উত্তানপাদ ধ্রুবের প্রতি সঠিক পিতৃদায়িত্ব পালন করতে না পারার জন্য আক্ষেপ করছেন।

জড় জগতে আমরা সকলে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘোরাঘুরি করছি। কিন্তু শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ এবং তাঁকে যিনি পাঠিয়েছেন—সেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায় আমরা জানতে পেরেছি পরম উদ্দেশ্যটি কি। এটা খুবই দুর্লভ। লোকে কেবল অর্থনৈতিক উন্নতি আর ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনেই ব্যস্ত। অল্পসংখ্যক লোক মুক্তি চায়, যেটা হল চতুর্থ সিদ্ধি। পঞ্চম সিদ্ধি হল—শুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম লাভ।

কৃষ্ণভক্তি সকলের জন্য, এমন কি নরাধমও তার যোগ্য। শুদ্ধ ভক্তিতে সব রকম জাগতিক আত্মপরিচয় থেকে মুক্ত হতে হয় যে, আমি নারী, আমি পুরুষ, আমি গরিব, বড়লোক, বৃদ্ধ, যুবক ইত্যাদি। কারণ "জীবের স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্ণদাস।" শ্রীল প্রভুপাদ যখন আমেরিকায় গিয়েছিলেন, তাঁকে বলা হয়েছিল—আপনি আমাদের মতো ধনী দেশে ভারতীয় সংস্কৃতি আনছেন কেন? শ্রীল প্রভুপাদ বলেছিলেন, তোমরা আমেরিকান নও, খ্রিষ্টানও নও, ভারতীয় নও—তোমরা চিন্ময় আত্মা। এটি হল সব চেয়ে বড় জ্ঞান—পরম গুহ্য জ্ঞান।

ঠিক একই ভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও চেয়েছিলেন মানুষের চিন্তাধারা বদল করতে। নারদ মুনির অনুরোধে মহাপ্রভু তাঁর সমস্ত পার্ষদদের, গোপীদের, দ্বারকার মহিষীদের সাথে নিয়ে অবতরণ করলেন। তিনি বললেন, আমি

শচীমাতার গর্ভে জন্ম নিয়ে সকলকে কৃষ্ণপ্রেমে প্লাবিত করব। আর যদি কেউ খুব দূরে পশ্চিমে কোথাও পালিয়ে যায়, তা হলে আমি ভগবানের ভক্তসেনাধিপতিকে পাঠাব তাদের উদ্ধার করে আনতে।

অতএব নারদ মুনি শ্রীবাস পণ্ডিত রূপে আবির্ভূত হলেন, এবং শ্রীচৈতন্যদেব এলেন তাঁর কৃপা বিতরণ করতে। অবশ্য আমরা যদি নিজেরাই ফলটি খেতে ব্যস্ত হয়ে পড়ি, তবে বিতরণ কাজটা খুব ভাল করে হবে না। ফল আস্বাদন এবং বিতরণ দুই-ই একসাথে করতে হবে।

পৃথিবীতে সবাই যাতে মুক্তি পায় সেই জন্য শ্রীল প্রভুপাদ বিশেষ উদ্বিগ্ন ছিলেন। ঠিক এই জিনিসটাই আমাকে স্পর্শ করেছিল ১৯৬৮ সালে যেদিন আমি মন্ট্রিলে প্রথম শ্রীল প্রভুপাদের সাক্ষাৎ পাই—তিনি বলেছিলেন, আমার এত বয়স হয়ে গেছে আমি সাহায্যের লোক চাই। এই দুঃখ-দুর্দশার জগৎ থেকে মানুষকে উদ্ধার করতে কে আমাকে সাহায্য করবে?

আর শ্রীল প্রভুপাদ এখনও ঐ রকমভাবে ডাকছেন। তবে এখন লোকে অনেকটাই নিরামিষ আহারের দিকে ঝুঁকছে, কিছু কিছু পূজা অর্চনা মানছে এবং আরও অনেক ক্ষেত্রে শাস্ত্রসম্মতভাবে সহনশীল হয়ে উঠছে। এখন আমরা শ্রীল প্রভুপাদকে বলতে পারি—কিরকম ভাবে বড় অফিসাররা, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতারা ধ্যান জপের জন্য সময় রাখেন, যেটা পাঁচশ বছর আগে দেখা যেত না। তবে আরও কয়েক বছরের মধ্যে আমাদের কাজ হবে তাদের ধ্যান-ধারণাগুলির অস্পষ্ট নিরাকার বিষয় থেকে ঘুরিয়ে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রের দিকে আনা, জপমালায় জপ করতে শেখানো।

শ্রীল প্রভুপাদ চাইতেন—সকলে যেন অংশ নিতে পারে, গরিবদের জন্য তিনি প্রসাদ বিতরণ 'ফুড ফর লাইফ' অর্থাৎ জীবনদায়ী খাদ্য বিতরণের আয়োজন করেছেন, ধনীদের জন্য 'আজীবন সদস্য' পরিকল্পনা করেছেন শ্রীকৃষ্ণের সেবায় অর্থ সংগ্রহ করতে। কেউ যেন বাদ না যায়।

একবার আমি কলকাতার স্বপ্ন দেখেছিলাম—যেখানে আমাদের রথযাত্রা উৎসব হয়, অনেক লোক, রাস্তায় জঞ্জাল, যে শহর আগে ইংরেজদের সময়ে ভারতের রাজধানী ছিল। তারপর দেখলাম দ্বারকা—সব লোকেরা জপ কীর্তন করছে, হাতে মালা, কপালে তিলক, পরিচ্ছন্ন পোশাক পরা। কৃপা হলে এই সবই সম্ভব, কলকাতাও দ্বারকা হয়ে যেতে পারে, এবং জগন্নাথদেব রয়েছেন—কেন নয়! নিউ ইয়র্কও নিউ দ্বারকা হতে পারে। এইভাবে সারা বিশ্বেই আমরা পবিত্র ধাম রচনা করতে পারি।

মায়া আমাদের নানা রকমে ঠকাতে চেষ্টা করবে। কিন্তু আমাদের দৃঢ়সঙ্কল্প থাকতে হবে, এবং মনে রাখতে হবে যে, শ্রীকৃষ্ণ তাকেই সাহায্য করেন, যে তাঁর সেবা করে। প্রত্যেকের পারমার্থিক জীবনেই বাধা-বিপত্তির পরীক্ষা আসবে। যত আমরা সেগুলি পেরিয়ে আসব, ততই আমরা আরও বড় বাধা পেরোতে সক্ষম হয়ে উঠব, এবং সব শেষে সবচেয়ে বড় বাধা মৃত্যুকে জয় করে আমাদের প্রকৃত আলয় শ্রীকৃষ্ণের কাছে ফিরে যাব।

তাই শ্রীল প্রভুপাদ প্রতি মুহূর্তে কার্যকরী ক্ষেত্রে আমাদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন বৈষ্ণবদের সেবা করতে, গুরুপরম্পরার সেবা করতে এবং বাধা বিপত্তি অতিক্রম করার শক্তি সংগ্রহ করতে। এই ব্রত সাধনে ভক্তদের কৃপাই আমাদের সম্বল। অনেকে বলে, সব কিছুই ভগবানের দয়ায় হবে—সেটা হল বেড়াল-ছানা তত্ত্ব। কোন দার্শনিক বলে, সব কিছুই নিজের চেষ্টার দ্বারা সফল হয়—সেটা হল বানর-ছানা তত্ত্ব।

মা-বেড়াল তার ছানাকে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। ছানা ভাবে—'আমি কিছুই করতে পারি না, ভগবান সব করে দেবেন।' খ্রিস্টানরাও ঐরকম। তারা ভাবে—'আমি ইন্দ্রিয় সংযম করতে পারি না, আমি কিছু করতে পারি না, আমি নিজের মতে সব করে যাব, কিন্তু ঈশ্বরের কৃপায় নির্ভর করে থাকব।'

আর এক দল লোক আছে যারা বলে, 'ভগবানকে আমার দরকার নেই, গুরুর কি প্রয়োজন, নিজের চেষ্টাতেই সব হবে।'

কিন্তু আচার্য ব্যক্তিরা বলেন,—আমরা অন্ধকূপে পড়ি গেছি, এবং শ্রীকৃষ্ণ গুরুপরম্পরায় তাঁর ভক্তদের মাধ্যমে দড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছেন। আমরা নিজেরা কুঁয়ো থেকে উঠতে পারি না। দড়ি ধরতে হবে, তাঁরা টেনে তুলবেন তবে উঠতে পারব। কিন্তু আমাদের চেষ্টারও প্রয়োজন আছে, ভক্তের সহযোগিতারও প্রয়োজন।

শ্রীল প্রভুপাদ আমাদের উপায় দেখিয়ে দিয়েছেন, সেবাগুলি অনুশীলন করতে হবে। এইভাবে সফলতা আসবেই—শ্রীকৃষ্ণ নিজে আশ্বাস দিয়েছেন, 'মা শুচঃ', দ্বিধা করো না, তুমি অবশ্যই আমার কাছে ফিরে আসবে।

সমাজের ভাবটা এই রকম হওয়া উচিত যে, সকলকে কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে উঠতে সাহায্য করা।

ভ্রূণহত্যা অপরাধ

ভগবানের চতুর্ভুজ রূপ, তাঁর সোনার কুণ্ডল রক্তিম চক্ষু, যখন তিনি দাঁড়িয়েছিলেন তখন তাঁকে আকাশের তারার মতো দেখাচ্ছিল। এইরূপে পরীক্ষিৎ মহারাজ মাতৃগর্ভে ভগবানকে দর্শন করেছিলেন।

ব্রহ্মসংহিতার পঞ্চম অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে ভগবান শ্রীগোবিন্দ পরমাত্মা রূপে তাঁর একটি স্বাংশ প্রকাশের দ্বারা এই জগতের আলোর মধ্যে প্রবেশ করেন এবং পরমাত্মারূপে প্রতিটি জীবের হৃদয়ের মধ্যে বিরাজ করেন এবং ভৌতিক শক্তির অণুর মধ্যেও থাকেন। তাই ভগবান হচ্ছেন সর্বদাই সর্বত্র বিরাজমান। তিনি তাঁর অচিন্ত্য শক্তি দ্বারা উত্তরা দেবীর গর্ভে প্রবেশ করেছিলেন তাঁর প্রিয় ভক্ত পরীক্ষিৎ মহারাজকে মহাবিপদ থেকে রক্ষা করার জন্য।

ভগবদ্গীতায় (৯/৩১) ভগবান প্রতিজ্ঞা করেছেন তাঁর ভক্তের কোন বিনাশ হবে না। কেউ ভগবানের ভক্তকে হত্যা করতে পারে না যেহেতু ভগবান তাকে রক্ষা করেন এবং ভগবান যাকে মারতে চান কেউ তাকে বাঁচাতে পারবে না। ভগবান হচ্ছেন সর্বশক্তিমান, সেইজন্য তিনি রক্ষা বা নিহত তাঁর ইচ্ছামতো করতে পারেন। তিনি তাঁর ভক্ত মহারাজ পরীক্ষিৎকে দর্শন দিয়েছেন যখন পরীক্ষিৎ তাঁর মাতৃগর্ভে বিপদগ্রস্ত ছিলেন, ভগবান তাঁকে ক্ষুদ্র আকার ধারণ করে দেখা দিয়েছিলেন, কেননা ভগবান বহুগুণে বড় এবং অণুর চেয়েও ক্ষুদ্র আকার একই সঙ্গে ধারণ করতে পারেন। তিনি দয়ালঠাকুর এবং তিনি তাঁর সীমিত বদ্ধ জীবদের জন্য উপযুক্ত পরিমাণ রূপ গ্রহণ করতে পারেন যাতে তারা তাঁকে দর্শন করতে পারেন। তিনি হচ্ছেন অপরিসীম এবং আমাদের চিন্তার থেকেও তিনি অধিক বিশাল এবং ক্ষুদ্র। তিনি হচ্ছেন সর্বশক্তিমান প্রভু। উত্তরার গর্ভে দর্শনধারী এবং বৈকুণ্ঠধামের নারায়ণের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। ভগবানের অশেষ কৃপার দ্বারা এই ভৌতিক জগতের জীবদের কাছে তিনি অর্চা-বিগ্রহরূপে প্রকাশিত হয়েছেন। তার ফলে বদ্ধ জীবগণ তাঁর সেবা লাভ করে ভগবানের কৃপা লাভ করতে পারেন। ভগবানের আদিরূপ আমাদের জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভব করা অসম্ভব। সেই অর্চা-বিগ্রহ একটি সর্ব আধ্যাত্মিক রূপ যার দ্বারা বদ্ধ জীবগণ সহজেই ভগবানের দর্শন লাভ করতে পারে। আমাদের কখনও ভাবা উচিত নয় যে ভগবানের অর্চাবিগ্রহ হচ্ছে এই

জড় জগতের প্রাকৃত বস্তু। ভগবানের কাছে জড়া এবং আধ্যাত্মিক শক্তির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। আমাদের কাছে যদিও বা এক বিরাট পার্থক্য রয়েছে, কিন্তু ভগবানের পক্ষে সব কিছুরই আধ্যাত্মিক পরিবেশ রয়েছে।

মাতৃগর্ভস্থ পরীক্ষিৎ মহারাজকে হত্যা করার জন্য অশ্বত্থামা ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করল। উত্তরাদেবী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে হে দেব দেব ! হে ভগবান ! হে জগৎপতি ! সম্বোধন করে প্রার্থনা করে ভগবানের কাছে আশ্রয় নিলেন এবং বললেন, "হে ভগবান, আমাকে হত্যা করুন তাতে আমার কোন দুঃখ নেই, কিন্তু আমার সন্তান যেন নষ্ট না হয়।"

এইটি ছিল আমাদের বৈদিক সংস্কৃতি। মায়েরা এমন দায়িত্বশীল যে তাদের নিজের সন্তানকে রক্ষা করার জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করতে তারা প্রস্তুত ছিলেন। তখন উত্তরাদেবী ভেবেছিলেন যে, "আমি মরে গেলেও আমার সন্তানকে বাঁচাতে হবে, যদিও আমার গর্ভের মধ্যে আছে।" তাই তিনি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলেন যে আমার জন্য আমি প্রার্থনা করছি না, কেন না ভক্তরা কখনও ভগবানের কাছে নিজের জন্য প্রার্থনা করেন না। তারা সব সময় ভগবানের সেবার জন্য এবং অপরের জন্য প্রার্থনা করেন। এই জন্য উত্তরাদেবী প্রার্থনা করলেন যে তার গর্ভস্থ সন্তান যেন নষ্ট না হয়, কারণ সে ভগবানের ভক্ত হবে।

কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে এটা চিন্তা করা দরকার যে এমন একটি কুসংস্কার ঢুকে গেছে আমাদের মধ্যে যে আধুনিক প্রভাবের জন্য বিভিন্ন রকম নাস্তিকদের ভুল ভ্রান্তির জন্য এখন মায়েরা নিজেরাই স্বীকার হচ্ছেন ভ্রূণ হত্যা করার জন্য। সাধু ঋষিরা আগে কোন দিন কল্পনা করতে পারেনি যে একজন মা তার নিজের সন্তানকে হত্যা করেন। আমাদের বেদ শাস্ত্র বলে যে সন্তান যখন গর্ভে আসে তখন সে জীবিত। যখন স্ত্রী-পুরুষের মিলন হয় এবং গর্ভের মধ্যে প্রথম দিনে দুটি বীজ এক সঙ্গে মিলন হয় তখন থেকেই জীবের সঞ্চার হয়। সেই জীবকে গর্ভ থেকে অসাধারণভাবে হত্যা করাকে শাস্ত্রে মহাপাপ বলা হয়।

হিরণ্যকশিপু যখন তপস্যা করছিলেন সে সময় তার স্ত্রী গর্ভবতী ছিল; তখন দেবগণ ভেবেছেন যে হিরণ্যকশিপু মস্ত বড় অসুর ভবিষ্যতে কি কষ্টই বা সে আমাদের দেবে এবং তার যদি সন্তান জন্মে তাহলে আমরা সঙ্গে সঙ্গে মেরে ফেলব, তা না হলে ভবিষ্যতে না জানি আমাদের কত কষ্টই না হবে। তারা বাচ্চাকে মারতে রাজি কিন্তু ভ্রূণ হত্যা করতে রাজি হয়নি। ভ্রূণ হত্যা করা পাপ বলে দেবগণ পর্যন্ত ভয় পেয়েছিল।

প্রহ্লাদ মহারাজের জন্মের আগে থেকেই দেবগণ তার মাকে আটক করে রাখতে চেয়েছিল। কিন্তু নারদমুনি তাঁর মাকে বলেছিলেন কোন রকম ভয় করবেন না। হিরণ্যকশিপুর সন্তান হবে মহা ভাগবত ভক্ত। তাই ঐ সময়ে হিরণ্যকশিপুর স্ত্রী কয়াধু গর্ভবতী থাকা কালে নারদ মুনির নিকট ভাগবত কথা শ্রবণ করছিলেন। তখন প্রহ্লাদ মাতৃগর্ভে থেকে ভাগবত কথা শ্রবণ করে আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জন করেন। কিন্তু যদিও কয়াধু হরি কথা শ্রবণ করেছেন কিন্তু পরবর্তী কালে অসৎ সঙ্গের প্রভাবে তা ভুলে যান কিন্তু প্রহ্লাদ কখনও ভুলে যাননি।

আগে মানুষের স্মরণ শক্তি খুব বেশি ছিল এবং হয়ত অনেক স্ত্রী লোকেরও ভাল স্মরণ শক্তি ছিল আবার কখনও তারা হয়ত ভুলে যায়। কিন্তু আজকাল স্ত্রী-পুরুষ সবাই খুব সহজেই ভুলে যায় এবং অল্প সংখ্যক লোকই কিছু মনে রাখতে পারে। তার জন্য ব্যাসদেব আমাদের জন্য বেদ লিখেছেন যাতে প্রতিদিন হরিকথা শ্রবণ করতে পারি। আমরা যদি প্রতিদিন গীতা ভাগবত শ্রবণ না করি তা হলে আমরা আস্তে আস্তে সব ভুলে যাই, ভুলে গিয়ে অন্ধকার মহামায়ার মধ্যে আমরা ডুবে থাকি।

সে জন্য ভাগবতে আছে, নিত্যং ভাগবত সেবয়া—আমাদের প্রতিদিন শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন এবং সদ্‌গুরুর আনুগত্যে সেবা করার বিশেষ কর্তব্য রয়েছে। এইভাবে কয়াধুর গর্ভে প্রহ্লাদের জন্ম হয় এবং তাঁর লীলা কাহিনী আপনারা নিশ্চয়ই জানেন।

ঠিক এইভাবে উত্তরাদেবী তার সন্তানকে বাঁচাতে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলেন এবং কৃষ্ণ তার গর্ভে পরমাত্মার মতো রূপ গ্রহণ করে প্রবেশ করে পরীক্ষিৎ মহারাজকে দর্শন দিলেন। পরীক্ষিৎ নাম হল কেননা পরীক্ষিৎ মহারাজ যে রূপ দর্শন পেয়েছেন গর্ভের মধ্যে, তিনি সব সময় খুঁজছেন তার প্রভুকে দর্শন পাবার জন্য। সেইজন্য প্রত্যেক মানুষের মুখের দিকে পরীক্ষিৎ মহারাজ তাকিয়ে দেখতেন এই সেই পরম পুরুষ ভগবান কিনা। তার কখনও ভুল হয়নি। সব সময় খুঁজে খুঁজে পরীক্ষা করছেন। কোথায় ভগবান। তার জন্য তার নাম হল পরীক্ষিৎ। তিনি সব সময় সব কিছু পরীক্ষা করছেন আবার যদি সেই ভগবানকে দর্শন পাওয়া যায়। সেই তার কামনা ছিল।

আমরা আশা করি যে ভবিষ্যতে ভারতবর্ষের মানুষেরা বুঝবে যে সত্যিকারে ভ্রূণ হত্যা হচ্ছে এক বিরাট পাপ এবং এই সব কাজ করা খুব খারাপ যদিও সরকার সেটা অনুমোদন করছেন তাঁর নাস্তিক প্রভাবে। আসলে কোন ধর্ম

সেটা অনুমোদন করে না। মানুষ ভুল ভ্রান্তি করে মহাপাপ করছে ফলে ভবিষ্যতে অনেক দুঃখ-কষ্ট তারা পাবে। সেই কষ্ট যাতে তারা না পায় তার জন্য আমি এইটুকু বললাম।

কৃষ্ণকৃপা দরকার

ব্রহ্মা কৃষ্ণের সঙ্গী বালকদের ও গোবৎসদের লুকিয়ে রেখে এসে দেখলেন কৃষ্ণের সঙ্গে আগের মতোই আবার সেই সব বালকেরা ও গোবৎসেরা রয়েছে। ব্রহ্মা চিন্তা করছিলেন ব্যাপারটা কি হল? যাদের লুকিয়ে রাখলেন তারাই বা কে? এই যে সমস্ত গোপবালকেরা কৃষ্ণের সঙ্গে আছে এরাই বা কে? কেননা কৃষ্ণই সমস্ত গোপবালক ও গোবৎসদের রূপ ধারণ করে নিজেকে বিস্তার করেছিলেন। তাই কৃষ্ণ যখন বিষ্ণুরূপে প্রকাশিত হয়েছেন, প্রতিটি গোপবালক তখন চতুর্ভুজ রূপ ধারণ করেছে। তাদের হাতে বলয়, কর্ণে কুণ্ডল, চরণে নূপুর। এই রকম বক্ষে শ্রীবৎসচিহ্ন ধারণ করেছেন। সেই সমস্ত গোপবালকেরা। প্রভুপাদ বলছেন যে সারূপ্য মুক্তি লাভ করলে এই রকম রূপ লাভ করা যায়। কৌস্তভ মণি ও শ্রীবৎস চিহ্ন কেবল কৃষ্ণের বক্ষে থাকে। যখন বিদেশীরা ভারতে আসে তখন ওরা বলে সব ভারতীয়গুলো দেখতে এক রকম। আবার ভারতীয়রা অনেক সময় বলে যে, সব বিদেশীরাই দেখতে এক রকম। বৈকুণ্ঠে গেলে দেখা যাবে যে, দেখতে সবাই এক রকম। সবারই চতুর্ভুজ, মস্তকে মুকুট আছে, চরণে নূপুর আছে। যেন বিষ্ণুতে ভর্তি শহর। তখন কি করে চিনে নেবেন যে, কে প্রকৃত বিষ্ণু? তখন খুঁজতে হবে যে, শ্রীবৎস আর কৌস্তভ মণি কার বক্ষে আছে। আর তা না হলে, প্রত্যেকেই দেখতে এক রকম। অবশ্য পরিচয় হলে পরে বিশেষ বিশেষ সম্পর্ক হয় তখন বুঝা যায়, কিন্তু সাধারণভাবে ওরা সবাই এক রকম। ব্রহ্মা এবারে বিভ্রান্ত। বিপদে পড়েছেন। বালকগুলি কে? বিষ্ণুর রূপ ধারণ করছে শত শত বালক, এরাই বা কে? কি করে হল। ঐশ্বর্য মণ্ডিত তাদের গা থেকে ব্রহ্মজ্যোতি বেরুচ্ছে। ব্রহ্মা তখন বিহ্বল হয়ে পড়েছেন কৃষ্ণের দ্বারা। ব্রহ্মা সাধারণত এ রকম আশা করেছিলেন না।

যখন কেউ সাযুজ্য মুক্তি লাভ করে, এক রকমের মুক্তি, যদিও ভক্তরা এই রকম মুক্তি আকাঙ্ক্ষা করেন না। সেখানে কোন সেবা নেই। পাঁচ প্রকারের মুক্তি আছে। সময় সময় ভক্তরা এই ধরনের মুক্তি গ্রহণ করে, যদি সেখানে ভগবৎ সেবায় যুক্ত থাকে। সাযুজ্য মানে হচ্ছে ভগবানের অঙ্গজ্যোতিতে মিশে যাওয়া। সারূপ্য মানে হচ্ছে ভগবানের যেমন রূপ, সেই রকম রূপ আপনি প্রাপ্ত হবেন। সালোক্য মানে হচ্ছে একই লোকে বাস করা। ভগবান যেখানে বাস করেন আপনিও সেখানে থাকবেন। সামীপ্য মানে ভগবানের কাছাকাছি থাকবেন। সার্ষ্টি মানে হচ্ছে ভগবানের মতোই ঐশ্বর্যশালী থাকবেন। এগুলো হচ্ছে বিভিন্ন প্রকারের মুক্তি। যারা বৈকুণ্ঠে বাস করেন, তারা সাধারণত চতুর্বিধ মুক্তি লাভ করে থাকেন। সেটা স্বাভাবিক। সারূপ্য মানে হচ্ছে একই রকম রূপ হতে হবে তাদের। বিষ্ণুর মতো দেখতে হবে। চিন্ময় জগতের দিব্য ঐশ্বর্য দ্বারা মণ্ডিত তাদের নিজস্ব বিমান আছে। তারা এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় পুষ্প বিমানে করে অনায়াসে যেতে পারেন। জেট-ফেট লাগে না। আমাদের এখানে কারিগরি বিদ্যায় এত উন্নত হয়নি। চিন্ময় জগতে এগুলো হচ্ছে চিন্ময় ঐশ্বর্য। লোকেরা অবশ্য ইচ্ছে করে, যেরকম চিন্ময় জগতে সুবিধা আছে সেই সুবিধাগুলি যদি এখানে করা যেত বিভিন্ন যন্ত্রপাতির মাধ্যমে।

ব্রহ্মা নিজেকে একটু বড় বলে মনে করতেন। এই গোপবালক ও গোবৎসগুলি যে অসাধারণ হবে তা তিনি ভাবতে পারেন নি। কৃষ্ণের থেকে তাঁর কিছু শিক্ষা হল। কৃষ্ণ কৃপালু। সমস্ত গোপবালকেরা চুরি হওয়া সত্ত্বেও কৃষ্ণ রাগ করেননি। কৃষ্ণ রাগ করতে পারতেন। বদলা নিতে পারতেন। তা না করে ব্রহ্মাকে আশীর্বাদ করেছেন। তাঁকে শিক্ষা দিচ্ছেন। কেউ যদি এসে আপনার ছেলে বা মেয়েকে চুরি করে নিয়ে যায়, তাহলে আপনি সেই লোকটিকে দেখে কি রকম করতেন। প্রচণ্ড বিক্ষুব্ধ ও ক্রোধান্বিত হতেন। সে রকম হতে পারত কৃষ্ণের। কিন্তু কৃষ্ণ সব ব্যাপারেই সংযত। এই সমস্ত ঘটার পরে ব্রহ্মা তখন অত্যন্ত বিনীত হয়ে পড়েছেন। তিনি কৃষ্ণের চরণে চারটি মস্তক দিয়ে প্রণাম জানিয়েছেন।

তারপর ব্রহ্মা নবদ্বীপে এসেছিলেন। নবদ্বীপ হচ্ছে একটা মস্ত বড় পদ্মের মতো। মাঝখানে যেন পদ্মের একটা কর্ণিকা আছে। ওখানে বসে তিনি ধ্যান করতে শুরু করলেন। তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নাম জপ করতে লাগলেন। গৌরাঙ্গ, গৌরাঙ্গ, গৌরাঙ্গ। তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ব্রহ্মার কাছে এসেছেন।

ব্রহ্মা আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেছেন। লাফিয়ে উঠেছেন। উঠে প্রার্থনা করতে শুরু করবেন কিন্তু তাঁর বাক্ রুদ্ধ হয়ে গেছে। তিনি বিহ্বলচিত্তে তখন গৌরাঙ্গকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম জানিয়েছেন। তারপর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁকে বললেন, তুমি কেন ডেকেছ? কি চাও, কি আশীর্বাদ চাইছ?

ভগবান যখন ভক্তের কাছে আসেন তাঁর নিয়ম হচ্ছে যে তিনি আশীর্বাদ করবেন। যখন এক সময় লোকেরা পরীক্ষিৎ মহারাজের বাবার প্রশংসা করছিল, তখন তাদেরকে পরীক্ষিৎ মহারাজ সোনার উপহার দিয়েছিলেন। সেই রকম ভগবান যখন আসেন তখন জিজ্ঞাসা করবেন যে কি চাও, আশীর্বাদ গ্রহণ কর। ভক্তকে কিছু দেওয়া হয়। ব্রহ্মজ্যোতিতে বিলীন হয়ে যেতে পার। ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যেতে পার। ভগবানের দিব্য জ্যোতিতে বিলীন হয়ে যেতে পার। ব্রহ্মজ্যোতিতে বিলীন হয়ে যেতে ভক্তরা চান না। হে কৃষ্ণ আমি তা চাই না, আমি তোমার সেবা করতে চাই। কৃষ্ণ আপনাকে কিছু দিতে চান আর আপনি চাইছেন না। হয়তো ভগবদ্ধামে যাওয়ার জন্য টিকিট দিয়ে যেতে পারেন। সময় সময় কৃষ্ণ পরীক্ষা করতে চান। কি চান আপনি? কলাবেচা শ্রীধরকে তিনি অনেক কিছু দিতে চেয়েছিলেন। রাজা হবে? অলৌকিক শক্তি, আরও কিছু দিতে চেয়েছিলেন। ভগবান হয়তো বলতে পারেন তুমি কি অলৌকিক শক্তি পেতে চাও? তাহলে ভালই হয়। তাহলে আর আমাকে আকাশে ভ্রমণ করার জন্য টিকিট লাগবে না। কিন্তু সাবধান হতে হবে। ব্রহ্মাকে ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন যে, কি আশীর্বাদ চাইছ? ব্রহ্মা জানতেন না যে কি চাইবেন? তিনি বললেন যে, আমার অর্ধেক জীবনতো অতিবাহিত হয়ে গেছে। আমার জীবনের দ্বিতীয় ভাগটা আছে। ৫০ বছর পার হয়ে গেছে আমার জীবনের। মানুষ চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর পার হলে চিন্তা করে যে কি করবে? কি করলাম জীবনে? ব্রহ্মা বলছেন, ৫০ বছর হয়ে গেল, তবুও আপনার কাছে অপরাধ করছি। গরু বাছুর চুরি করলাম, গোপবালক চুরি করলাম, কত অপরাধ করলাম। আমি আশীর্বাদ চাই যাতে করে আমি আপনার প্রতি শুদ্ধভক্তি লাভ করতে পারি, যাতে করে আমি আর কখনও অপরাধ না করি। বিনীত হই। যাতে সর্বদা আপনার সঙ্গ লাভ করতে পারি। যখন আপনি কলিযুগে পৃথিবীতে আসবেন তখন আপনার সঙ্গ পেতে চাই। তখন মহাপ্রভু বললেন 'তথাস্তু'। তাই হোক। যা তুমি চাইছ তাই হবে। বিনীত হওয়ার জন্য তুমি জন্ম গ্রহণ করবে মুসলমান পরিবারে। কিন্তু তুমি প্রতিদিন তিনলক্ষ হরিনাম করবে। তখন তোমার নাম হবে নামাচার্য।

হরিনামের গুরু। তুমি আমার পার্ষদ হবে। তুমি আমার আগে আসবে। তুমি আমার সঙ্গে থাকবে। তোমাকে লোকে বলবে হরিদাস। তুমি সত্যলোকে ফিরে যাওয়ার জন্য তৈরী হও। আমি পাঁচহাজার বছর পরে পুনরায় আসছি।

ব্রহ্মার হিসাবে বেশি দিন নয়। ইতিমধ্যেই পাঁচ হাজার বছর পার হয়ে গিয়েছিল। ব্রহ্মার বেশি সময় ছিল না। সবাইকে যে বলে আসবেন তারও সময় নেই। যদিও হয়তো ব্রহ্মলোকের হিসাবে সামান্য কয়েক বছর। আমাদের হিসাবে যে ৭০/৮০ বছর সময় ব্রহ্মার হিসাবে তা কয়েক মুহূর্ত মাত্র। হরিদাস ঠাকুর পৃথিবীতে কত বছর ছিলেন? ৮০ বছর মাত্র। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ছিলেন ৪৮ বছর এই পৃথিবীতে। আর হরিদাস ঠাকুর ছিলেন তখন মধ্য বয়সী। হরিদাস ঠাকুর ভাবলেন যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন চলে যাবেন তখন তিনি যেন এই পৃথিবীতে না থাকেন। তাই তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা করলেন। মহাপ্রভুর অপ্রকটের কিছুদিন আগে তিনি অপ্রকট হন।

এই ব্রহ্মবিমোহন লীলার সঙ্গে চৈতন্যলীলার একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। কৃষ্ণলীলা এবং চৈতন্যলীলার সঙ্গেও যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। যেমন সুরভী গাভী এসেছিলেন, ইন্দ্র এসেছিলেন, বৃন্দাবনে যখন ইন্দ্র প্রচুর বর্ষণ করেছিলেন, সারা বৃন্দাবনকে প্লাবিত করতে চেয়েছিলেন তখন কৃষ্ণ গিরিগোবর্ধন উত্তোলন করেছিলেন। তারপর ইন্দ্র আত্মসমর্পণ করলেন। তারপরে স্বর্গের সুরভী গাভী সুরভীকুঞ্জে এসেছিলেন। সুরভীকুঞ্জ হচ্ছে সরস্বতী (জলঙ্গী) নদীর ওপারে। ওখানে গিয়ে তাকে দর্শন করতে পারেন, যদি আপনার দিব্য দৃষ্টি থাকে। তিনি নিজেকে প্রকাশ করতে পারেন। কিন্তু সবার কাছে প্রকাশ হন না। খুব ভাগ্যবান না হলে দর্শন করা যায় না। সুরভী গাভী সাধারণত আমাদের এই মর্ত্য জীবের দৃষ্টিগোচর হন না। মার্কণ্ডেয় ঋষিও এখানে এসেছিলেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁদের উপস্থিতি সম্বন্ধে খুব সচেতন ছিলেন। এইভাবে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। বৃন্দাবনের যে দ্বাদশ বন সেগুলিও মায়াপুরে আছে। নবদ্বীপ মণ্ডল পরিক্রমায় গেলে আমরা দেখি বেলপুকুর হচ্ছে বেলবন। দীনবন্ধু প্রভু আমাদের পরিক্রমায় নিয়ে গিয়েছিলেন দ্বাদশ কানন ভ্রমণ করতে। প্রায় গুলোই ভ্রমণ করেছি। অনেকগুলি করা হয়নি। ঐ বনগুলি এইখানেও রয়েছে। বৃন্দাবনের সেই রাধাকুণ্ড, ঋতুদ্বীপের রাদুপুরে রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড আছে। গোবর্ধন কোলদ্বীপে থাকার কথা। বৃন্দাবন, অযোধ্যা অন্যান্য তীর্থস্থানও মায়াপুরে বর্তমান। বৈকুণ্ঠ আছে। সমস্ত নারায়ণেরা বৈকুণ্ঠে থাকেন। এই বৈকুণ্ঠ আবার বৃন্দাবনে আছে। নবদ্বীপ

ধামে একটি স্থান আছে বৈকুণ্ঠপুর নামে। আমাদের লুপ্ত তীর্থের মধ্যে এটা একটি। গোদ্রুমদ্বীপে কোথায় কি আছে আমরা যথাযথভাবে জানি না। ভালভাবে খোঁজ নিতে হবে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বৃন্দাবনে গিয়েছিলেন, দেখেছিলেন একটি ডোবা। তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন এটা হচ্ছে রাধাকুণ্ড। তারপর এটা খনন করা হল। ষড়্গোস্বামীরা খনন করেছিলেন। এই রকম মহাপ্রভু, রাধামাধব যদি আরও প্রকাশ করেন, নবদ্বীপের বিভিন্ন স্থানে কোন্ জায়গায় কি কি আছে। নবদ্বীপ ধাম, বৃন্দাবন ধাম, সবই এখানে আছে। শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর বলেছেন—

শ্রীগৌড়মণ্ডল-ভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি,
তা'র হয় ব্রজভূমে বাস ॥

আমরা ব্রজভূমিতে বাস করতে পারি যদি আমরা বুঝতে পারি যে, গৌড়মণ্ডল হচ্ছে চিন্তামণি ধাম, দিব্য ধাম।

ব্রহ্মা ব্রজে এসে কৃষ্ণকে দেখলেন আর সেই কৃষ্ণের গোপবালক ও গোবৎস সব হরণ করলেন। তারপরে উনি ফিরে এসে ভাবলেন যে, মস্ত বড় ভুল হয়েছে। যে সব গোপবালক নিয়ে গিয়েছিলাম আবার এরাই তো এখানে। তারপর তাদের নারায়ণরূপ দেখে ব্রহ্মা তাজ্জব হয়ে গেলেন। ব্রহ্মাজী নিজেকে বিস্তার করে এরকমভাবে নারায়ণ দেখতে পারবেন না। কৃষ্ণের অনন্ত শক্তি। অনন্তলীলাময় কৃষ্ণ। দামোদর অষ্টকে বলা হয়, নমো অনন্তলীলায়। তাঁর অনন্ত লীলা, অসীম ক্ষমতা, তা সত্ত্বেও তাঁর মায়ের স্নেহে তিনি রজ্জুবদ্ধ হন। সেই হচ্ছে দামোদরলীলা।

কিছু কিছু বিজ্ঞানীরা খোঁজার চেষ্টা করছেন যে, কখন মহাভারত লেখা হয়েছিল। একজন বিজ্ঞানী বলেছেন যে, তিন হাজার চৌষট্টি বছর পূর্বে এবং ভারতীয় একজন বিজ্ঞানী বলছেন যে, এক হাজার ছয়শত বছর আগে। বিভিন্নভাবে তারা বিচার করতে চেষ্টা করছেন। খবরের কাগজে প্রায় সময়ই দেখা যায় এরকম কত উল্টা পাল্টা। প্রকৃত সেই মহাভারতের ঘটনাটা কোন্ সময়ে হয়েছিল এই ব্যাপারে অনেকেই মনগড়া চিন্তা করে। ওরা চেষ্টা করছে খুঁজে পেতে জল্পনা-কল্পনা করে। শেষ পর্যন্ত পাঁচহাজার বছর আগের ঘটনা কোথা থেকে কি পাব। প্রভুপাদ যখন শ্রীমদ্ভাগবত প্রণয়ন করেছেন তখন বলছেন যে এটা ইতিহাস। এগুলি ঘটেছে। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী, মহর্ষি ব্যাসদেব শুধু শুধু কিছু গল্প বানান নি। এটা ঐতিহাসিক ঘটনা, কৃষ্ণ ছিলেন, কৃষ্ণ বসবাস করেছেন। কৃষ্ণ অদ্ভুত কিছু করতে পারেন।

তাঁর পবিত্র ধামে আসতে পারা খুব সৌভাগ্যের বিষয়। গুপ্ত বৃন্দাবনে আসতে পেরেছি। আমরা খুব ভাগ্যবান। এখানে ব্রহ্মা আশীর্বাদ পেয়েছেন, ব্রহ্মা জানতেন যে, কৃষ্ণের কৃপাময় রূপ হচ্ছেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর রূপ। নিজেকে সংশোধন করার জন্য ভগবানের শুদ্ধভক্ত যাতে হওয়া যায় ব্রহ্মাজী সুযোগ নিয়ে ছিলেন এই নবদ্বীপ ধামে। ব্রহ্মাজী যদি নিজেকে সংশোধন করতে আসেন, তাহলে আমাদের আর কি কথা। আমরা কত পতিত। আমি কত পতিত। আপনারা অনেক উন্নত আছেন। মহাপ্রভুর কৃপা আমার দরকার। তাই আমি নবদ্বীপ ধামে আসি। কারণ এখানে কৃপা প্রবাহিত হচ্ছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পরম করুন।

পরম করুণ, পঁহু দুইজন,
নিতাই গৌরচন্দ্র।
সব অবতার- সার-শিরোমণি,
কেবল আনন্দ-কন্দ ॥
ভজ ভজ ভাই, চৈতন্য নিতাই,
সুদৃঢ় বিশ্বাস করি।
বিষয় ছাড়িয়া, সে রসে মজিয়া
মুখে বল হরি হরি ॥

তিনি হচ্ছেন সমস্ত অবতারদের শিরোমণি। তিনি বিনামূল্যে কৃপা বিতরণ করছেন। আপনি যোগ্য কি যোগ্য নন, তা বিচার করছেন না। কমপক্ষে আমারতো কোন যোগ্যতাই নেই। আমিতো একটা হতাশ ব্যক্তি। আপনাদের অনেকের যোগ্যতা আছে, আমার কোন যোগ্যতাই নেই। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভু, তাঁরা কৃপা করেছেন। নির্বিচারে, অর্থাৎ এই ব্যক্তি যোগ্য কি অযোগ্য এসব বিচার না করে তাঁরা কৃপা বিতরণ করেছেন। কোন না কোন ভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপা লাভ করার জন্য সেই কামনা বর্ধন করতে পারি তা হলে তিনি হয়তো তাঁর কৃপা প্রদান করবেন। সময় সময় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপার জন্য কান্না করতে হবে। ব্রহ্মা কান্না করছিলেন। সময় সময় গভীর অনুভূতি আসে। ব্রহ্মার শিক্ষা যে, আমরা কিছু অনুভূতি লাভ করি। তাই সময় সময় আমরা বিভিন্ন অসুবিধায় পড়ি পারমার্থিক জীবনে। বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। প্রভুপাদ বলেছেন যে, এই ধরনের যে সমস্যায় পড়া, পারমার্থিক অগ্রগতির জন্য এগুলো আমাদের সহায়ক হতে পারে। সেগুলো কাজে লাগাতে হবে। সেইগুলিকে ব্যবহার করতে হবে আরও বেশী

পারমার্থিক জীবন দৃঢ় করার জন্য। যাতে করে নিতাই-গৌরের কৃপা লাভ করতে পারি, পঞ্চতত্ত্বের কৃপা লাভ করতে পারি। যদি গুরুগৌরাঙ্গের কৃপা লাভ করতে পারি, আর তা হলে বুঝতে পারা যাবে যে, এই সব সমস্যাগুলো লুক্কায়িত আশীর্বাদ। কোন না কোন ভাবে আমরা ধামে এসেছি। আমাদের খুব সাবধান থাকতে হবে। কৃপা লাভ করার চেষ্টা করতে হবে। গভীরভাবে কামনা করতে হবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপা পাওয়ার জন্য। ব্রহ্মা অনেক অপরাধ করেছিলেন কিন্তু কৃষ্ণ কৃপা করেছিলেন। কৃষ্ণ বড় সহিষ্ণু। আর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কি কথা। প্রভুপাদ বলেছেন যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কৃষ্ণ অপেক্ষা হাজার গুণ কৃপালু। তিনি পাপীতাপীকে উদ্ধার করছেন।

পাপী তাপী যত ছিল হরিনামে উদ্ধারিল।
তার সাক্ষী জগাই আর মাধাই রে ॥

ব্রহ্মা বালকগুলোকে নিয়ে মারামারি বা ঝামেলা করেন নি। ঘুমিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু জগাই মাধাই বদমাশ ছিল। নিত্যানন্দ প্রভুকে মেরেছে। তবুও নিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা করলেন, এদের কৃপা করুন। নিত্যানন্দ প্রভু কত কৃপালু। জগাই-মাধাই সেটা বুঝতে পেরেছিল। জগাই-মাধাইয়ের সমাধি আছে কাটোয়ায়। কাটোয়া গেলে দেখা যায় যেখানে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন সেখান থেকে নিকটে রয়েছে যাজিগ্রাম। শ্রীনিবাস আচার্যের স্থান। তিনি ওখানে ছিলেন। অনেক লীলা হয়েছে। নরোত্তম দাস ঠাকুর রামচন্দ্র কবিরাজকে নিয়ে এখান থেকে দশকিলোমিটার দূরে শ্রীখণ্ডে বাস করতেন। নরহরি সরকার ঠাকুর, মুকুন্দ দাস, চিরঞ্জীব, পুরন্দর ঠাকুর আরও অনেকে বাস করতেন। কাটোয়াতেই রয়েছে জগাই-মাধাইর সমাধি। নবদ্বীপে কিছু শত্রুতা হয়েছিল বোধ হয়, তাই তাঁরা কাটোয়া গিয়েছিলেন। ওখানে মাধাই ঘাট করা হয়েছে। এত প্রেমানন্দে জগাই-মাধাই হরিনাম জপ করতেন যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তারা নাচতে শুরু করতেন। চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ত। স্বতঃস্ফূর্ত প্রেমে তারা মগ্ন ছিলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায়। প্রতিদিন গঙ্গায় যেতেন স্নান করতে। পরমানন্দে নৃত্য করতেন। যদিও তাঁরা ছিলেন সবচাইতে বড় দস্যু। সারা নবদ্বীপ ধামে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এইভাবে কৃপা বিতরণ করেছেন।

গৌরহরির আবির্ভাব লীলা

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অবতীর্ণ হয়েছিলেন আজ থেকে পাঁচশো বছর আগে, মহাপ্রভুর আবির্ভাবের তেরো মাস-আগে মাঘমাসে মহাপ্রভুর মা-বাবা শচীদেবী ও জগন্নাথ মিশ্র দেখলেন শ্রীঅনন্তদেব তাঁদের ঘরের ভেতরে বিরাজ করছেন। তাঁর হাজার হাজার মুখে দিব্য বেদস্তুতি প্রকাশ করছেন। তিনি হাজার মুখে একই সঙ্গে সমস্ত বেদ মন্ত্র পাঠ করছিলেন।

ভগবান এখানে অবতীর্ণ হবেন এই জন্যে অনন্তদেব সেই স্থান এভাবে পবিত্র করতে লাগলেন। ভগবান যখন অবতীর্ণ হলেন তখন তিনিও উপস্থিত ছিলেন। জগন্নাথ মিশ্রের শরীর জ্যোতির্ময় হয়েছিল। সেই জ্যোতিতে ঘর দুয়ার ভরে গেল। জ্যোতির্ময় হওয়ার কারণটি হল জগন্নাথমিশ্রের হৃদয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু বিরাজ করছিলেন।

সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ।

জগন্নাথমিশ্রের হৃদয়ে শচীনন্দন গৌরহরি বিরাজ করছেন। সেইজন্য তাঁর শরীর থেকে দিব্য জ্যোতি প্রকাশিত হচ্ছিল। সেই সময়টিতে জগন্নাথ মিশ্র শয়নকালে দিব্য স্বপ্ন দেখলেন, বৈকুণ্ঠ-ধাম এসে তাঁর হৃদয়ে প্রবেশ করল। তারপর দেখলেন সেই ধাম তাঁর হৃদয় থেকে শচীদেবীর হৃদয়ে স্থানান্তরিত হল।

বেদশাস্ত্রে বলে তমো রজো ও সত্ত্ব গুণের উর্ধ্বে শুদ্ধসত্ত্ব স্তর। যে ব্যক্তি এই স্তরে উন্নীত হয়েছেন, তাঁকে বলা হয় বসুদেব। বসুদেবস্তরের ব্যক্তির হৃদয়ে ভগবান আবির্ভূত হন। সেই রকম শুদ্ধ অবস্থা না হলে ভগবান সেখানে আবির্ভূত হবেন না।

আমাদের হৃদয়ে ভগবানকে আনতে হলে আগে আমাদের হৃদয়কে পরিষ্কার করতে হবে। ভগবানের নাম গ্রহণ, ভগবানের সেবা, ভগবানের সাধনা দ্বারা চেষ্টা করব আমাদের হৃদয়কে শুদ্ধ করে তুলতে যাতে ভগবান আমাদের হৃদয়ে আসতে পারেন। জগন্নাথমিশ্র ও শচীমাতা আমাদের মতো বদ্ধ জীব নন। তাঁরা নিত্য সিদ্ধ ভক্ত। জগন্নাথ মিশ্র বসুদেবের অভিন্ন স্বরূপ। তাঁর হৃদয় শুদ্ধ। শচীদেবীও তাই। আমরা চাই আমাদের হৃদয়ে ভগবান অধিষ্ঠিত হোন, তাই আমাদের চেতনা শুদ্ধ করতে হবে। হরিনামের দ্বারা চেতনা মার্জিত ও শুদ্ধ হয়। শুদ্ধ হলে তখন ভগবানের উপস্থিতি অনুভব করতে পারব। জগন্নাথ

মিশ্র সাধারণ জীব নন। তিনি গোলোক বৃন্দাবন থেকে নেমে এসেছেন। কৃষ্ণলীলার অধিকাংশ ভক্তই গৌরলীলায় অংশগ্রহণ করেছেন। আমরা বদ্ধ জীবেরাও ভগবানের নিত্যলীলায় যুক্ত হতে পারি, যদি আমরা নিষ্ঠার সঙ্গে হরিনাম করি, ভগবানের সেবা করি, যদি ঐকান্তিকভাবে আকাঙ্ক্ষা করি ভগবানের নিত্য লীলায় যুক্ত হব। ভগবানের বিশেষ কৃপা লাভ করতে পারলে আমাদের হৃদয়ে ভগবান অধিষ্ঠিত হবেন।

কৃপাসিদ্ধ, সাধনসিদ্ধ ও নিত্যসিদ্ধ—এই তিন ধরনের ভক্ত আছেন। যাঁরা গোলোক ধাম থেকে এই জগতে লীলা করতে এসেছেন তাঁরা নিত্যসিদ্ধ। সাধনা ছাড়াও ভগবানের বিশেষ কৃপা প্রাপ্ত হয়ে সিদ্ধ হয়েছেন এমন ভক্ত কৃপাসিদ্ধ। আর যাঁরা ভগবদ্ পাদপদ্ম লাভের জন্য সাধনা করে সিদ্ধি লাভ করেছেন, তাঁরা সাধনসিদ্ধ। কে কি ধরনের সিদ্ধ ব্যক্তি হয়েছেন তাতে কোনও যায় আসে না। যদি আমরা পরম সিদ্ধি লাভের জন্য ঐকান্তিক হই, তবে এই জীবনের অন্তিমে আমাদেরকে নিয়ে যাওয়া হয় সেই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যেখানে গৌরলীলা চলছে। সেখানে আমরা গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর মহাকীর্তন দলের মধ্যে আমরা যুক্ত হতে পারব কিংবা অন্য কোন বিশেষ সেবা আমরা পেতে পারব। এই হচ্ছে ভক্তি জগতের সাধারণ নিয়ম। এই পৃথিবী থেকে সরাসরি গোলোক বৃন্দাবনে না গিয়ে সাধারণত যে ব্রহ্মাণ্ডে কৃষ্ণলীলা চলছে কিংবা গৌরলীলা চলছে সেই ব্রহ্মাণ্ডে গিয়ে সেই লীলায় আমরা অংশগ্রহণ করতে পারব। তারপরে সেখানে আমরা সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ হয়ে গোলোকে উপনীত হতে পারব।

পরদিন জগন্নাথ মিশ্র দিব্য স্বপ্নের কথা শচীদেবীকে বললে শচীদেবীও জানালেন, 'আমি স্বপ্ন দেখলাম, আপনার হৃদয় থেকে দিব্য জ্যোতির্ময় একটি ধাম আমার হৃদয়ে প্রবেশ করল। আবার আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলাম দেবতারা আমার দিকে তাকিয়ে কি সব স্তব-স্তুতি ও প্রার্থনা করছে।

এই জগতে লোকে ধর্মাচার করছে নিজের কিছু জড়জাগতিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করবার উদ্দেশ্যে। ভগবানের সন্তোষ বিধানের জন্য কেউ কিছু করছে না। ভক্তদের পক্ষে এরকম পরিস্থিতি বিপজ্জনক। দেবতারা ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করতে লাগলেন যে, স্বর্গের দেবতা হয়েও তাঁরা অনেক বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছেন। প্রথমত, পৃথিবীর তুলনায় সেখানে অনেক বেশী সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে বহুকাল সুখভোগ করার ফলে ভগবানকে বিস্মৃত হয়েই থাকা হয়। দ্বিতীয়ত, দৈত্য দানবেরা প্রায়ই স্বর্গলোক আক্রমণ করে থাকে এবং

দেবতাদের উৎপীড়ন করতে থাকে। তৃতীয়ত, স্বর্গলোক থেকে সহজে ভগবৎপ্রেম লাভ করে জড়জগতের অতীত বৈকুণ্ঠ গোলোকে যাওয়া যায় না। ভগবান স্বয়ং গোলোকের প্রেম দান করবার জন্য পৃথিবীতে এসেছেন। সেই প্রেম পৃথিবীর অধিবাসীরা লাভ করতে পারবে, স্বর্গের দেবতা হয়ে লাভ কি! তাই প্রেম থেকে যাতে বঞ্চিত না হওয়া যায় সেজন্য দেবতারাও মহাপ্রভুর অবতরণ কালে পৃথিবীতে মনুষ্যগৃহে জন্মগ্রহণ করবার বাসনা করলেন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যেদিন জন্মলীলা প্রকাশ করলেন সেদিন ছিল চন্দ্রগ্রহণ। সারা নবদ্বীপ নগরের লক্ষ লক্ষ লোক গঙ্গার জলে নেমেছিলেন। চন্দ্রগ্রহণ সময়টি অপবিত্র সময়, তাই সেই সময়ে শাস্ত্রবিধি হচ্ছে গঙ্গার জলে নেমে স্নান করা। সেই লক্ষ লক্ষ লোক সবাই উচ্চ কলরোলে হরিধ্বনি তুলতে লাগল।

তখনকার ব্রাহ্মণরা বলতেন হরিনাম জোরে করা যায় না। হরিনাম মনে মনে করতে হয়। সবার সম্মুখে যদি হরিনাম করা হয় তবে অপরাধ হবে, নামের শক্তি হ্রাস পাবে, হিন্দু সমাজে অমঙ্গল হবে, বিভিন্ন অসুবিধা আছে। কিন্তু গঙ্গা ক্ষেত্র পবিত্র বলে সেখানে হরিনাম উচ্চস্বরে করলে বাধা নেই। শ্রীবাস ঠাকুর ভাবলেন যে, সবাই বলে চন্দ্রগ্রহণ অশুভ, কিন্তু আমি তো শুনছি সবাই হরিনাম করছে অতএব এটাই শুভ মুহূর্ত। সারা নগরের লোক জলের মধ্যে—সবার মুখে হরিধ্বনি। শ্রীবাস ঠাকুর বলছেন এরকম মুহূর্ত যেন প্রতিদিনই থাকে। প্রতিদিনই লোক হরিনাম করুক। তা হলে জগতের মঙ্গল হবে।

পূর্ণিমার সন্ধ্যাকালে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শচীমাতার কোলে জন্মগ্রহণ করলেন। প্রতিবেশীরা সেখানে আসতে লাগল, দেবীদেবীগণও অলক্ষিতে আসতে লাগলেন মহাপ্রভুর অঙ্গকান্তি দর্শনে। দেবদেবীরা ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীরূপে আসতে লাগলেন।

জগন্নাথমিশ্র অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। তিনি ছিলেন দরিদ্র। কিন্তু মনে মনে জগৎবাসীকে বিপুল পরিমাণে সম্পদ দান করতে লাগলেন। পরদিন অদ্বৈত আচার্যের পত্নী সীতা ঠাকুরাণী ওষধী, অলঙ্কার, পোশাক ইত্যাদি নিয়ে এলেন শিশু এবং তার মা-বাবার জন্য। তিনি এসে ভালভাবেই লক্ষ্য করলেন এই শিশু চৈতন্য মহাপ্রভুর চেহারাটির হুবহু গোকুলের কৃষ্ণের মতোই। গায়ের বর্ণ ছাড়া আর কোনও পার্থক্য নেই। কৃষ্ণের অঙ্গবর্ণ শ্যাম আর এই শিশুটি গৌরবর্ণ। গৌর অঙ্গ।

কৃষ্ণ এত কৃপালু এই কলিযুগে গৌরাঙ্গরূপে এসেছেন বদ্ধজীবকে উদ্ধার করবার জন্য। আমাদের জীবন অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। আমরা সুযোগ পেয়েছি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর হরিনাম সংকীর্তন আন্দোলনে আমরা থাকতে পেরেছি। কতজন কত দূর থেকে এখানে মহাপ্রভুর জন্মতিথি উৎসবে যোগ দিতে এসেছেন। মধ্যপ্রাচ্য দেশ থেকে কেউ কেউ এসেছেন যারা অন্যধর্ম-যাজন করেন। সকাল বেলায় পাঁচজন আমার কাছে এসেছিলেন। তাঁদের দেশে কোনও হরেকৃষ্ণ কেন্দ্র গড়ে উঠেনি। তবুও তাঁরা হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করছেন। তাঁরা আনন্দেই রয়েছেন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এসেছেন কেবল বাঙ্গালীদের বা ভারতীয়দের উদ্ধার করবার জন্যই নয়, সারা বিশ্বকে উদ্ধার করার জন্য। যখন শ্রীল প্রভুপাদকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কেবল ভারতে হরেকৃষ্ণ প্রচার করলেন আর বিশ্বের বাদবাকী স্থানগুলিতে প্রচার করেননি কেন? তখন শ্রীল প্রভুপাদ উত্তর দিয়েছিলেন, যে যে স্থানে প্রচার হয়নি সেই সমস্ত স্থানে প্রচারের দায়িত্ব মহাপ্রভু আমাদের সবার হাতেই অর্পণ করেছেন।

আসুরিক মনোবৃত্তি বিফলে যায়

ভক্ত প্রহ্লাদ বলেছিলেন 'শ্রীহরি সর্বত্র বিরাজ করছেন।' পুত্রের এই কথায় ক্রুদ্ধ পিতা অসুররাজ হিরণ্যকশিপু যখন প্রহ্লাদকে জিজ্ঞেস করেন, 'তোর শ্রীহরি কি এই স্তম্ভটিতে আছে?' প্রহ্লাদ নির্ভয়ে উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, শ্রীহরি সর্বত্রই বিরাজ করছেন।"

হিরণ্যকশিপু তখন স্তম্ভটিকে ভেঙে ফেলার জন্য সজোরে আঘাত করলেন। ভক্তের কথার সত্যতা প্রমাণ করার জন্য পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি সভাগৃহের সেই স্তম্ভের মধ্য থেকে আবির্ভূত হলেন। তবে শ্রীহরির সেই রূপটি ছিল অদ্ভুত রকমের। সেই রূপটি ছিল না মানুষের, না সিংহের। এভাবে নরসিংহরূপে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন।

ভগবান বলেছেন, ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি। 'আমার ভক্তের কখনও বিনাশ নেই।' প্রহ্লাদ জানতেন ভগবান শ্রীহরি আমাকে সর্ব অবস্থায় সুরক্ষা করবেন।

আমাকে কখনও ক্ষতিগ্রস্ত হতে দেবেন না। যেহেতু প্রহ্লাদ সম্পূর্ণভাবে শ্রীকৃষ্ণের ওপর নির্ভরশীল, তাই শ্রীকৃষ্ণও সম্পূর্ণভাবে তাঁকে সুরক্ষা প্রদান করলেন। হিরণ্যকশিপু বারংবার শিশুপুত্র প্রহ্লাদকে শ্রীহরিনাম কীর্তন করতে নিষেধ করেছিলেন। এমনকি প্রহ্লাদকে হত্যা করবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু প্রহ্লাদের স্থির বিশ্বাস ছিল যে, শ্রীহরির সুরক্ষার ফলে কিছুতেই কেউ তাঁকে বধ করতে পারবে না। হিরণ্যকশিপু স্তম্ভটিকে ভেঙে ফেললেন এবং তিনি জানতেন শ্রীহরি স্তম্ভের ভেতর থেকে আসবে। অতএব তাঁর পুত্রকে আগের থেকেই ধমক দিয়ে বলেছিলেন, 'স্তম্ভের ভেতর যদি তোমার শ্রীহরিকে না দেখতে পাই তবে তোমাকে আমি কেটে ফেলব, দেখি তোমার শ্রীহরি কিভাবে তোমাকে রক্ষা করে!' নাস্তিক অসুরদের প্রচণ্ড ঔদ্ধত্য।

অসুর হিরণ্যকশিপু অত্যন্ত কঠোর তপস্যা করেছিলেন। তাঁর তপস্যায় শ্রীব্রহ্মা তাঁকে বর দিতে চাইলে, তিনি বললেন, কোন পশু, মানুষ, রাক্ষস, দেবতা, গন্ধর্ব, তথা ব্রহ্মার সৃষ্টির কোনও জীবের দ্বারা তাঁর মৃত্যু হবে না। আকাশে জলে বা মাটিতে তার মৃত্যু হবে না। রাতে বা দিনের বেলায় তার মৃত্যু হবে না। ঘরের বাইরে কিংবা ভেতরে তাঁর মৃত্যু হবে না। কোনও অস্ত্রে বা অভিশাপে বা ব্যাধিতে মৃত্যু হবে না। এ সমস্ত বর তিনি ইতিমধ্যেই ব্রহ্মার কাছে প্রাপ্ত হয়েছেন।

শ্রীব্রহ্মার সমস্ত রকমের বর লাভ করে হিরণ্যকশিপু নিজেকে স্বাধীন ও স্বরাট্ ও নির্ভীক স্বেচ্ছাচারী বলে মনে করেছিলেন। কিন্তু ঘটনাক্রমে স্তম্ভটি থেকে ভয়ংকর গর্জন করতে করতে অদ্ভুতরূপ নৃসিংহদেবকে দর্শন করে তিনি অবাক হলেন। তাঁকে হিরণ্যকশিপু গদার আঘাতে মেরে ফেলতে চাইলেন। কিন্তু সেই রূপ অত্যন্ত ভয়ংকর ছিল।

অসুর হিরণ্যকশিপু বুঝলেন, ব্রহ্মার সমস্ত বর এবার বৃথা হয়ে যাচ্ছে। কেননা, ঐ নরসিংহরূপধারী ব্রহ্মার সৃষ্টির কোনও জীব নন। সমস্ত অস্ত্র ছাড়াই লম্বা তীক্ষ্ণ নখ দ্বারা নিহত হতে হচ্ছে। গোধূলি বেলায়। দিন বা রাত বলা চলে না। ঘরের বাইরে বা ভেতরেও তার মৃত্যু হচ্ছে না—ঠিক ঘরে চৌকাঠের মধ্যেই। আকাশে, জলে বা মাটিতে নয়, নরসিংহের জানুর উপরেই মৃত্যুবরণ করতে হচ্ছে। এভাবে সমস্ত তপস্যার ফল স্বরূপ তিনি ব্রহ্মার কাছে যা যা বর চেয়েছিলেন সব বরই অনর্থক লাভ করেছিলেন। এভাবে ভয়ংকর উগ্ররূপ নৃসিংহদেবের আবির্ভাব হল।

প্রতাপশালী অসুর হিরণ্যকশিপু স্বর্গ মর্ত্য পাতাল অধিকার করেছিলেন। প্রায় সমস্ত দেবতা তাঁর অধীন দাস হয়ে পড়লেন। হিরণ্যকশিপু সর্বত্র ঘোষণা

করলেন, কোথাও বিষ্ণুপূজা চলবে না। একমাত্র পূজা হবে—হিরণ্যকশিপু পূজা। বিষ্ণু তাঁর বড় ভাইকে হত্যা করেছেন। সেইজন্য সমস্ত বৈষ্ণবদের উপর অত্যাচারও শুরু হল। সারা জগতে এখন চলবে কেবল হিরণ্যকশিপু পূজা। অসুররাজ হিরণ্যকশিপুকে পূজা করার জন্য তৈরি হল বিশাল একটি গৃহ, যার দৈর্ঘ্য ছিল একশো যোজন। এক যোজন সমান আট মাইল বা বারো কিলোমিটার। অতএব পূজাগৃহটি ছিল একহাজার দুশো কিলোমিটার দীর্ঘ। এখান থেকে দিল্লী। প্রায় চৌদ্দশ কিলোমিটার। অতএব সেই পূজার ঘরটি কত বড় ছিল। ঘরের ভেতরেই ছিল গাছপালা, পুকুর সব কিছু। মেঝে ছিল সব দামী পাথরে মোজাইক করা। সেই ঘরটি আয়তনে আমাদের ভারত দেশটির মতো জায়গাজুড়ে। চারশ হাত উচ্চতা যুক্ত একটি গগনচুম্বী বেদীতে হিরণ্যকশিপু বসে থাকতেন। আর সবাই তাঁর জয় ধ্বনি দিয়ে তাঁর পূজা করতে লাগল। অপ্সরা বিদ্যাধর গন্ধর্ব সেই মন্দিরে নৃত্য, গান, বাদ্য বাদন করতে লাগল। সেখানে হিরণ্যকশিপুর প্রভাবে সারা ঘর দুয়ার জ্যোতির্ময় হয়েছিল। প্রাকৃতিক পরিবেশ মনোরম হয়েছিল। কারও রোগ ছিল না। কারও খাদ্যের অভাব ছিল না। ধরিত্রীদেবী ভয়ে অঢেল ফুলফল শস্যে সুসজ্জিতা ছিলেন। সবাই অসুররাজ হিরণ্যকশিপুকে ভগবানজ্ঞানে শ্রদ্ধা ও পূজা নিবেদন করতে লাগলেন।

কিন্তু হিরণ্যকশিপুর পুত্র প্রহ্লাদ বললেন, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির থেকেই এই ক্ষমতা বাবা পেয়েছেন তাই এত প্রভাবশালী হয়েছেন। আদৌ বাবার এক বিন্দুও ক্ষমতা নেই। সমস্ত ঐশ্বর্য সমস্ত শক্তির উৎস একমাত্র শ্রীহরি।

পুত্রের মুখে এরকম কথা শুনে হিরণ্যকশিপু ক্রোধান্বিত হলেন। তিনি বললেন, 'প্রহ্লাদ, আমিই সর্বেসর্বা। আমার চেয়ে বড় কেউ নেই। এ কথা যদি তুমি স্বীকার না করো তবে তোমাকে আমি মেরে ফেলব। আমি তোমাকে আজ সন্ধ্যাকাল পর্যন্ত সময় দিলাম। এর মধ্যে তুমি যদি আমাকে পরমেশ্বর ভগবানরূপে স্বীকার না করো তবে অবশ্যই আজ তোমাকে হত্যা করব।'

সবাই দেখল আর মোটেই সময় নেই, সন্ধ্যা নেমে আসছে, কিন্তু প্রহ্লাদ কেবল শ্রীহরির নাম করছে। তার পিতা হিরণ্যকশিপুকে ভগবান বলে মানছে না। এমন সময় দেখা গেল সেই মন্দিরের বিশাল তোরণদ্বার দিয়ে অদ্ভুত নৃসিংহদেব আগমন করছেন। এই অদ্ভুত রূপটি কি? হিরণ্যকশিপুর নির্দেশে তার অনুচরেরা সেই নৃসিংহদেবকে আসতে বাধা দিয়ে, সেখান থেকে চলে যেতে বলল। কিন্তু সব নির্দেশ অগ্রাহ্য করে শ্রীনৃসিংহদেব এগিয়ে আসতে

লাগলেন। মায়াবী অসুরেরা স্থানটিকে অন্ধকার করে তুলল যাতে নৃসিংহদেব কিছু না দেখতে পান। কিন্তু নৃসিংহদেবের অঙ্গের জ্যোতিতে কোথাও অন্ধকার থাকল না। তারপর অনুচরেরা বিভিন্ন অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করল, কিন্তু কোনও অস্ত্রেই নৃসিংহদেবের অঙ্গ স্পর্শই করল না। অনুচরেরা তখন হিরণ্যকশিপুকে পরিস্থিতির কথা জানালে হিরণ্যকশিপু বিভিন্ন অস্ত্র ধারণ করলেন। আগ্নেয়াস্ত্র, বায়ুঅস্ত্র, বরুণ অস্ত্র, কঙ্কাল অস্ত্র, নারায়ণ অস্ত্র ইত্যাদি যাবতীয় অস্ত্র প্রয়োগ করতে লাগলেন, কিন্তু সমস্ত অস্ত্রই বিফল হল। এবার হিরণ্যকশিপু অস্ত্রহীন হয়ে স্বহস্তে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন। নৃসিংহদেব হিরণ্যকশিপুর শরীরটিকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে ফেললেন। তারপর হিরণ্যকশিপুর মৃত্যু হলে নৃসিংহদেব আহ্বান করলেন এবার কে আছো এসে যুদ্ধ করো। অসুরেরা সবাই তখন ভয়ে পালালো। দেবতারা ভগবান নৃসিংহদেবের পূজা ও বন্দনা করতে লাগলেন। প্রহ্লাদ এসে নৃসিংহদেবকে একটি ফুলের মালা প্রদান করলেন।

বিভিন্ন কল্পে ভগবান নৃসিংহদেব বিভিন্ন রকমের লীলাবিলাস করে আবির্ভূত হয়ে থাকেন। এ কল্পে স্তম্ভ থেকে আবির্ভূত হন, অন্য কল্পে অন্য রকম। আজকাল এ সমস্ত ঘটনা নিয়ে আমরা সমালোচনা করতে পারি। যেমন হিরণ্যকশিপুর পূজার ঘর এত বিশাল কি করে হবে? কিন্তু এখন অল্পশক্তি সম্পন্ন মানুষ এক একটি স্টেডিয়াম করছে। স্টেডিয়াম করতে আবার কোথাও কোথাও নিষেধ করা হচ্ছে। এক একটি স্টেডিয়ামে পঞ্চাশ থেকে একশো হাজার লোক থাকে। আর, হিরণ্যকশিপু জগতের সমস্ত শক্তি অর্জন করেছিলেন। সমস্ত দেবতাকে তিনি জয় করেছিলেন। ইন্দ্রশক্তি, অগ্নিশক্তি, বায়ুশক্তি, বরুণশক্তি, সমস্তই তার করায়ত্ত। তা হলে তাঁর পক্ষে সুন্দর সজ্জিত বড় একটা স্টেডিয়াম করা এমন কিছু কঠিন নয়। আমাদের এই পৃথিবী একটি ছোট গৃহ। এর তুলনায় অন্যান্য গ্রহগুলি অনেক গুণ বড়। সব গ্রহগুলি হিরণ্যকশিপুর দখলে ছিল। সেই রকম ব্যক্তির পক্ষে একটা বড় ঘর বানানো কোনও আশ্চর্যের ব্যাপার নয়।

ভক্ত প্রহ্লাদ তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস কখনও হারিয়ে ফেলেননি। তাঁর উপর কত অত্যাচার হল, তবুও তিনি নিশ্চল ছিলেন। আমাদের যদি ছোট খাটো কিছু হয় তবে আমাদের ভয় লেগে যায়, আমরা অনেক ক্ষেত্রেই বিচলিত হয়ে পড়ি। কিন্তু প্রহ্লাদ একবিন্দুও বিচলিত হননি। তাঁর দৃঢ় অটুট বিশ্বাস ছিল। তিনি নিরন্তর শ্রীহরি স্মরণ করতেন। শ্রীহরিনাম কীর্তন করতেন। এরকমই শিক্ষা।

হিরণ্যকশিপু সমগ্র জগৎ জয় করে ফেললেন। সমগ্র জগতের রাজা হলেন। তবুও তিনি সুখী হননি। মনের তুষ্টি লাভ করতে পারেন নি। এই

জড় জগতে যে লাখপতি, সে ক্রোড়পতি হতে চায়, যে ক্রোড়পতি, সে দশক্রোড় পতি হতে চায়। কোন ব্যবসায়ীর হাজার ক্রোড়েরও উর্ধ্বে সম্পত্তি রয়েছে, তবুও সে খুশী হতে পারে না। জগৎটাই হিরণ্যকশিপুর মালিকানায় এল। তবুও সে খুশী নয়। পুত্র প্রহ্লাদ তার শরণাপন্ন হচ্ছে না দেখে তাঁকে মেরে ফেলতে চাইছে। হিরণ্যকশিপু ভাবছিলেন, আমার উপরে কোনও আইন নেই। আমি যমরাজকে কারাগারে রেখে দিয়েছি, আমাকে নরকে যাতনাও পেতে হবে না। নরক আমারই সম্পত্তি। দেবতাদেরকে নরকে আটক রেখেছি। অতএব তার কতই না সুখ সুবিধা। তাতে খুশী থাকার তো কথা। কিন্তু না, হিরণ্যকশিপু খুশী হতে পারে নি। আমাদের মানবজীবনে এভাবে আসুরিক মনোবৃত্তি গ্রহণ করা উচিত নয়। ভগবানের প্রতি শুদ্ধভক্তি অনুশীলন করা উচিত। আমরা যদি শ্রীকৃষ্ণের সেবা করি, সেবাদায়িত্ব নিই, তবে ভক্তবৎসল কৃষ্ণও আমাদের দায়িত্ব নেবেন এবং আমাকে রক্ষা করবেন।

মহাপ্রভুর বিশ্বব্যাপী হরিনাম সংকীর্তন

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু যে কিভাবে নিরন্তর পতিত জীবদের উদ্ধার করার চিন্তায় মগ্ন থাকতেন, তা 'এ দুঃখ অপার' উক্তিটির মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে। এই উক্তিটি থেকে বোঝা যায় যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, যিনি স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তিনি সর্বদা এই জড় জগতের অধঃপতিত জীবদের পোষণ করে অত্যন্ত দুঃখিত হতেন...তাই তিনি সর্বদা চিন্তা করতেন, কিভাবে তাদের এই দুর্বিষহ জীবন থেকে উদ্ধার করতে পারা যায়।

সকল জীবেরই জীবনে অত্যাবশকীয় উদ্দেশ্য—পরম পুরুষোত্তম ভগবানের সাথে লুপ্ত সম্বন্ধ পুনরুদ্ধার করা। আমাদের পরমাত্মা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শুদ্ধ প্রেমভক্তির বিকাশ না হলে অন্তরের বেদনাময় অসন্তোষের অভিজ্ঞতা আমাদের সইতেই হবে—জড় সম্পদের সাফল্য-ঐশ্বর্যে যে যতই ভূষিত হই, ভগবদ্ভক্তির অভাবে জন্মে জন্মে একটি অনিত্য শরীর থেকে আর একটি শরীরে দেহান্তরিত হয়ে জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধির বেদনাময় আবর্তে কষ্ট পেতেই হবে। জীবনের এই দুঃখময় পরিস্থিতি থেকে আমাদের উদ্ধার করবার জন্যেই ভগবদ্ভক্তির কল্পবৃক্ষ রূপে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

আর তা সত্ত্বেও, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং বিরাজমান থাকলেও, নানা শ্রেণীর মানুষ সুকৌশলে তাঁর নাম-সংকীর্তন আন্দোলনটিকে পরিহার করে চলছিল। বহু নির্বিশেষবাদী, বৃথা তার্কিকের দল, এবং কর্মফলের প্রত্যাশী কর্মী মানুষ শ্রীচৈতন্যবৃক্ষটির প্রসারমান শাখা-প্রশাখা এবং উপশাখাগুলির বাইরে থাকতে চাইছিল। এই সমস্ত হতভাগ্য মানুষগুলির অবস্থা লক্ষ্য করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর হৃদয়ে অপার দুঃখ অনুভব করেছিলেন। সুগভীর উৎকণ্ঠা নিয়ে, মহাপ্রভু চিন্তা করতেন—কিভাবে তাঁদেরও উদ্ধার করা যেতে পারে, এবং তাই তাঁর ব্রত সাধনের উদ্দেশ্যে নানা প্রকার সার্থক পরিকল্পনার উদ্ভাবন করেছিলেন।

আজও, বিগত দিনের মতোই, লক্ষ লক্ষ মানুষ কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনটিকে পরিহার করে চলতে বেশ পটু। তাই, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তদানীন্তনকালে যেমন সেই ধরনের 'সুপটু লঙ্ঘনকারী' মানুষদের দুর্দশায় ব্যথিত হতেন, তেমনই আজও তিনি 'সুপটু লঙ্ঘনকারী' মানুষদের দুর্ভাগ্যে সমানভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে রয়েছেন, তা অনুমান করা মোটেই অযৌক্তিক নয়। যদিও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর দিব্যনাম প্রবর্তন করেছেন তবুও তাঁর সেই 'অপার দুঃখ' এখনও বর্তমান এবং তাঁর অহৈতুকী কৃপার পূর্ণ সুযোগ সকলে গ্রহণ না করলে সেই দুঃখের অবসান হতে পারে না। অধঃপতিত জীবের দুর্দশা দর্শন করে মহাপ্রভু যখন দুঃখিত হন, তখন তাঁর ভক্ত তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, "প্রভু, আপনি উদ্বিগ্ন হবেন না।" এইটিই আদর্শ সেবার ভাব। এই আদর্শ অবলম্বনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উদ্বেগ দূর করা সকলেরই কর্তব্য। যিনি পতিতপাবন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই উদ্বেগ দূর করার চেষ্টা করেন, তিনি নিঃসন্দেহে ভগবানের সব চেয়ে অন্তরঙ্গ ভক্ত।

শ্রীভগবানের উদ্বেগ উৎকণ্ঠা প্রশমনে যে অন্তরঙ্গ ভক্ত নিষ্ঠা সহকারে সেবা নিবেদন করে, তার যথার্থ মানসিকতা এখানে শ্রীল প্রভুপাদ ব্যক্ত করেছেন। যেভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং শ্রীল প্রভুপাদ পতিতজনের উদ্ধারের কথা চিন্তা করেছিলেন, সেইভাবে আমাদেরও গভীরভাবে চিন্তা করা উচিত—মহাপ্রভুর সংকীর্তন আন্দোলনে বিমুখ মানুষদের কিভাবে উদ্ধার করা যেতে পারে।

প্রতিটি দিন অতিবাহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, হাজার হাজার জীবাত্মা একমাত্র চৈতন্যবৃক্ষের মাধ্যমে লভ্য ভগবৎ-প্রেমভক্তির অমৃতময় ফল আস্বাদন করেই এই জগৎ ছেড়ে বিদায় নিচ্ছে, এবং তার ফলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর 'অপার দুঃখ' বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। তাই কৃষ্ণভাবনামৃত আমাদের বিতরণ করতেই হবে, আর সময় নেই...

জরুরী মনোভাব আত্মস্থ করা চাই

যদি প্রত্যেকের মনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে শাশ্বত শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি সেবার মনোভাব জাগে, তা হলে আপনা হতেই কলি আর্তনাদ করতে করতে দূর হয়ে যাবে।

পাঁচশ বছর আগে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন যে, তাঁর পবিত্র নাম পৃথিবীর সমস্ত গ্রামে-গঞ্জে শহরে-নগরে প্রচারিত হবে। শাস্ত্রাদিতে এমনও ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে যে, কলিযুগের পাপময় দিনগুলিতে চিন্ময় উপলব্ধির জ্যোতি অন্ধকারাবৃত হয়ে গেলেও শ্রীভগবানের নাম সংকীর্তনের আন্দোলন ১০,০০০ বছর ধরে বিজয়গর্বে সর্বত্র চলতে থাকবে। 'ভগবান' কথাটির অর্থ যিনি বোঝেন, তিনিই জানেন যে, পরমেশ্বর ভগবান যা কিছুই ভবিষ্যদ্বাণী করে থাকেন, তা সবই সত্য প্রতিপন্ন হয়, যেহেতু কোনও যুগেই বা কোনও পরিস্থিতিতেই তাঁর অভিলাষ অবহেলিত হতে পারে না।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুগামীরা শ্রীভগবানের অত্যাশ্চর্য বিস্ময়কর, নাটকীয় লীলাস্বরূপ তাঁর নাম সংকীর্তন-লীলারই অনুগামী—এই লীলায় তিনি পরম কৃপাভরে তাঁর দিব্যনাম জপকীর্তন প্রচারের মাধ্যমে কলিযুগের আধিপত্য খর্ব করেছেন।

দুঃসাহসিক কর্মকাণ্ড সবেমাত্র শুরু হয়েছে। মহাপ্রভুর মহান সেনাধ্যক্ষ শ্রীল প্রভুপাদ সকল দেশেই সুদৃঢ় তথা দুশ্ছেদ্য নোঙর স্থাপন করেছেন, যাতে জগতের সৌভাগ্য সুনিশ্চিত হতে পারে। কিন্তু কলি "আপনা হতেই আর্তনাদ করতে করতে দূর হয়ে যাবে না।"—তাকে দূর করতে হলে ভগবৎ-প্রেমের মহাসমুদ্রে পৃথিবীর প্রত্যেকটি নারী-পুরুষ এবং সন্তানকে পরিপূর্ণভাবে নিমজ্জিত হতেই হবে। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর 'বৈশিষ্ট্যাকম্' রচনার মধ্যে ব্যাখ্যা করেছেন যে, "শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণীর সারমর্ম পিঞ্জরাবদ্ধ করে রেখে সমগ্র জগতকে বধ করাই কলির উদ্দেশ্য।"

আর সেটাই বর্তমান যুগের হালচাল নয়? চমকদার বিজ্ঞানী, দার্শনিক আর রাজনীতিকদের মারাত্মক ভবদর্শনগুলিই গুরুত্ব লাভ করেছে, অথচ ভাগবতের যথার্থ আলোকবর্তিকা হয়ে রয়েছে অন্তর্হিত এবং বিস্মৃত। ফলস্বরূপ—জনগণ বিভ্রান্ত, মানব-জীবনের ব্রতসাধন আজ বিধ্বস্ত, এবং জগৎ নিমজ্জিত হয়েছে অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশা আর বিক্ষোভ-বিদ্বেষের দুঃস্বপ্নময় অন্ধকারে।

এমন পরিস্থিতি সংস্কারের মহান ব্রত ন্যস্ত হয়েছে আমাদের কাছে—শ্রীল প্রভুপাদের শিষ্য-প্রশিষ্যবর্গের হাতে। নোঙর ফেলা হয়ে গেছে, কিন্তু এখন

আমাদের সাঙ্গোপাঙ্গবাহিনীকে অবশ্যই কলির রাজ্যে অনুপ্রবেশ করে চলতে হবে এবং ক্রমশই একে একে ভূমি দখল করে যেতে হবে। প্রত্যেকের কাছেই ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের প্রক্রিয়া সহজলভ্য তথা সহজসাধ্য করে তোলার মাধ্যমে ভগবৎ প্রেমের ভাণ্ডার উজাড় করে দিতে হবে; কলির লৌহকঠিন কারাপ্রাচীর আমাদের বিধ্বস্ত করে দিতে হবে, যাতে শ্রীভগবানের মূল্যবান উপদেশামৃত মুক্তধারায় জগৎ-কল্যাণে প্রবাহিত হতে থাকে; কলির কবলমুক্ত করতে হবে জনগণকে; ভগবদ্গীতা ও শ্রীমদ্ভাগবতের মহান ভাবোজ্জ্বল উপদেশাবলী তাদের কাছে অবারিত করতে হবে আমাদেরই।

শ্রীল প্রভুপাদের জরুরী অনুরোধ এই যে ঃ

দিন যত যাচ্ছে, কলিযুগের প্রভাব ততই বাড়ছে এবং হতভাগ্য জীবকুল দুর্দশায় সকলে আর্তনাদ করছে। বৈষ্ণবজনের কৃপার অভাবে প্রত্যেকেই অসুখী। ভগবদ্ভক্তির চিহ্নমাত্র লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে বলে জড়জাগতিক সামগ্রীর ভোগ-ব্যবহারেই সারা পৃথিবীটা পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছে। তবু, তারা শান্তির খোঁজ করছে। এই কৃষ্ণভাবনামৃত তাদের মধ্যে প্রচার করে, তাদের বাসনা চরিতার্থ করতে হবে। সাগরাদি থেকে, পৃথিবীর প্রান্ত অবধি সমগ্র বিশ্ব পরিব্যাপ্ত করতে হবে। আজই, আমার ভ্রাতৃবর্গ, এই কাজে নিয়োজিত হও। তোমাদের প্রচার অভিযানের মাধ্যমেই নিষ্পেষিত জীবকুলকে রক্ষা করতে হবে।

একটি মুহূর্তও আমাদের আর প্রতীক্ষা করা চলবে না। আজই আমাদের এই কাজে নামতেই হবে।

মহাবদান্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ইচ্ছাক্রমে পর্যাপ্তভাবে অপ্রাকৃত লীলাবিলাস উপভোগ করার পর তিনি অন্তর্হিত হন। অবশ্য, অন্তর্ধানের পরে তিনি মনে মনে অনুমান করেন, "এ পর্যন্ত আমি জগতের মানুষকে আমার প্রতি বিশুদ্ধ ভক্তি প্রদান করিনি। সেই ধরনের অনন্যভক্তি নিবেদন বিনা জগতের কোনই অস্তিত্ব থাকা সম্ভব নয়। পৃথিবীর সর্বত্র শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে মানুষ আমার

আরাধনা করে। কিন্তু এই বিধি-ভক্তি অনুশীলন করার মাধ্যমে ব্রজভূমির ভক্তদের প্রেমভাব প্রাপ্ত হওয়া যায় না। আমার ঐশ্বর্য সম্বন্ধে অবগত হওয়ার ফলে সমস্ত জগৎ আমাকে শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে দর্শন করে। কিন্তু শ্রদ্ধার প্রভাবে শিথিল যে প্রেম, তা আমাকে আকৃষ্ট করে না।...আমি স্বয়ং এই যুগের যুগধর্ম নাম-সংকীর্তন বা সম্মিলিতভাবে ভগবানের মহিমা কীর্তনের প্রবর্তন করব। ভগবদ্ভক্তির চার প্রকার রস আস্বাদন করিয়ে আমি জগতকে প্রেমানন্দে উদ্বেলিত করে নৃত্য করাব।...ভক্তের ভূমিকা অবলম্বন করে আমি ভক্তিযোগে ভগবানের সেবা করার শিক্ষা প্রদান করব। আমার অংশ-প্রকাশেরাও প্রত্যেক যুগে অবতীর্ণ হয়ে যুগধর্ম প্রবর্তন করতে পারে, কিন্তু আমি ছাড়া অন্য কেউ ব্রজের প্রেম দান করতে পারে না।...তাই আমি আমার আপন ভক্তদের সঙ্গে পৃথিবীতে অবতরণ করে বহুবিধ আনন্দময় লীলাবিলাস পরিবেশন করব।" এইভাবে চিন্তা করে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কলিযুগের প্রথম ভাগে (সন্ধ্যায়) নদীয়ায় অবতীর্ণ হলেন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রবর্তিত শ্রীভগবানের দিব্য নাম সংকীর্তনের ব্রতচারণ যে সর্বোত্তম কল্যাণকর্ম, এই সিদ্ধান্ত সামান্য কয়েকজন মুষ্টিমেয় গোষ্ঠী-অনুসারীদের ভাববিলাসী বিচার-প্রসূত নয়। শুধুমাত্র বাস্তবানুগ বিচার মাধ্যমেই যে কেউ এই তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারবেন। সেই কারণেই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের লেখক, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী এই পদ্ধতি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জনকল্যাণকর কার্যকলাপের মাধ্যমে অবাধে প্রয়োগের জন্য আগ্রহী পাঠকদের আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁরা যদি তা করতে পারেন, তা হলে তাঁরা উপলব্ধি করতে পারবেন যে, এই পদ্ধতি সব থেকে বিস্ময়করভাবে ফলপ্রসূ হতে পারে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা চলে, আমাদের আধুনিক সভ্যতার মধ্যেই মানব প্রগতি বলতে যা বোঝায়, তা বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের আপেক্ষিক মূল্যবোধ রীতি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বিবেচিত হয়ে থাকে। যে সমস্ত মানুষ জাগতিক তথা ভৌত বিজ্ঞানের উপলব্ধিকেই জীবনের পরম আবশ্যক বলে দৃঢ়বিশ্বাস পোষণ করে থাকেন, তাঁদের কাছে নিউটন, ডারউইন, কিংবা ফ্রয়েডের মতো বিজ্ঞানীদের জটিল তত্ত্বগুলিকেই প্রগতিশীল বলে বিবেচিত হতে পারে। যাঁরা দৃঢ় মত পোষণ করে থাকেন যে, সামাজিক তথা রাষ্ট্রনৈতিক প্রগতিই জীবনের পরম আকাঙ্ক্ষিত ভাবধারা, তাঁদের কাছে লিঙ্কন কিংবা গান্ধীর কার্যকলাপই তার চেয়ে অনেক বেশি প্রগতিপন্থী বলে প্রতীয়মান হয়ে থাকে। আর যাঁরা

মায়াবাদী কল্পচিন্তার জটিলতাতেই বিশেষভাবে অভিভূত হয়ে থাকেন, তাঁদের কাছে প্লেটো, অ্যারিস্টটল, হিগেল, কিংবা কান্ট-এর চিন্তাসমৃদ্ধিকেই আরও বেশি প্রগতিশীল বলে মনে হতে পারে।

পরিণামে অবশ্য এই সমস্ত আপাত প্রগতির দৃষ্টান্তগুলি সবই ব্যর্থ হয়ে যায়, কারণ সেইগুলি শুধুমাত্র জড়জাগতিক জীবনের স্বপ্নময় অলীক পরিবেশ-পরিস্থিতির সাথেই সম্পর্কিত ভাবধারা মাত্র এবং তাই অপ্রতিহত মহাকালের সামান্যমাত্র অস্থিরতার ফলেই তা সবই নস্যাৎ হয়ে যাবে। আধুনিক জগতের মহা দুর্ভাগ্য যে, জড়জাগতিক জ্ঞানবিকাশে আমাদের প্রগতি হওয়া সত্ত্বেও, আমাদের অন্তস্থিত শাশ্বত চিরন্তন আত্মার সম্পর্কে নৈরাশ্যজনকভাবেই অজ্ঞতা পোষণ করে চলেছি। যে শাশ্বত আত্মার অনুপস্থিতির ফলে জড় শরীরের সমস্ত মানসিক, দৈহিক এবং চিন্তামূলক প্রচেষ্টা অন্তর্হিত হয়ে যায়, সেটাই হল সৃষ্টির অস্তিত্বের অপরিহার্য মূল তত্ত্ব। আর এই আত্মার যা কিছু অত্যাবশকীয় প্রয়োজন, তাই হল জীবনের পরম বাঞ্ছিত বস্তু। মানুষের সকল আগ্রহ অনুরাগের মধ্যে এই সর্বশ্রেষ্ঠ বিষয়টিকে আমরা যতদিন অবহেলা করে চলব, ততদিনই বিজ্ঞানে, প্রযুক্তিতে, চিকিৎসাশাস্ত্রে, শিল্পকলায়, দর্শনতত্ত্বে, সংস্কৃতি অনুশীলনে, এবং সাহিত্যচর্চায় আমাদের সকল প্রকার সাফল্যই নিতান্ত দ্রুত ক্ষণস্থায়ী বিষয়াদির অর্থহীন চর্চায় ব্যর্থ পর্যবসিত হবে, কোনও দিন আমাদের অভীষ্ট সার্থকতা তথা সিদ্ধিলাভের পথে এগিয়ে যেতে দেবে না।

এই ধরনের ভাবধারার সম্পূর্ণ বৈপরীত্যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং তাঁর অনুগামীদের অনুষ্ঠিত জনকল্যাণকর সেবাকার্যের মাধ্যমে শাশ্বত চিন্ময় আত্মায় পরম সুখ তৃপ্তির প্রত্যক্ষ আয়োজন করা সম্ভব হয়েছে, এবং তার ফলে সকলের জীবনে সর্বশ্রেষ্ঠ কল্যাণ বর্ষিত হয়েছে। আজ অথবা কাল যে অস্থায়ী অনিত্য অস্তিত্বের বিলোপ সাধন অবশ্যম্ভাবী, সেই ধরনের জাগতিক উন্নতি-প্রগতির সাথে শ্রীভগবানের জনকল্যাণ ব্রতের কোনই সম্পর্ক নেই। আমাদের মোহনিদ্রা থেকে জাগিয়ে তোলার জন্য, আমাদের অস্তিত্ব পরিশুদ্ধ করবার উদ্দেশ্যে এবং শাশ্বত চিরন্তন জীবকুলের নিত্য কর্তব্যরূপে ভগবদ্ভক্তির প্রথা স্থাপনার জন্যই মহাপ্রভুর আবির্ভাব।

বৈদিক সংস্কৃতি অনুসারে, মানুষের কর্তব্য—ভগবৎ চেতনা লাভ করা। তাকে জানতে হবে ভগবান কি, এই জড় জগৎ কি, এবং ভগবানের সঙ্গে তার কি সম্পর্ক। একে বলা হয় 'শ্রেয়', বা পরম মঙ্গলময় কার্য।

পরম মহাবদান্যভাবে ভাবিত হয়ে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু চেয়েছিলেন এই কলিযুগের অধঃপতিত জীবকুলের কাছে অনন্য ভগবৎ-প্রেমের সর্বোচ্চ শ্রেয় বিতরণ করবেন, যাতে প্রত্যেক মানুষকে যথার্থ আশ্রয়দানের উদ্দেশ্যে তাঁর ব্রত সফল হতে পারে। তাই, তিনি যে নিঃস্বার্থ মহানুভবতার উদারতা স্বপ্রকাশিত হতে চাইবেন, তাতে কোনই বিস্ময় নেই, এবং সেই ভাবধারা বৃক্ষরূপে প্রতিভাত হয়েছে।

গৃহস্থদের দায়িত্বশীল হতে হয়

শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধের ২৪ অধ্যায়ে বর্ণিত কাহিনীতে আমরা দেখি যে, প্রচেতা রাজকুমারেরা ভগবান শিবের দর্শন পাওয়ায় বিদুর আশ্চর্যান্বিত হয়েছেন। কারণ মহাদেব সচরাচর সহজে কাউকে দেখা দেন না।

বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে মহাদেবের অস্তিত্বের মহিমা সবার উপরে, একমাত্র শ্রীবিষ্ণুর পরে। যথার্থ গুরুশিষ্য পরম্পরার ধারায় তিনি একজন বিশিষ্ট বৈষ্ণবও। এই নবদ্বীপেই মহাদেব বিষ্ণুস্বামীকে উপদেশ দেন। এই মায়াপুর নবদ্বীপে শিবের অন্যান্য লীলা আছে। প্রকৃতপক্ষে শিব হলেন ধামাদির রক্ষাকর্তা। শিবের অনুগ্রহ বিনা ধামে প্রবেশ করতে কেউ পারে না।

নবদ্বীপ পরিক্রমায় একাধিক শিব-মাহাত্ম্যের স্থান পাই। সীমন্তদ্বীপে বিভিন্ন মূর্তি আছে। পার্বতীদেবীকে শিব উপদেশ দেন গৌরাঙ্গদেবের আরাধনা করতে, তাঁর দর্শন লাভ করে তাঁর চরণধূলি গ্রহণ করতে। গোদ্রুম, হরিহরক্ষেত্র, মহৎপুর, রুদ্রদ্বীপ, শঙ্করপুর, ঋতুদ্বীপ ইত্যাদি স্থান শিবের নানা লীলাস্থল। একবার ব্রহ্মার বাহনে চড়ে শিব অবতরণ করেন। সেই জায়গায় এখন রাজহংসের পিঠে শিবের মূর্তি পূজা হয়। রুদ্রদ্বীপের শঙ্করপুরে শঙ্করাচার্য এসে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর স্বয়ং সাক্ষাৎ করে দর্শন লাভ করেন এবং মহাপ্রভু তখন তাঁকে বলেন যে, এটি আমার ধাম, এখানে সবাই ভগবানের ভক্ত, এখানে কোনও রকম প্রচারের প্রয়োজন নেই, আপনি অন্যান্য স্থানে প্রচারকার্য করুন।

শঙ্করাচার্য এসেছিলেন আনুমানিক দু'হাজার বছর আগে। তাঁর পরে আসেন বৈষ্ণবাচার্য, তিনি জনসাধারণের মধ্যে ভগবানের ব্যক্তি রূপের

আরাধনা প্রচার করেন। এইভাবে চারজন বৈষ্ণব ধারা প্রবর্তক এসেছিলেন—মধ্বাচার্য, রামানুজাচার্য, নিম্বার্কাচার্য এবং বিষ্ণুস্বামী।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এসেছিলেন বৈষ্ণব পরম্পরার এই চারটি ধারাকেই একত্রিত করতে। কলিযুগে একটাই ধারা থাকবে, শ্রীল প্রভুপাদ বলছেন, বৌদ্ধদের আর মায়াবাদ প্রচার করবার দরকার নেই, সকলেই হয়ে উঠুক সাকারবাদী। বৌদ্ধরা নিশ্চয় জানবেন যে, ভগবান বুদ্ধ নিজেই শ্রীবিষ্ণু। মায়াবাদীদের জানা উচিত যে, স্বয়ং শিব এসেছেন শঙ্করাচার্য রূপে—বিষ্ণুরই আদেশে, বৌদ্ধগণকে বেদ অনুগামী করে তুলতে।

এই হচ্ছে সময় যখন সকলেই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তিভাবাপন্ন হয়ে উঠবে। এখন মহাপ্রভু আদেশ করলেন, সারা ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত মানুষ কৃষ্ণভাবনা গ্রহণ করুক, এবং বাকি সকলকে তা বিতরণ করুক।

ভগবান শিবকে দর্শনে পাওয়া খুবই দুর্লভ। শঙ্করাচার্য খুবই সুদর্শন ছিলেন। তেমনই, প্রচারকার্যে আমাদেরও ভগবান শিবের আশীর্বাদ দরকার। পাটনা গয়ায় কৃষ্ণ, বলরাম এবং শিবলিঙ্গের মূর্তি আছে। কথিত আছে যে, গৌর-নিতাই আছেন ঐ কৃষ্ণ-বলরাম রূপে এবং অদ্বৈত আচার্য এসেছেন ঐ শিবলিঙ্গ রূপে। সুতরাং ভক্তগণ সেখানে শিবের আশীর্বাদ এবং কৃষ্ণ-বলরামের কৃপা গ্রহণ করে থাকেন।

বৃন্দাবনের শিব গোপেশ্বরশিব রূপে পূজিত। দক্ষিণ ভারতে প্রচার করার সময়ে সেখানকার ভক্তরা বলে 'আপনারা কেবলই কৃষ্ণ, বলরাম, রামের কথা বলেন, রুদ্র সম্প্রদায় শিবের কথা বলেন না কেন? কারণ তামিল অঞ্চলে ভগবান শিবের পূজার প্রচলনই বেশি। আমাদের পরম্পরা ধারায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শিবের প্রতি খুব শ্রদ্ধাবান ছিলেন। তিনি শিব মন্দিরেও যান, যেমন সুন্দরেশ্বর মন্দির দক্ষিণ ভারতে এবং মীনাক্ষি মন্দির এবং সেখানে তিনি কি করেছিলেন—মহাপ্রভু সেখানে 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে' কীর্তন করেছিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন, অন্য কোনও দর্শনের প্রয়োজন নেই। মায়াবাদের কোনও প্রয়োজন নেই। আধ্যাত্মিক তাৎপর্যের শুরু হয় ভগবদগীতা অধ্যয়ন করার পর থেকে, এবং গীতার চরম উপদেশ হচ্ছে, পরম পুরুষ পরমেশ্বর ভগবানের কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ। যদিও লোকে শিবের পূজো করে নানা জাগতিক প্রয়োজনে, সেটা অবশ্যই প্রশংসনীয় তবে শিবের কৃপা হল ভগবদ্ভক্তি লাভের জন্য।

শিব একজন মহান বৈষ্ণব, তিনিই ভগবদ্ভক্তি দান করতে পারেন। ঠিক যেমন গোপীরা আরাধনা করেছিল, তারা জাগতিক কিছু পেতে চায়নি, বরং ত্যাগী হয়ে আরাধনা করেছিল—ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তাদের স্বামীরূপে পেতে।

প্রার্থনা করা উচিত একমাত্র কৃষ্ণভক্তি পাওয়ার জন্য। এতকাল ধরে, জন্ম থেকে লোকে যে পূজা পদ্ধতিতে অভ্যস্ত, তা ত্যাগ করতে বলাটা খুব কঠিন, এটা তাদের জানানো প্রয়োজন—কিভাবে শিব নিজেই বিষ্ণুর কাছে প্রার্থনা নিবেদন করে থাকেন।

এখনি সময় এসেছে সমস্ত বদ্ধ জীবদের মায়াবাদ ধারণা থেকে পরিশুদ্ধ করে, তাদের অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্বে ফিরিয়ে আনার, পরম সত্যের ব্যক্তি-স্বরূপ উপলব্ধির পথে ফিরিয়ে আনার। এর জন্য প্রয়োজন ভগবদ্‌গীতা যথাযথ-র একনিষ্ঠ অধ্যয়ন এবং জোরদার প্রচার। গীতায় কৃষ্ণ বলেছেন, 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ'। কিছু বিজ্ঞজন তার অনুবাদ করেন যে, কৃষ্ণের মধ্যে যে 'ছেলে'টি আছে তার প্রতি আত্মসমর্পণ করতে বলা হয়েছে। কিন্তু প্রভুপাদ বলছেন সেটা ভুল। শ্রীকৃষ্ণ ভেতরে বাইরে সবই এক চিন্ময় সচ্চিদানন্দ। এই ভাবেই মানুষ বিভ্রান্ত হয়, তারা ভগবানের ব্যক্তি-স্বরূপটা উপলব্ধি করতে পারে না।

শ্রীকৃষ্ণের ব্যক্তিত্ব বোঝা খুব শক্ত। তিনি যখন বৃন্দাবন ছেড়ে মথুরা যান, সেখানে কত রকম বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা ছিল, রাজপুত্র যখন হলেন তখন কত প্রকার রাজনৈতিক কূটনৈতিক ব্যাপার সামলাছেন।

কৃষ্ণ-বলরাম যখন হস্তিনাপুর যান, স্যমন্তক মণি চুরির ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েন। সত্যভামার পিতার মৃত্যুতে সত্যভামা এসে কৃষ্ণের কাছে শোকাহত হয়ে কান্নাকাটি করলে শ্রীকৃষ্ণও তাঁর রাণীর দুঃখে ব্যথিত হন এবং তাঁর চোখেও জল দেখা দেয়। যদিও শ্রীকৃষ্ণ চিন্ময়, এবং জাগতিক লাভ-ক্ষতির সাথে তাঁর কোন সম্পর্ক নেই, তবুও তাঁর ভক্তদের আবেগ অনুভূতির প্রত্যুত্তরে তিনি খুবই ব্যক্তিগত আচরণ প্রকাশ করতে পারেন। এবং এই রকম পরিস্থিতিরও সৃষ্টি করেন তাঁর লীলা প্রকাশ করার জন্য। এই লীলাশক্তির প্রভাবে আর সকল অংশগ্রহণকারীও এই লীলায় যোগদান করতে পারে। ঠিক যেমন আমরা নাটক মঞ্চস্থ করে থাকি, ভগবানও তাই করেন—লীলা।

সর্বজ্ঞ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কি জানতেন না যে, স্যমন্তক মণিটা কোথায় ছিল? কিন্তু তিনি আর সকলের মতো সাধারণ ভাবেই খোঁজাখুজির লীলা করে চললেন। এমনটি ঋষিরা পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের ব্যক্তিত্ব বুঝে উঠতে পারে না।

কেবলমাত্র ভক্তরাই বুঝতে পারেন যে, এই সমস্তই তাঁর বিশাল লীলাখেলার অঙ্গ।

স্যমন্তক মণি চুরি যাওয়ার রহস্যে লোকে শ্রীকৃষ্ণের নামেও বাজে গুজব রটনা করেছিল। শ্রীকৃষ্ণ যতদিন এই ধরাধামে ছিলেন, তাঁর লীলাশক্তির প্রভাবে, আর দশজন সাধারণ মানুষের মতোই নানাজনের সমালোচনার পাত্র বনেছিলেন। যদিও স্যমন্তক মণি চুরি বা অধিকারের বিষয়ে কৃষ্ণের কোনও ভূমিকা ছিল না, তবুও লোকে তাকে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছিল। তখন তিনি অক্রূরকে ডেকে বলে দেন, উদ্ধার করা মণিটা এখন কার কাছে থাকা উচিত। সত্রাজিৎ যেহেতু মৃত, তাঁর স্ত্রীও মৃত, এবং তাঁদের কোনও পুত্রসন্তান নেই, সুতরাং বৈদিক রীতি অনুসারে পরবর্তী উত্তরাধিকারী হচ্ছে কন্যার পুত্রসন্তান, সত্যভামার যে ছেলে জন্মাবে, তার মণিটা নিজে না নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ এই ব্যবস্থা করলেন সকলকে বোঝাতে যে, এই মণির ব্যাপারে তিনি সত্যিই মর্মাহত হয়েছেন।

কৌরব রাজসভাতেও পাণ্ডবদের ও বিদুরকে নানাভাবে দুর্যোধনের মিথ্যা অপবাদের পাল্লায় পড়তে হয়েছিল। ভক্তদের মাঝেও অনেক সময়ে একজন আর একজনের বিরুদ্ধে কথা বলে থাকে। এটা মোটেও ভাল নয়। এতে ভক্তদের উপর অভিশাপ আসে। কিন্তু তাতে হতাশ হওয়া উচিত নয়। আসলে হতাশ হবার মতো পরিস্থিতিই এটা, তবুও ভগবানের সেবায় যুক্ত থাকতে হবে। মনে রাখতে হবে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পর্যন্ত নিন্দনীয় অপবাদের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। ভক্তরা মাঝে মধ্যে এরকম ভাবে যে কেউ আমার নামে বলেছে, সুতরাং আমি আর এই সেবা করতে পারব না—এটা মিথ্যা অহমিকা। আমরা বিপদে থাকি অথবা সম্পদে থাকি, বেদনায় থাকি বা সুখে থাকি, ভগবান কৃষ্ণের সেবা থেকে আমরা কখনও চ্যুত যেন না হই।

অনেকে মনে করে, ব্রহ্মচারী বা সন্ন্যাসীদের ভক্তিচর্চায় নানা প্রকার সুবিধা রয়েছে। কিন্তু যে কোনও আশ্রমই হোক, তা সঠিক ভাবে পালন করাটাই সেই আশ্রমের দায়িত্ব।

একবার এক ভক্ত প্রভুপাদের কাছে এসে তার কিছু সমস্যার কথা বলে। প্রভুপাদ পরামর্শ দেন, তুমি গৃহস্থ আশ্রম নিচ্ছ না কেন? ভক্তটি বলে, 'না, না, তাহলে আমি অধঃপতিত হয়ে যাব।' শ্রীল প্রভুপাদ বলেছিলেন, "না, তুমি অধঃপতিত হয়েই গেছ, কারণ ব্রহ্মচর্য আশ্রম সঠিকভাবে পালন করছ না, এবং গার্হস্থ্য আশ্রম নিলে পতিত হবে না। সেটা একটা দায়িত্ব।"

আমরা চাই ব্রহ্মচর্য আশ্রমে যারা থাকবে তারা অবশ্যই সম্পূর্ণ নৈষ্ঠিক হবে। বর্তমান কলিযুগে কামনা বাসনা অত্যন্ত প্রবল। তবে কামনা আসবে আর তাকে দমন করব, এটাই প্রবণতা হওয়া উচিত নয়। স্ত্রী পুত্র সংসার এগুলি খারাপ নয়। গৃহস্থ হওয়া মানে পতন থেকে উদ্ধারের পথে নামা। তবে তাদের ঐ আশ্রম পালনে অত্যন্ত দায়িত্বশীল হতে হয়।

ভক্তিমূলক সেবাটাই প্রধান কথা, তা সে যে আশ্রমই হোক। চাই দায়িত্ববান ব্রহ্মচারী, চাই দায়িত্ববান গৃহস্থ, চাই দায়িত্ববান সন্ন্যাসী—দায়িত্বহীনদের আমাদের কোথাও প্রয়োজন নেই। যে ব্রহ্মচারী নিষ্ঠাচার ভঙ্গ করছে, সেটা খুবই নিন্দনীয়, তাকে চাই না, যে গৃহস্থ তার আশ্রম তার পরিবারের দায়িত্ব নেয় না, তাকে চাই না। যে আশ্রমই নিই নিষ্ঠাযুক্ত হতে হবে। পতিত ব্রহ্মচারী হওয়ার চেয়ে দায়িত্বশীল গৃহস্থ হওয়া কত ভাল।

প্রচেতাদের আলাদা আলাদা স্ত্রী থাকবে কারণ সেটা তাদের গুরুর আদেশ ছিল। তারা এমনভাবে গার্হস্থ্য আশ্রম গ্রহণ করতে চায়নি যাতে সেখানে তারা গৃহমেধী হয়ে ওঠে। তাই তারা তপস্যা করে কঠোর ব্রহ্মচর্য পালন করছিল, যাতে যখন গৃহস্থ আশ্রমে প্রবেশ করবে, তখন কঠোর নিষ্ঠাযুক্ত গৃহস্থ হতে পারবে, এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আরাধনার ফলে তারা শ্রীকৃষ্ণকেও সন্তুষ্ট করছিল, শিবও সন্তুষ্ট হচ্ছিলেন।

ব্রহ্মচারী অনেক রকমের আছে—যারা সারা জীবন ব্রহ্মচারী থাকতে চায় অথবা পরে কোনও এক ধাপে গৃহস্থ হতে চায়। কলিযুগের সমগ্র পরিস্থিতিতে যে কোনও আশ্রম পালনই খুব কঠিন। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন, কৃষ্ণভক্তি অনুশীলন করতে হবে।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বিভিন্ন লীলারহস্য

শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গে বিভিন্ন গো-পালেরা ছিলেন, কৃষ্ণলীলার সখারা এসেছিলেন এবং তাঁরা শৈশব লীলা করেছিলেন নিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গে। তাঁরা নিয়মিত নাটক করতেন। স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের খেলা ছিল ভাগবতে রামায়ণে যে সমস্ত লীলা আছে, রামলীলা, নানা অবতার লীলা তাঁরা অভিনয় করতেন। প্রতিবেশীরা আশ্চর্য হতেন যে, এই বালকেরা কি করে জানলো কি কি হলো, কোথায় হলো, কোনও রকম শিক্ষা তো তাদের দেওয়া হয়নি।

একটি সুন্দর লীলা হয়েছিল—নিত্যানন্দ প্রভু রামলীলা করছিলেন, লক্ষ্মণের অভিনয়। একটা ছেলে ছিল ইন্দ্রজিৎ, সে শক্তিশেল মারল। নিত্যানন্দ প্রভু অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন। আর সেই সঙ্গে তাঁর মা পদ্মাবতী দেবী এসেছেন, নিত্যানন্দ প্রভুর তখন প্রসাদের সময় হয়েছে। মায়েরা যেমন খেলার মধ্যে গিয়ে বলেন, খাওয়ার সময় হয়ে গিয়েছে, স্নান করতে হবে চলো; সেইভাবে বাচ্চারা সবাই প্রস্তুত কিন্তু নিত্যানন্দ প্রভু অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন, তখনও শক্তিশেল বিদ্ধ। নিশ্বাস প্রশ্বাসও নেই। তখন দেখা গেল যে মারাই গেছেন, সবাই ডাক্তার ডেকে আনতে গেল। কেউ স্থির করতে পারলেন না, কি করে কি করা যায়।

ছেলেদেরকে লোকেরা তখন বলল, ও কি করছিল? ছেলেরা বলল,—ও তো রামলীলা করছিল। লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিতের শক্তিশেলে বিদ্ধ হয়েছে, হনুমান গন্ধমাদন পাহাড় থেকে বিশল্যকরণী নিয়ে এসে সেই পাতার রস দিলে লক্ষ্মণের চেতনা ফিরবে। তাই আমাদের সেই লীলা পূর্ণ করতে দাও। তখন সেই ছেলেটাকে ডেকে আনল—কে হনুমান হয়েছে—তাড়াতাড়ি যাও পাহাড়ে। সে সেখানে গিয়ে কাঁধে করে একটি ছোট গাছ উঠিয়ে এনে নিত্যানন্দ প্রভুর নাকে সেই গাছের পাতার রস দিল। তখন নিত্যানন্দ প্রভুর চেতনা ফিরে এলো। তাঁরা লীলায় এতই মগ্ন ছিলেন।

তাঁরা এই সব লীলা প্রকাশ করছিলেন। এইভাবে অনেক সুখের দিন কেটেছে বিভিন্ন বন্ধুদের সঙ্গে, যাঁরা বয়স্ক ছিলেন তাঁরাও নিত্যানন্দ সম্বন্ধে আলোচনা করছিলেন।

হাড়াই ওঝা ছিলেন ব্রাহ্মণ। তিনি তাঁর ছেলেকে কাছাকাছি রাখতেন। একদিন এক সন্ন্যাসী এসেছেন হাড়াই ওঝার বাড়িতে। সন্ন্যাসী কৃষ্ণকথা আলোচনা করলেন এবং পরে প্রসাদ পেলেন। এইভাবে এক-দুই দিন কেটে গেল। তিনি চলে যাবার সময় হলে হাড়াই ওঝা বললেন, আপনার জন্য কিছু সেবা করতে পারি?

তিনি বললেন, আমি যা চাইব তা-ই তুমি দেবে? তখন 'নি-ত্যা-ন-ন্দ' বলে কেঁদে উঠেছেন। তিনি বিশ্বাস করতে পারেননি আর অচেতন হয়ে পড়লেন। জেগে উঠে মনে করলেন, এটা কি সত্যি? আমি নিত্যানন্দকে দেব? ব্রহ্মচারী হিসাবে সন্ন্যাসীর সেবা করবে? হাড়াই পণ্ডিতের মাথা ঘুরছে—নিত্যানন্দ ছাড়া তো বাঁচব না। তখন তিনি ভাবছেন, ব্রাহ্মণের কাছে কথা তো দিয়েছি। তো আমি যদি এখন মিথ্যা কথা বলি, নিত্যানন্দ তা হলে

ধর্মের নিয়ম ভুল শিখবে। তাঁর ছেলেকে দৃষ্টান্ত দেওয়ার জন্য তাকে তার সেই উচ্চ পর্যায়ের আদর্শের প্রতিশ্রুতি অনুসারে নিত্যানন্দকে সন্ন্যাসীর সাথে দিতে রাজী হলেন। তখন তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরে পড়ছে সব সময়ে। তাঁরা চলে গেলে হাড়াই ওঝা নিত্যানন্দের বিরহে প্রাণত্যাগ করলেন।

অনেক বছর পর, নিত্যানন্দ প্রভু এই পৃথিবী থেকে চলে যাবার পর জাহ্নবী দেবী একচক্রে গিয়েছিলেন। এক বৃদ্ধ লোকের সঙ্গে দেখা হলো—তাঁর চোখে অশ্রু—জপ করছিলেন। তিনি শুনলেন—'নিত্যানন্দ! নিত্যানন্দ!' বলে কান্নাকাটি করছেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—'নিত্যানন্দ' বলে কান্নাকাটি করছেন কেন? তিনি বললেন—কেন নয়? তিনি ছিলেন এই গ্রামের প্রাণস্বরূপ, তাঁকে ছাড়া আমরা কিছু জানতাম না, তিনি সবাইকে দিব্য আনন্দ দান করতেন। হাড়াই ওঝা কেন ওকে কোথায় দিলেন, আরও কত ছেলে ছিল, সারা গ্রাম প্রাণশূন্য হয়ে গেল। তাদের জীবন ধারণের আর কোনও উদ্দেশ্য নেই। তাই কেউ কেউ নবদ্বীপে চলে গেল। —এই বলে আবার কান্নাকাটি শুরু করলেন। জীবনভর তিনি নিত্যানন্দের বাল্যলীলা চিন্তা করছিলেন।

নিত্যানন্দ প্রভু বারো বছর বয়সে বেরোলেন সারা ভারতবর্ষে তীর্থ করতে। সমস্ত পবিত্র নদীগুলি পবিত্র করলেন—এই সব নদীগুলি তাঁর সঙ্গ লাভের জন্য অপেক্ষা করছিল—ঠিক যেমন বলরাম নানা তীর্থে ঘুরেছিলেন। বৃন্দাবনে গেলেন, সেখানে গাভীরা, ব্রজবাসীরা, হরিণরা অভ্যর্থনা প্রার্থনা করছে—বৃন্দাবনে পুনরায় তিনি এসেছেন বলে।

তারপর তিনি শুনলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু রূপে এসেছেন আর তাঁর সংকীর্তন যজ্ঞ শুরু করেছেন—এখন নবদ্বীপে যাওয়ার সময় হয়েছে। সেখানে তিনি নন্দনাচার্যের বাড়িতে ছিলেন (আমাদের মন্দিরের পাশে যে মন্দিরটি ওটি নন্দনাচার্যের বাড়ি ছিল)। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন—আমার নিত্য সঙ্গী, আমার অংশ, আমার ভাই নিত্যানন্দ—সে এসেছে এখানে, তোমরা তাকে খুঁজে নিয়ে এসো।

ভক্তরা খুঁজতে বেরুলেন, লোকেদের দ্বারে দ্বারে টোকা দিয়ে—লোকেরা বলতে লাগল, কী করছো, আমরা এখন বিশ্রাম করছি, ইত্যাদি, নিত্যানন্দ বলে এখানে কেউ নেই। সর্বত্র খুঁজে খুঁজে তাঁরা ফিরে এলেন শূন্য হাতে।

মহাপ্রভু বললেন, তোমরা পাবে না, ভগবানকে ঐভাবে খুঁজে পাবে না। তিনি নিজেকে প্রকাশ করলে তবে পাবে। কেবল ভক্তির মাধ্যমেই ভগবানকে

খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন আমি খুঁজে পেতে পারি, তোমাদের যেতে হবে না, আমি যাবো। সে আমার কাছ থেকে লুকোতে পারবে না।

পরের দিন মহাপ্রভু কীর্তনদল নিয়ে নবদ্বীপ নগর গেলেন। যখন নন্দনাচার্যের বাড়ির কাছে গেছেন, নিত্যানন্দ প্রভু কীর্তনের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলেন—করতাল, মৃদঙ্গ। তখন তিনি লাফিয়ে উঠেছেন। মহাপ্রভুও সোজাসুজি নন্দনাচার্যের বাড়িতে ঢুকে পড়েছেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন নিত্যানন্দ প্রভুকে জড়িয়ে ধরে 'নি-ত্যা-ন-ন্দ' বলে চেঁচিয়ে উঠেছেন। আর নিত্যানন্দ প্রভু 'গৌ-রা-ঙ্গ' বলে চেঁচিয়ে উঠেছেন! দুজনে দুজনের দিকে ছুটে গেলেন—তাঁদের অশ্রু ঝরে পড়ছে। আর সমস্ত ভক্তরা—'গৌরহরি বোল হরিবোল' বলে একই আনন্দ আস্বাদন করতে লাগলেন। সমস্ত দেবতারা দেখতে এসেছিলেন কৃষ্ণ-বলরামের মিলন। তখন তাঁরা পুষ্পবৃষ্টি করছিলেন আকাশ থেকে। এই যে মহামিলন—লোকে দেখে বলতে লাগল কারা এরা, এত সুন্দর, আগে তো দেখিনি এবং সকলে 'নিতাই গৌরাঙ্গ' বলে যোগ দিল।

নবদ্বীপে তাঁদের অনেক লীলা আছে, বিশেষ করে শ্রীবাস ঠাকুরের বাড়িতে—সেখানে নিত্যানন্দ প্রভু বাল্যভাব অবলম্বন করতেন। এক সময়ে শচীমাতা জেগে উঠে নিমাইকে ডেকে বলছেন—আমি একটা স্বপ্ন দেখলাম বুঝতে পারলাম না; বলতে পারো কি এর অর্থ? —দেখলাম যেন কৃষ্ণ বলরামের বিগ্রহ এখানে আছে, আমি ভোগ নিবেদন করছি। সামনে দুটি শিশু, তুমি আর নিত্যানন্দ যেন। নিত্যানন্দ সেই বিগ্রহকে বলছে—এই ভোগ তোমার জন্য নয়, এখন কলিযুগ, এটা চৈতন্য মহাপ্রভুর জন্য, গৌরাঙ্গের জন্যে!

নিমাই তখন বললেন, মা, নিত্যানন্দ বোধ হয় খুব ক্ষুধার্ত, নিত্যানন্দকে একটু দুপুরে খাওয়াতে হবে। তোমার বিগ্রহগুলি খুব কাজের তো, কিছু লীলা করেছে, কে বুঝতে পারে এই সব লীলা। বলো তো আমি এখনি গিয়ে নিত্যানন্দকে নিমন্ত্রণ করে আসি।

শচীমা তো খুব খুশি গৌর নিতাইকে খাওয়াবেন,—তক্ষুণি ছুটলেন রান্নাঘরের দিকে। মহাপ্রভু তাঁকে খুঁজতে গিয়ে শুনলেন তিনি গঙ্গায় সাঁতার কাটতে গেছেন। খবর পেয়ে নিত্যানন্দ সাঁতরে কাছে এলেন। নিমাই তখন বললেন, শোনো, আজ তুমি আমার সঙ্গে প্রসাদ পাবে, শচীমা রান্না করেছেন। তবে খবরদার কোনও পাগলামি করবে না। নিত্যানন্দ প্রভু বলছেন, বলো কি! আমি তো পাগলামি করি না, তুমি তো পাগলামি করো। এইভাবে দুই ভাই-এ কথা বলছিল—দেখা যাক কে পাগলামি করে।

এদিকে শচীমা ভোগ নিবেদন করেছেন কৃষ্ণ বলরামের সামনে। আর গৌর নিত্যানন্দের জন্য থালা পেতেছেন পরম আনন্দে তিনি তিন খানা থালা পেতেছেন—কে জানে কেন। হিসাব হারিয়ে ফেলেছেন, যদিও দু'জন আছেন সেখানে। ভেতরে গেছেন, বহু রকম ব্যঞ্জন রান্না করেছেন, সেগুলি নিয়ে যখন এসেছেন, দেখছেন আসনে গৌর নিতাই কই? বিগ্রহগুলি—কৃষ্ণ বলরাম বসে বসে প্রসাদ খাচ্ছে। তিনি তখন সঙ্গে সঙ্গে মূর্চ্ছা গেছেন। পরে জেগে উঠেছেন, তখন নিমাই এসে গেছেন—কি হয়েছে মা তোমার। তিনি দেখেন, কৃষ্ণ বলরামের জায়গায় গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ। তখন তিনি কাঁদতে শুরু করেছেন এবং ছুটে গিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন।

একদিন নিত্যানন্দ প্রভুকে মহাপ্রভু বলেছেন—তোমার ব্যাসপূজা করবো আগামীকাল। তখন শ্রীবাস ঠাকুরের বাড়িতে আগের দিন অধিবাস করলেন। বলে দিলেন, বাইরের লোক যেন কেউ না আসে এখানে শুধু ভক্তরা থাকবে। বড় কীর্তন হচ্ছে, নৃত্য করছে, একবার নিত্যানন্দ প্রভু চেষ্টা করছেন মহাপ্রভুর চরণ থেকে ধুলো নিতে, আবার পরের বার মহাপ্রভু চেষ্টা করছেন নিত্যানন্দ প্রভুর চরণ থেকে ধুলো নিতে। একে অপরকে আলিঙ্গন করছেন, পরম আনন্দে কীর্তন করছেন দীর্ঘ সময় ধরে। তারপর পূজার উপকরণ জোগাড় করা হয়েছে, মহাপ্রভু তখন বিশ্রাম করতে যাবেন। নিত্যানন্দ প্রভু তখন ব্রহ্মচারী দণ্ড ভেঙে, কমন্ডলু ভেঙে ফেলে দিয়েছিলেন। কেউ জানে না কেন এটা করলেন। চৈতন্যভাগবতে বলা হয়েছে অনেক কারণ হতে পারে—আগে থেকে যদি কেউ মনে করে যে, সে রসিক আলোচনা করবে—সেটা একটা বড় অপরাধ। তাই সেটা দেখানোর জন্য তাঁর দণ্ড ভঙ্গ করেছিলেন। তিনি হচ্ছেন বর্ণাশ্রমের উর্ধ্বে, তিনি হচ্ছেন ভগবান স্বয়ং, তাই বিভিন্ন ধারণা রয়েছে।

পরের দিন সকাল বেলায় শ্রীবাস ঠাকুরের ভাই দেখলেন যে কমণ্ডলু সব ভাঙা। মহাপ্রভু তখন দণ্ডটাকে নিজে হাতে নিয়ে গিয়ে গঙ্গায় ফেলে দিয়ে এলেন। তারপরে ব্যাস পূজার সময়ে শ্রীবাস ঠাকুর নিত্যানন্দের হাতে দিলেন মালাটা। সেই মালাটা, ব্যাসদেবের যে উৎস তাঁর কাছে অর্পণ করলেন, যিনি হচ্ছেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু। তখন মহাপ্রভু তাঁর ষড়ভুজ রূপ দর্শন করালেন। সেখানে দণ্ড, কমণ্ডলু, বাঁশরী ছিল, নিত্যানন্দের হল ছিল। নিত্যানন্দ যখন এই সব দেখলেন তিনি পরম আনন্দে মূর্চ্ছা গেলেন। মহাপ্রভু বলরাম-ভাব-এ ছিলেন এবং তিনি বলরামের অনুকরণ করছিলেন—এ্যায় বারুণি দাও, মধু দাও। ছেলেরা ভক্তরা জানে না কি করবে, তখন একপাত্র গঙ্গাজল নিয়ে এসে

দিয়েছেন। তখন সেই মধু সবাইকে বিতরণ করলেন। সেই লীলা করে নিত্যানন্দ প্রভুর কাছে এলেন—তুমি যেন কোন অপরাধ নিও না আমার। মহাপ্রভুর থেকে সব কিছুর উৎস, বলরাম তাঁর অবতার, তাই তিনি বলরাম লীলা প্রকাশ করলেন। যখন ষড়ভুজ রূপ দর্শন করালেন মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ প্রভু তখন মূর্চ্ছা গেছেন—ভক্তরা কেউ তাঁকে জাগাতে পারছেন না, চিন্তিত। কীর্তন শুরু করলে তিনি জেগে উঠলেন। এই সব ছিল তাঁর লীলা। গুরুদেব যে পূজা গ্রহণ করেন তা ব্যাসদেবের প্রতিনিধি হিসাবে। মোটের ওপর সমস্ত পূজাই হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের জন্য। শেষে মহাপ্রভু বললেন—আজকের মতো ব্যাসপূজা সম্পূর্ণ হলো।

নিত্যানন্দ প্রভুর বিভিন্ন লীলা রয়েছে সেইগুলি আলোচনা করে অবশ্যই সকলে তাঁর কৃপা লাভ করতে পারেন এবং কৃষ্ণপ্রেম লাভ করতে পারেন। অবশ্য যারা বৈষ্ণব অপরাধ করে, সেটা মস্ত বড় বাধা। সেই সম্বন্ধে খুব সতর্ক থাকতে হবে, যাতে এই জন্মেই আমরা কৃষ্ণের কাছে যেতে পারি গুরু গৌরাঙ্গের কৃপায়।

বৈষ্ণব সঙ্গের ফল

যার যে কুলেই জন্ম হোক না কেন, যার যেমন গুণই থাক না কেন, সে যদি শ্রীভগবানের শুদ্ধভক্তের কৃপা লাভ করে তখন তার আর এই জাগতিক মায়াবদ্ধতা থাকে না। সে তখন শুদ্ধভক্তির দ্বারা শ্রীভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করে চিন্ময় পরিবেশে বিরাজ করে। শ্রীভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত সবকিছুই হচ্ছে চিন্ময়।

মৃগারী ব্যাধ অরণ্যে শিকার করে বেড়াত, জীব হত্যা করত। কিন্তু সেই ব্যাধও অবশেষে শ্রীভগবানের শুদ্ধভক্ত নারদ মুনির সংস্পর্শে এসে, তাঁর আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়ে একজন শুদ্ধভক্তে পরিণত হয়েছিল। বাল্মিকী মুনি প্রথম জীবনে একজন দস্যু ছিলেন। সে সময় তিনি দস্যু রত্নাকর নামে পরিচিত ছিলেন। তার পেশা ছিল ডাকাতি করা। মানুষকে হত্যা করে তাদের ধন দ্রব্যাদি অপহরণ করতেন। এইসব দুষ্কর্ম নিয়েই তিনি থাকতেন। কিন্তু

পরবর্তীকালে এই দস্যু রত্নাকর নারদ মুনির সান্নিধ্য লাভ করে, তাঁর কৃপা প্রাপ্ত হয়ে মহর্ষি বাল্মিকী'তে পরিণত হলেন। তিনি 'রামায়ণ' রচনা করলেন এবং শুদ্ধ রামভক্তির দ্বারা তিনি ভগবদ্ধামে প্রবেশের অধিকার প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

আজ থেকে প্রায় পাঁচশো বৎসর আগে এই বাঙলার বনবিষ্ণুপুর রাজ্যে বীরহাম্বীর বলে এক রাজা ছিলেন। তিনি বাইরে নিজেকে খুব ভালো বলে জাহির করতেন, কিন্তু গোপনে গোপনে দুষ্কর্ম করতেন। তাঁর অধীনে কিছু গোয়েন্দা কর্মচারী ছিল, যাদের কাজ হল, রাত্রিবেলা ঐ রাজ্যের মধ্য দিয়ে যাতায়াতকারী যাত্রীদের ধন-রত্নের খোঁজ রাখা এবং পরে সেসব ধন-রত্ন চুরি করে, ডাকাতি করে সরাসরি রাজাকে প্রদান করা। এরপর নিঃস্ব লুণ্ঠিত যাত্রীরা যখন রাজার কাছে গিয়ে অভিযোগ করত, "হে রাজা, দেখুন, আমরা আপনার রাজ্যের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলাম আর আমাদের সবকিছু লুঠেরারা লুঠ করে নিয়েছে, সবকিছু ডাকাতি হয়ে গেছে" অভিযোগ শুনে রাজা অত্যন্ত সহানুভূতির সুরে বলতেন, "খুবই দুঃখের কথা। আমি অত্যন্ত দুঃখিত। আমি যখনই ঐ ডাকাতদের, চোরদের ধরতে পারব তখন তাঁদের কঠিন শাস্তি দেব। আচ্ছা, আপনারা এই অল্প কিছু টাকা নিয়ে যান এবং আপনাদের যাত্রা শুভ হোক।" রাজার কথা শুনে যাত্রীরা ভাবতো,—"ও এই রাজা কত ভালো! রাজা আমাদের সাহায্য করেছে।" এই রাজাই আবার রাজসভায় পণ্ডিতদের নিয়ে এসে ভাগবত পাঠ শুনতেন আর এদিকে মনে মনে কুকর্মের চিন্তা করতেন। বহিরঙ্গে ভক্ত, অন্তরঙ্গে চোর। অবশেষে একদিন হল কি, রাজা রাজ-জ্যোতিষীকে জিজ্ঞাসা করলেন—"দেখুন তো বিচার করে, শীঘ্রই কোন ভাল যাত্রী মূল্যবান কিছু নিয়ে আমার রাজ্যের মধ্য দিয়ে যাবে কি না।" জ্যোতিষী গণনা করে বলল "মহারাজ আপনার রাজ্যে মহাধন আসছে। যে সম্পদ আসছে তার মূল্যের কোন সীমা পরিসীমা নেই। এত মূল্যবান ধন আপনার রাজ্যে কোনদিন আসেনি। এবং যার কাছে এই সম্পদ থাকে তার সর্বমঙ্গল হয়।" এই কথা শুনে রাজা অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। ভাবলেন, আজ আমার ভাল দিন এসেছে। তিনি তৎক্ষণাৎ তার গোপন লুঠেরা কর্মচারীদের ডেকে বললেন, "দেখ, এই ধরনের সব লোক আসছে এবং তাদের কাছে এমন সম্পদ আছে যা মহামূল্যবান। তোমরা যদি এই জিনিসটি হরণ করে আমার কাছে নিয়ে আসতে পার, আমি তবে তোমাদের প্রত্যেককে এক হাজার রৌপ্য মুদ্রা পুরস্কার দেব।"

সেদিন রাত্রে রাজার লুঠেরারা খোঁজ করে দেখল, গরুর গাড়ি করে কিছু যাত্রী এসেছে এবং তারা সব সাধু। যাত্রীরা সবাই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। তাঁদের কাছে রয়েছে একটা বড় বাক্স। সেই সময় লুঠেরারা সেই বাক্সটি লুঠ করে রাজার কাছে নিয়ে গেল। রাজা তাদের প্রত্যেককে একহাজার রৌপ্যমুদ্রা পুরস্কার দিয়ে বিদায় করে, নিজেই বাক্সটি নিয়ে সিন্দুক গৃহে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন। এত মহামূল্য সম্পদ দেখে কেউ যদি পাগল হয়ে যায়! সে যদি রাজাকে হত্যা করে! তাই রাজা কাউকেই এসব দেখাতে চান না। অবশেষে রাজা বাক্সটি খুলে দেখলেন। কিন্তু একি! কোথায় হীরে-মণি-মাণিক্য মহামূল্যবান ধন সম্পদ? বাক্সটি যে গ্রন্থে পরিপূর্ণ! রাজা গ্রন্থগুলি হাতে নিয়ে দেখতে লাগলেন। সংস্কৃত ও বাংলায় রচিত বিভিন্ন গ্রন্থ। কয়েকটি গ্রন্থ পড়ে দেখলেন। লেখা আছে—

> যারে দেখ তারে কহ 'কৃষ্ণ'-উপদেশ।
> আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার এই দেশ ॥

রাজা ঠিক বুঝতে পারলেন না এগুলি কি ধরনের গ্রন্থ। পরে তিনি রাজপণ্ডিতবর্গকে আহ্বান করে গ্রন্থগুলি দেখালেন। তারা বললেন, "মহারাজ, এতো দেখছি ধর্মগ্রন্থ।" রাজা বললেন, "সে তো আমিও বুঝতে পারছি। কিন্তু এটা কি ধরনের শাস্ত্র গ্রন্থ?" পণ্ডিতেরা বললেন, "সেটা আমরাও ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে এটা শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় গ্রন্থ।" রাজা এরপর পণ্ডিতদের চলে যেতে বলে ভাবতে লাগলেন, "আমি নিশ্চয়ই কোন সাধু মহাত্মার গ্রন্থ চুরি করেছি। সাধুদের গ্রন্থ চুরি করার ফলে, আমার সর্বনাশ হয়ে গেল! হায়! আমি মহাপাপ করেছি। এতদিন আমি বিষয়ী লোকেদের ধন-সম্পদ অপহরণ করে পাপ করেছি। আজ সাধুর গ্রন্থ চুরি করে মহাপাপ করলাম।" রাজা ঠিক করলেন তিনি ভাগবত পাঠ শ্রবণ করে পাপ মোচন করবেন। তিনি মনে করলেন ভাগবত শ্রবণ করে তাঁর এই পাপ মোচন হয়ে যাবে। কিন্তু পরে বুঝতে পারলেন প্রকৃতপক্ষে তিনি শুধু পাপই নয়, পাপের চেয়েও ভয়ঙ্কর মহাপরাধ করেছেন। তিনি বৈষ্ণব অপরাধ করেছেন। তিনি বৈষ্ণবের গ্রন্থ চুরি করে বৈষ্ণব অপরাধ করেছেন। আর বৈষ্ণব অপরাধীকে ভগবান বাঁচাতে পারে না, কেউ তাঁকে বাঁচাবে না, এমন কি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পর্যন্ত তাকে ক্ষমা করবেন না। একমাত্র যে বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ হয়েছে, তিনি যদি ক্ষমা করেন তবেই অপরাধীর উদ্ধার হবে। এই ভেবে রাজা তার সেই গোপন লুঠেরাদের ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমরা কার কাছ থেকে লুঠ করেছ?

এই বাক্সের মধ্যে ধর্মীয় গ্রন্থ ছিল।" লুঠেরারা জবাব দিল—"হ্যাঁ, তাঁরা সাধু ছিলেন। কিন্তু আমরা তাঁদের সঙ্গে লড়াই করি নি।" রাজা বললেন, আগে কেন এ কথা আমাকে বল নি? তাহলে এগুলো ফেরত দিতে পারতাম।" লুঠেরারা বলল "আমরা আপনাকে বিরক্ত করতে চাইনি।" রাজা তাদের নির্দেশ দিলেন,—"তোমরা যেখান থেকে পার এ গ্রন্থ যাঁর তাঁকে খুঁজে বের কর।" কিন্তু তারা অনেক খুঁজে খুঁজেও সাধুদের আর সন্ধান পেল না।

একদিন এক ব্রাহ্মণ এলেন রাজার সঙ্গে দেখা করতে। সে সময় রাজা ভাগবত পাঠ শ্রবণ করছিলেন। কিন্তু যিনি ভাগবত পাঠ করছিলেন, তিনি মায়াবাদীভাষ্য ব্যাখ্যা করছিলেন। সেই ভাষ্য শুনতে শুনতে ব্রাহ্মণের মুখ বিকৃত হয়ে গেল। রাজা সেটি লক্ষ্য করে বললেন—'এ কি! মহা-পণ্ডিতের ভাগবত পাঠ শ্রবণ করে এরকম মুখভঙ্গি করছেন কেন? আপনার কি কোন কষ্ট হচ্ছে?" ব্রাহ্মণ জবাব দিলেন—"হ্যাঁ, উনি ভাগবত যেভাবে ব্যাখ্যা করছেন, তা শুনে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে।" রাজা বললেন—"আপনি কি এর চেয়ে ভালভাবে ব্যাখ্যা করতে পারবেন? তাহলে আসন গ্রহণ করে আপনি তা ব্যাখ্যা করুন। আর এর চেয়ে যদি ভাল ব্যাখ্যা না হয়, তাহলে এভাবে পণ্ডিতকে অপমান করার ফলে আমি আপনাকে প্রাণদণ্ড দেব।" তখন সেই ব্রাহ্মণ আসন গ্রহণ করে ভাগবত খুলে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ ও বৈষ্ণববৃন্দের উদ্দেশ্যে প্রণতি নিবেদন করে ভাগবত ব্যাখ্যা করতে শুরু করলেন। ব্রাহ্মণের ব্যাখ্যা শ্রবণে সমবেত ভক্তবৃন্দ সেখানে মুগ্ধ হয়ে গেল। রাজাও অদ্ভুত মুগ্ধতা অনুভব করলেন। রাজা নিজে বুঝতে পারলেন, এই ব্রাহ্মণ কোন সাধারণ ব্যক্তি নন, তিনি একজন মহান বৈষ্ণব। রাজার মনে সন্দেহ হল হয়ত আমি এঁরই গ্রন্থ চুরি করেছি। পাঠ শেষ হলে পর রাজা বিনীতভাবে বললেন, "আপনার সঙ্গে আমার একটা ব্যক্তিগত কথা আছে। আপনি যদি দয়া করে আমার সঙ্গে ভেতরে আসেন!"

যে ঘরে গ্রন্থগুলি রয়েছে, রাজা ব্রাহ্মণকে সেই ঘরে নিয়ে গিয়ে অত্যন্ত বিনীতভাবে তাঁর পরিচয় জানতে চাইলেন। ব্রাহ্মণ বললেন, "আমার নাম শ্রীনিবাস দাস। আমি শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামীর শিষ্য এবং শ্রীল জীব গোস্বামীর কাছে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়েছি। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং এই কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু রূপে আবির্ভূত হয়েছেন এই জগতে কৃষ্ণভক্তি প্রচারের জন্য। তাঁর আশীর্বাদধন্য অন্তরঙ্গ পার্ষদগণ শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু, শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু বৃন্দাবনে অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। সেখানে

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবন চরিত রচনা করলেন। আমি তাঁদের আদেশ প্রাপ্ত হয়ে শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর এবং শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুর সঙ্গে সেই সমস্ত গ্রন্থ নিয়ে আসছিলাম। পথিমধ্যে আপনার রাজ্যে একরাত্রিতে সেইসব গ্রন্থগুলি চুরি হয়ে গেল। এখন আমার অস্থির অবস্থা। সেইসব মহান বৈষ্ণব আচার্যগণের সমগ্র জীবনের কাজ সেইসব গ্রন্থের মধ্যে ছিল। কিন্তু সেই গ্রন্থ এখন নিখোঁজ, আমরা তা খুঁজে পাচ্ছি না।"

এই কথা শুনে, রাজা শ্রীনিবাস আচার্যের পায়ে লুটিয়ে পড়ে বলতে লাগলেন, "আমাকে ক্ষমা করুন। আমাকে ক্ষমা করুন। আমি মহা-অপরাধ করেছি। আপনার গ্রন্থগুলি আমিই চুরি করেছি। এখন এই মহা-অপরাধ থেকে আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। আজ আমি আপনাকে গুরুরূপে বরণ করলাম।"

শ্রীনিবাস আচার্য প্রভু তখন সব বুঝতে পারলেন। তিনি বললেন, "ওহে! আগে আমাকে সেই গ্রন্থগুলি দেখান, আমি দেখি সেই গ্রন্থগুলি আমার কিনা! আগেই কেন ওকথা বলছেন?" রাজা তখন সিন্দুক থেকে সেই ট্রাঙ্কটি বের করে শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুকে দেখালেন। শ্রীনিবাস আচার্য প্রভু বললেন—"হ্যাঁ, এগুলি আমারই গ্রন্থ।" রাজা বললেন, "এ গ্রন্থ আমার রাজ্যের মহা-পণ্ডিতগণও বুঝতে পারেনি। দয়া করে তা আমাদের কাছে ব্যাখ্যা করুন। এই গ্রন্থের তত্ত্ব আমরা জানতে চাই।" শ্রীনিবাস আচার্য বললেন—"না, এই গ্রন্থ আমি নবদ্বীপে নিয়ে যাবো। সেখানে পণ্ডিতেরা এই গ্রন্থগুলির নকল করার পর আমরা তা সমস্ত বৈষ্ণবদের কাছে পৌঁছে দেব। এইভাবে তা প্রচারিত হবে।" রাজা বললেন, "না, না, নবদ্বীপে যেতে হবে না, আমি পণ্ডিত নিয়ে এসে এখানে তা নকল করাব। আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না।"

এইভাবে সেই দস্যু রাজা, বৈষ্ণবের সঙ্গ প্রভাবে একজন ভক্তে পরিণত হল। অবশেষে এই রাজা বীরহাম্বীর শ্রীনিবাস আচার্যের কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করেন।

এই হচ্ছে সাধু সঙ্গ বা বৈষ্ণব সঙ্গের ফল। যার যে কুলেই জন্ম হোক না কেন, যার যে রকম গুণই থাক না কেন, সাধু বৈষ্ণবের সঙ্গ প্রভাবে সেও পরম ভগবদ্ভক্তে পরিণত হয়। বৈষ্ণবের সৎ সঙ্গের দ্বারা বৈষ্ণবের গুণ অবৈষ্ণবের মধ্যে আপনা থেকেই রোপণ হয়ে যায়।

শ্রীমদ্ভাগবত কেন পড়বেন

শ্রীল ব্যাসদেব যে শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করেছিলেন, সেটি কোন সাধারণ গ্রন্থ নয়। পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং গ্রন্থাবতার রূপে শ্রীমদ্ভাগবতের মাধ্যমে মানুষের শিক্ষিত সমাজে আবির্ভূত হয়েছিলেন বলেই আমরা সকলে বিশ্বাস করে থাকি। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ে ৪০ সংখ্যক শ্লোকটি পাঠ এবং মর্ম-উপলব্ধি করলে সেই সত্য হৃদয়ঙ্গম হতে পারে। এমনই গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থসম্ভারের আলোচনা-পর্যালোচনার উৎসাহ আজ মানব সমাজে পুনরুজ্জীবিত না করতে পারলে, ব্যাপকভাবে ভগবৎ-উপলব্ধি বাস্তবিকই দুঃসাধ্য।

ভগবৎ-অবতার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই গ্রন্থটিকে সকল বৈদিক শাস্ত্রসম্ভার এবং বৈদিক সমাজ ব্যবস্থার অভ্রান্ত সারাৎসার বলেই আমাদের সামনে তুলে ধরেছিলেন। কারণ এই শ্রীমদ্ভাগবতের মধ্যেই পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ সান্নিধ্যলাভে ধন্যাতিধন্য বহু ভাগবতশ্রেষ্ঠ পুরুষের বহু নির্বাচিত কথা ও কাহিনী মনোরম আঙ্গিকে পরিবেশিত হয়েছে।

সেই অনবদ্য কাহিনী সঞ্চালনের মধ্যে যেমন মনোহারী গল্পকথার মাধুর্য মনোহরণ করে, তেমনই মর্মে মর্মে অনুভব করা যায় যে, দিব্য গ্রন্থখানির প্রতিটি ছত্রে ভগবত্তার স্বরূপ উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে এবং সেই কারণে শ্রীমদ্ভাগবতের পাঠক মাত্রেই পরম শ্রদ্ধা সহকারে শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে স্বভাবতই ভক্তি প্রণতভাবে আপ্লুত হয়ে ওঠেন।

এটাই শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ তথা অনুশীলনের পরম সুফল। সুতরাং আমরা এই গ্রন্থখানি পাঠ করলে শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ আশীর্বাদ আমাদের জীবনে সহজলভ্য হয়ে ওঠে, উপরন্তু ভাগবত পাঠকমাত্রেই দিব্যজ্ঞান লাভের আলোকে অন্তরে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠেন।

যেহেতু শ্রীভগবানই সকল জ্ঞানালোকের উৎস, সকল আশীর্বাদ এবং সকল পরিপূর্ণতার পরম প্রদাতা, তাই শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থখানিও তেমনই চিন্ময় গুণান্বিত গ্রন্থসম্ভার, তাতে কোনই দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবকাশ থাকা অনুচিত।

যে-গুরুদেব এবং যে-ভক্তের হৃদয়ে এমনভাবেই শ্রীমদ্ভাগবতের দিব্যরসের অনুভূতি সঞ্চারিত হতে পেরেছে, তেমন ভাগবত-পুরুষেরই মুখনিঃসৃত ভাগবত-কথা যেন পরম ব্রহ্মজ্যোতির দিব্য আলোক স্বরূপ আমাদেরও জীবন আলোকময় করে তোলে।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর একান্ত পার্ষদ শ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামী প্রভু পুরী-ধামে সকল সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শন-অভিলাষী সমস্ত মানুষকেই তাই কোনও যোগ্য ভাগবত-পুরুষের কাছে বসে ভাগবত গ্রন্থের পাঠ এবং তাৎপর্য অনুশীলন করতে পরামর্শ দিতেন। সুযোগ্য ভাগবত-পুরুষ বলতে আত্মজ্ঞান সম্পন্ন শ্রীগুরুদেবের কথাই সর্বপ্রথমে আমাদের স্মরণে আসা স্বাভাবিক। তেমন শুদ্ধ পুরুষের কাছ থেকে ভাগবতের তাৎপর্য অনুশীলনের সুযোগ লাভ করতে পারলেই পরম সৌভাগ্য। তখন যেন উপলব্ধি হতে থাকে স্বয়ং শ্রীভগবানই বুঝি কত ভালবেসে আমাদের আগ্রহ আকুলতা চরিতার্থ করবার উদ্দেশ্যে সামান্য ভূমিকা গ্রহণ করেও আমাদের কাছে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠেন। অবশ্যই পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আশীর্বাদধন্য হতে পারলে, তবেই এমন সার্থকতা আসে জীবনে।

শ্রীমদ্ভাগবতকে গ্রন্থাবতার বলে সম্মানিত করা হয়েছে। এই গ্রন্থসম্ভার যদি আপনার ঘরে থাকে, তা হলে প্রতিদিন দেবতারা সেখানে দিব্যরূপে এসে প্রণতি জানিয়ে যান। একদা শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভুর একান্ত শিষ্য শ্রীশঙ্করদেব আসাম প্রদেশে শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থবিগ্রহ স্থাপনা করে মন্দির গড়েছিলেন, যেখানে ভাগবতের শ্লোকগীতি উচ্চারণের মাধ্যমে গ্রন্থাবতাররূপে শ্রীভগবানের আরাধনা করা হতো। সেই অঞ্চলটিতে সকলেই বৈষ্ণবভাবাপন্ন শুদ্ধ সাত্ত্বিক নাগরিক হয়ে উঠতে পেরেছিলেন।

ভাদ্রপূর্ণিমার পুণ্যদিবসে সকল মন্দিরের বেদীমূলে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রদ্ধাভরে স্থাপনা এবং আরাধনার রীতি ভারতীয় বৈদিক সংস্কৃতির একটি অঙ্গ। গ্রন্থবিতরণ যজ্ঞ উদ্‌যাপনের আগেও এইভাবে ভাগবত পূজা করা উচিত।

কলিযুগে মানুষের মনে জ্ঞান এবং বৈরাগ্য সহজে স্ফুরিত হতে পারে না। জড়জাগতিক বহু আকর্ষণ-বিকর্ষণের ফলেই মানুষ এমন দুর্ভাগা হয়ে পড়েছে। নানাপ্রকার টানাপোড়েন থেকে মুক্তি লাভের সব রকম চেষ্টাও মানুষের জীবনে আজ সবই বিফল হচ্ছে।

তাই জ্ঞান বৈরাগ্যমুক্তি—এই সব কিছুর অভাবে মানুষ বিভ্রান্তি বোধ করছে। এমনই অসহায় পরিস্থিতি থেকে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র উপায়—ভক্তি অনুশীলন, যা অতি সহজেই মানুষের মনে জাগিয়ে তোলা সম্ভব। আর সেই অমূল্য ভগবদ্ভক্তি অর্জনের পথে শ্রীমদ্ভাগবতের মনোজ্ঞ কথা ও কাহিনী বিশেষভাবে কার্যকরী হয়, তা আমরা বাস্তব জীবনে লক্ষ্য করেছি।

মুশকিল এই যে, কলিযুগে অনেক ভাগবত-পাঠকই নাম-যশ-অর্থ প্রতিপত্তি অর্জনের লোভে মানুষকে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম থেকে সারমর্ম না শুনিয়ে, একেবারে দশম স্কন্ধ থেকে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের রাসলীলার গূঢ় তত্ত্ব বোঝাতে চেষ্টা করে থাকেন। তাতে যথার্থ ভগবদ্ভক্তি জাগে না এবং কাহিনীর যথার্থ পারমার্থিক তাৎপর্যও বোঝা যায় না।

যথার্থ ভগবদ্ভক্ত ভাগবত-পাঠক একেবারে প্রথম স্কন্ধ থেকেই ভাগবতের অমৃতরস ক্রমান্বয়ে শ্রোতাদের কর্ণগোচর করতে থাকেন। তার ফলে ক্রমান্বয়ে জ্ঞান, বৈরাগ্য এবং ভক্তিভাব জাগতে থাকে।

আপনারা যদি তেমন অভিজ্ঞ সুযোগ্য ভাগবত-পাঠক ভক্তের সন্ধান না পেয়ে থাকেন, তা হলে শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের অপূর্ব তাৎপর্যমণ্ডিত শ্রীমদ্ভাগবতের খণ্ডগুলি নিজেরাই অধ্যয়নের সুযোগ করে নিতে পারেন। শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের অনবদ্য ভাগবত-তাৎপর্য পাঠ করতে থাকলে আপনাদের হৃদয়ে যথার্থ পারমার্থিক জ্ঞানের আলোকদীপ জ্বলে উঠবে এবং সেই আলোকে জাগবে জড়জাগতিক ভোগ-তৃষ্ণার প্রতি আবশ্যকীয় বৈরাগ্যবোধ।

এইজন্য শাস্ত্রে উপদেশ দেওয়া হয়েছে—'ভাগবত নিত্যসেবয়া'। প্রতিদিন সকালে শ্রীমদ্ভাগবতের একটি করে শ্লোকের তাৎপর্য পড়ুন এবং সকলকে ডেকে শোনাতে থাকুন। ঐভাবে সারাদিনের সকল কর্তব্যকর্মের শেষে, সকলে মিলে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার একটি করে শ্লোক তাৎপর্যসহ অধ্যয়নের অভ্যাস করতে থাকুন।

শ্রীমদ্ভাগবতে রয়েছে পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় কথা আর শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় আছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত পরম তত্ত্বকথা। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বহু মানুষ এই অমূল্য গ্রন্থরত্নগুলির যথার্থ তাৎপর্য আজ ভুলেই গেছে। কিন্তু এইগুলিই ছিল ভারতবর্ষের শুদ্ধ সাত্ত্বিক শান্তিপূর্ণ সভ্যতার মূল উপাদান।

বিশেষ করে এখন এই কলিযুগে নানা ধরনের অভূতপূর্ব অচিন্ত্যনীয় দুর্ঘটনা-দুর্বিপাকের দিনে আমাদের সকলেরই উচিত-প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যা শ্রীমদ্ভাগবত এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা চর্চার অভ্যাস আবার ঘরে ফিরিয়ে আনা।

গ্রন্থরাজ শ্রীমদ্ভাগবতের জয় হোক!

কৃষ্ণের কৃপা আসে গুরুদেবের মাধ্যমে

আচার্যং মাং বিজানীয়ান্ নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্বদেবময়ো গুরুঃ ॥

"আচার্যকে আমার থেকে অভিন্ন বলে মনে করা উচিত এবং কখনও কোনভাবে তাঁকে অশ্রদ্ধা করা উচিত নয়। তাঁকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে তাঁর প্রতি ঈর্ষান্বিত হওয়া উচিত নয়, কেননা তাঁর মধ্যে সমস্ত দেবতার অধিষ্ঠান আছে।" (ভাগবত ১১/১৭/২৭)

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অন্তরঙ্গ সখা উদ্ধবকে এই কথা বলেছেন। শ্রীল প্রভুপাদ বিভিন্ন জায়গায় এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করেছেন। সমাজের চার বর্ণের চার আশ্রমের মানুষদের কিভাবে চলা উচিত সেই সম্বন্ধে উদ্ধব জানতে চেয়েছিলেন। কৃষ্ণ বলেছিলেন, ব্রহ্মচারীরা শ্রীগুরুদেবের আশ্রয়ে থেকে গুরুদেবের প্রতি শ্রদ্ধা রাখবে এবং সেবানিষ্ঠা পরায়ণ হবে। গুরুদেব শিষ্যের কাছ থেকে শুধু সেবা পেতে থাকবেন বা ভোগ করে যাবেন—তা নয়। তিনি একজন পিতার মতো। পিতা ছোট ছেলেদের মানুষ করে গড়ে তোলেন, যত্ন নেন। আধ্যাত্মিক জগতে গুরুদেবও শিষ্যদের প্রতি সেই রকম। গুরুদেব পারমার্থিক বিষয়ে অবগত থাকেন।

মনুসংহিতায় আচার্যের কর্তব্য নির্ধারিত হয়েছে। আচার্য বা গুরুদেব অবশ্যই পরম্পরার ধারায় শিক্ষা গ্রহণ করেন। আচার্য অন্যদের দ্বিজত্ব দান করে থাকেন। গুরুদেব যখন দীক্ষা দেন তাকে বলা হয় উপনয়ন, যার মাধ্যমে কেউ একজন শ্রীগুরুদেবের সন্নিকটে আসতে পারেন। যতক্ষণ পর্যন্ত পৈতা বা উপবীত ধারণ মাধ্যমে গুরুদেবের কাছে না আসছে ততক্ষণ শূদ্রস্তরে সে থেকে যায়।

উপনয়ন সংস্কারের মাধ্যমে শিষ্য গুরুদেবের কাছে উপবীত পেয়ে থাকেন। বেদের জ্ঞান লাভ হয়ে থাকে গুরুদেবের কাছ থেকে। গুরুদেবই নিত্য শিক্ষা দান করেন। কেউ জন্মগত ক্ষেত্রে শূদ্র থাকলেও শাস্ত্রানুমোদিত সংস্কারের মাধ্যমে দ্বিজত্ব লাভ করে সেবা অধিকার পেয়ে থাকে। বায়ুপুরাণে বলা হয়েছে, যিনি বৈদিক সিদ্ধান্তে নিপুণ, যিনি বেদের নিয়ম পালন করেন এবং শিষ্যদের শিক্ষা দেন তিনি আচার্য। তাঁর কাজ হচ্ছে ভগবানের অপ্রাকৃত ভক্তিমূলক সেবায় তিনি সর্বদা নিয়োজিত থাকবেন। তিনি ভগবানের চরণে

আত্মসমর্পিত প্রাণ। যাঁরা নিজেকে আচার্য বলছেন, ভগবানের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করছেন না, তাঁরা অপরাধী বলে বিবেচিত হন। অপরাধ আচার্যের পদ থেকে বিচ্যুত করে দেয়।

পরম্পরার আচার্যগণ সর্বদা শুদ্ধভক্তি সেবায় রত থাকেন। আচার্য হচ্ছেন শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভুর সাক্ষাৎ প্রতিনিধি স্বরূপ। আচার্য কখনও তাঁর ইন্দ্রিয় বেগ দ্বারা প্রভাবিত হন না। জড় জাগতিক পরিস্থিতি থেকে তিনি অনেক ঊর্ধ্বে। সেইজন্য আচার্যকে ভগবানের অভিন্ন স্বরূপ বলা হয়েছে। তিনি সর্বদা অপ্রাকৃত স্তরে স্থিত থাকেন।

শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন, আচার্য ভগবানের প্রতিনিধি। তিনি কৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়। গুরুদেব স্বয়ং কৃষ্ণ নন। কোনও কোনও মায়াবাদী বলে থাকে যে, গুরুদেব হচ্ছেন স্বয়ং কৃষ্ণ—এটা সাধারণ মানুষদের প্রতারণা করা হয়। বৈষ্ণবগণ বলেন, গুরুদেব হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয় সেবক। কিন্তু সাক্ষাৎ ভগবান নন। জগন্নাথপুরীতে এক প্রতারক নিজেকেই জগন্নাথ বলে জাহির করেছিল। মেয়েরা তাকে ভোগ নিবেদন করত। এক সময় সে মহিলাদের সঙ্গে নৃত্য করেছিল। এক মহিলা তার প্রতিবাদ করেছিল। তাকে মাছ নিবেদন করা হয়েছিল। সে মাছও খেত। মহিলাটির স্বামী পুলিশকে জানিয়ে ছিল। গোয়েন্দা পুলিশ তাকে লক্ষ্য করেছিল। তাকে প্রতারক বুঝতে পেরে জেলবন্দী করা হয়েছিল।

গুরুদেব হচ্ছেন ভগবানের অন্তরঙ্গ প্রতিনিধি ভগবানের কৃপার মূর্তি। ভগবানের অল্প কিছু কিছু শক্তি গুরুদেবের মধ্যে আছে, তাই তাঁকে শ্রদ্ধা করা হয়। শ্রীল প্রভুপাদ সেই রকম মূর্ত বিগ্রহ। বোষ্টন শহরে যখন শ্রীল প্রভুপাদকে তাঁর শিষ্য ও অনুগামীরা পূজা অভ্যর্থনা করছিল, একে একে সারি করে দাঁড়িয়ে পর পর তাঁকে মালা পরাচ্ছিল এবং টিভিতে তা দেখানো হয়েছিল। তখন অনেকের মনে প্রশ্ন ছিল। কে এই লোকটি? কেন ওঁকে এভাবে পূজা করা হচ্ছে? উনি কি ভগবান?

পরে তারা বুঝতে পারল যে, শিষ্যদের কর্তব্য হচ্ছে গুরুদেবকে ভগবানের প্রতিনিধি জ্ঞানে পূজা করা। প্রভুপাদ দৃঢ়ভাবে বলেছিলেন, গুরু যদি মনে করেন যে তিনি হচ্ছেন ভগবান—তা হলে তিনি ভগবান নন; তিনি মোটেই God নন, তিনি হচ্ছেন গডের বিপরীত Dog।

কলিযুগে বৈদিক সংস্কৃতির অভাব। তাই কে ভগবান—সে সম্বন্ধে মানুষের ধারণাই নেই। মানুষ যাকে-তাকেই ভগবান বলে মনে করছে। গুরুদেব

প্রকৃত পারমার্থিক জ্ঞান দান করেন কিভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করতে হয়। তিনি অন্তরঙ্গ সেবক। তাই তিনি অভিজ্ঞ। তিনি ভক্তিসেবার মূর্ত রূপ।

ভগবানকে সেবা করতে হয় গুরুদেবের মাধ্যমে। আমরা সরাসরি ভগবানের সেবা করতে পারি না। কখনও নিজেকে মনে করা উচিত নয় যে, আমি শুদ্ধ হয়ে গেছি, আমিই উপযুক্ত। গুরুদেব ভগবানকে ভোগ নিবেদন করেন গুরু পরম্পরার মাধ্যমে। শেষে রাধারাণী, তারপর কৃষ্ণের কাছে—এভাবে সেবা পৌছায়। আবার ভগবানের প্রসাদ বা কৃপা রাধারাণী থেকে শুরু করে পরম্পরা হয়ে গুরুদেব পর্যন্ত আসে। তারপর আমাদের কাছে পৌছায়। এভাবে আমরা মহামহা প্রসাদ পেয়ে থাকি। পরম্পরা বাদ দিয়ে আমরা ভগবানের সঙ্গে সংযুক্ত হতে পারি না।

শ্রীল প্রভুপাদ আমাদের জীবন। তিনি ইসকন পরিচালনার মুখ্য শিক্ষক। কোন কোন সময় কেউ হয়তো গাইডেন্‌স্ পাচ্ছে না। অনেকে শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষা নিজের মতো করে ব্যাখ্যা করছে। কিন্তু প্রভুপাদের শিক্ষা অপরিবর্তনীয়। জি.বি.সি আমাদের সেই শিক্ষানুসারে গাইডেন্‌স্ দিয়ে থাকেন। অনেকের ব্যক্তিগতভাবে সমস্যা থাকে।

দুটি নির্দেশ বা পথ আছে। বানর ছানা তার মাকে আঁকড়িয়ে ধরে থাকে। বিড়াল ছানাকে তার মা ধরে থাকে। এই দুটি পন্থার মধ্যে কোন্‌টি দরকার? দুটোই দরকার। কৃষ্ণের নাম করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কৃষ্ণের কাছে যেতে হলে কৃষ্ণনাম ধরে থাকতে হবে। তা হলে কৃষ্ণ কৃপা করবেন। এমন নয় যে, এখনই কৃপা লাগবে, কৃষ্ণ কৃপা করবেন, আর আমাদের নিজেদের কিছু কাজ নেই, করব না কিছুই। না এরকম ঠিক নয়। কে কতটা পারমার্থিক গুরুদেবকে ধরে রাখছে, সেটি গুরুত্বপূর্ণ। গুরুদেবকে ধরে থাকতে হবে এবং গুরুদেব আমাকে ছাড়বেন না। দুটোরই সমন্বয় আমাদের রাখতে হবে।

কুঁয়োতে একজন পড়ে আছে। অন্যজন দড়ির একটি প্রান্ত কুঁয়োর মধ্যে ফেলল। পতিত ব্যক্তিকে দড়িটি ভাল করে ধরে থাকতে হবে। যে দড়ি ফেলল সে সেই দড়িটা উপরের দিকে আকর্ষণ করতে থাকবে। তাহলে পতিত উদ্ধার হবে। গুরুকৃপা লাগবে আবার সেই কৃপা ধরার জন্য প্রয়াসী থাকতে হবে। তা হলে উদ্ধার পাওয়া যাবে।

কেউ কেউ বলে থাকেন, 'আমি তো শুদ্ধ ভক্ত নই। তাই আমি চেষ্টা করতে পারছি না।' না, চেষ্টা অবশ্যই করতে হবে। এমন কি শুদ্ধ ভক্ত না হলেও কৃপালাভের চেষ্টা করতেই হবে। আমাদের অনেক কিছু সমস্যা থাকতেই

পারে। কিন্তু আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি গুরুকৃষ্ণের কৃপা লাভের জন্য, সেই আমাদের চেষ্টা কিরকম সেটাই কৃষ্ণ দেখবেন।

বিড়াল ছানা মনে করে, মা আমাকে তুলে নেবে, আমি কেবল চুপচাপ থাকব—এরকম পন্থা, কিংবা বানর ছানার মতো মাকে ধরে থাকতে হয়, তাই ধরে থাকব, আর কোনও কৃপা লাগবে না—এই দুটো পন্থাই অসম্পূর্ণ।

কৃষ্ণভাবনামৃতে সমস্ত বৈষ্ণব নিজেরা আচরণ করে আমাদের শিক্ষা দিয়ে থাকেন। সকল বৈষ্ণবই আমাদের গুরু। গুরুর মধ্যে দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাঁরা আমাদের ভগবানের কাছে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব নিয়ে থাকেন। দীক্ষাগুরুর সংস্পর্শ না পেলে শিক্ষাগুরুই আমাদের উদ্ধার পাওয়ার পন্থার নির্দেশ দেন।

কৃষ্ণ গুরু পাঠাচ্ছেন আমাদের জন্য, আর আমরা বলছি, না না, এখন নয়, আমার গুরু গ্রহণ করার প্রয়োজন নেই। এটাই হচ্ছে বৃথা অহংকার। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলা হয়েছে গুরুদেব কৃষ্ণের প্রেষ্ঠ জন। তাঁর মূল পরিচয়—তিনি কৃষ্ণসেবক। যার মধ্যে গুরুকৃষ্ণের সেবা মনোভাব নেই, সে কখনও গুরু হতে পারে না। সেই ব্যক্তি কখনও জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধিময় জীবন চক্র থেকে কাউকে উদ্ধার করতে পারে না।

গুরু পরমাত্মা নন যে, কে কি করছে দেখতে পাবেন। গুরু স্বয়ং নারদমুনি নন যে, চট্ করে কারও সমস্যা বুঝতে পারেন। তবে গুরুদেবের শাস্ত্রচক্ষু রয়েছে।

দেখা যায়, কেউ এমনভাব করছে, তার যেন অনেক সমস্যা। তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, 'তোমার কি সমস্যা?' সে বলে, 'গুরুমহারাজ, আমার সমস্যার কথা কি বলব, আপনি খুব ব্যস্ত।' ডাক্তারের কাছে অবশ্যই রোগীকে তার রোগের কথা বলতে হবে। মায়ার ফাঁদে পড়ার আগে গুরুদেবের কাছে সমস্যা বিষয়টি বলতে হবে। রোগ জটিল হওয়ার আগেই ডাক্তারের কাছে যেতে হবে। সেটিই কর্তব্য।

মায়াতে পড়ার আগে গুরুদেবের শরণাগত হওয়া দরকার। সমস্যার কথা বলা দরকার। সমস্যায় পড়লে কোনও সংকোচ না করেই গুরুদেবের কাছে জানাতে হবে। কেননা গুরুদেব তার দায়িত্ব নিয়েছেন কৃষ্ণের কাছে তাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। সে যদি মায়া সমস্যায় জর্জরিত হয়ে পড়ে থাকে, তা হলে গুরুদেবকেও ফিরে আসতে হয় তাকে নেওয়ার জন্য। শিষ্যের কর্তব্য নয়, গুরুদেবকে তার জন্য আবার বিব্রত করা।

আমরা কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের সকলে এক পরিবার ভুক্ত। একজন অসুস্থ হলে অন্যেরা তাকে সুস্থ হতে সাহায্য করবে। লোকদেরকে মায়া থেকে উদ্ধার করতে হবে। কৃষ্ণভাবনামৃত দান করতে হবে। সেটিই আমাদের প্রধান কাজ। মানুষ একে একে কৃষ্ণচেতনায় উদ্বুদ্ধ হলে সারা পৃথিবী পরিবর্তন হয়ে যাবে। আনন্দময় হবে।

আত্মত্যাগ করার মনোভাব রাখতে হবে। একজনকে উদ্ধার করবার জন্য ১০০ পাউণ্ড রক্ত যদি দিতে হয়, সেজন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। অপ্রাকৃত রক্ত। আমাদের শরীরে অপ্রাকৃত রক্ত কত আছে?

নেপালে এক সময় একজন যোদ্ধা যুদ্ধ করতে গিয়ে তার পেটের ভেতরে নাড়িগুলি বেরিয়ে গিয়েছিল। সে সেই নাড়িগুলি পেটের মধ্যে ঢুকিয়ে কাপড় দিয়ে পেট বেঁধে আবার যুদ্ধ করছিল। এটি ক্ষত্রিয়দের শৌর্যবীর্য গুণ।

তা হলে পারমার্থিক জীবনের উন্নতি করতে হলে আমাদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হতে হবে। অনেক রক্ত দিতে হবে বদ্ধ জীবকে উদ্ধার করবার জন্য।

অনেক সময় শিষ্যরা কেউ কেউ বিভ্রান্ত হয়ে মনে করে, গুরুদেব আমাকে ভালোবাসেন না। মা যেমন তার শিশুকে বলেন তোমাকে ভালবাসি না, কিন্তু মা অবশ্যই ভালোবাসেন। গুরুদেবও মায়ের মতো ভালোবাসেন। শ্রীগুরুদেবের শক্তি কৃষ্ণের কাছ থেকে আসে। অসীম কৃপাময় শ্রীকৃষ্ণের কৃপা গুরুদেবের মাধ্যমে জগতে নেমে আসে।

কৃষ্ণ সে তোমার কৃষ্ণ দিতে পারো
তোমার শকতি আছে ।

গুরু পরম্পরার মাধ্যমে কৃষ্ণপাদপদ্ম লাভ হয়ে থাকে। তাই আমাদের বিনীত হতে হবে। অপরাধমুক্ত থাকতে হবে। পূর্ববর্তী আচার্যদের উপর নির্ভর করে থাকতে হবে।

সন্তানের জন্য দায়িত্ব

আগেকার দিনে গৃহস্থদের শিশুর জন্ম, উত্থান উৎসব, অন্নপ্রাশন ইত্যাদি বহু রকমের বৈদিক মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান ছিল। আজকাল আধুনিক সমাজের মানুষ সেই সমস্ত মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান ভুলে গেছে। গার্হস্থ্য ধর্ম হচ্ছে সন্তান উৎপাদন

করা এবং সন্তান যাতে শ্রীভগবানের পাদপদ্মে উপনীত হতে পারে সেই দায়িত্ব গ্রহণ করা। সেজন্য সমস্ত মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান থেকে শুরু করে সন্তানের জাগতিক ও পারমার্থিক শিক্ষার ব্যাপারে যত্ন নেওয়া অবশ্য দরকার।

আধুনিক পাশ্চাত্যদেশে গৃহস্থরা সন্তান চায় না। কেননা তাদের মনোভাব হল, সন্তানকে গর্ভে ধারণ থেকে পালন পোষণ ইত্যাদি অনেক কষ্টের ব্যাপার। তাই সন্তান না থাকাটা তারা নাকি ভালো মনে করে। ভারতে দেখা যায়, সরকার খুব চাপ দিচ্ছে যাতে বেশী সন্তান না জন্মায়। কেননা জনসংখ্যা বৃদ্ধি হলে আর্থিক, সামাজিক নানাবিধ অসুবিধা হবে।

ফিনল্যাণ্ডের মানুষ কি কম সন্তান কি বেশী সন্তান—কোনও সন্তানই তারা চায় না। 'পরিবার পরিকল্পনা' নিয়েই তারা জীবন অতিবাহিত করে। তারা মনে করে সন্তান গ্রহণ করা মানেই যন্ত্রণা আর ঝামেলা। তার চেয়ে যেভাবে আছি সেভাবে থাকি আর ভোগ করে যাই। কোনও ঝামেলার বালাই নেই। তাদের এই মনোভাবের জন্য ফিনল্যাণ্ডের জনসংখ্যা খুব কমে যাচ্ছে। আগামী ত্রিশ বছরের মধ্যে যদি এভাবে সন্তান না জন্মায়, তা হলে ফিনল্যাণ্ড ফিনিস্‌ড্ বা শেষ হয়ে যাবে। তাদের সরকার গৃহস্থদের সন্তান উৎপাদন করতে উৎসাহ দিচ্ছে। যদি তাদের সন্তান হয় তবে দুলক্ষ করে টাকা সরকার থেকে দান করা হবে। মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে, 'আমাদের দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি করার প্রয়োজন।' তিনি বলেছেন 'সন্তানের জন্ম বেশী হোক, কিন্তু বাইরের কোনও দেশ থেকে সন্তান নেওয়া হবে না। এখানেই সন্তান উৎপাদন করা হোক।'

শ্রীল প্রভুপাদ বলেছিলেন, সুসন্তান দরকার। পাঁচটি সন্তানের মধ্যে একটি যদি মন্দ হয় তা হলে সারা পরিবার সে নষ্ট করে দেবে। পাঁচজনই যদি সুন্দর গুণশালী হয় তাহলে সেইভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হলে কোনও দোষ নেই।

শাস্ত্রে আছে অষ্টমী, একাদশী, ব্রত উপবাসের দিন গর্ভাধান নিষিদ্ধ। আধুনিক মানুষেরা গর্ভাধান সংস্কার বিষয়ে সচেতন থাকে না। ভাগবতে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, অসময়ে কশ্যপ-পত্নী দিতি গর্ভধারণ করেছিলেন। তার ফলে তাদের যে সন্তান জন্ম নিয়েছিল তারা ছিল অত্যন্ত ভয়ংকর অসুর। কশ্যপ বলেছিলেন, সন্ধ্যাকালে শিবের অনুচরেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে, এই সময়ে গর্ভধারণ করলে সন্তান অসুর হবে। কিন্তু দিতি অধৈর্য হয়েই কশ্যপের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন।

গর্ভাধান সংস্কারের দিন ভোরের মঙ্গল আরতি দর্শন করে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের কাছে সৎসন্তান প্রার্থনা করতে হবে। কমপক্ষে পঞ্চাশ মালা হরিনাম জপ

করতে হবে। যেখানে কোনও বৈদিক নিয়ম কানুন নেই সেই সমাজে যে সমস্ত সন্তান জন্মগ্রহণ করে তারা প্রায় সকলেই কুলক্ষণযুক্ত সন্তান হয়ে থাকে। তারা তাদের পরিবারে, তাদের সমাজে বিশৃঙ্খলতাই আনবে। বর্তমানে লোকে পরিবার পরিকল্পনা করে থাকে। লোকে সন্তান চায় না, এমন অবস্থায় যদি সন্তান জন্মগ্রহণ করে সেও বর্ণ-সঙ্কর সন্তান। বিশৃঙ্খল।

বাল্যকালে আমার এক বন্ধু ছিল। তার চরিত্র ভাল ছিল না। একদিন সে বলেছিল, 'আমার বাবা-মা আমাকে বলেছে যে, তারা আমাকে চায়নি। তারা পরিবার পরিকল্পনা করেছিল। কিন্তু তবুও হঠাৎ যেন আমার জন্ম হয়েছে।...' তারপর সে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। তাকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি।

আসল কথা হচ্ছে, সন্তান যদি কৃষ্ণভক্ত হয়, তবে জগতের কল্যাণ। কম সন্তান বেশী সন্তান নিয়ে কোনও কথা নয়। ভক্ত হলে জগতের মঙ্গল।

শচীমাতার নয়টি কন্যা সন্তান মারা গেল। তারপর বিশ্বরূপ ও নিমাইয়ের জন্ম হয়। ছোট পুত্রের নামকরণ কালে শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্তী শিশুর নাম রাখলেন বিশ্বম্ভর। নীলাম্বর চক্রবর্তী ছিলেন মহান জ্যোতিষী। তিনি বুঝেছিলেন, এই সন্তানটি সারা বিশ্বের ভরণ-পোষণ করবে। তাই নাম রাখলেন বিশ্বম্ভর। স্ত্রীলোকেরা পিশাচী-ডাকিনীর মুখে নিম-তিতা সূচক 'নিমাই' নাম দিয়েছিলেন। শিশুর কোষ্ঠিবিচার, নামকরণ, রুচি পরীক্ষা বিভিন্ন উৎসব করা হয়। জগন্নাথ মিশ্র একটি বড় থালাতে সোনা, রূপা, কড়ি, পয়সা, কলম, ভাগবত গ্রন্থ, ফুল, শস্য ইত্যাদি দ্রব্য রেখে শিশু পুত্র নিমাইয়ের রুচি পরীক্ষা করছিলেন। নিমাই তখন শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থটি আলিঙ্গন করেছিল।

শ্রীল প্রভুপাদের বাবা কলকাতার মহাত্মাগান্ধী রোডে থাকতেন, রাধাগোবিন্দ পূজা করতেন। তাঁর কাপড়ের দোকান ছিল। সাধুসেবা করতেন। হরিনাম করতেন। প্রায় দিনই সাধুদের নিমন্ত্রণ করে ভোজন করাতেন। সাধুদের কাছে তিনি তাঁর পুত্র অভয়ের (প্রভুপাদ) জন্য বলতেন, আপনারা আমার ছেলেকে আশীর্বাদ করুন যাতে ওর প্রতি রাধারাণীর কৃপা হয়। যাতে ওর কৃষ্ণভক্তি হয়।'

বাবা চিন্তা করেছিলেন, আমার ছেলেকে বিদেশে পাঠাব না সাহেব হতে। আমি আমার ছেলেকে সাধন-ভজন শেখাবো।

মা-বাবার একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হচ্ছে, যে-সন্তানের জন্ম দেওয়া হল, সেইটাই যেন তার শেষ জন্ম হয়। তাকে যেন আর এই বারংবার জন্মমৃত্যুর দুঃখময় চক্রে না আসতে হয়। পড়াশোনার ব্যাপারে দেখা যায়, আমেরিকা,

অস্ট্রেলিয়া, কানাডা প্রভৃতি দেশে লোকেরা ছেলেমেয়েদের মুখস্থ বিদ্যা শেখায় না। তাদের কিছু নীতি এবং তার প্রয়োগ শেখানো হয়। আর, ভারতে অনেক কিছু মুখস্থ করে পড়তে হয়। দিনরাত পড়ার চাপ। শোনা গেল, কিছুদিন আগে, একটি ছেলে পরীক্ষা দিয়েছে। তারপর পাশ করবে কিনা সেই চিন্তায় ভারাক্রান্ত হয়ে আত্মহত্যা করে বসে।

এটা কিরকম শিক্ষা? জীবনের উদ্দেশ্যটি কি? ছেলেরা প্রায়ই এই শিখেছে যে, শিক্ষার উদ্দেশ্য—ভাল পদমর্যাদা, ভাল একটা চাকুরি পাওয়া। কিন্তু আবহমান কাল জন্ম-মৃত্যুর যাতনা থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার শিক্ষাটি কে পাচ্ছে? মা-বাবা তাদের সন্তানদের কি শিক্ষা দিচ্ছেন? পড়াশুনা করছি কেন? ভাল চাকরী হবে। ভাল পড়া করতে না পারলে চাকরী পাব না। চাকরী না পেলে আমার জীবন অচল। চাষ করব না, অন্য কিছু করব না। আমি হতাশ গ্রস্ত। এভাবে শিক্ষার কোনও মূল্য নেই।

বাড়িতে নামহট্ট পরিবেশ থাকা দরকার। বাড়িতে কৃষ্ণভক্তি শেখা দরকার। চাকরী-বাকরী যা কর—সবই শেখা দরকার। কিন্তু শেষ জন্ম হওয়ার শিক্ষাটা অবশ্যই দরকার। হরিনাম জপ করা দরকার। ছোটবেলা থেকে হরিভজনের অভ্যাস থাকা দরকার। কাঁচা মাটি যেভাবে গড়াও গড়বে, কিন্তু মাটি পোড়ানো হয়ে গেলে আর তাকে নতুন করে গড়ানো যায় না। তাই ছোটবেলা থেকে সদ্ অভ্যাস করা দরকার।

দক্ষিণ ভারতে আমার এক শিষ্য আছে। সে ভাল টাকা রোজগার করে। সে বিয়ে করল। ভক্ত হল। সে ও তার স্ত্রী দুজনেই তাদের সারাদিন কাজকর্মের পর সন্ধ্যাবেলায় শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ মন্দিরে সন্ধ্যা আরতিতে যোগ দেয়। একদিন তার বাবা এসে দেখল, ওরা সব কাজ করছে, হরিনাম করছে, মন্দিরে যাচ্ছে। এ সব দেখে বাবা বলল, 'এ কি! তোমরা অল্প বয়সে এসব করছ কেন? তোমরা ভোগ বিলাস কর। আনন্দ স্ফূর্তি কর। এখন ওসব করার দরকার কি?'

বাবার বয়স পঁয়ষট্টি বছর। তার ছোট ভাই একদিন বলছে, 'তুমি তো বুড়ো হলে, আর ঘরের চিন্তা করো কেন, যাও তীর্থ ভ্রমণ কর। বৃন্দাবনে যাও। তা হলে শেষ জীবনটা সার্থক হবে।' কিন্তু পঁয়ষট্টি বছরের বয়স্ক লোকটি বলছে, 'বৃন্দাবনে যাব? ও আমার অভ্যাস নেই। আমার টাকাগুলো ইউনিয়ন ট্রাস্টে রাখব, চিট ফাণ্ডে রাখব, পিয়ারলেসে রাখব। ছেলের বিয়ে হল। নাতনী আছে। তাদের কথা তো চিন্তা করতে হবে।' কয়েক দিন পরেই হঠাৎ হার্ট এ্যাটাকে লোকটি মারা গেল। এই হল অবস্থা।

বুদ্ধিমান মানুষেরা বরাবরই পারমার্থিক কল্যাণের জন্য হরিভজনের অভ্যাস করে চলেন। কৌমারং আচরেৎ প্রাজ্ঞো। প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি শৈশব অবস্থা থেকে সাধনভজন অনুশীলন করবেন।

আমার মা একদিন আমাকে প্রশ্ন করলেন, তুমি কেন অল্প বয়সে ব্রহ্মচারী হলে? আমি বললাম, মা আমি আর কতদিন বাঁচব তুমি জানো? মা বললেন 'তা আমি বলতে পারব না।' 'আমি আর কতদিন বাঁচব তুমি বলতে পারছ না? তা হলে আমি এখন থেকেই ধর্ম করতে থাকি।'

কে কতদিন বাঁচে? তাই প্রথম থেকে অভ্যাস করা উচিত। গৃহস্থরা সাধন-ভজনে মতি রাখবে। তারা আত্মীয় বন্ধু বান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশী অন্যান্যদেরও প্রেরণা দিয়ে ভক্তিপথে আনবে। তারা যা শিখবে পরবর্তীতে তাদের সন্তান সন্ততিরা সেই শিক্ষার সুযোগ পাবে।

গুরুদেবের কর্মযজ্ঞে সহায়তাই গুরুভক্তি

শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে ৩১ অধ্যায়ের ১৬ শ্লোকে বলা হয়েছে, পরমেশ্বর ভগবান অন্তর্যামী পরমাত্মারূপে সকলের হৃদয়ে বিরাজ করছেন, তিনি ছাড়া আর কে স্থাবর এবং জঙ্গম বস্তুদের পরিচালনা করতে পারেন? তিনি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ—কালের এই তিনটি অবস্থায় বিরাজ করেন। তাঁরই নির্দেশনায় বদ্ধ জীব বিভিন্ন কার্যকলাপে যুক্ত হয়, এবং বদ্ধ জীবনের ত্রিতাপ দুঃখ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য, আমাদের কেবল তাঁরই শরণাগত হতে হবে।

অনবদ্যভাবে ভাগবত-ভাষ্যপ্রদানকারী কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ এই উপদেশের তাৎপর্য বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে লিখেছেন, বদ্ধ জীব যখন ঐকান্তিকভাবে মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হতে উৎসুক হয়, তখন তার হৃদয়ে পরমাত্মারূপে বিরাজমান পরমেশ্বর ভগবান তাকে এই জ্ঞান প্রদান করেন—"আমার শরণাগত হও।" ভগবদ্‌গীতায় ভগবান বলেছেন, "সমস্ত

ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল আমার শরণাগত হও।" আমাদের স্বীকার করতে হবে যে, সমস্ত জ্ঞানের উৎস হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। তা ভগবদ্গীতাতেও প্রতিপন্ন হয়েছে। মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ। ভগবান বলেছেন, "আমার মাধ্যমে প্রকৃত জ্ঞান ও স্মৃতি লাভ হয়, এবং বিস্মৃতিও আমার থেকেই আসে।" যিনি জড়জাগতিক বিচারে তৃপ্ত হতে চান অথবা যিনি জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য করতে চান, ভগবান তাঁকে তাঁর সেবার কথা ভুলে যাওয়ার সুযোগ দেন এবং জড়জাগতিক কার্যকলাপের তথাকথিত সুখে নিমগ্ন করেন।

তেমনই, কেউ যখন জড়া প্রকৃতির ওপর আধিপত্য করতে গিয়ে নিরাশ হয়ে, ভববন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী হন, তখন ভগবান অন্তর থেকে তাঁকে শরণাগত হওয়ার জ্ঞান প্রদান করেন, এবং তারই ফলে তিনি মুক্ত হন।

পরমেশ্বর ভগবান অথবা তাঁর প্রতিনিধি ব্যতীত কেউই এই জ্ঞান প্রদান করতে পারেন না। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে শ্রীল রূপ গোস্বামীকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উপদেশ দিয়েছেন যে, জড় জগতে নানা প্রকার দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করতে করতে, জীব জন্ম-জন্মান্তর ধরে ভ্রমণ করছে। কিন্তু সে যখন জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী হয়, তখন শ্রীগুরুদেব ও শ্রীকৃষ্ণের মাধ্যমে সে দিব্যজ্ঞান লাভ করে। অর্থাৎ পরমাত্মারূপে শ্রীকৃষ্ণ জীবের হৃদয়ে বিরাজ করছেন, এবং জীব যখন ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী হয়, তখন ভগবান তাকে তাঁর প্রতিনিধি বা সদ্গুরুর শরণাগত হওয়ার নির্দেশ দেন। অন্তর থেকে এইভাবে পরিচালিত হয়ে এবং বাইরে গুরুদেবের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে, জীব কৃষ্ণভক্তির পন্থা প্রাপ্ত হয়, যা হচ্ছে সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার উপায়।

তাই পরমেশ্বর ভগবানের আশীর্বাদ ব্যতীত স্বরূপে অধিষ্ঠিত হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। পরম জ্ঞানের আলোকপ্রাপ্ত না হলে, জড়া প্রকৃতিতে কঠোর জীবন সংগ্রামে জীবকে তীব্র যাতনা ভোগ করতে হয়। তাই গুরুদেব হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের কৃপার মূর্ত বিগ্রহ। বদ্ধ জীবকে প্রত্যক্ষভাবে গুরুদেবের আদেশ প্রাপ্ত হতে হয়, এবং তার ফলে সে ধীরে ধীরে কৃষ্ণভক্তির পথে অগ্রসর হয়। গুরুদেব বদ্ধ জীবের হৃদয়ে কৃষ্ণভক্তির বীজ বপন করেন, এবং গুরুদেবের উপদেশ শ্রবণ করার ফলে, সেই বীজ অঙ্কুরিত হয়, এবং তখন তার জীবন ধন্য হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতের ৩/২৯/৮ শ্লোকের তাৎপর্যে শ্রীল প্রভুপাদ লিখেছেন, বদ্ধ অবস্থায় কেউ যখন ভক্তিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন তাকে সম্পূর্ণরূপে শরণাগত হয়ে, সদ্গুরুর নির্দেশ পালন করতে হয়। গুরুদেব হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের প্রকট প্রতিনিধি, কারণ তিনি গুরু-পরম্পরার মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানের আদেশ যথাযথভাবে প্রাপ্ত হন এবং তা প্রদান করেন।

ভগবদ্গীতায় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, গীতার জ্ঞান পরম্পরা ধারায় প্রাপ্ত হওয়া উচিত, তা না হলে তাতে ভেজাল থাকবে। পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের উদ্দেশ্যে, সদ্গুরুর নির্দেশ অনুসারে আচরণ করাই হচ্ছে শুদ্ধ ভক্তি।

শ্রীমদ্ভাগবতের (৫/৫/২) শ্লোকে বলা হয়েছে, মায়ার জড়জাগতিক বন্ধন থেকে মুক্ত হতে হলে পরম নিরপেক্ষ মহৎ-এর সেবা করতে হয়। ভগবানের সান্নিধ্য লাভের অভিলাষ না থাকলেও মহৎ সঙ্গ একান্ত প্রয়োজন। মহৎ সেবা না করলে অসৎ সঙ্গের প্রবৃত্তি জাগে। মহৎ জন আমাদের শিক্ষা দেন কিভাবে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসতে হয়। মহৎ সেবা সেই শিক্ষার সুযোগ এনে দেয়।

শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসার শিক্ষা গ্রহণ করলে পাপকর্ম থেকে মুক্তিলাভ হয়, পাপের কর্মফল দূর হয়, সুপ্ত কৃষ্ণপ্রেম জাগে। ভাগবতে বিভিন্ন স্থানে সর্বত্র বলা হয়েছে, এই জড় জগৎ দুঃখ দুর্দশায় পরিপূর্ণ, তাই গুরুর নির্দেশে কৃষ্ণভাবনার পথ অনুসরণ করে সেই দুর্দশার পথ ছাড়া যায়। সমগ্র ভাগবতে সেই ভগবদ্ভক্তির রসামৃত পরিবেশন করা হয়েছে।

ভগবদ্ভক্তগণ গুরুদেবের ভগবৎ-সেবার ব্রতসাধনে আত্মনিয়োগ করে, তাঁকে সন্তুষ্ট করে কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনের সুযোগ লাভ করেন। শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব শতবার্ষিকীর প্রাক্কালে আমরা সেই বাণী স্মরণ রেখে গুরুদেবের অভিলাষ পূরণার্থে আত্মনিয়োগ করে থাকব। সেই লক্ষ্য পূরণে আমাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা থাকবে অব্যাহত।

সাফল্যের রহস্য হল গুরুদেবের ভগবৎ সেবন ব্রতের অভিলাষ সর্বপ্রকার গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করা। সেটাকে নিজের ব্রত অভিলাষ রূপে স্বীকার করে নেওয়া উচিত। শ্রীল প্রভুপাদের বাণী থেকে কিছুমাত্র বিচ্যুতি বা দ্বন্দ্বের অবকাশ রাখা অনুচিত। এই যে ব্যাসপূজা উৎসব, এর তাৎপর্যই হল—এই শুভ উপলক্ষ্যে গুরুদেবের কাছে তাঁর অভিলাষ পূরণের সেবা অঙ্গীকারের একটি আনুষ্ঠানিক সুযোগ।

গীতায় (২/৪) বলা হয়েছে, গুরুদেবের চরণকমলে সেবা নিয়োজিত থাকলে, তাঁর আনুকূল্যে পরমেশ্বর ভগবানের সান্নিধ্য লাভের পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয়। ভগবানের দর্শন যারা পেতে চায়, তাদের উচিত দীক্ষাগুরুর সেবায় মনপ্রাণ অর্পণ করা।

শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধের বিংশতি অধ্যায়ের বিভিন্ন শ্লোকের বর্ণনা প্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন, সদ্‌গুরুর কাছ থেকে প্রাপ্ত ভগবানের আদেশ পালন করাই মানুষের কর্তব্য। 'ব্যবসায়াত্মিকাবুদ্ধিঃ—বলতে সেই কথাই বোঝায়—প্রতিটি মানুষেরই কর্তব্য ভগবানের আদর্শ প্রতিনিধি গুরুদেবের নির্দেশ প্রাণাপেক্ষা প্রিয় বলে পালন করা।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর উল্লেখ করেছেন, মুক্তিলাভ হবে কিনা সেই সম্বন্ধে কোন রকম চিন্তা না করে, শ্রীগুরুদেবের সাক্ষাৎ আদেশ পালন করে যাওয়া উচিত। তা করলে সর্বদাই মুক্ত থাকা যায়।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের অভিলাষ মতো গৌড়ীয় মঠ চলেনি বলেই তা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেছে। গুরুদেবের উপদেশ স্মরণ করে জীবনপথে যে কাজেই অগ্রসর হওয়া যায়, তা সর্বশুভ হয়। তা না করে ওরা জিজ্ঞাসা করে, ইসকনের গুরুভক্তি ব্যাপারটা কি ধরনের।

সকলেরই জানা দরকার, ইসকনে গুরুসেবার মান অনেক উচ্চে। ভক্তের মধ্যে এখানে সেবার অভিলাষ সর্বদা জাগিয়ে তোলা হচ্ছে নানা উৎসব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। ইসকনের ভক্তদের গুরুনিষ্ঠা সম্পর্কে জনসমাজে উচ্চ ধারণা আছে।

সেই নিষ্ঠা থেকে বিচ্যুত হলে ভক্তিমার্গ থেকে বিপথগামী হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা। শ্রীল প্রভুপাদ এই কারণেই একটি নীতি দৃঢ়ভাবে মেনে চলতে বলতেন—তা হল গুরুদেবের ভগবৎ-সেবন ব্রত সাধন।

গুরুদেবের ভগবৎ-ব্রত সাধনের মাধ্যমে তাঁকে সন্তুষ্ট করলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সন্তুষ্ট হন এবং শ্রীকৃষ্ণ সন্তুষ্ট হলে তিনি ভক্তকে দিব্য জ্ঞানের আলোক প্রদান করেন। সেই জ্ঞান শুদ্ধ ভক্ত সঙ্গের মাধ্যমে শিষ্যের কাছে নেমে আসে।

এমন কি শূদ্রেরাও ভগবদ্ভক্তির মাধ্যমে গুরুকৃপায় কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদন করতে পারে। কলিযুগে শূদ্রেরাও এই পন্থায় কৃষ্ণভক্তি অর্জন করতে সক্ষম।

গুরুদেবের বাণী শ্রবণ করতে করতে তার অর্থ উপলব্ধি হলেই শিষ্যের অগ্রগতি শুরু হয়ে যায়। গুরুর ভক্তিলতায় জল সিঞ্চন করলে তা ক্রমেই গোলোকধাম অবধি বৃদ্ধি পায়।

গুরুভক্তির ধারা পরম্পরাক্রমে ভগবান শ্রীকৃষ্ণে পৌছায়। গুরুদেবের উদ্দেশ্যে নিবেদিত ভক্তি শ্রদ্ধার্ঘ সবই তিনি গুরু-পরম্পরাক্রমে পূর্বতন গুরুর কাছে নিবেদন করেন। সেইভাবেই পরম্পরাক্রমে তা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে নিবেদিত হয়।

লোকে ভাবে, কৃষ্ণভক্তির ফলে শ্রীকৃষ্ণ আমাকে কি দেবেন? কিন্তু শুদ্ধ ভক্ত ভাবেন, পরমেশ্বর ভগবান যিনি আমাকে না চাইতেই এত কিছু দিয়েছেন, তাঁর সন্তুষ্টির জন্য আমি কি সেবা করতে পারি?

যথার্থ ভগবদ্ভক্ত সর্বদা ভাবেন, কেমন করে আরও শুদ্ধভাবে ভক্তিমার্গে এগিয়ে চলা যায়, কিভাবে আরও সুশৃঙ্খলভাবে পারমার্থিক জীবন যাপন করা যায়, কিভাবে ভগবানের দিব্য প্রতিনিধি শ্রীগুরুদেবকে সন্তুষ্ট রাখা যায়, কিভাবে মন্দির গড়ে তোলা যায়। পূজারী ভক্ত চিন্তা করবেন, কেমন করে ভগবানের উপাসনা আরও সুন্দর, আরও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যেতে পারে। ভগবানের নামের প্রচারক চিন্তা করবেন, কিভাবে ঘরে ঘরে নামের মহিমা আরও ব্যাপকভাবে পৌছে দেওয়া চলে।

এইভাবেই প্রত্যেকে গুরু-পরম্পরা ধারায় তার গুরুদেবের কাজে সহায়তা করতে পারে। প্রত্যেকেরই মনোভাব হওয়া উচিত গুরুর বিপুল কর্মযজ্ঞে যে যেভাবে সম্ভব সহায়তা করতে হবে, গুরুকে সেবা করতে হবে এইভাবে ভৃত্যের মতো।

এইভাবে গুরুদেবের সহায়তা করা হলে তিনি সেই সেবা-সহায়তা শ্রীকৃষ্ণের কাছে অর্পণ করেন। তাই তার ফললাভ হয় ভক্তেরই। তাই গুরু-বৈষ্ণবগণের সেবা থেকে নিবৃত্ত হওয়া অনুচিত। গুরু-বৈষ্ণবের সেবার মাধ্যমেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সন্তুষ্ট হন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎভাবে সন্তুষ্ট করার মূল নীতি হল গুরুভক্তি এবং শুদ্ধ বৈষ্ণব সেবা।

মীরাবাঈ ছিলেন এক মহান ভক্ত রমণী। কিন্তু তিনি গুরুদেবের সেবার মাধ্যম স্বীকার না করে সরাসরি শ্রশ্রীরাধাকৃষ্ণের ভজনা করতেন বলে বিপুলভাবে বৈষ্ণবসমাজে সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিলেন। কারণ শ্রীল জীব গোস্বামীর নির্দেশ তিনি উপলব্ধি করেননি, ফলে দাসানুদাসের মতো বিনয়নম্রভাবে গোপীপদরেণুর অভিলাষ না করেই শ্রীকৃষ্ণের চরণাশ্রয় করেছিলেন।

জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণে তাই আমি প্রার্থনা জানাই যেন আমরা গুরুভক্তির নিষ্ঠা থেকে বিচ্যুত না হই। শুদ্ধ বৈষ্ণবের রীতি এবং জীবন দর্শন অক্ষুণ্ণ রেখে আমরা যেন পরমারাধ্য গুরুদেবের বাণী অনুসরণের মাধ্যমে তাঁকে সন্তুষ্ট করে, তাঁর সেবাকার্যে সহায়তার মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণের করুণা লাভের পথে অবিচল থাকতে পারি।

শ্রীগৌরাঙ্গের তাৎপর্য বুঝতে শ্রীরাধিকার উপলব্ধি

ব্রহ্মসংহিতায় আদিপুরুষ শ্রীগোবিন্দের বন্দনা প্রসঙ্গে এই শ্লোকটি রয়েছে—

আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভি-
স্তাভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ।
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

"পরম আনন্দবিধায়ক হ্লাদিনী শক্তির মূর্ত প্রকাশ শ্রীমতী রাধারাণীর সঙ্গে যিনি স্বীয় ধাম গোলোকে অবস্থান করেন, এবং শ্রীমতী রাধারাণীর অংশপ্রকাশ, চিন্ময় রসের আনন্দে পরিপূর্ণ ব্রজগোপীরা যাঁর নিত্যলীলাসঙ্গিনী, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।"

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত মহাকাব্যের আদিলীলা খণ্ডের চতুর্থ পরিচ্ছেদেও শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী ব্রহ্মসংহিতা থেকে এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমের পরম আশ্রয় শ্রীমতী রাধারাণীর ভাব বর্ণনা করতে চেয়েছেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিজের সচ্চিদানন্দ রূপের মধ্যে রাধারাণীর অংশরূপে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় সহচরীরা তিনটি শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত—তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের তিন প্রকার শক্তি—'কৃষ্ণকান্তাগণ দেখি ত্রিবিধ প্রকার'—লক্ষ্মীগণ, দ্বারকার মহিষীগণ এবং বৃন্দাবনের ব্রজগোপিকাগণ। শ্রীমতী রাধারাণী থেকে এই সমস্ত কান্তাদের বিস্তার হয়েছে—

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে বলা হয়েছে,

অবতারী কৃষ্ণ যৈছে করে অবতার।
অংশিনী রাধা হৈতে তিন গণের বিস্তার ॥

(চৈঃ চঃ আদি ৪/৭৬)

অবতারী শ্রীকৃষ্ণ থেকে যেভাবে সমস্ত অবতারদের বিস্তার হয়, তেমনই শ্রীমতী রাধারাণী থেকে সমস্ত লক্ষ্মী, মহিষী ও ব্রজদেবীরা প্রকাশিতা হন।

বৈভবগণ যেন তাঁর অঙ্গ-বিভূতি।
বিম্ব-প্রতিবিম্ব-রূপ মহিষীর ততি ॥

(চৈঃ চঃ আদি ৪/৭৭)

লক্ষ্মীগণ তাঁর বৈভব-বিলাসাংশরূপ।
মহিষীগণ প্রাভব-প্রকাশস্বরূপ ॥

(চৈঃ চঃ আদি ৪/৭৮)

লক্ষ্মীদেবীরা হচ্ছেন তাঁর বৈভব-বিলাস এবং মহিষীগণ হচ্ছেন তাঁর প্রাভব প্রকাশ।

আকার স্বভাব-ভেদে ব্রজদেবীগণ।
কায়ব্যূহরূপ তাঁর রসের কারণ॥

(চৈঃ চঃ আদি ৪/৭৯)

ব্রজদেবীদের আকার এবং স্বভাব বিভিন্ন। তাঁরা হচ্ছেন শ্রীমতী রাধারাণীর কায়ব্যূহরূপ এবং তাঁরা তাঁর রস বিস্তার করেন। লক্ষ্মী হচ্ছেন শ্রীরাধিকার আংশিক প্রকাশ।

বহু কান্তা বিনা নহে রসের উল্লাস।
লীলার সহায় লাগি' বহুত প্রকাশ॥

(চৈঃ চঃ আদি ৪/৮০)

বহু কান্তা রূপ না হলে ভগবানের প্রেমের রস আস্বাদনের আনন্দ উপভোগ করা যায় না। তাই ভগবানের লীলাবিলাসে সহায়তা করার জন্য শ্রীমতী রাধারাণী বহুরূপে প্রকাশিত হন।

তার মধ্যে ব্রজে নানা ভাব-রস-ভেদে।
কৃষ্ণকে করায় রাসাদিক-লীলাস্বাদে॥

(চৈঃ চঃ আদি ৪/৮১)

ব্রজে বিভিন্ন যূথে বিভিন্ন ভাব ও রস অনুসারে গোপিকারা শ্রীকৃষ্ণকে রাসনৃত্য ও অন্যান্য লীলাবিলাসের রস আস্বাদন করান।

উপরোক্ত শ্লোকগুলির তাৎপর্য প্রসঙ্গে শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ লিখেছেন, "শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীমতী রাধারাণীর দেহ ভিন্ন হলেও, তাঁরা এক। শ্রীকৃষ্ণ পুরুষাবতার আদি বিভিন্ন অবতারে নিজেকে বিস্তার করেন। তেমনই শ্রীমতী রাধারাণী, লক্ষ্মী, মহিষী এবং ব্রজগোপীরূপে নিজেকে বিস্তার করেন। সেই সমস্ত কান্তাগণ তাঁর অংশ-প্রকাশ। শ্রীকৃষ্ণের বিষ্ণুরূপের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এই কান্তারূপের বিস্তার হয়। আদিরূপ থেকে এই বিস্তৃতিকে বিম্ব ও প্রতিবিম্বের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। আদিরূপের সঙ্গে প্রতিবিম্বিত রূপের কোন পার্থক্য নেই। শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তির কান্তারূপে প্রতিবিম্ব স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ থেকে অভিন্ন।

"শ্রীকৃষ্ণ যখন স্বয়ং নিজেকে বিস্তার করেন, তখন তাঁকে বলা হয় বৈভব বিলাস এবং প্রাভব প্রকাশ। শ্রীমতী রাধারাণীর বিস্তারও তেমনভাবেই বর্ণিত হয়েছে। বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণ হচ্ছেন শ্রীমতী রাধারাণীর বৈভব বিলাস, এবং দ্বারকার মহিষীগণ হচ্ছেন তাঁর প্রাভব প্রকাশ। রাধারাণীর সখীরা, ব্রজাঙ্গনারা, হচ্ছেন তাঁর নিজের কায়ব্যূহ। তাঁর অপ্রাকৃত বিস্তাররূপে ব্রজাঙ্গনারা শ্রীমতী রাধারাণীর পরিচালনায় শ্রীকৃষ্ণকে আনন্দ দান করেন। চিৎ-জগতে বৈচিত্র্যের মাধ্যমে পূর্ণরূপে আনন্দ আস্বাদন করেন। শ্রীমতী রাধারাণীর মতো বহু কান্তা, যাঁরা গোপী বা সখী নামে পরিচিত, তাঁদের সঙ্গ প্রভাবে অপ্রাকৃত রস বর্ধিত হয়। বহু কান্তার বৈচিত্র্য শ্রীকৃষ্ণের রস আস্বাদনের কারণ, এবং তাই শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ বিধানের জন্য রাধারাণীর এই সমস্ত বিস্তার প্রয়োজন। তাঁদের অপ্রাকৃত প্রেম বিনিময় বৃন্দাবন লীলার পরম উৎকর্ষ। শ্রীমতী রাধারাণী তাঁর এই কায়ব্যূহ বিস্তারের মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণকে রাসনৃত্য ও সেই রূপ লীলাবিলাসের আনন্দ আস্বাদন করান। রাসলীলারূপ পুষ্পের মধ্যবর্তী দলও হচ্ছেন শ্রীমতী রাধারাণী।

শ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামীর কড়চা গ্রন্থেও একটি শ্লোকেও শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তিরূপে শ্রীমতী রাধারাণীর আবির্ভাব প্রসঙ্গ সমর্থন করে বলা হয়েছে—

রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতিহ্লাদিনীশক্তিরস্মা-
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্ ॥
(চৈঃ চঃ আদি ৪/৫৫)

অর্থাৎ "শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রণয় ভগবানের হ্লাদিনী শক্তির বিকার। শ্রীমতী রাধারাণী ও শ্রীকৃষ্ণ একাত্মা। কিন্তু একাত্মা হলেও তাঁরা অনাদি কাল থেকে গোলোকে পৃথক দেহ ধারণ করে আছেন। এখন সেই দুই চিন্ময় দেহ পুনরায় যুক্ত হয়ে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামে প্রকট হয়েছেন। শ্রীমতী রাধারাণীর এই ভাব ও অঙ্গকান্তিযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে আমি প্রণতি নিবেদন করি।"

বাস্তবিকই, শ্রীগৌরাঙ্গদেবের তাৎপর্য বুঝতে হলে শ্রীমতী রাধারাণীকে ভালভাবে বুঝতে হয়।

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে পরবর্তী শ্লোকে (আদি ৪/৮২) বর্ণিত শ্রীমতী রাধারাণীর নামগুলির দ্বারা তাঁকে সম্বোধন করা হয়—

গোবিন্দানন্দিনী, রাধা, গোবিন্দমোহিনী।
গোবিন্দসর্বস্ব, সর্বকান্তা-শিরোমণি ॥

শ্রীমতী রাধারাণী হচ্ছেন শ্রীগোবিন্দের আনন্দদায়িনী, এবং তিনি গোবিন্দমোহিনীও। তিনি গোবিন্দের সর্বস্ব, এবং সমস্ত কান্তাদের শিরোমণি।

দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
সর্বলক্ষ্মীময়ী সর্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা ॥

"পরদেবতা অর্থাৎ পরমারাধ্য শ্রীমতী রাধারাণী সাক্ষাৎ 'কৃষ্ণময়ী', 'সর্বলক্ষ্মীময়ী', 'সর্বকান্তি', 'কৃষ্ণ-সম্মোহিনী', ও 'পরাশক্তি' বলে কথিত হয়েছেন।"

এই শ্লোকটি 'বৃহদ্‌গোতমীয় তন্ত্র' থেকে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে শ্রীমতী রাধিকার মাহাত্ম্য বর্ণনা প্রসঙ্গে উদ্ধৃত হয়েছে—(আদিলীলা ৪/৮৩)

'দেবী' কহে দ্যোতমানা, পরমা সুন্দরী।
কিম্বা, কৃষ্ণপূজা-ক্রীড়ার বসতি নগরী ॥ (৮৪)
কৃষ্ণময়ী—কৃষ্ণ যার ভিতরে বাহিরে।
যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে ॥ (৮৫)

দ্যুতিবিশিষ্টা পরমা সুন্দরী বলে, কিংবা কৃষ্ণপূজারূপ যে ক্রীড়া, তার বসতি-স্থান বলে তিনি 'দেবী'। যাঁর অন্তরে এবং বাইরে সর্বত্রই কৃষ্ণ বিরাজ করছেন, তিনিই 'কৃষ্ণময়ী'। তিনি যেখানেই দৃষ্টিপাত করেন, সেখানেই তিনি কৃষ্ণকে দর্শন করেন।

কিম্বা, প্রেমরসময় কৃষ্ণের স্বরূপ।
তাঁর শক্তি তাঁর সহ হয় একরূপ ॥ (৮৬)
কৃষ্ণবাঞ্ছা-পূর্তিরূপ করে আরাধনে।
অতএব 'রাধিকা' নাম পুরাণে বাখানে ॥ (৮৭)

কিংবা তিনি শ্রীকৃষ্ণেরই স্বরূপ, কেন না তিনি প্রেমরসময়। শ্রীকৃষ্ণের শক্তি এবং স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ অভিন্ন। তাঁর আরাধনা হচ্ছে কৃষ্ণবাঞ্ছা-পূর্তি। তাই পুরাণে তাঁকে 'রাধিকা' বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

রাধা নামটি প্রকাশিত হয়েছে আরাধনা শব্দ থেকে। যার অর্থ হচ্ছে উপাসনা করা। যিনি শ্রীকৃষ্ণের আরাধনায় সর্বশ্রেষ্ঠা তাঁরই নাম রাধিকা।

'শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত' গ্রন্থে শ্রীল প্রভুপাদের তাৎপর্যে এইভাবে শ্রীমতী রাধিকার মাহাত্ম্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

গোপিকাগণের প্রধানা হচ্ছেন শ্রীমতী রাধারাণী। সেই গোপিকাধামে শ্রীমতী রাধারাণীর আনন্দ উপলব্ধির উদ্দেশ্যে কত লোক সর্বস্ব পরিত্যাগ করে ব্রজধামে গিয়ে থাকেন। এই কারণে বহু ঋষি দিব্য আনন্দের অনুসন্ধান করতে শ্রীরাধিকার লীলাস্থলীতে গেছেন যুগে যুগে। সেই আনন্দের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছেন রাধা।

রাধারাণীকে আমরা সবাই বেশি বুঝতে পারব না। কৃষ্ণকে আমরা ভাল বুঝি। রাধারাণী আমাদের সকলের পূজনীয়া, তিনি হচ্ছেন অলৌকিক, অতুলনীয়া এবং শক্তিমত্তার অদ্বিতীয়া। শ্রীরাধাভজনা করলে তবেই শ্রীকৃষ্ণ ভজনার পথ খুঁজে পাওয়া যায়। শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ লাভে অসীম আনন্দ লাভ করেন।

শ্রীকৃষ্ণও শ্রীরাধিকার মাধ্যমে সর্বাপেক্ষা বেশি প্রেমানন্দ উপভোগ করে থাকেন। সমস্ত লক্ষ্মীর (গোপীর) মধ্যে প্রধান হচ্ছেন রাধা।

যখন শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে আবির্ভূত হয়েছেন, তখন অল্প সময়ের ব্যবধানে রাধারাণীরও আবির্ভাব হয়। শ্রীরাধারাণীর জন্মের সময় থেকেই দুই চক্ষু মুদিত রাখতেন। সকলেই ভাবলেন, রাজা বৃষভানুও ভাবলেন, তাঁর কন্যা অন্ধ হয়েই জন্ম গ্রহণ করেছে। পরে একদিন ঘটনাক্রমে শিশু কৃষ্ণ এসে যখনই শিশুকন্যা রাধারাণীর মুখের ওপর ঝুঁকে তাঁকে দেখতে চাইলেন, অমনি রাধা তাঁর চোখ মেলে তাকিয়ে জীবনে প্রথম তাঁর চক্ষু সার্থক করলেন। শ্রীকৃষ্ণের মুখচন্দ্রিমা দর্শন করে! সে এক অলৌকিক যোগাযোগ!

শ্রীরাধিকার জন্মতিথি রাধাষ্টমী উদ্‌যাপন করলে শত যজ্ঞ অনুষ্ঠানের সুফল অর্জন করা যায়। রাধাষ্টমী যে পালন করে, তার একাদশী পালনের সুফল থেকেও শতগুণ ফল লাভ হয়। যে রাধাষ্টমী পালন করে, তার এতই সম্পদ হয়, যা মেরুপর্বতে যত সোনা সঞ্চিত আছে, তার থেকেও বেশি সম্পদ লাভ হয়।

যারা রাধাষ্টমী পালন করে, তারা সবাই শুদ্ধ কৃষ্ণভক্ত হয়ে ওঠে। এক পাপী ভাবল, অন্যান্যভাবে ধনসম্পদ অর্জন করব এবং নিজের আলয় ছেড়ে দান ধ্যান করব। এক জায়গায় গিয়ে সে দেখল, ভক্তগণ কোনও উৎসবের আয়োজন করেছে। সেখানে শ্রীমতী রাধারাণীর পূজার চন্দন, দীপ, ধূপ, কাপড়, খাদ্যদ্রব্য, কীর্তনগীতের আয়োজন ছিল। তখন পাপী লোকটি জিজ্ঞেস করল। 'আপনারা কি করছেন?'

তাঁরা বললেন, আজ হচ্ছে রাধাষ্টমী—যে দিনে রাধার আবির্ভাব হয়েছে। আমরা যত্ন করে তাই এই দিনটি পালন করছি। যারা এই অষ্টমী পালন করে, তার সমস্ত পাপ দূর হয়ে যায়।

তখন সেই পাপী ঐ সব ভক্তদের সাথে রাধাষ্টমী পালন করল। তারপরে বিষ্ণুদূতেরা এসে তাঁকে বৈকুণ্ঠলোকে নিয়ে চলে গেলেন। যে সব মহিলা রাধাষ্টমী পালন করে না, তাদের সর্বনাশ হয়। রাধার কৃপায় নারী সমাজের কল্যাণ হোক। কিন্তু অনেকেই জানে না রাধারাণীর মাহাত্ম্য। শ্রীকৃষ্ণের যেমন অনন্ত গুণ, শ্রীরাধিকারও অনন্ত গুণ।

হেডলাইটের পেছনে ট্রেন আছে

এক জায়গায় শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, 'অহং বীজপ্রদ পিতা—'আমি সব কিছুর বীজ প্রদানকারী পিতা।' অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি আলোচনা করে, কি আগে হল—ডিম না মুরগি। এখানে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, "আমি সমস্ত বীজের স্বরূপ" অর্থাৎ বীজটা আগে হল এবং বীজ হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ থেকে সব কিছুর উৎপত্তি হয়েছে। (গীতা ১৪/৪)

'স্থাবর' মানে যে সব জীব অচল, যেমন গাছ; 'জঙ্গম' হল কীট, পতঙ্গ-পাখি—যারা চলে। সব কিছু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকে আসছে। এই থেকে আমরা বুঝতে পারি আমরা সবাই শ্রীকৃষ্ণের সন্তান।

অনেকে মনে করেন তিনি নিরাকার এবং নিরাকার ব্রহ্ম হচ্ছে মূল কারণ। নিরাকার ব্রহ্ম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের একটি স্বরূপ, তাঁর নিজের অঙ্গের জ্যোতি। গীতার ১৪শ অধ্যায়ে তিনি বলেছেন, "আমি নির্বিশেষ ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়।" অনেকে মনে করেন, 'এই জগতের আকার আছে, পরম ব্রহ্ম তো নিরাকার—এই সোজা ব্যাপারে বিবাদ কিসের?' কিন্তু দিন সাদা, রাত কালো—এ তো জড় বুদ্ধি। সাদা, কালো, দিন, রাত—এইগুলি বিষয়বস্তু। এইভাবে অনুবাদ করে পরম ব্রহ্মকে বোঝা যায় না। পরম ব্রহ্ম বুঝতে হলে তাঁর কাছ থেকেই জানতে হবে। গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ ব্যাখ্যা করেছেন—আমি কে।

একটা উদাহরণ আছে—একজন গ্রাম থেকে এসেছে, জীবনে প্রথম রেল লাইন দেখছে। সবাই বলেছে, লাইনের কাছে দাঁড়ালে ট্রেন দেখা যাবে। ট্রেন কি রকম দেখতে তার কোনও ধারণা নেই। দেখতে দেখতে রাত হয়ে গেল, ট্রেন নেই। তখন অনেক দূরে ট্রেনের সামনে যে বাতি থাকে সেটা দেখা গেল। তা দেখে একজন বলে উঠল, আরে আমি ট্রেন দেখেছি। লোকে যখন জিজ্ঞাসা করল, কি দেখেছ, সে বলল, ট্রেন একটা লাইট, জ্যোতি।

আর একজন ইঞ্জিন দেখেছে, সে বলল, তার দু'দিকে ধোঁয়া, পীপ্ পীপ্ শব্দ আর চারদিকে ধুলোবালি—এই বলে 'আমি ট্রেন দেখেছি, ট্রেন দেখেছি' চিৎকার করতে করতে বাড়ি ফিরে গেল। যে দেখেনি সে জানল, ট্রেনের একটা রূপ আছে—কালো, লোহার আর চারিদিকে ধুলো বালি ছড়িয়ে থাকে।

কিন্তু আর একজন সেইখানে দাঁড়িয়ে থেকে দেখল ট্রেন স্টেশনে থামল। ড্রাইভার, টিকিট চেকার, অনেক যাত্রী, সেখানে মুড়ি বেচা হয় ইত্যাদি। তারপর ট্রেন স্টেশন ছেড়ে চলে যায়—তাও দেখল।

এই জীবন থেকে চলে গেলে প্রথমে ব্রহ্মজ্যোতি দর্শন হয়, মনে হবে পরম ব্রহ্ম দেখেছি। ঠিক যেমন ট্রেনের বাতি দেখা লোকটি বাড়ি ফিরে গেল। কিন্তু দ্বিতীয় জন ধৈর্য ধরে দেখেছে জ্যোতি কোথা থেকে আসছে; যোগীরা জানে পরমব্রহ্মের পরমাত্মা রূপ থেকে রশ্মিচ্ছটা বিকিরণ হয়, তবে রূপটা জানে না। কিন্তু ভক্তিযোগী হচ্ছেন তৃতীয় ব্যক্তিটির মতো—সে ট্রেন, ইঞ্জিন, যাত্রী সমস্ত কিছু দেখেছে; ভক্তিযোগী গোলোক বৃন্দাবনে যায়, সেখানে দেখে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, রাধারাণী, অষ্টসখী, মা যশোদা, নন্দ মহারাজ, গোপজন, গিরি গোবর্ধন—সব কিছু আছে। শ্রীকৃষ্ণ একলা নেই। ভক্তিযোগী উপলব্ধি পায় যে, ভগবান আনন্দময়, বহু পার্ষদ নিয়ে থাকেন।

এখন প্রথম জন ঠিকই ধরেছে—ট্রেনের একটা বাতি তো থাকেই, কিন্তু যারা মনে করছে বাতিই সব কিছু...বাতিটা একটা অংশমাত্র। তেমনই, যে মাত্র ইঞ্জিনের রূপ দেখল—সেও মিথ্যা নয়; আংশিক একটা উপলব্ধি। কিন্তু ভক্তিযোগীর পূর্ণ উপলব্ধি আছে।

যারা নিরাকারবাদী, তারা বুঝতে পারে না, ভক্ত কেন এভাবে ভগবানকে পূজা করে, ভক্তি করে। তারা অনুমান করে যে, সব কিছু শূন্য। কিন্তু আমাদের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে এমন কিছু আছে কি, যা শূন্য থেকে এসেছে? 'কিছু নেই' থেকে 'কিছু' হয় না। কি করে হবে? এটা অসম্ভব ব্যাপার। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ গুণ সমন্বিত—এই হিসাবে তিনি নির্গুণ,

জড় জাগতিক গুণ নেই, পারমার্থিক গুণ বিপুল আছে। সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমাদের সকলের কারণ, আমরা তাঁর কাছ থেকে এসেছি। এই জন্য সকলের পক্ষে তাঁর সেবা করা, ভক্তি করা, পূজা করা স্বাভাবিক কর্তব্য থাকে।

গীতাতে এই কথাও বলা আছে, আমরা যদি ভগবানের অংশ হই, তবে আমাদের উচিত তাঁর সেবা করা—অংশ অংশীকে সেবা করবে। আমাদের হাত হচ্ছে আমাদের দেহের অংশ, হাত দেহকে সেবা করবে। হাত যদি কোনও কাজ না করে দেহের সাথে জুড়ে থাকে, তা হলে সে রোগী। আমরা যদি বলি ভগবানের সেবা করব না, নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধন, লালসাই করব, তা হলে আমরাও রোগী, অকাজী এবং তার ফলে আমাদের দুঃখ কষ্ট।

আমরা যদি ভগবানের সেবা করি তা হলে আমাদের স্বাভাবিক আনন্দ আস্বাদন হয়। তিনি আমাদের স্বরূপ। যত আচার্য, যত সম্প্রদায় সকলের পিতা তিনি। শঙ্করাচার্য, রামানুজাচার্য, মধ্বাচার্য, বিষ্ণুস্বামী, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু—সবাই গীতাকে মানেন। বেদের সার হচ্ছে গীতা; গীতার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—"আমি সমস্ত বীজের স্বরূপ।"

অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের সখা আর শ্রীকৃষ্ণ হলেন পার্থসারথি। তিনি সমস্ত জীবের তারণ কর্তা, কিন্তু তাঁর বন্ধুর জন্য তিনি রথের সারথি হলেন। ভগবান পরম ঈশ্বর, তিনি বিশ্বরূপ দেখালেন অর্জুনের কাছে, কিন্তু ভালবাসা প্রেমের জন্য তাঁর ভক্তকে সেবা করছেন।

এই জন্য শ্রীকৃষ্ণকে অনেকে বুঝতে পারে না। একদিকে তিনি যদি ভক্তের দাসত্ব করতে পারেন, কি করে উনি পরমেশ্বর হবেন? এই হচ্ছে তাঁর মহত্ত্ব। যেমন বাবা ছেলের সেবা করেন। ভগবান ভক্তের ছেলে হতে পারেন, এই জন্য শ্রীকৃষ্ণ যশোদা এবং নন্দ মহারাজের নন্দন হলেন।

সর্ব ধর্ম স্বীকার করে যে, ভগবান হচ্ছেন পরম পিতা। গীতা তাও বলছেন কিন্তু তার ওপরেও গীতা বলছেন যে, ভগবান তাঁর ভক্তের জন্য কেবল পরম পিতা নন, তিনি ভক্তের অভিলাষ পূর্ণ করতে চান—বাবা সব সময়ে ছেলের সেবা করতে চান। অন্য কোনও ধর্মে কিন্তু এটা শোনা যায় না। এই জন্য এটা হচ্ছে পি-এইচ. ডি, ধর্ম। এখানে রহস্য আছে। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন অর্জুনের কাছে—"কতকগুলি রহস্য আমি তোমার কাছে বলছি, গুহ্যতত্ত্ব।"

ভগবান কি করে তাঁর ভক্তের অধীন হতে পারেন—ভালবাসা প্রেমের দ্বারা, এটা একটা রহস্য। এটা সবার কাছে বিস্তারিত বলা যায় না। যারা হিংসা করে, যারা ভগবানকে মানে না, স্বীকার করে না, ভগবানের কাছে যারা প্রণাম

করবে না, ভক্তি করবে না, তাদের কাছে বললেও তারা কি বুঝবে? সরল যারা, তারা বুঝতে পারবে ভগবানের মাহাত্ম্য—যে, ইচ্ছা করলে ভক্তের অধীনে আসতে পারে—ভক্তবৎসল।

যত আমরা ভগবানের কথা শ্রবণ করি, মনে হয় এই রকম প্রভুর কেন সেবা করব না? এত দয়াময়, এত কৃপালু, কেন কেউ তাঁর আশ্রয় নেবে না? এই জগতে আমরা সবাই চেষ্টা করছি প্রভু হতে। সবাই চায় যে, সবাই তার সেবা করুক, যেন দাস হওয়া মানে ঘৃণার ব্যাপার। ভগবানের অন্তরঙ্গ সেবক হতে পারলে এর থেকে আর বড় জিনিস নেই। তাই তাঁর দাস হওয়ার অনুশীলনে পি-এইচ. ডি. লাভ করা যায়—হেডলাইট দেখার পরও তার পেছনে যে ট্রেন আছে, তার যাত্রী, ড্রাইভার, চেকার, স্টেশন ইত্যাদি সব কিছু সম্বন্ধে জানা হয়ে যায়। এই জন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সকলের কাছে কৃষ্ণপ্রেম বিতরণ করলেন, কৃষ্ণভক্তি অনুশীলন করতে আদেশ দিলেন। সবাই যেন কৃষ্ণনাম করে তার জীবন ধন্য করে তোলে।

সাধুর কথা শুনে সাধুকে চিনতে হয়

মহাদেব হলেন ভগবানের অংশের অংশ—তিনি একজন অবতার। মহাদেব শিব হচ্ছেন তমোগুণের দেবতা, বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ। তিনি জগতে অবতীর্ণ হন পতিতদের উদ্ধার করার জন্য এবং ভগবানের কাজ সম্পন্ন করার জন্য। ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধের ২য় অধ্যায়ে বর্ণিত কাহিনীতে দক্ষ ছিলেন একজন প্রজাপতি, তাঁর ষোলটি কন্যা ছিল। সব থেকে কনিষ্ঠ ছিল সতী, কিন্তু সতীর কাছে দক্ষ কথা বলতেন না। সতীর সাথে মহাদেবের বিবাহ হয়েছিল। দক্ষ মহাদেবকে হিংসা করতেন, ভাবতেন, এ আমার কি রকম জামাই হল? আমার আর সব জামাইরা খুব ভাল, ভদ্র, সাধু ঋষি; কিন্তু কনিষ্ঠ কন্যা দান করলাম এমন এক জামাইকে যে শ্মশানে থাকে, বিভিন্ন রকম অসভ্য ব্যক্তির সাথে তার মেলামেশা, ভূতেদের সাথে মেশে—কি অবস্থায় না এখন আমার কন্যাকে বাস করতে হচ্ছে!

এইসব চিন্তা করে দক্ষ মহাদেবকে ঘৃণা করতেন। কিন্তু মহাদেব এভাবে ভূত-প্রেত অসুরদের উদ্ধার করছেন, দয়া করছেন অথচ তাদের সঙ্গের প্রভাবে কলুষিত হননি। তাঁর পারমার্থিক প্রভাব এত দৃঢ় যে, অশুচি স্থানে থাকলেও তিনি সব সময়ে পবিত্র হয়ে থাকেন।

সাধুকে বিচার করতে গেলে, দেখে বিচার করতে হয় না, তাঁর কথা শুনে জানতে হয়, অর্থাৎ আসল স্বভাবকে জানতে হয়। বহিরঙ্গা মহাদেবকে দেখে মনে করছে যে, শ্মশান, মৃত্যুর দ্বারা সে অশুচি।

ভাগবতে লেখা আছে—প্রচেতাগণ যখন ধ্যান করছিলেন, তখন মহাদেব তাঁদের কাছে গিয়ে সবাইকে আশীর্বাদ করলেন, শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত আমার কাছে সব থেকে প্রিয়। আমার যে পূজা করে, তার থেকে কৃষ্ণভক্তকে আমি বেশি ভালবাসি। তাই আমি তোমাদের একটি মন্ত্র শেখাব, যে-মন্ত্র পাঠ করে তোমরা কৃষ্ণভক্তি লাভ করবে।

মহাদেব শিব হচ্ছেন সবার গুরু। সব থেকে বড় আশীর্বাদ শিবের কাছে পাওয়া যায়—কৃষ্ণভক্তি। সেটা আজকালকার মানুষ চায় না। কেউ চাইছে টাকা, কেউ বাড়ি, চাকুরি, কিন্তু তাঁর কাছে ভগবানের ভক্তি, দিব্য জ্ঞান চাওয়া যায়—এটা সাধারণত কেউ চায় না। জলের মধ্যে একটা মাছ যে দিকে যায়, সব মাছ সেই দিকেই চলে। ওরা চিন্তা করে না, আমি কোথায় আছি। যে মাছ জালে ধরা পড়েছে, সে যদি অন্যদের আসতে বারণ করে, তারা বলে, তুমি গেছ, আমরা যাব না কেন? তুমি নিশ্চয় ভাল আছ, আর আমাদের ভাল চাও না, তাই যেতে নিষেধ করছ যাতে একা একা ভোগ করতে পার, আমরা যাবই।

একে বলে গণগড্ডালিকা। অন্ধ বিশ্বাস করে সবাই যাচ্ছে। এইভাবে যে সাধু হয়েছে, সে সাধু নয়। সে মাছ মাংস বিড়ি খাচ্ছে, বলছে, ভগবানের দরকার নেই, আমি ভগবান। ভগবানের হাতে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম থাকে, কিন্তু বিড়ি হাতে ভগবান কখনও শুনিনি। কিন্তু হাজার হাজার লোক তাই শুনছে। প্রকৃত ভগবান কে, তা জানে না।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছিলেন, সাধু শাস্ত্র গুরুর কাছ থেকে উপদেশ জানতে হয়। শাস্ত্রে কি বলে—ভগবান কি রকম হয়, প্রকৃত গুরুর কি গুণ আছে, প্রকৃত সাধুর কি লক্ষণ—শাস্ত্র থেকে এগুলি জানতে হয়। গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—বহু রকম বিভূতি ব্যাখ্যা করার কি দরকার, আমার এক অংশ দিয়ে সমস্ত জগৎকে সৃষ্টি করছি এবং স্থায়ী রাখছি। ক্ষুদ্র এক মানুষ মনে করছে,

সে ভগবান হয়ে গেল, কিন্তু সে তো জগৎকে স্থায়ী রাখছে না। সে কিছু না কিছু দেখায় বা বলে আর কিছু সময় চলে যায়।

আবার সাধারণ দৃষ্টিতে কেউ বলতে পারে শিব অপবিত্র—শ্মশান, খুলি সাজানো এসব অপবিত্র। মহাদেব শিবকে দক্ষ হিংসা করলেন কিন্তু শিব যে পরম পবিত্র পরম বৈষ্ণব, তিনি ভগবানের অংশপ্রকাশ—এটা তিনি বুঝতে পারেননি।

এই রকম হিংসা করার ফলে দক্ষের সর্বনাশ হল। একজন মহৎ ব্যক্তি, জগদ্‌গুরু, তাঁকে হিংসা করা মহাপাপ, মহা-অপরাধ। দক্ষ একজন নির্গুণ দমন বিশারদ ছিলেন কিন্তু যেহেতু উনি বৈষ্ণব ঠিকমতো নন, তাই উনি উপযুক্ত গুরু নন। কিন্তু যে বৈষ্ণব ভগবানকে ভক্তি করে থাকে, সাধারণ পরিবারে জন্ম হলেও তিনি গুরু হতে পারেন।

ভগবান খুশি হন ভক্তির দ্বারা, ভক্তি দ্বারা তাঁকে জয় করা যায়। অজেয়কে কেউ জয় করতে পারে না কিন্তু ভক্তবৎসল—ভক্তির দ্বারা তিনি পরাজিত হয়ে যান। ভগবান এত দয়াময় যে, যখন উনি ভক্তি দেখেন, মুগ্ধ হয়ে পড়েন, ভক্তকে কৃপা করেন।

পদ্মপুরাণে এক পাহাড়ী ব্যক্তির কাহিনী আছে। সে শূদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিল, কোনও শাস্ত্র পাঠ করেনি, কিন্তু কিভাবে বৈষ্ণবের মুখে ভগবানের গুণগান শুনে নিরন্তর ভগবানের নাম উচ্চারণ করতে থাকত। যখন চাষ করত, গোবিন্দ হরি কেশব মাধব কৃষ্ণ ভগবান কেশীনিসূদন—এইভাবে ভগবানের নাম নিরন্তর পাঠ করত। আর সব সময়ে মনে রাখত ভগবানের সেবা হচ্ছে আমাদের জীবনের সব চেয়ে বড় উদ্দেশ্য। কিন্তু ভগবানের সেবা কিভাবে করতে হয়, তা সে ভালভাবে জানত না।

পাহাড়ের মধ্যে যখন কোনও ফল জোগাড় করত, তখন একটু ভাল ফল ভগবানকে নিবেদন করতে হয় জানল। ফল মিষ্টি, কি তেতো, কি টক জানতে একটু মুখে দিয়ে পরীক্ষা করত। ফল ভাল হলে—'ভগবান, তোমার চরণের কাছে অর্পণ করছি', বলে নিবেদন করত। জানত না যে, না খেয়ে ভগবানের কাছে অর্পণ করতে হয়। কিন্তু না জানলেও খুব ভক্তি ছিল। সব সময়ে ভগবানের নাম নিয়ে গুণমুগ্ধ হয়ে থাকত।

একদিন নতুন এক রকম পাহাড়ী ফল সে দেখতে পেল—ছোট্ট মতো। সে ভাবল, ভগবানকে নিবেদন করব কি না আগে দেখি। তখন একটু মুখে দিতে গিয়ে একেবারে গলার মধ্যে আটকে গেল। তখন চিন্তা করল, আমি কি

মহাপাপী, ভগবানকে নিবেদন না করে খেয়ে ফেলছি। এখন তা হলে গলার থেকে বার করতে হয়। সে অনেক রকম চেষ্টা করল বার করতে—ভগবানকে নিবেদন করবে।

কিন্তু কোনও রকমে সে গলা থেকে বার করতে পারল না। ভাবছে, এভাবে নিবেদন না করে খেলে আমি পাপী, নিষ্ঠুর হব। তখন কুড়াল দিয়ে নিজের গলা কেটে ফেলল। রক্তপাত হয়ে ফল বার করে ভগবানকে নিবেদন করে মরে গেল।

ভগবান দেখছেন, অদ্ভুত ব্যাপার, আমাকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে নিজের গলা কেটে ফেলল। বিষ্ণু এসে দেখছেন তার মৃতদেহ রয়েছে—তাকে কি আশীর্বাদ দেব? এ রকম তো ইতিহাসে দেখা যায় না। সে তো জানে না, না খেয়ে আমাকে নিবেদন করতে হয়, কিন্তু সব কিছুতে আমাকে সন্তুষ্ট করার ইচ্ছা আছে। আমি তার কাছে কত ঋণী হয়ে পড়লাম।

তখন বিষ্ণু পুনরায় তার প্রাণ ফিরিয়ে আনেন, আত্মা ফিরে আসে এবং তার দেহকে সুস্থ করে দেন। তখন বিষ্ণু ঐ চপ্রিকা পাহাড়ীকে জিগেস করেন, তোমার ভক্তি দেখে আমি সন্তুষ্ট হয়েছি, তোমাকে কি বর দেবে বল।

চপ্রিকা ভগবান বিষ্ণুর দর্শন পেয়ে প্রণাম করে বলল, তোমার দর্শন পেলাম আমি আর কি চাইব? আমি পাহাড়ী অশুদ্ধ ব্যক্তি, জানি না কি করে তোমার সেবা করতে হয়। তবু তুমি এমন আশীর্বাদ দিলে যে, তোমার দর্শন আমি লাভ করছি। এর থেকে বড় আশীর্বাদ আমার আর দরকার হয় না। তবে যদি কোনও আশীর্বাদ চাইতেই হয়, তা হলে কখনও যেন তোমার সেবা থেকে বঞ্চিত না হই—সেই আশীর্বাদ আমাকে কর।

এই প্রার্থনা শুনে ভগবান বিষ্ণু আরও খুশি হলেন, বললেন, 'তোমার ভক্তি দেখে আরও খুশি হলাম এবং আশীর্বাদ দিলাম তুমি আরও ভক্তির মধ্যে থাকবে, এবং ভবিষ্যতে তুমি আমার কাছে আসবে।' এই বলে বিষ্ণু অন্তর্ধান করলেন।

তখন চপ্রিকা দ্বারকায় গিয়ে ভগবানের সেবা করে পরে শ্রীকৃষ্ণলোকে অবস্থান করলেন। কিভাবে একজন অনভিজ্ঞ ব্যক্তির শুদ্ধ ভক্তি থাকার ফলে ভগবানের কাছে সে যেতে পেরেছে—এটার প্রমাণ পাওয়া গেল।

ভক্তরা জানেন—তাঁদের মৃত্যু নেই

শ্রীমদ্ভাগবতের (৪/২৯/৭৬-৭৭) শ্লোক দুটিতে বলা হয়েছে, শুঁয়োপোকা যেমন একটি পাতা অবলম্বন করে পূর্ববর্তী পাতাটি পরিত্যাগ করে, তেমনই, জীব তার পূর্ববর্তী কর্ম অনুসারে, অন্য আর একটি শরীর অবলম্বন করে তার বর্তমান শরীর ত্যাগ করে। তার কারণ, মন হচ্ছে সর্বপ্রকার বাসনার আগার।

শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ এই প্রসঙ্গে যে সুদীর্ঘ তাৎপর্য বর্ণনা করেছেন, তা আমাদের বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। জড় কার্যকলাপে মগ্ন জীব জড়দেহের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়ে পড়ে। এমন কি, মৃত্যুর সময়েও তার শরীর এবং শরীরের সঙ্গে সম্পর্কিত আত্মীয়-স্বজনের কথা সে চিন্তা করে। তার ফলে সে দেহাত্মবুদ্ধিতে এতই মগ্ন থাকে যে, মৃত্যুর সময়েও তার বর্তমান শরীর সে ত্যাগ করতে চায় না। কখনও কখনও দেখা যায় যে, মরণোন্মুখ ব্যক্তি দেহত্যাগ করার পূর্বে বহুদিন মূর্চ্ছিত অবস্থায় থাকে। তা বিশেষভাবে তথাকথিত রাজনৈতিক নেতাদের ক্ষেত্রে দেখা যায়, যারা মনে করে—তাদের ছাড়া সারা দেশ বা সমাজ বুঝি অচল হয়ে পড়বে।

একে বলা হয় মায়া। রাজনৈতিক নেতারা তাদের পদ ছাড়তে চায় না। হয় শত্রুর গুলিতে অথবা মৃত্যুর আগমনে তাদের পদত্যাগ করতে হয়। দৈবের আয়োজনে জীব আর একটি শরীর প্রাপ্ত হয়, কিন্তু তার বর্তমান শরীরের প্রতি আকর্ষণের ফলে, সে অন্য আর একটি শরীরে দেহান্তরিত হতে চায় না। তখন তার বর্তমান শরীর ত্যাগ করে অন্য আর একটি শরীর গ্রহণ করতে প্রকৃতি তাকে বাধ্য করে।

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মানানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে ॥

(গীতা ৩/২৭)

"জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের প্রভাবে বিমূঢ় জীবাত্মা নিজেকে কর্তা বলে অভিমান করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা সবই সম্পাদিত হয় প্রকৃতির দ্বারা।"

জড়া প্রকৃতি অত্যন্ত শক্তিশালী, এবং জড়া প্রকৃতির গুণগুলি জীবকে অন্য আর একটি শরীর গ্রহণ করতে বাধ্য করে। তা বোঝা যায় যখন জীবকে উন্নততর শরীর থেকে নিকৃষ্ট শরীরে দেহান্তরিত হতে হয়। বর্তমান শরীরে যে কুকুর কিংবা শূকরের মতো আচরণ করে, সে অবশ্যই তার পরবর্তী জীবনে

কুকুর অথবা শূকরের শরীর গ্রহণ করতে বাধ্য হবে। কোন ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতির শরীর উপভোগ করতে পারে, কিন্তু যখন সে বুঝতে পারে যে, তাকে কুকুর বা শূকরের শরীর গ্রহণ করতে হবে, তখন তার বর্তমান শরীরটি সে ত্যাগ করতে চায় না। তাই মৃত্যুর পূর্বে বহুদিন মূর্চ্ছিত অবস্থায় সে পড়ে থাকে। বহু রাজনীতিবিদের মৃত্যুর সময়ে তা দেখা গেছে।

মূল কথা হচ্ছে, পরবর্তী শরীরটি দৈবের নিয়ন্ত্রণাধীনে ইতিমধ্যেই নির্ধারিত হয়ে রয়েছে। জীব এক দেহ ত্যাগ করার পরেই আর একটি দেহে প্রবেশ করে। কখনও বা জীব অনুভব করে যে, তার বর্তমান শরীরের মাধ্যমে তার অনেক বাসনা ও কল্পনা পূর্ণ হয়নি। যারা তাদের শরীরের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, তাদের প্রেতশরীরে থাকতে হয় এবং তারা অন্য আর একটি স্থূল শরীর ধারণ করতে পারে না। প্রেত শরীরে তারা প্রতিবেশী এবং আত্মীয়স্বজনদের নানারকম উপদ্রব করে। এই প্রকার পরিস্থিতির মূল কারণ হচ্ছে মন। মন অনুসারে বিভিন্ন প্রকার শরীর তৈরি হয়, এবং জীবকে তা গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয়। গীতায় (৮/৬) সেই কথা প্রতিপন্ন হয়েছে—

যং যং বাপি স্মরণ্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥

"শরীর ছাড়ার সময়ে মানুষ যে অবস্থা স্মরণ করে, নিঃসন্দেহে সেই অবস্থা সে প্রাপ্ত হয়।"

মানুষ তার শরীর ও মনের দ্বারা কুকুরের মতো আচরণ করতে পারে অথবা দেবতার মতো আচরণ করতে পারে, এবং সেই অনুসারে তার পরবর্তী জীবন সে প্রাপ্ত হবে। তার বিশ্লেষণ গীতায় (১৩/১২) করা হয়েছে—

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
কারণং গুণসঙ্গোহস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু ॥

"জড়া প্রকৃতিতে জীব প্রকৃতির তিনটি গুণ ভোগ করে। গুণের এই সঙ্গ প্রভাবে উত্তম বা অধম যোনিতে সে জন্মগ্রহণ করে।"

গুণের সঙ্গ অনুসারে জীব উৎকৃষ্ট অথবা নিকৃষ্ট শরীরে দেহান্তরিত হয়। যদি সে তমোগুণের সঙ্গ করে, তা হলে পশু অথবা নিকৃষ্ট স্তরের মানুষের শরীর সে প্রাপ্ত হয়; কিন্তু যদি সে সত্ত্বগুণ বা রজোগুণের সঙ্গ করে, তা হলে সেই অনুসারে সে দেহ প্রাপ্ত হয়। সেই কথাও গীতায় (১৪/১৮) প্রতিপন্ন হয়েছে—

ঊর্ধ্বং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ ॥

"যারা সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত, তারা ক্রমশ উচ্চতর গ্রহলোকে উন্নীত হয়; যারা রজোগুণে রয়েছে, তারা ভূর্লোকে অবস্থান করে; আর যারা তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত, তারা নরকে যায়।"

সঙ্গের মূল কারণ হচ্ছে মন। এই মহান কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন মানব-সমাজের কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ, কারণ তা মানুষকে ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করার মাধ্যমে সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করার শিক্ষা দান করছে। এইভাবে, জীবনের অন্তে মানুষ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ লাভ করতে পারবে। একে বলা হয়—নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট, অর্থাৎ গোলোক বৃন্দাবনে প্রবেশ। ভগবদ্গীতায় (১৮/৫৫) সেই কথা বিশ্লেষণ করা হয়েছে—

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
তততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥

"ভক্তির দ্বারাই কেবল ভগবানকে তত্ত্বত জানা যায় এবং কেউ যখন এই প্রকার ভক্তির দ্বারা পূর্ণরূপে ভগবৎ-চেতনা প্রাপ্ত হন, তখন তিনি ভগবদ্ধামে প্রবেশ করেন।"

মন যখন পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনায় মগ্ন হয়, তখন গোলোক বৃন্দাবন নামক গ্রহলোকে প্রবেশ করা যায়। ভগবানের সঙ্গ লাভ করতে হলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জানতে হয়। শ্রীকৃষ্ণকে জানার পন্থা হচ্ছে ভগবদ্ভক্তি।

শ্রীকৃষ্ণকে তত্ত্বত জানার পর, কৃষ্ণলোকে প্রবেশ করে তার সঙ্গ করার যোগ্যতা লাভ হয়। এই প্রকার অতি উচ্চ পদ প্রাপ্ত হওয়ার কারণও হচ্ছে মন। মনের দ্বারা কেউ কুকুর বা শূকরের শরীর প্রাপ্ত হতে পারে, আবার ভগবানের নিত্য পার্ষদের শরীর লাভ করতে পারে। তাই মনকে সর্বদা কৃষ্ণভাবনায় মগ্ন রাখাই মানব-জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সিদ্ধি।

শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ বর্ণিত এই তাৎপর্য বিশ্লেষণ থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, এই জীবনে আমরা যা কিছু করি, তা সবই পরের জীবনে আমাদের উৎপত্তির কারণ। যেমন ছাত্রজীবনে যে যেভাবে নিজেকে প্রস্তুত করে, সেইভাবেই সে তার জীবনের পরবর্তী পর্যায়ে যেদিকে ইচ্ছা যেতে পারে।

ঠিক এইভাবেই শাস্ত্রে বলা হয়েছে, মৃত্যুকালে আমরা যা চিন্তা করি, পরজন্মে তাই আমাদের জীবনে হয়। কোনও পুরুষ যদি মরণকাল পর্যন্ত কেবলই নারীর চিন্তা করতে থাকে, বৈদিক শাস্ত্রের জন্মান্তরবাদ তত্ত্বে বলা হয়েছে—পরজন্মে সে নারীজন্ম পেতে পারে।

বাস্তবিকই, আমাদের ইহজীবনেও এখন যা অভ্যাস করছি, পরবর্তী বয়সকালে তেমনই জীবনধারা লাভ হয়—এই কথা অনস্বীকার্য সত্য।

তেমনি, যারা চিন্ময় আনন্দে পরিপূর্ণ চিরনবীন গোলোক বৃন্দাবনের দিব্য গ্রহলোকে যাঁরা ফিরে যেতে চান, তাঁদেরও মন এখন থেকে তৈরি করতে হবে। অর্থাৎ, গোলোক বৃন্দাবনের অধিপতি পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাকথায় সদাসর্বদা মন ভরিয়ে রাখতে হবে, যাতে মনগোন্মুখ হলেও কৃষ্ণচিন্তা থেকে মন বিরূপ হতে পারবে না এবং তেমন কৃষ্ণোন্মুখ মনের যিনি অধিকারী, সচ্চিদানন্দময় নিত্য গোলোক বৃন্দাবনধামে পরজন্ম অতিবাহিত করার সৌভাগ্যও তাঁর অর্জিত হওয়ায় বিপুল সম্ভাবনা থাকে। কারণ কৃষ্ণচিন্তার মাধ্যমে তাঁর ব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞান অন্তিমকালেও মনে থাকবে—যে-জ্ঞান গোলোকধাম প্রাপ্তির একমাত্র পাথেয়।

কাঁচা বাঁশ সহজে বেঁকানো যায়, কিন্তু পাকা বাঁশ বেঁকাতে গেলে ভেঙে যায়। তেমনি, ছোট বয়স থেকে কৃষ্ণকথা শ্রবণ ও কীর্তনের অভ্যাস করাতে পারলে শেষ বয়সে আপনা হতেই কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনের দিব্য রুচি সৃষ্টি হতে পারে। এই জন্য পাঁচ বছর বয়স থেকেই শিশু সন্তানদের কৃষ্ণভাবনাময় পরিবেশে কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনের সুযোগ-সুবিধা করে দিতে হয়—তাদের কৃষ্ণমন্দিরে নিয়মিত নিয়ে যেতে হয়, গৃহপরিবেশে কৃষ্ণভজনা, কৃষ্ণলীলা আলোচনা-পর্যালোচনার নিয়মিত আয়োজন করতে হয়, কৃষ্ণনাম ভজন-কীর্তনের ব্যবস্থা করতে হয়। তাতে মানুষের জীবনে শুদ্ধসাত্ত্বিক মানসিকতার সৃষ্টি হয় এবং সেই ধরনের মানসিকতাই ভগবদ্ভক্তির অনুকূল হয়।

বিজ্ঞানের যুগে আজ নানা রকমের যন্ত্রপাতি আর কলকজা সৃষ্টি হয়েছে বলে লোকে মনে করে ঐসব যন্ত্রের আনুকূল্যে তারা অফুরন্ত সুখ-শান্তির অধিকারী হতে পারবে। তা কিন্তু বাস্তবিক সত্যি নয়। বিজ্ঞানের কল্যাণে সমাজে যতই উন্নতি হোক, জরা ব্যাধি মৃত্যু থেকে কারও পরিত্রাণ নেই। আজকাল অনেক রকমের নতুন নতুন রোগ-ব্যাধি হচ্ছে, যা আগে দেখা যেত না। লোকে জানে না—ভবিষ্যতে আরও কত ব্যাধির প্রকোপ দেখা দেবে, মানুষ তাতে কষ্ট পাবে, মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করতে বাধ্য হবে।

এই জন্য প্রত্যেক মানুষেরই স্পষ্টভাবে জানার চেষ্টা করা উচিত—জন্ম কি, মৃত্যু কি, জীবন কি? পশুরা সকল বিষয়ে ভয় পায়, কারণ তারা এই সব তত্ত্ব জানে না। কিন্তু মানুষ ভয় করে না, কারণ সে এই সকল পারমার্থিক বিষয়ে যুগ যুগ ধরে আত্মানুসন্ধানের মাধ্যমে পরমতত্ত্ব আহরণ করতে পেরেছে।

দুর্লভ মানব তাই বুদ্ধিমান মানুষ জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধির রহস্য জানতে আগ্রহী হয়। এই রহস্যের মহাসিন্ধু পার হওয়াই মানব-জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য বলে তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষেরা যুগে যুগে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। এইজন্য বৈষ্ণব মহাজনেরা গেয়েছেন—

দুর্লভ মানব জনম সৎসঙ্গে
তরহ এ ভবসিন্ধু রে।

বর্তমান মানব-সভ্যতার কাণ্ডারী শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ এই বিষয়ে অভয় দিয়েছেন—কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদন করলে দুর্গম ভবসিন্ধু পার হওয়া সহজ হবে এবং জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধির আবর্ত থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব হবে।

জনপ্রিয় চিত্রাভিনেতা উত্তমকুমার অসুস্থ হয়েছিলেন, ডাক্তার বলে দিয়েছিলেন—তিনি বেশিদিন থাকবেন না, তাঁকে প্রস্তুত হতে বলেছিলেন। উত্তমকুমার বলেন, আমাকে আর কিছুদিন বাঁচতে দিন, বাঁচতে চাই।

ডাক্তার ভেবেছিলেন, তাঁর চিকিৎসায় উত্তমকুমার আরও কিছুদিন বেঁচে থাকতে পারবেন। উত্তমকুমার তবু হঠাৎ একদিন মারা গেলেন। ডাক্তার বললেন, অনেকবার ওঁকে তো বাঁচিয়েছি—এই একবারই ফেল হয়ে গেল!

জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধির অমোঘ বিধির কাছে ঐরকম সব ডাক্তারকেই ফেল করতে হয়।

ভগবদ্ভক্তরা জানেন—তাঁদের মৃত্যু হবে না। কারণ তাঁরা গীতা অনুধ্যান করে আন্তরিকভাবেই উপলব্ধি করেছেন যে, তাঁরা চিন্ময় জীবাত্মা—ন হন্যতে হন্যমানে—কেউ সেই আত্মাকে বধ করতে পারে না। ভক্ত তাঁর শরীর পরিত্যাগ করেন, নতুন জীবন লাভ করেন—তাঁর নিত্য ধামে ফিরে যান। তাঁর ভয়ের কি কারণ?

বাস্তবিকই গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়টি ভালভাবে পাঠ এবং মনোনিবেশ সহকারে অনুধ্যান করতে পারলে, যে কোনও প্রকৃত বুদ্ধিমান মানুষ উপলব্ধি করতে পারে যে, মৃত্যুর কোনও ভয় নেই—কোনও জীবাত্মার মৃত্যু হয় না।

পুণ্য সংগ্রহের মাস—মাঘ মাস

অশুভ কর্মফল থেকে মুক্ত হয়ে কৃষ্ণভাবনায় অগ্রসর হওয়ার জন্য নানা সুযোগ ভগবান তাঁর আশীর্বাদস্বরূপ আমাদের দিয়ে থাকেন। বছরে সেই রকম একটি সময় হল মকর সংক্রান্তির শুরুতে—মাঘ মাস।

তিনটি মাস বিশেষ মাহাত্ম্যপূর্ণ। যেমন বৈশাখ মাস হল বিষ্ণুর উপাসনার জন্য বিশেষ উপযুক্ত সময়। এই সময়ে থাকে নৃসিংহ চতুর্দশী, চন্দন যাত্রা ইত্যাদি নানা পূজাপর্ব। তারপর আসে কার্তিক মাস বা দামোদর মাস, যখন আমরা পূজাদি সহ কিছু কৃচ্ছ্রসাধন আয়ত্ত করি এবং বিশেষ কোনও কোনও খাদ্য বর্জন করে চলি।

আর তৃতীয় মাস হল মাঘ মাস—যখন ভক্তরা ভগবানের আরাধনা করে তাঁকে পুষ্পাদি নিবেদন করে থাকে। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে মাঘ মাসকে শ্রীমাধব বলা হয়েছে। কথিত আছে—"যদি বর্ষে মাঘের শেষ, ধন্য রাজার পুণ্য দেশ"। অর্থাৎ, মাঘ মাসের শেষে বৃষ্টি হলে সেটা খুবই শুভ লক্ষণযুক্ত। মাঘ মাসের শুক্ল পক্ষে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন। গৌর পূর্ণিমার সময়ে তিনি পৃথিবীতে প্রকটিত হন, কিন্তু এই পুণ্য মাঘ মাসেই তিনি তাঁর পিতামাতার শরীরে প্রবেশ করেন এবং তেরো মাস পরে ফাল্গুন মাসে তিনি ধরাধামে আবির্ভূত হন।

'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ে উল্লেখ আছে যে, পদ্মপুরাণের একটি উল্লেখযোগ্য শ্লোকে মহর্ষি বশিষ্ট রাজা দিলীপকে বলেছেন, "হে রাজন্, মাঘ মাসের সকালে স্নান করার অধিকার যেমন সকলেরই রয়েছে, ঠিক তেমনই ভগবদ্ভক্তি অনুশীলন করার অধিকার সকলেরই আছে।" পদ্মপুরাণের এই কাহিনীতে বর্ণিত রাজা দিলীপ কোনও সাধারণ রাজা ছিলেন না, তিনি ছিলেন সমগ্র পৃথিবীর সম্রাট। একবার তিনি উপযুক্ত পোশাকাদি পরে বনে গিয়েছিলেন শিকার করতে। শিকারের সমস্ত সরঞ্জাম, ধনুক, তরোয়াল, সাঙ্গপাঙ্গ, ঘোড়া ইত্যাদি নিয়ে তিনি যাত্রা করেন। ক্ষত্রিয়দের যুদ্ধ করাই ধর্ম। কিন্তু শান্তির সময়ে, যখন যুদ্ধ থাকে না, তখন বনে গিয়ে শিকার করার অনুমতি তাদের দেওয়াই আছে।

সেবার এক লোভনীয় জন্তুর পেছনে ধাওয়া করতে করতে রাজা দিলীপ গভীর অরণ্যে ঢুকে পথ হারিয়ে ফেলেন। বহুক্ষণ ঘোরাঘুরি করতে করতে

রাত ভোর হয়ে যায় এবং তৃষ্ণার্ত, শ্রান্ত হয়ে রাজা সুন্দর এক পদ্মদলশোভিত, পাখিদের গুঞ্জনমুখরিত বিশাল জলাশয়ের কাছে পৌঁছান। সেখানে সরিত মুনি ধ্যানমগ্ন ছিলেন। শীর্ণকায় তাঁর দেহ; তিনি নিরন্তর ভগবান বিষ্ণুর নাম কীর্তন করে চলেছিলেন। রাজা তাঁকে দর্শন করামাত্র শ্রদ্ধাভরে প্রণতি নিবেদন করেন। রাজাকে পরিশ্রান্ত দেহে ধূলিময় বস্ত্রাদিতে দেখে মুনি মন্তব্য করেন—এই পুণ্য মাঘ মাসের প্রাতে তুমি এখনও স্নান সম্পন্ন করনি! রাজা কৌতূহলবশত জানতে চান এমন আবশ্যকীয় স্নানের তাৎপর্য কি? এবং মুনির নির্দেশ অনুযায়ী রাজা বশিষ্ঠ মুনির কাছে যান পূর্ণাঙ্গ উত্তর পেতে। তিনি বলেন, বৈশাখ, কার্তিক ও মাঘ—এই তিন পুণ্য মাস অতিক্রান্ত হয়ে বসন্ত থেকে ক্রমে শীত ঋতু আগত হয়। পুণ্যপ্রার্থী এই সময়ে বহু পুণ্য লাভ করতে পারে, তার সমস্ত পাপ ধৌত হয়। তবে সমস্ত প্রক্রিয়াটাই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টিবিধানের উদ্দেশ্যে পালিত হওয়া উচিত।

হিমালয়ের মণিকূট পাহাড়ের ফল, ফুল, বনস্পতি সহ প্রাকৃতিক সম্পদের বিপুল শোভা বিলাসের মাঝে আবিষ্ট ভৃগু মুনির কাছে এক বিদ্যাধর-দম্পতি আসে। এবং কোনও কারণে তারা যে পারমার্থিক দিক দিয়ে উদ্বিগ্ন, তা প্রকাশ করে। ভৃগু মুনি বলেন, পুরো মাঘ মাসটা দিনে তিনবার স্নান করবে, বিশেষ করে সকালে। এইভাবে, চাঁদ যেমন কমতে কমতে একাদশী দশা প্রাপ্ত হয় এবং বৃদ্ধি পেতে পেতে পূর্ণিমাতে ষোল কলা পূর্ণ হয়, তেমনি তোমার পাপ হ্রাস পাবে এবং পুণ্য বৃদ্ধি পাবে।

আরও কাহিনী আছে যেখানে বর্ণিত হয়েছে চম্পক ফুলের দ্বারা পূজিত হলে বিষ্ণু কত খুশি হন। এক দুরাচারী রাজা ছিল, সে ছিল পাপী, শুচিক্রিয়া করত না, নিজের ক্ষমতার অপব্যবহার করত, বাছ বিচার বিহীনভাবে ইন্দ্রিয়তৃপ্তিতে মগ্ন হত, লোক ঠকাতো, ঘুষ নিত—মোটের ওপর সে এক অযোগ্য শাসক ছিল। প্রজারা তার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছিল, ফলে এক বিদ্রোহী দল গড়ে উঠল রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করবে বলে।

এই চারিত্রিক ইতিহাস যার, সেই রাজা একবার যায় তার এক বেশ্যা-বান্ধবীর সাথে দেখা করতে। মহিলাটি তার বাগানে এক চম্পক গাছের নিচে সুন্দর করে সাজানো বসার জায়গায় অপেক্ষা করে ছিল। কোনভাবে বিদ্রোহীরা এই সংবাদ পায় এবং তারা এই বাগানবাড়িটি ঘিরে ফেলে এবং সুযোগের ওৎ পেতে থাকে।

রাজা যখন গল্প করছিল, গাছ থেকে একটি চম্পক ফুল ঝরে পড়ে। এবং সেই মুহূর্তে রাজা বলে ওঠে "মুরারি পুষ্পক নারায়ণায় নমঃ"। ঠিক যেমন একটা গল্পে আছে—এক ফেরিওলা ঝুড়িতে করে খই নিয়ে যাচ্ছিল। এক দমকা হাওয়ায় সব খই উড়ে যায়। খইগুলো যখন বাতাসে রয়েছে, লোকটি চেঁচিয়ে বলে নিল, "উড়ো খই গোবিন্দায় নমো"। অর্থাৎ মাটিতে যতক্ষণ না পড়ছে ততক্ষণ অবধি তা শুদ্ধ আছে, বিক্রির লাভ যখন হলই না, শুদ্ধ থাকতে থাকতে গোবিন্দকে নিবেদনে লাভটুকু পেয়ে নেওয়া যাক। যখন সেটা কোনও কাজেই লাগছে না, তখন আমরা তা কৃষ্ণকে দিয়ে দিই। 'কিছু না'-এর থেকে তা-ই ভাল।

রাজা যেইমাত্র বলেছে, 'নারায়ণ, এই ফুলটি তোমার উদ্দেশ্যে দিলাম', ঠিক সেই মুহূর্তে বিদ্রোহীরা শোঁ করে একটা তীর ছুঁড়ল এবং তা গিয়ে বিঁধল সোজা রাজার বুকে। তৎক্ষণাৎ মৃত্যুকোলে ঢলে পড়ল রাজা। যমদূতেরা তাকে নিতে এল, কারণ সে ছিল পুরোপুরি অধার্মিক পাপাচারী নরাধম। বিষ্ণুদূতেরাও এল, তারা বলল, 'ঠিক কথা, কিন্তু মৃত্যুকালে ওর শেষ কথা ছিল বিষ্ণুর নাম। এই পুণ্য মাঘ মাসে সে বিষ্ণুকে একটি পুষ্প অর্পণ করেছে এবং বিষ্ণুর নাম উচ্চারণ করে দেহ ত্যাগ করেছে।' যমদূতেরা প্রতিবাদ করে বলল, 'ও তো নিষ্ঠার সাথে কিছু করেনি।'

বিষ্ণুদূতেরা সেই কথায় কর্ণপাত না করে রাজার আত্মাকে নিয়ে বৈকুণ্ঠে, বিষ্ণুলোকে চলে গেল। সেখানে ভগবান বিষ্ণু দু'বাহু প্রসারিত করে, 'আমার প্রিয় ভক্ত, এস', বলে রাজাকে অভিনন্দন জানালেন। রাজা ভাবছে, 'আমি? ভক্ত?' বিনয়ের সাথে বলল, 'আমি এত শুদ্ধ হতে পারলাম কই?' বিষ্ণু বললেন, না, না, তুমি আমায় আমার প্রিয় চম্পক ফুল অর্পণ করেছ। পুণ্য মাঘ মাসে যে এই কাজ করে, আমার কাছে আসার পথ তার কাছে অতি সহজ হয়ে যায়। তারপর মৃত্যুকালে তোমার মুখের শেষ কথা ছিল আমারই নাম। অন্তিম মুহূর্তে যে আমার নাম নিতে পারে সেও আমাকেই প্রাপ্ত হয়।'

রাজা বুঝল, ভগবান বড়ই করুণাময়। যদিও আমি যোগ্য নই, তবু সুযোগ তো একটা পেয়েছি। এই ভেবে সে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করল। হৃদয়ে সে এক পরিপূর্ণ পরিবর্তন অনুভব করল। ফলে ভগবান তাকে আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরলেন এবং সে সম্পূর্ণ শুদ্ধতা অর্জন করল।

সুতরাং এই মাঘ মাসে সামান্য একটা ফুল নিবেদনেরও কত বিশাল পাওনা থাকে। তাই এটি একটি বিশেষ মাস।

তবে ভক্তরা নিত্যের খদ্দের। তারা সব মাসেই ভগবানের কৃপা লাভ করে থাকে। অতএব এটি হল নবাগতদের আকৃষ্ট করার একটি পন্থা। প্রকৃতপক্ষে, ভক্তরা সব রকম আচার-অনুষ্ঠানই সব মাসে করে থাকে—এবং তারা তা করে শুধুমাত্র শ্রীকৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্য নিয়ে।

বর্তমান সঙ্কট মোচনে শ্রীগৌরাঙ্গই ভরসা

পরম পুরুষোত্তম ভগবানের কথা সদাসর্বদা শ্রবণ-কীর্তন করতে থাকলে সাধু-সজ্জন মানুষের সকল জাগতিক দুঃখ-দুর্দশার লাঘব হয়, কারণ ভগবানের চিন্তার মধ্যে থাকে তাঁর দিব্য লীলার অমৃত আস্বাদন। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের মাধ্যমে শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ সেই আস্বাদনের প্রতি সাধু-সজ্জন মানুষদের আগ্রহী করে তুলতে চেয়েছেন। যাঁরা বাস্তবিকই সাধু-সজ্জন এবং প্রকৃত অর্থে জড়জাগতিক দুঃখকষ্ট থেকে অব্যাহতি পেতে চান, তাঁরা ভগবানের লীলা-মাহাত্ম্য ছাড়া অন্য কোনও বিষয়ে কখনই চিন্তা করেন না, বা কথা বলতে চান না।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর ভক্তবৃন্দ সম্পর্কে সদাসর্বদা আগ্রহ-আকুলতা থাকলে জড়জাগতিক দুঃখ-দুর্দশার পীড়ন আর তেমনভাবে দেহ-মনের ওপরে দৌরাত্ম্য করতে সাহস পায় না। কারণ সেগুলি হল মায়ার প্রবঞ্চনা মাত্র, তাই যখনই কোনও মানুষ কৃষ্ণকথা আর কৃষ্ণচিন্তার আশ্রয় নেয়, তখনই মায়াময় দুঃখ-দুর্দশার অনুভূতি কোনো এক দিব্যভাবের স্পর্শে দুর্বল হয়ে পড়ে।

এই হল কলিযুগে জীবনের সকল দুঃখ-কষ্ট নির্মূল করবার রহস্য। আধুনিক সমাজে নানা ধরনের ওষুধপত্র আবিষ্কার করা হচ্ছে, কিন্তু প্রকৃতিও নিত্য নতুন রোগব্যাধির ক্লেশ নিয়ে মায়াময় প্রবঞ্চনা সৃষ্টি করছে। দুঃখ কষ্টের সীমা নেই।

কিন্তু এই সমস্ত কিছুরই উর্ধ্বে চলে যাওয়ার অতি সহজ পন্থা রয়েছে, সেই পন্থা মোটেই কঠিন নয়, তা হল—কেবলমাত্র পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্যলীলা এবং অপ্রাকৃত কার্যকলাপের চিন্তায় মনকে সদাসর্বদা

ভরিয়ে রাখা, শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধ ভক্তদের কার্যকলাপ আর চিন্তাধারায় মগ্ন হয়ে থাকা।

অন্তত প্রতিদিন দু'এক ঘণ্টা করে কৃষ্ণভাবনাময় গ্রন্থ চর্চা করা মোটেই দুঃসাধ্য ব্যাপার নয়, অথচ তা করতেই অনেকে সময় পায় না বলে বৃথা আক্ষেপ করে থাকে। কিন্তু আজেবাজে খবরের কাগজ আর ম্যাগাজিনগুলো দূরে ফেলে রেখে সেই সময়টা কৃষ্ণকথা শ্রবণ বা পাঠ করলে আপনা হতেই কৃষ্ণকথায় রুচি জাগতে থাকবে। আমরা যতই কৃষ্ণকথা শুনব, ততই ভাল লাগবে। রুচি তৈরি করে নিতে হবে, কারণ এটা তো ভাল রুচি—এমন একটা সাত্ত্বিক রুচি, যার চর্চা থেকে ভগবদ্ভক্তি জাগে, যে-ভক্তিভাব সকল সঙ্কট মোচনে সহায়তা করে। তাই শ্রীমদ্ভাগবতে (১/২/১৮) পরামর্শ দেওয়া হয়েছে—নিত্যং ভাগবতসেবয়া। প্রতিদিন শ্রীমদ্ভাগবতের অমৃত আস্বাদন করতে হবে শ্রবণ কীর্তনের মাধ্যমে। শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত বাণীসম্ভার, আর শ্রীমদ্ভাগবত হল ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় তত্ত্ব ও লীলাবিলাস কাহিনীসম্ভার।

অতএব গীতা-ভাগবত থেকে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা শ্রবণ করলে, কৃষ্ণভাবনাময় গ্রন্থাবলী থেকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মাহাত্ম্য অনুধাবন করলে আমরা বাস্তবিকই সমস্ত রকমের দুঃখ-কষ্টের গণ্ডি অনায়াসে অতিক্রম করে যেতে পারি।

কারণ, কৃষ্ণভাবনা অনুশীলনের ফলে আমাদের মন এই জড় জগতের সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার জটিলতা থেকে অন্য এক জগতে উত্তীর্ণ হয়ে যায় বলেই সব দুঃখ ভুলে যেতে পারি—মনপ্রাণ তখন এক নিত্য আনন্দে ভরে ওঠে এবং সেই আনন্দের শক্তি এমনই যে, সমস্ত দুঃখ-কষ্ট তার প্রভাবেই তুচ্ছ হয়ে যায়। সেই আনন্দ চিন্ময় জগৎ থেকে আমাদের সত্তার মধ্যে নেমে আসে।

সুতরাং আমাদের শুধু মনস্থির করে নিতে হবে—চিন্ময় আনন্দ লাভের পথে মনকে এগিয়ে দেব কি না। একবার মন ঠিক করে সেই পথে এগুতে থাকলেই শক্তি জাগতে থাকবে। কিন্তু পথিমধ্যে অধীর হলে চলবে না। অস্থিরতা জাগলে, আরও বেশি করে শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক কাহিনী শ্রবণ কীর্তনে মন দিতে হবে, আরও বেশি করে ভক্তিসেবা অনুশীলন করতে হবে। পারমার্থিক জীবনচর্যার সেটাই হল সংজ্ঞা—

ধর্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্‌সেনকথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্‌যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্‌॥

(ভাঃ ১/২/৮)

যখনই আমরা আগ্রহ সহকারে ভক্তি বিষয়ক কথা শুনি, তখনই আমাদের পারমার্থিক জীবনচর্যা যথাযথভাবে এগিয়ে চলে। যদি আগ্রহ না জাগে, যদি আকুলতা না জাগে, তা হলে বুঝতে হবে আমরা এখনও ভক্তিমার্গের কনিষ্ঠ পর্যায়ে রয়ে গেছি।

অতএব শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু যে কৃষ্ণভাবনার ধারা বয়ে এনেছেন, শ্রীল প্রভুপাদ এবং অগ্রণী ভক্তগণ যে কৃষ্ণভক্তির প্রসার করতে চেয়েছেন, তার তাৎপর্য এইভাবে উপলব্ধি করতে হবে। গৌরপূর্ণিমা উৎসবের সময়ে ভক্তরা পরিক্রমায় বেরিয়ে কত কষ্ট পান। কিন্তু যখন আমরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মহিমা শ্রবণ করি, সেই মুহূর্তে আমরা সমস্ত কষ্টকর পরিবেশটা ভুলে যাই। পরিক্রমা থেকে ফিরে এসে আমাদের মুখে হাসি ফোটে। কারণ আমরা অপ্রাকৃত জগতের আনন্দ আস্বাদন করে ফিরে আসি।

নবদ্বীপে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য যখন দেখেছিলেন মানুষ ইন্দ্রিয় সুখভোগে মত্ত হয়ে পারমার্থিক আনন্দরসের আস্বাদন থেকে বঞ্চিত হয়ে আছে, অথচ তারা সবাই জড়জাগতিক দুঃখ-দুর্দশায় নিমজ্জিত হয়ে রয়েছে, তখন তিনি স্বয়ং মহাবিষ্ণুর অংশপ্রকাশ হলেও চিন্তা করেছিলেন, ঐসব বিভ্রান্ত মানুষকে পাণ্ডিত্যের সঙ্কট থেকে উদ্ধার করার জন্য শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির আস্বাদন দিতে পারেন একমাত্র স্বয়ং ভগবান। তাই তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের প্রার্থনা জানিয়ে 'গৌরাঙ্গ, গৌরাঙ্গ' বলে কেঁদেছিলেন, তপস্যা করেছিলেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, বিভ্রান্ত মানুষের সঙ্কট মোচনে শ্রীগৌরাঙ্গই একমাত্র ভরসা।

বাস্তবিকই, সঙ্কটকালে ক্লেশমুক্তির উদ্দেশ্যে ভগবদ্ভক্তি অর্জন করতে হলে, শুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম লাভ করতে হলে, স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর ভক্তমণ্ডলীর অহৈতুকী কৃপা অবশ্যই অর্জন করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং শুদ্ধ ভক্তি প্রদান করতে বিশেষ আগ্রহী নন। কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ধরাধামে মহাবদান্য শ্রীগৌরাঙ্গ অবতাররূপে অবতীর্ণ হয়ে সেই শুদ্ধ ভক্তি অকাতরে বিতরণ করে গেছেন—

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেম প্রদায়তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্য নাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥

তাই শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর ভগবদ্ভক্তি বিষয়ক উপদেশাবলী অতি সহজেই আমরা মেনে চলতে পারি এবং সকল যুগেরই জড়জাগতিক সঙ্কট মোচনের কাজে লাগাতে পারি। যদি আমরা শ্রীগৌরাঙ্গদেবের পদাঙ্ক অনুসরণ করার উদ্দেশ্যে আমাদের জীবন-ধন সব উৎসর্গ করে দিতে পারি, তা হলে সর্ব সঙ্কট মোচনের মহৌষধ যে ভগবদ্ভক্তি, তার ভাবোল্লাসময় সুলক্ষণগুলি সবই একে একে আমাদের মধ্যে জেগে উঠতে পারে।

বাস্তবিকই, কৃষ্ণপ্রেম অর্জন করা জন্মজন্মান্তরের সাধনা। কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অচিরেই তা আমাদের নাগালে এনে দেন। সারা জগতের সঙ্কট মোচনের জন্য, সমস্ত মানুষকে ভগবদ্ভক্তির পথে অতি সহজে আকৃষ্ট করার জন্য, তিনি যে সংকীর্তন আন্দোলনের পরিকল্পনা করেছিলেন, তা সহজলভ্য, অথচ আশু ফলপ্রদ।

ইতিহাসে দেখি, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ১৪৮৬ সালে আবির্ভূত হন আর ১৪৯২ সালে কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করলেন—এটা কোনও আকস্মিক ব্যাপার বলে আমি মনে করি না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রকটকালেই আমেরিকা আবিষ্কার হল, আর সেই আমেরিকাতেই শ্রীগৌরাঙ্গের নামকীর্তন আন্দোলন প্রসারে ১৯৬৫ সালে গিয়েছিলেন শ্রীল প্রভুপাদ এই গৌরভূমি ভারতবর্ষ থেকে। শ্রীল প্রভুপাদের জয় হোক! তিনি আমেরিকা থেকে আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিনিধি হয়ে সারা পৃথিবীতে গৌরাঙ্গবাণী প্রচারে বেরিয়ে পড়েছিলেন—গিয়েছিলেন ইউরোপে, অস্ট্রেলিয়াতে, হংকং-এ, আফ্রিকায়, রাশিয়ায়। এ সবই শ্রীগৌরাঙ্গের দিব্য পরিকল্পনা মতোই হয়েছে, তা মানতেই হবে।

আমরা যদি শুধুই সুখ-শান্তি অর্জনের দিকে ঝুঁকে পড়ি, কিছুটা জড়জাগতিক স্বাচ্ছন্দ্যকেই আঁকড়ে থাকতে চাই, তা হলে আমাদের শুদ্ধ অমৃতের আস্বাদন থেকে, কৃষ্ণভাবনামৃত থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকতে হবে। আর তার ফলে আমাদের মন হবে চঞ্চল—ঐসব অনিত্য সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বাসনা থেকেই জাগবে আমাদের চাঞ্চল্য।

কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গবাণী অনুসরণ করে আমরা যদি শ্রীকৃষ্ণভক্তি অর্জনের উদ্দেশ্যে, ভগবদ্-প্রেমের সন্ধানে আত্মনিয়োগ করি, তা হলে আপনা থেকেই আমাদের অপ্রাকৃত সুখ-শান্তি আসবে। যে কোনও অবস্থাতেই আমরা থাকি না কেন, কৃষ্ণভাবনা চর্চা করার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের মাঝে প্রকৃত সুখের উন্মেষ ঘটতে থাকবে, সে-বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই।

আসলে, ভগবদ্ভক্তি চর্চার মধ্যে যে প্রকৃত সুখের আস্বাদন রয়েছে, তারই সন্ধান করছে প্রত্যেকে, কিন্তু যথাযথ আগ্রহের স্বল্পতায় এবং শুদ্ধ ভক্তের কৃপার অভাবে, অনেকে তা অর্জন করতে পারছে না।

অথচ শ্রীগৌরাঙ্গদেব প্রবর্তিত হরেকৃষ্ণ সংকীর্তন যজ্ঞের মাধ্যমে কলিযুগের সব রকম সঙ্কট আর বিপর্যয়ের মুখোমুখি হওয়া যায়, একথা শ্রীল প্রভুপাদ বিশ্বব্যাপী অগণিত মানুষকে আজ বোঝাতে পারলেও, এখনও বহু লোক দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে রয়েছে। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গেই বলেছেন, সুখী হতে হলে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানের উদ্দেশ্যে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করতেই হবে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রীত হলে তাঁর কাছ থেকেই দিব্য সুখের ধারা সবার ওপরে নেমে আসবে।

শ্রীল প্রভুপাদ বলেছিলেন, ভগবদ্ভক্তি চর্চায় আগ্রহী হতে হলে চিন্ময় ভাবনার একটা ক্ষুধা থাকা চাই। কেবল মনে মনে ভাবলেই হয় না, লোক দেখানো অনুকরণ করলেই চলে না। সত্যিকারের আকুলতা, যথার্থ পিপাসা, কৃষ্ণলীলার অমৃত আস্বাদনে তীব্র ক্ষুধা জাগাতে হবে। হরেকৃষ্ণ সংকীর্তন আন্দোলন সারা পৃথিবীতে নানাভাবে সার্থকতার মাধ্যমে সেই কাজ করে চলেছে। কারণ এ ছাড়া মানুষকে সমূহ বিপর্যয় থেকে রক্ষা করার অন্য কোনও পন্থা নেই। আজ সে-কথা ধীরে ধীরে পৃথিবীর অধিকাংশ রাষ্ট্রনায়কেরাই মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছেন।

শ্রীগৌরাঙ্গের সংকীর্তন আন্দোলন যুগসঙ্কট নিরসনের প্রামাণ্য এক পন্থা আর শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ সেই পন্থা অবলম্বন করেই বিদ্যুৎ গতিতে লক্ষ লক্ষ কপি কৃষ্ণগ্রন্থাবলীর প্রচার মাধ্যমে অগণিত মানুষের অন্তরে সত্যি সত্যিই কৃষ্ণপ্রেম-পিপাসা জাগিয়ে তুলতে পেরেছেন। আমরাও পরম নিষ্ঠাভরে সেই পন্থা অনুসরণ করে চলেছি।

শ্রীগৌরাঙ্গ-চরণে প্রণত হয়ে তাঁর কাছে দুঃখজর্জরিত আমাদের সকলকেই প্রার্থনা জানাতে হবে, "হে মহাপ্রভু, আপনার চরণে আমরা আত্মসমর্পণ করলাম, আপনার চরণধূলিকণারূপে আমাদের ঠাঁই দিন—আপনার সংকীর্তন আন্দোলনে আমাদের যুক্ত করুন—আমাদের আর কোনও বাসনা নেই!"

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।

(শ্রীশিক্ষাষ্টক)

তাঁরই ভাষায় বলতে হবে—"আপনার চরণসেবা ছাড়া আমাদের আর কোনই বাসনা নেই, ধনজন স্ত্রী পুত্র ঐশ্বর্য কিছুই চাই না—এই হোক শ্রীগৌরপূর্ণিমার শুভ আবির্ভাব তিথিতে আপনার আশীর্বাদ—কারণ আপনার চরণে আমরা পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করেছি।"

এর মধ্যে কোনই বোঝাপড়া কিংবা আপস-রফা চলবে না। শুদ্ধ জীবনচর্যার মান উন্নত রাখতেই হবে, শ্রীল প্রভুপাদ সেই কথা আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন। প্রত্যেকটি ব্যক্তিকে শ্রীগৌরাঙ্গদেব প্রদর্শিত, তাঁর 'শিক্ষাষ্টকে' বাণীবদ্ধ নির্দেশ মেনে সহজ সরল জীবনচর্যায় অনুপ্রাণিত হতেই হবে—সঙ্কট মোচনের সেটাই একমাত্র ভরসা।

এই গৌরাঙ্গ-বাণী যে স্বয়ং ভগবানেরই বাণী, তার প্রমাণ অনেক আছে, তবে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী প্রমাণ গাথা রয়েছে শ্রীমদ্ভাগবতেই—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাহকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥

(ভাঃ ১১/৫/৩২)

শ্রীল জীব গোস্বামী এই শ্লোকটির বিশ্লেষণ করে বলেছেন, শ্রীকৃষ্ণ গৌরকান্তি ধারণ করে অবতীর্ণ হবেন। সেই গৌরাঙ্গ শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, যাঁকে বুদ্ধিমান মানুষেরা এই যুগে আরাধনা করে থাকেন। সেই আরাধনায় শ্রীকৃষ্ণের নাম-সংকীর্তন প্রাধান্য লাভ করবে। কারণ কলিযুগে ব্যাপকভাবে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রবর্তিত হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রই মানুষের একমাত্র ভরসা।

রাধাকৃষ্ণের মিলিত তনু হলেন শ্রীগৌরাঙ্গ

রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি।
অন্যোন্যে বিলাসে রস আস্বাদন করি ॥

"শ্রীমতী রাধারাণী এবং শ্রীকৃষ্ণ এক ও অভিন্ন। কিন্তু তাঁরা পৃথক দুটি দেহ ধারণ করেছেন। এভাবেই তারা পরস্পরের প্রেমরস আস্বাদন করেন।"

এই শ্লোকের তাৎপর্যে শ্রীল প্রভুপাদ বলছেন এই শ্লোক স্বরূপ দামোদরের কড়চা থেকে তোলা হয়েছে। বলা হয়েছে—রাধা-কৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি। দুজনেই এক। একজন শক্তিমান এবং একজন শক্তি। ভগবান এবং

তাঁর শক্তি অভিন্ন। "অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্ব" যেভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উপদেশ দিয়েছেন অচিন্ত্য তত্ত্ব, কিভাবে ভগবান এবং তাঁর শক্তি ভেদ ও অভেদ। অন্তরঙ্গা শক্তি তিন প্রকার বর্ণনা করা হয়েছে—সৎ, চিৎ এবং আনন্দ। সৎ হচ্ছে অস্তিত্ব। বিভিন্ন জগৎ রয়েছে—জড় জগৎ, চিন্ময় জগৎ, ব্রহ্মজ্যোতি। ভগবানের বিভিন্ন লীলা প্রকাশ ভগবানের সৎ শক্তিকে আরও বিকাশ করে সেটা হল চিৎ বা সম্বিত। পূর্ণ জ্ঞান ভগবানের বহু রূপ আছে মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, বিভিন্ন লীলাবতার, বৈকুণ্ঠে বিভিন্ন নারায়ণ আছেন, ভগবানের বৈভব প্রকাশে এইভাবে বিভিন্ন রূপ থাকে ভগবানের এবং সম্বিত শক্তি থেকে সেই সব রূপ বিকশিত হয়। শক্তি যখন শক্তিমান বা ভগবানকে আনন্দ দান করেন তখন সেই শক্তিকে বলা হয় হ্লাদিনী শক্তি। সৎ শক্তি, সম্বিত বা চিৎ শক্তি, হ্লাদিনী বা আনন্দদায়ী শক্তি। এইভাবে ভগবানের শক্তির তিনটি ভাগ আছে। আমাদের শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে জানতে হলে রাধা-কৃষ্ণকে জানা দরকার। কৃষ্ণ প্রকাশ করেন রাধা। কৃষ্ণ পুরুষ, রাধা শক্তি। শক্তিমান এবং শক্তি। এক আত্মা দুটো দেহ, মনে হচ্ছে রাধার আনন্দ বেশী। রাধার আনন্দ যে পায় সে কৃষ্ণকে সেবা করে। কৃষ্ণ তো আনন্দ পাচ্ছেন। তার চেয়ে কৃষ্ণের সেবা করে রাধা আরও বেশী আনন্দ পাচ্ছেন। এজন্য কৃষ্ণ ঐ আনন্দকে আস্বাদন করার জন্য রাধার ভাব অঙ্গীকার করে কলিযুগে গৌরাঙ্গ রূপে আবির্ভূত হলেন। এই নবদ্বীপ ধাম রাধারাণী তৈরি করলেন। এখানে ভগবানের সেবা ভাব প্রধান এবং ভগবান যখন এখানে আসেন তিনি সেবা ভাব নিয়ে আসলেন এবং তাঁর ভাব ভগবানের সেবা করা। বৃন্দাবনে কৃষ্ণ তো প্রভু। কৃষ্ণ পুরুষ, তিনি লীলা করেন। সবাই কৃষ্ণের সেবা করে। কিন্তু কৃষ্ণ যখন এখানে আসলেন তখন রাধারাণীর ভাব অনুশীলন করে কৃষ্ণকে সেবা করলেন। কৃষ্ণ কৃষ্ণকে সেবা করে। গৌরাঙ্গের লীলা বুঝতে হলে রাধা-কৃষ্ণের মহিমা জানা দরকার। প্রভুপাদ বলছেন যে ভক্তরা রাধা-কৃষ্ণের অন্তরঙ্গ লীলা বুঝতে পারেন। কিন্তু যারা মায়াবাদী তারা সহজে বুঝতে পারে না। মায়াবাদী যদি এক মহা ভাগবৎ ভক্তের সাহায্য না পায় তারা বুঝতে পারবে না। কেননা মায়াবাদী মনে করে যে ভগবানের রূপ এই জড় জগতের শক্তি মতো। তারা জানে না ভগবানের একটি চিন্ময় রূপ আছে। তারা মনে করছে নিরাকার হচ্ছে প্রধান। আর সেই নিরাকারটিকে ভগবানের সত্ত্বগুণে ভগবানের কোন একটা রূপ প্রকাশ করেন। কেননা পরমব্রহ্মের কোন রূপ তো থাকতে পারে না। এই হচ্ছে তাদের ভুল ধারণা।

একবার আমি মুম্বাই এয়ারপোর্টে বসেছিলাম, একটা সাদা কাপড় পরা বিধবা বয়স্ক মহিলা আমার পাশে এসে বসে বলে 'আপনার মন্দিরটা খুব ভালো। কিন্তু আসলে আমি বুঝতে পারি না কেন আপনারা বিগ্রহ পূজা করেন। পরমব্রহ্ম তো নিরাকার। তাহলে আকার ধরে পূজা করেন কেন। আমি আপনার লাইফ মেম্বার।' আমি অবাক হয়ে গিয়েছি। লাইফ মেম্বার হয়ে কোন মায়াবাদী ওনাকে বলে যে নিরাকার হচ্ছে প্রধান। সেইজন্য তারা রাধা-কৃষ্ণের মহিমা বুঝতে পারে না। হয়তো তারা মনে করতে পারে যে রাধাকৃষ্ণ জড়জাগতিক কোন ব্যাপার। কিন্তু তা নয়, রাধা-কৃষ্ণ চিন্ময় বস্তু। প্রভুপাদ একবার আমাকে জগন্নাথপুরী পাঠিয়েছিলেন কিভাবে ইসকনের বিদেশী ভক্ত জগন্নাথ মন্দিরে প্রবেশ করে জগন্নাথের দর্শন পাবে। আমি মিনিস্টারের অফিসারকে বলেছি। তিনি বললেন আমার তো কোন ক্ষমতা নেই, আমি রামকৃষ্ণ মিশনে থাকি। রামকৃষ্ণ মিশনে গেলাম, ওনারা বলছে যে আমাদের কথায় চলে না। পুরীর শঙ্করাচার্য হচ্ছেন এখানকার গুরু, উনি যদি অনুমতি দেন তাহলে আপনারা যেতে পারবেন, আপনি তার কাছে যান। তার কাছে গেলাম, উনি অবশ্য মহারাজ, সন্ন্যাসী। তার পাশে অষ্টধাতুর তৈরি রাধা-কৃষ্ণ বিগ্রহ ছিল। আমি চিন্তা করলাম ইনি মায়াবাদী আবার রাধাকৃষ্ণ! মনে পড়েছে শ্রীল প্রভুপাদও বলেছেন যে, মায়াবাদীদের পথ খুব শুকনো পথ। সেই জন্য অনেক সময় রাধা-কৃষ্ণ লীলা বলে, রাধাকৃষ্ণ পূজা করে। কিন্তু আসলে রাধাকৃষ্ণকে বোঝার জন্য তাদের অধিকার নেই। কেননা ভক্ত নয়, কিন্তু কিছু রস পাওয়ার চেষ্টা করছে। আমি গেলাম এবং বললাম, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন "পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম, সর্বত্র প্রচারিত হইবে মোর নাম"। এখন সারা পৃথিবীতে গৌরের নাম কীর্তন করে এমন অনেক ভক্ত আছে। শ্রীচৈতন্যদেব সেই ভবিষ্যৎ বাণী জগন্নাথপুরীতে বসে বলেছিলেন। আমার গুরুদেব চান যে ওনার শিষ্য ভক্ত যাতে জগন্নাথদেবের দর্শন পায়। সেই শঙ্করাচার্য সন্ন্যাসী বলছে ঠিক আছে দর্শন পাবে, সারা জীবন ভগবানের সেবা কর, ধর্ম কর। যখন মরে গিয়ে পরের জন্মে হিন্দু হবে তখন জগন্নাথের দর্শন পাবে। দেখছি যে ওনার সঙ্গে কথা বলা বেকার হচ্ছে। আমি বললাম যে, আপনি রাধাকৃষ্ণকে পূজা করেন? বলল যে হ্যাঁ, আমিইতো রাধাকৃষ্ণ। আমি রাধাকৃষ্ণকে পূজা করি, তার অর্থ হল আমি আমাকেই পূজা করছি। আমি বললাম যে রাধা-কৃষ্ণ যুগলকিশোর কত সুন্দর সুন্দরী, আর আপনি দাড়িওয়ালা। তিনি বললেন যে, হ্যাঁ আমি সুন্দর নই, কিন্তু এ আমার

লীলা। আমি বললাম, এরকম লীলাতো সবাই করছে। সবাই বৃদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। তারা যুগল, নিত্য যৌবন, আপনি যদি সেরকম হতেন তাহলে কিছুটা বিশ্বাস হতো। কিছুই বুঝে না রাধাকৃষ্ণের সেবা ব্যাপারে। এখন যিনি শঙ্করাচার্য আছেন তার কি মত তা আমি জানি না। খবর পাওয়া গেছে যে, ওদেরকে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ বলেছে যে, ইসকনের ভক্তদের জগন্নাথ মন্দিরে যেতে দেওয়া উচিত। তো আমাদের সারা পৃথিবীতে শত শত জগন্নাথ, বলদেব, সুভদ্রা মন্দির আছে। ১০০ এর উপরে রথ হচ্ছে।

রাধাকৃষ্ণকে বুঝতে হলে কৃষ্ণভক্ত হতে হবে। একটা উদাহরণ আছে একটা গ্লাসের বোতলে মধু ছিল। মৌমাছি এই মধুর ঘ্রাণ পেল, মৌমাছি বুঝতে পারছে না যে সেটা কাঁচ। বাইরে থেকে দেখছে কাঁচে মধু, তো সে মনে ভাবল যে আমি মধুতে লাফ মারব। কিন্তু মাথা লেগেছে কাঁচে, কি হল! এত শক্ত মধু। একবার, দুবার, তিনবার এভাবে বার বার চেষ্টা করছে, তো মাথা ঘুরাচ্ছে। তখন বোতলের উপরের টুপিটাতে বসে পড়ল এবং পুরো ঘ্রাণ নিল এবং ভাবল যে হ্যাঁ, এবার মধু খেয়েছি। তখন মাথা তার ঘুরছে, তাই সে বুঝতে পারেনি যে মধু তো পাইনি, মধুর ঘ্রাণ পাচ্ছি। মায়াবাদীরা হচ্ছে এরকম, তারা রাধাকৃষ্ণের রস পেতে চায়। বার বার চেষ্টা করছে কিন্তু বুঝতে পারছে না। কারণ তাদের ধারণা তো ভুল-ভগবান নিরাকার। কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ। তাঁর শক্তি প্রকাশ হয় তার সেবা করার জন্য, সেটা মায়াবাদীরা বুঝতে পারেনা। তারা মনে করে বুঝতে পেরেছি, কিন্তু বাস্তবে তারা কিছুই বুঝতে পারেনি। যারা বুঝতে চায় তাদের ভক্তিযোগ করতে হবে, শুদ্ধ ভক্তের কাছে শুনতে হবে। শুদ্ধ ভক্ত জানে রাধা ও কৃষ্ণ নিত্য চিন্ময় বস্তু।

রাধারাণী চায় কৃষ্ণকে পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট করতে আর কৃষ্ণ চায় তার প্রিয় ভক্ত শ্রীমতী রাধারাণীকে খুশি করতে, দুজনের মধ্যে প্রতিযোগীতা। অনন্য ভক্ত কৃষ্ণকে সবসময় জয় করতে পারে এবং কৃষ্ণ একটু আশীর্বাদ দিল কিন্তু রাধারাণী এত সুদক্ষা তিনি কৃষ্ণকে অনেক সময় জয় করেন। একবার কৃষ্ণ লুকিয়ে গেছেন গোপীদের থেকে, আর গোপীরা খুঁজছে কোথায় কৃষ্ণ? কোথায় কৃষ্ণ? দেখছেন কৃষ্ণ একটা পাথরের উপর বসেছিলেন। সেখানে কৃষ্ণকে দেখে সবাই গিয়েছে কৃষ্ণের কাছে আর কৃষ্ণ ভাবছেন আরতো পালাতে পারবো না। কৃষ্ণ তখন চতুর্ভুজ রূপ ধারণ করেছেন, গোপীরা বলছেন ও এতো কৃষ্ণ নয়, নারায়ণ। সাধারণত কোন ভক্ত যদি নারায়ণ দেখতে পায় সে মনে ভাবে তার জীবন সার্থক হয়ে গেছে নারায়ণ দর্শন হয়ে গেছে। কিন্তু গোপিকারা নারায়ণ

দর্শন করেও ভাবছে কোথায় কৃষ্ণ। এক গোপী প্রণাম করে বলছে কৃষ্ণ কোথায় পালিয়ে গেছে। যখন রাধারাণী এসেছেন, তখন কৃষ্ণের চতুর্ভুজ দেখতে পাচ্ছে না। রাধা-কৃষ্ণ ভিন্ন, তো রাধার ইচ্ছা কৃষ্ণকে খুশি করা, কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করা। রাধাকে দেখে কৃষ্ণ চতুর্ভুজ রূপ রাখতে পারলেন না, দ্বিভুজ হলেন। রাধারাণীর জয় হলো।

কুরুক্ষেত্রে রাধারাণীর সঙ্গে যখন কৃষ্ণের মিলন হলো, রাধারাণী সেখানেই খুশি হলেন না। এই রাজ পোশাক, হাতি ঘোড়া। বৃন্দাবনে যে আনন্দ আছে এখানে তার একঅংশও নেই। আমরা কৃষ্ণকে নিয়ে যাব বৃন্দাবনে। সেখানে কেলি কদম্ব যমুনার তীরে সেই সব গাছের দিকে তাকালে আনন্দ পাবে। ঐভাবে রথযাত্রা শুরু হলো। কৃষ্ণকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে যমুনার তীরে বৃন্দাবনে।

যদি কেউ মনে করে যে রাধাকৃষ্ণের লীলা জড় জগতের স্ত্রী পুরুষের সম্পর্কের মতো, তবে তা মহা অপরাধ। বাইরে হয়তো সেরকম দেখতে কিন্তু গভীর ভাবে দেখলে সেরকম নয়। রাধা কৃষ্ণের সমস্ত লীলা আমাদের মনে রাখতে হবে, এগুলো হচ্ছে সচ্চিদানন্দ ব্যাপার, জড় জগতের ব্যাপার নয়। আজকের শ্লোকে আমরা রাধা-কৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ, রাধা কৃষ্ণ থেকে প্রকাশিত। অন্তরঙ্গা শক্তি রাধারাণী হচ্ছে মহামায়ার উৎস, সেইজন্য রাধারাণী মায়ার দ্বারা আবদ্ধ হতে পারে না। আমরা জীব শক্তি, আমরা রাধার থেকে আণবিক শক্তি, তাই আমরা মায়ার মধ্যে পড়তে পারি। আমরা যদি অন্তরঙ্গা শক্তির আশ্রয় পাই তবে ভগবানের নিত্য সেবায় যুক্ত হতে পারবো। আমরা যদি অন্তরঙ্গা শক্তির আশ্রয় ছেড়ে দিয়ে বহিরঙ্গা শক্তির আশ্রয়ে থাকি, তবে আমরা মায়ামগ্ন জীব হয়ে থাকবো। আমরা রাধারাণীর কৃপার প্রভাবে কৃষ্ণকে সেব্য রূপে দেখছি যেইভাবে শ্রীচৈতন্যদেব সেবা করলেন। কৃষ্ণপ্রেম স্বরূপিনী রাধাঠাকুরাণী।

শ্রীমদ্ভাগবতে রাধারাণীর ভাব সম্বন্ধে সরাসরি বলা হয়েছে যারা আমাদের উপদেষ্টা তারা বলেন যে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী যদি রাধানাম উচ্চারণ করতেন তবে তাঁর অষ্টসাত্ত্বিক বিকার হতো, এবং সাতদিনে শ্রীমদ্ভাগবত শেষ হতো না, স্তব্ধ হয়ে যেতো। সেজন্য ঘুরে ফিরে 'এক প্রধান গোপী' আছে, সে কৃষ্ণকে ভালভাবে আরাধনা করতে পেরেছে। অসংখ্য পুরাণ আছে যেখানে রাধার সম্বন্ধে বেশী বলা আছে। রাধাষ্টমী মাহাত্ম্য পদ্মপুরাণে আছে। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে রাধাষ্টমী মাহাত্ম্য সম্বন্ধে অনেক কিছু লেখা আছে।

গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক

পারমার্থিক জীবনে সিদ্ধিলাভের যথার্থ উপায় হচ্ছে শ্রীল গুরুদেবের সন্তোষবিধান এবং তার ফলে তাঁর আন্তরিক আশীর্বাদ লাভ করা। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর তাঁর বিখ্যাত গুর্বষ্টকমে বলেছেন—

> যস্য প্রসাদাদ্ ভগবৎপ্রসাদো
> যস্যাপ্রসাদান্ন গতি কুতোঽপি।
> ধ্যায়নস্তুবংস্তস্য যশস্ত্রিসন্ধ্যং
> বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥

অর্থাৎ, 'যিনি প্রীত হলে পরমেশ্বর ভগবান সন্তুষ্ট হন এবং যিনি অসন্তুষ্ট হলে জীবনে আর কোনও গতি থাকে না, আমার সেই পরমারাধ্য গুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।' তাই শিষ্যের কর্তব্য হচ্ছে অত্যন্ত বিনীতভাবে সদ্গুরুর সেবা করা। শ্রীল সূত গোস্বামী আদর্শ শিষ্যের এই সমস্ত গুণাবলী প্রদর্শন করেছিলেন এবং তাই শ্রীল ব্যাসদেব আদি তাঁর সমস্ত তত্ত্বদ্রষ্টা গুরুদেবের নিকট থেকে বিশেষ কৃপাধন্য হয়েছিলেন। নৈমিষারণ্যের ঋষিরা নিশ্চিতভাবে জানতেন যে, শ্রীল সূত গোস্বামী হচ্ছেন এক যথার্থ সদ্গুরু। তাই তাঁর শ্রীমুখের বাণী শ্রবণ করার জন্য তাঁরা উদ্গ্রীব হয়েছিলেন।

এই শ্লোকটি কতকগুলি গূঢ় রহস্য উদ্ঘাটন করছে। শ্রীল প্রভুপাদ এখানে বলেছেন যে, পারমার্থিক জীবনে সার্থকতার রহস্য হল পারমার্থিক দীক্ষাগুরুর সন্তোষবিধান এবং তাঁর আন্তরিক আশীর্বাদ অর্জন।

এক সময়ে যখন শ্রীমায়াপুর ধামে বিশাল এবং অতি মনোরম মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য শ্রীল প্রভুপাদ এক পারমার্থিক মহানগরী গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে শ্রীমায়াপুর প্রকল্পটি প্রবর্তনের কাজ করছিলেন, তখন শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের তিরোভাব তিথিতে শ্রীল প্রভুপাদ পারমার্থিক দীক্ষাগুরুর তিরোভাব তিথির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। তখন তিনি উল্লেখ করেছিলেন কিভাবে সে-সময়ে এক কালে জগন্নাথ দাস বাবাজী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঠিক জন্মস্থান নির্ধারণে সাহায্য করেন এবং কিভাবে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করতেন আর সেখানে প্রথম মন্দিরটি গড়ে তুলেছিলেন।

এইভাবে শ্রীল প্রভুপাদ গুরুশিষ্য পরম্পরার ধারা নির্ণয়ের প্রয়াস লাভ করে বলতেন, কিভাবে সমস্ত আচার্যবর্গই শ্রীধাম মায়াপুর উন্নয়নের জন্য কিছু না কিছু একটা চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছেন। তাঁর দীক্ষাগুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পুণ্য জন্মস্থানটিকে গড়ে তোলার জন্য এবং তার আরও উন্নতি সাধনের জন্য কাজ করেছিলেন।

তারপর শ্রীল প্রভুপাদ বলেন, "আমিও তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে কিছু করবার চেষ্টা করছি।" আর তিনি বলেন যে, সার্থকতার রহস্যই হল পূর্বতন আচার্যবর্গের প্রীতিসাধন। তারপরে তিনি বলেছিলেন যে, পূর্বতন আচার্যবর্গ যে পুণ্য শ্রীধাম মায়াপুরের উন্নতি সাধনের জন্য বিশেষ অভিলাষ পোষণ করে গিয়েছেন, তার উন্নতিকল্পে তাঁর যে সমস্ত অনুগামীরা তাঁর সাথে সহায়তা করছেন, তাঁদের প্রতি তিনি বিশেষ কৃতজ্ঞ। তার পরে কেমন করে যেন শ্রীল প্রভুপাদের কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে আসে এবং তিনি আর কোনও কথা বলতে পারেননি। তাঁর চোখ বেয়ে অশ্রুধারা নেমে আসে আর খানিক পরে তিনি শুধুই প্রত্যেককে হরেকৃষ্ণ কীর্তন করতে বলেন। সেখানেই প্রবচন সভা সাঙ্গ হয়ে যায়।

কতবার শ্রীল প্রভুপাদ ব্যক্ত করেছেন কিভাবে তিনি নিয়ত পূর্বতন আচার্যবর্গের সন্তোষ বিধানের চেষ্টায় ভাবিত হয়ে থাকতেন। আচার্য যে নিজেকে নতুন এক কর্তা মনে করেন, আর সমস্ত পূর্বতন আচার্যবর্গের কথা ভুলে যান, তা নয়। মায়াবাদী প্রথায় তা হতেও পারে। আমরা শুনেছি, মায়াবাদীরা যখন সন্ন্যাসী বা গুরু হয়, তারা ঐরকম মনে করে। ওরা ভাবে ওরা ভগবান হয়ে গেছে, আর যাই ইচ্ছা, তাই করতে পারে। গুরু ব্রহ্মা, গুরু বিষ্ণু, গুরু দেবো মহেশ্বরঃ—এই ধরনের মন্ত্র ওদের পূর্বতন গুরু দরজার গোড়ায় পাপোষের মতো, তুমি যেন তাঁর মাথার ওপর পা দিয়ে নির্বাণ অর্থাৎ ব্রহ্মজ্যোতির পথে ঢুকে পড়তে পারো।

কিন্তু আমাদের বৈষ্ণব ঐতিহ্যে, আমরা সবিশেষবাদী এবং সর্বদাই আমরা গুরুপরম্পরা-ক্রমে পূর্বতন আচার্যবর্গের স্মরণ করে থাকি আর তাঁদেরই অভিলাষ বাসনাদি আমাদের ভাবনা-চিন্তার ঊর্ধ্বে অধিষ্ঠিত রাখার চেষ্টা করে থাকি।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বিশেষ দৃঢ়ভাবে এর দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম যিনি ভাষ্যকার শ্রীধর গোস্বামী, তিনি এ সম্পর্কে একটা সুন্দর ভাষ্য প্রদান করেন, যদিও সেটা সম্পূর্ণ বিশদ ব্যাখ্যাকারী ভাষ্য না মনে

হতেও পারে (বাস্তবিকই পরবর্তীকালে অন্যান্য ভাষ্যকারেরাও শ্রীমদ্ভাগবতের আরও বিশদ তাৎপর্য ব্যক্ত করেন।) যদি কেউ আদি ভাষ্যকারের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন না করতেন, তা হলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাতে সায় দিতেন না। যখন এক ভাষ্যকার শ্রীধর গোস্বামীর ভাষ্যের মর্যাদা কিছুটা হানি করে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাতে বলেন, "তোমার স্বামীজীর প্রতি তুমি অনুগত নও।" পরোক্ষভাবে তিনি 'স্বামী' কথাটির বিশেষ শব্দব্যঞ্জনা বোঝাতেই চেয়েছিলেন—যে কথাটির অর্থ সন্ন্যাসী এবং পতি বা প্রভু দুই-ই বোঝায়। কোনও মহিলাকে যদি বলা হয় যে, সে তার স্বামীর প্রতি বিশ্বস্ত নয়, তা হলে তার পরোক্ষভাবে অর্থ হয়, এই যে, সেই মহিলাটি নষ্টচরিত্রা, কিংবা হয়ত বারনারী হতেও পারে।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই বিষয়ে ছিলেন বিশেষ কঠোর। তিনি সদাসর্বদাই তাঁর পূর্বতন আচার্যবর্গের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করতেন। উৎসর্গ করতে পারেন এমন যে কোনও অনুদান তিনি গ্রহণ করতেন। তা তিনি রেখে দিতেন, পারলে তাকে বাড়িয়ে তুলতেন আর তার বিকাশ উন্নতি সাধন করতেন। সেটাই তো ঠিক। তাদের নামের খাতিরে নয়, তাদের প্রতি সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা এবং যথাযোগ্য ভক্তি সহকারেই তা করতে হয়। এ কাজে কেবল আমাদেরই আধিপত্য রয়েছে। তাও নয়, বরং বলতে হয়, আমরা তাঁদের সেবারই চেষ্টা করছি এবং তাঁদের উদ্দেশ্য-লক্ষ্য পরিপূরণের প্রয়াস করছি। তাঁরা যে উদ্যোগের পরিকল্পনা করেছিলেন, যদি আমরা তার আরও প্রসার ঘটাতে পারি, তাতেই তাঁরা হবেন বেশি সন্তুষ্ট। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চেয়ে আরও বিশাল মন্দির শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর গড়ে তুলেছিলেন বলে সেটা শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রতি অপরাধ করা হয়েছে, তা নয়। বরং আরও বিশাল মন্দির গড়ে তোলা হয়েছে, তাতে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আরও কতই না সন্তুষ্ট হবেন। ঠিক তেমনই, ইসকনে, পুণ্য শ্রীধাম মায়াপুরে যদি আমরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আরও সুন্দর আর মহিমামণ্ডিত মন্দির গড়ে তুলতে পারি, নিশ্চয়ই তাতে পূর্বতন আচার্যবর্গের আরও বেশি প্রীতিসাধন হবে। একবার শ্রীমায়াপুরের কিছু সমসাময়িক প্রচারকবর্গ শ্রীল প্রভুপাদকে ইঙ্গিত জানিয়েছিলেন যে, যদি তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মস্থানের মন্দিরটির চেয়ে আরও বিশাল একটা মন্দির করতে চান, তা হলে তাতে পূর্বতন আচার্যবর্গ অসন্তুষ্ট হবেন। এ সমস্তই কূটনৈতিক কথা।

একবার শ্রীল প্রভুপাদ উল্লেখ করেন যে, কেউ যদি মায়াপুরে ত্রিশতলা একটা আকাশছোঁয়া অট্টালিকা গড়ে তুলতে পারে তো তাদের চিন্ময় জগতে প্রত্যাবর্তন ঘটবে। কেউ একবার শ্রীল প্রভুপাদের কাছে জানতে চায়, "মায়াপুরে বিশাল মন্দিরটি উদ্বোধন করবার জন্য যদি আমরা আমেরিকায় প্রেসিডেন্ট আর ইংল্যাণ্ডের রাজাকে আনতে পারি, তবে কী সেটা পূর্বতন আচার্যবর্গের প্রীতি সাধন করবে বা ঐ ধরনের কিছু একটা করলে কেমন হয়?" তখন শ্রীল প্রভুপাদ বলেন, "যদি তোমরা তা করতে পার তাহলে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর চিন্ময় জগৎ থেকে এসে তোমাদের হাত ধরে সোজা বৈকুণ্ঠধামে নিয়ে চলে যাবেন।" সেইভাবেই শ্রীল প্রভুপাদ ব্যক্ত করতেন তাঁর হৃদয়ের মাঝে পূর্বতন আচার্যবর্গের অতীব প্রীতিপ্রদ যা কিছু করণীয়, তা তিনি নিয়ত কিভাবে জাগরূক রাখতেন।

এখানে এই শ্লোকটিতে, মহানমুনিবর্গ শ্রীল সূত গোস্বামীর গুণগান করছেন, "আপনার গুরুদেববর্গের প্রতি আপনি নম্রবিনয়ী শ্রদ্ধাশীল এবং তাই তো তাঁরা আপনার ওপরে তাঁদের সমস্ত আশীর্বাদ প্রদান করেছেন।" যারা দুর্বিনীত, তার পূর্বতন আচার্যবর্গ যা বলে গেছেন, তা মানতে চায় না। তাদের নিজস্ব ধ্যান ধারণাগুলিকেই তারা অকাট্য বা উত্তমোত্তম একটা কিছু বলে চালাতে চায়। এইভাবে তারা বাস্তবিকই গুরুশিষ্য পরম্পরাক্রমে বিঘ্ন সৃষ্টি করে থাকে। প্রভুপাদ যে বিষয়টি উত্থাপন করেছেন, তা হল এই যে, শ্রীল সূত গোস্বামী যে যথার্থ সদ্‌গুরু ছিলেন, সে সম্পর্কে নৈমিষারণ্যের ঋষিকুল দৃঢ়প্রত্যয়ী ছিলেন আর তাই তাঁর কাছ থেকে তাঁরা তত্ত্বকথা শ্রবণে উৎসুক হন।

যথার্থ সদ্‌গুরু হওয়ার যোগ্যতা কি? যদি কেউ তার গুরুর প্রতি শ্রদ্ধাবান না হয় তো কি করে সে গুরুর প্রতিভূ হবে? কেউ যদি গুরুদেবের কাছ থেকে সব কিছু বিনয় নম্রতা সহকারে না শেখে তো কিভাবে ঐসব ধ্যানধারণার কথা সে যথাযথভাবে উপস্থাপন করবে, কেমন করে গুরুপরম্পরার ধারা অক্ষুণ্ণ থাকবে? শ্রবণ মাধ্যমে, গুরুকৃপার মাধ্যমে মানুষ কৃষ্ণভাবনাময় দার্শনিক তত্ত্ব বুঝতে পারে আর তা থেকেই পালাক্রমে সে অন্যের কাছে তা পৌঁছে দিতে পারে। কিন্তু মানুষ যদি শ্রদ্ধাসহকারে না শোনে আর নিজের ধ্যানধারণা আরোপিত করে, তা হলে তো মূল ধ্যানধারণা বংশানুক্রমে পৌঁছে দেওয়া যাবে না। সেটা বিকৃত হয়ে যাবে আর অন্যরকমের একটা কিছু হয়ে পড়বে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ছিলেন এরই বিরোধী, আর তাই তিনি মহাপণ্ডিতকে বলেন, "তুমি খুব বিদ্বান হতে পার, কিন্তু যেহেতু তুমি আদি ভাষ্যকারকে অবহেলা

করেছ, তাই তুমি বিচ্যুত।" তাঁরা যা করেছেন, তা আমাদের রক্ষা করতে হবে, আর তার পরে তার বেশি আমরা যা কিছু ব্যাখ্যা করলেও করতে পারি। কিন্তু তাঁদের মর্যাদা হানির মাধ্যমে তা করা যাবে না। যদি পূর্বতন আচার্যবর্গের চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান হতে চেষ্টা করি, এবং তাঁদের ধ্যানধারণার পরিপন্থী আমাদের ধ্যানধারণাগুলি উপস্থাপন করি, তো আমরা যথাযথ হলাম কি করে?

শ্রীল সূত গোস্বামীর পিতা রোমহর্ষণের হয়েছিল সেই সমস্যা। তিনিও ছিলেন অতীব বিদগ্ধজন, কিন্তু কোনক্রমে তিনি লক্ষ্যে উপনীত হতে পারছিলেন না, সারমর্ম হৃদয়ঙ্গম হচ্ছিল না। খানিকটা বিনয়-নম্রতার অভাব ছিল। যখন আদি গুরু শ্রীবলরাম প্রভু এলেন, তাঁর দাঁড়িয়ে উঠে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা উচিত ছিল। ব্যাপারটা সামান্য নয়, বিশেষত যখন পরমেশ্বর প্রভু স্বয়ং আগমন করেন। ব্যাসাসন মানে আপনি শ্রীব্যাসদেবের আসনে উপবেশন করে রয়েছেন, আপনি শ্রীব্যাসদেবের প্রতিনিধিত্ব করছেন। আর স্বয়ং ব্যাসদেব যখন আসেন, নিশ্চয়ই আপনি উঠে দাঁড়াবেন আর তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন। তিনি যদি বলেন, "এখন বসো, প্রবচন সভা হোক।" —তাই তখন করতে হয়।

তেমনি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবলরাম স্বয়ং এসেছিলেন, কিন্তু তিনি ভাবছিলেন, "আমি আসনে বসে আছি। কাউকে আমার শ্রদ্ধা দেখাতে হবে না।" কোনক্রমে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি কলুষিত হয়ে পড়েছিল। তা না হলে কেন শ্রীবলরাম তাঁর কাছে এগিয়ে এসে একটি ছোট্ট কুশাঘাতে তাঁর প্রাণবায়ু হরণ করে নিলেন?

নিঃসন্দেহে রোমহর্ষণ ছিলেন মহাপণ্ডিত, তা না হলে সমস্ত মহর্ষিদের সামনের সারিতে বসতেন না। কিন্তু তাঁকে কেন আসন থেকে দূর করে দেওয়া হল? কেন তাঁকে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল? কারণ তিনি শ্রীবলরামকে তাঁর দণ্ডবৎ প্রণাম বা শ্রদ্ধা নিবেদন করেননি। শ্রীবলরামের সামনে আভূমি প্রণত হতে তাঁকে বাধ্য করা হয়েছিল।

এখানে আমরা বুঝতে পারি যে, কৃষ্ণভাবনা সম্পর্কে কিছু বলবার ক্ষমতা অর্জনের জন্য যদিও বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষাগ্রহণ খুবই প্রয়োজন, তবু তার চেয়েও যেটা বেশি করে দরকার, তা হল পারমার্থিক দীক্ষাগুরুর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া এবং তাঁর বাণী অনুসরণে বিশ্বস্ত হয়ে থাকা। যদি কোনও মতপার্থক্য থাকে, কিংবা যদি অশ্রদ্ধাভরে কেউ বলে, "আমার গুরু আমাকে যা শিখিয়েছেন, তার

থেকে ভিন্ন কিছু আমি জানি,"তা হলে সেই লোকটির মহত্ত্বের লক্ষণ সেটা নয়, বরং সে যে রোমহর্ষণের মতো অযোগ্য, তারই লক্ষণ সেটা। বিনয়ী নম্র শিষ্য হল, যে শিষ্য পারমার্থিক দীক্ষাগুরুর নির্দেশ শ্রদ্ধা সহকারে প্রতিপালনে জীবনোৎসর্গ করে।

ভগবান শ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাব

প্রহ্লাদ মহারাজের একমাত্র দোষ ছিল তিনি পরমেশ্বর ভগবান বিষ্ণুকে স্মরণ করতো। হিরণ্যকশিপু ত্রিজগতের অধীশ্বর হয়েছিল। দেবরাজ ইন্দ্রকে জয় করেছিল। এটা একটা ভালো উদাহরণ যে, আমরা মনে করি ইন্দ্রিয় তৃপ্তি করে সুখী হবো। এই ইন্দ্রিয়তৃপ্তির বাসনা হিরণ্যকশিপুর ছিল অতুলনীয়। সমগ্র জগৎ জয় করে নিলো, কিন্তু একটি জিনিসকে সে জয় করতে পারল না। সে তার ইন্দ্রিয়কে জয় করতে পারেনি। প্রহ্লাদ মহারাজ বলেছেন, যারা ইন্দ্রিয়কে জয় করতে পারেনি, তারা কখনও শান্তি পায় না। পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মন দিয়ে আমাদের এই স্থূল শরীরটি গঠিত হয়েছে। ইন্দ্রিয়ের যারা সেবা করে থাকে তাদের বলা হয় গোদাস। যারা ভগবানের সেবায় নিজের ইন্দ্রিয়কে নিযুক্ত করে থাকেন, তাদের বলা হয় গোস্বামী। গোদাস মানে প্রবল মাত্রায় ইন্দ্রিয় তোষণ। গোস্বামী হতে গেলে আমাদের ইন্দ্রিয়কে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করতে হবে। ভগবানের সেবা হচ্ছে গোস্বামী হওয়ার একমাত্র উপায়। ভগবানের সেবায় আমাদের ইন্দ্রিয়কে ব্যবহার করে শান্তি লাভ করতে পারি। ইন্দ্রিয়ের দাস ছিল এই হিরণ্যকশিপু। যদিও তার অসীম ক্ষমতা ছিল তার ইন্দ্রিয়কে সেবা করতে। হিরণ্যকশিপু পরমেশ্বর ভগবান বিষ্ণুর গুণগান সহ্য করতে পারে নি। তাই তিনি প্রহ্লাদ মহারাজকে বললেন, "কি স্পর্ধা তোমার, আমিই হচ্ছি এই জগতের সবচেয়ে শক্তিশালী, তুমি আমার পূজা না করে বিষ্ণুর সেবা কর। এবার তোমাকে শেষ করে দেবো! দেখি তোমার সেই পরমেশ্বর ভগবান তোমাকে বাঁচাতে আসে কিনা, আমি দেখতে চাই।" এরপর হিরণ্যকশিপু বলল "এই স্তম্ভটির মধ্যে তোমার ভগবান আছে কি?" প্রহ্লাদ মহারাজ বললেন, "আমার ঈশ্বর সর্বত্র

বিরাজমান, তিনি সমস্ত স্থানেই অবস্থান করেন।" তখন হিরণ্যকশিপু বললেন, "তুমি আমার পুত্র নও, তোমার আমি মস্তক ছেদন করব, দেখি আমার চেয়ে শক্তিশালী তোমার বিষ্ণু এসে তোমাকে রক্ষা করে কি না।" তারপর যেই হিরণ্যকশিপু তরবারি উত্তোলন করে প্রহ্লাদ মহারাজকে হত্যা করতে উদ্যত হলেন ঠিক সেই সময় ভীষণ গর্জন করে সেই স্তম্ভ থেকে অর্ধেক নর ও অর্ধেক সিংহ রূপী ভগবান নৃসিংহদেব বেরিয়ে এলেন। হিরণ্যকশিপু দেখছেন এ অসুর না মানুষ, এতো অসুরও নয় আর মানুষও নয়। হিরণ্যকশিপু ব্রহ্মার কাছ থেকে বর পেয়েছে, কোন অসুর তাকে মারতে পারবে না, কোন মানুষ তাকে মারতে পারবে না। ভগবানের শক্তি অসীম, অপরিমিত। যারা অসুর তারা চিন্তা করতে পারে না, অনুমান করতে পারে না, কল্পনা করতে পারে না ভগবানের শক্তি কতটা। তাই হিরণ্যকশিপু চিন্তা করলেন কোন অসুর আমাকে মারতে পারবে না, দেবতা মারতে পারবে না, কোন মানুষ মারতে পারবে না, তাহলে কে আমাকে মারতে পারে। কিন্তু ভগবান শ্রীহরি যে অর্ধেক মানুষ এবং অর্ধেক পশুর রূপ হবে সেটা হিরণ্যকশিপু চিন্তা করতে পারেনি।

পরমেশ্বর ভগবানের এত শক্তি আছে যেকোন জায়গায়, যেকোন অবস্থায় যেকোন ভাবেই হোক তিনি তাঁর ভক্তকে রক্ষা করেন। সেইজন্য বিষ্ণুই হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। তাই হিরণ্যকশিপুর সমস্ত সৈন্যগণ নরসিংহদেবের উপর আক্রমণ করতে উদ্যত হলে নৃসিংহদেবের প্রলয়াগ্নির দ্বারা তারা ভস্মীভূত হলো। তখন হিরণ্যকশিপু বললেন "এবার আমি বুঝেছি তুমি বিষ্ণু, আমাকে মারতে এসেছ। কিন্তু আমাকে কেউ মারতে পারবে কি? আমি অমর। আমার মতো যোদ্ধা কেউ নাই।" এইভাবে হিরণ্যকশিপু তখন নরসিংহদেবের উপর আক্রমণ শুরু করে। বিভিন্ন অস্ত্র নিয়ে তিনি নরসিংহদেবকে আঘাত করার চেষ্টা করেও বিফল হয়েছে। হিরণ্যকশিপু নরসিংহদেবের প্রলয়াগ্নির মতো জ্যোতি দেখতে পেল। আর সেই জ্যোতির মধ্যেই হিরণ্যকশিপু অদৃশ্য হয়ে গেল। যেহেতু হিরণ্যকশিপু অসুর, তাই সে ঢাল তলোয়ার নিয়ে আবার নরসিংহদেবকে আক্রমণ করতে উদ্যত হল। কিন্তু কিছুই করতে পারল না। নরসিংহদেব হিরণ্যকশিপুকে ধরে একটা পোকার মতো টেনে নিয়ে তাকে দরজার সামনে নিয়ে গেলেন। তারপর নরসিংহদেব হিরণ্যকশিপুকে তাঁর হাঁটুর উপর স্থাপন করে তাঁর তীক্ষ্ণ ধারালো নখ দিয়ে ছিঁড়ে ফেললেন। কারণ ব্রহ্মার কাছে সে সমস্ত বর লাভ করে নিয়েছে—ঘরের ভিতরে অথবা বাইরে তাকে মারতে পারবে না। কিন্তু ঘরের দরজা ঘরের ভিতর বা বাহির নয়।

দিনে অথবা রাত্রে মারতে পারবে না—কিন্তু নরসিংহদেব তাকে গোধূলির সময় বধ করলেন যেটা দিনও নয় এবং রাত্রিও নয়। কোন অস্ত্র দ্বারা তার মৃত্যু হবে না—তাই নরসিংহদেব তাঁর নখের দ্বারা তাকে বধ করলেন, নখ কোন অস্ত্র নয়। এভাবে হিরণ্যকশিপুকে প্রদত্ত ব্রহ্মার সমস্ত বর বজায় রেখে অদ্ভুত ভাবে তাকে হত্যা করলেন। নরসিংহদেবের সমস্ত কেশরাশি আকাশে ছড়িয়ে গেল। তার চোখ থেকে যে প্রলয়াগ্নির মতো জ্যোতি বের হতে লাগল তার দ্বারা সূর্য চন্দ্র ঢাকা পড়ে গেল। সমস্ত পাহাড় পর্বত উৎপাটিত হয়ে যাচ্ছে। স্বর্গের দেব দেবীগণ আকাশ থেকে পুষ্প বৃষ্টি করতে লাগল। ব্রহ্মা, ইন্দ্র, শিব, পিতৃলোক, সিদ্ধলোক, গন্ধর্ব, যক্ষ, তপলোক, সুনন্দ, কুমুদ সবাই ভগবান নরসিংহদেবের কাছে গিয়ে স্তব স্তুতি করতে লাগলেন। এ সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন ভগবানের প্রতি সুদৃঢ় বিশ্বাস থাকার জন্য ভগবান প্রহ্লাদ মহারাজকে রক্ষা করলেন। তাই যারা কৃষ্ণভাবনামৃত গ্রহণ করে ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ করেন, ভগবান সবসময় তাদের সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা করে থাকেন। নরসিংহদেব আমাদের হৃদয়ে বিরাজ করেন। তিনি আমাদের হৃদয়ে অবস্থান করে আমাদের সমস্ত অজ্ঞতারূপ অন্ধকার দূর করে দিব্য জ্ঞান দান করেন। আশাকরি আপনারা সবাই ভগবান নরসিংহদেবের কাছে শুদ্ধ ভক্তির প্রার্থনা করবেন। জয় শ্রীনৃসিংহদেব ভগবান কি জয়!

মানুষকে ভক্তে পরিণত করতে গ্রন্থ বিতরণই প্রথম পদক্ষেপ

গ্রন্থ বিতরণই হচ্ছে আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারের মূল বা প্রাণকেন্দ্র। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরও গ্রন্থ প্রকাশ ও তা বিতরণের উপর জোর দিতেন। তিনি বলতেন নামহট্টের প্রচার একদিকে যেমন পবিত্র ধামের উন্নয়ন ঘটাতে সাহায্য করবে, তেমনই আরও অধিক সংখ্যক গ্রন্থ বিতরণেও সাহায্য করবে। এই ছিল মূল পরিকল্পনা।

আমেরিকার হাউস্টোনে আমাদের সাতটি ভক্তিবৃক্ষ দল আছে। সেখান থেকে কিছুদিন আগে আমাকে ফোনে জানানো হলো যে 'ওয়ালমার্ট'-এর

জনৈক ম্যানেজার আমাদের একটি ভক্তিবৃক্ষ দলের সদস্য এবং তিনি 'ওয়ালমার্ট'এর বাইরে বইয়ের টেবিল স্থাপন করে ভক্তদের গ্রন্থ বিতরণের জন্য 'ওয়াল-মার্ট' কর্তৃপক্ষের অনুমোদন জোগাড় করেছেন। যারা জানেন না 'ওয়ালমার্ট' কি, তাদের জন্য বলছি—'ওয়ালমার্ট' হচ্ছে একটি বৃহৎ বিপনী বা সুপার মার্কেট, যেখানে সবকিছু তারা বিক্রি করে, আপনি যা চান সবকিছুই সেখানে আপনি পাবেন। সপ্তাহের শেষ দিনে হাজার হাজার লোক 'ওয়াল-মার্টে' কেনাকাটা করতে যায়। ভক্তরা মাত্র কয়েক সপ্তাহ হলো সেখানে বইয়ের টেবিল সাজিয়ে গ্রন্থ বিতরণ করছে, কিন্তু এরই মধ্যে তারা যথেষ্ট সফল। গত কয়েকদিন আগে, আমি যেদিন খবর নিলাম, জানলাম তারা সেদিন সাতশো ডলার মূল্যের গ্রন্থ বিতরণ করেছে। খারাপ নয়।

রাশিয়াতেও আমি সাবওয়ে বা ভূগর্ভ পথগুলির বাইরে বইয়ের টেবিল সাজিয়ে গ্রন্থ বিতরণ করতে দেখেছি। তাই, এখন এইভাবে বিভিন্ন স্থানে বইয়ের টেবিল সাজিয়ে গ্রন্থ বিতরণের পন্থাটি প্রচলিত হচ্ছে। আটলান্টায় অনেক ভারতীয় দোকান রয়েছে। ভবিষ্যতে সপ্তাহান্তে কোন বড় ভারতীয় দোকানের সামনে এইভাবে বইয়ের টেবিল সাজিয়ে আমরা গ্রন্থ বিতরণ করতে পারি। এতে ভারতীয় দোকানদারেরা কিছু মনে করবে না। কেননা সেখানে প্রচুর ভারতীয়রা আসেন। দিল্লীর ভক্তরা এ বৎসর (২০০৬) গ্রন্থ বিতরণের ম্যারাথনে প্রথম হয়েছে। শ্রীমৎ গোপালকৃষ্ণ স্বামী মহারাজ আমাকে বলেছিলেন ৬০ শতাংশ গ্রন্থ বিতরণ করেন গোষ্ঠীবদ্ধ প্রচারকেরা। বৎসরের এক মাস তারা শুধু এই সেবাই করেন। কিছুকাল আগে ব্যাঙ্গালোরে আমাদের বিভিন্ন ভক্তিবৃক্ষ গোষ্ঠীগুলি পরস্পর গ্রন্থ বিতরণের প্রতিযোগিতায় নেমেছিল। তারা এতটাই প্রতিযোগি মনোভাবাপন্ন ছিল যে ম্যারাথন শেষ হয়ে যাবার পরও তারা চাইছিল, এরকম প্রতিযোগিতা চলুক। এটিও একটি নতুন দিক।

গ্রন্থ বিতরণের আরেকটি বড় দিক হলো গণ-সখ্য-ভিত্তিক গ্রন্থ বিতরণ। জনসাধারণের সঙ্গে আমাদের প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। গ্রন্থ বিতরণের পরিমাণের উপর শুধু নজর দিলেই চলবে না, জনসাধারণের সঙ্গে সখ্যতার সম্পর্ক তৈরির গুণের দিকেও আমাদের নজর দিতে হবে। জনসাধারণের যদি ভক্তদের প্রতি ভালো ধারণা জন্মায়, তারা যদি ভক্তদের পছন্দ করে, যদি ভক্তেরা মানুষের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে, তাহলে কাউকে গ্রন্থ বিতরণের জন্য আর আলাদা করে কোন বিশেষ কৌশলের পরিকল্পনার দরকার হয় না। প্রথমবার যদি কেউ গ্রন্থ নাও গ্রহণ করেন, যদি তার সঙ্গে

ভালো ব্যবহার বজায় থাকে, তাহলে পরের বার সে নিশ্চয়ই গ্রন্থ গ্রহণ করবে। কেউ গ্রন্থ না কিনলেও, তার সঙ্গে আমাদের সখ্যতার সম্পর্কটি বজায় রাখা উচিত, যদি ভক্তদের নাম, ঠিকানা, ফোন নং ইত্যাদি যোগাযোগের সূত্র সম্বলিত কার্ড থাকে, তবে সেটি সেই মানুষটিকে দিতে হবে। যারা গ্রন্থ কিনছে, তাদের সঙ্গেও একটি প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তোলা উচিত। তাকে অনুরোধ করতে হবে, 'গ্রন্থটি পাঠ করে আপনার কেমন লাগলো, আপনার মতামত আমাদের চিঠি লিখে জানাবেন।' গ্রন্থের ক্রেতা, গ্রন্থ বিতরণকারী ভক্তকেও তাঁর মতামত জানাতে পারেন, অথবা গ্রন্থ-বিতরণকারী ভক্তের কাছে এটি অতিরিক্ত চাপ মনে হলে, গ্রন্থের ক্রেতাকে নিকটবর্তী ইসকন কেন্দ্রে তাঁর মতামত জানাতে বলতে হবে। আর নিকটবর্তী ইসকন কেন্দ্রকে সেইসব মতামত প্রেরণকারীদের সঙ্গে চিঠির উত্তর দিয়ে অথবা যেকোনভাবে যোগাযোগ গড়ে তুলতে হবে। তবে সাধারণতঃ গ্রন্থ-ক্রেতাগণ বা সাধারণ মানুষেরা প্রথম যে ভক্তের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল সেই ভক্তের কাছ থেকেই আবার শুনতে চায়—'ও, আমি ঐ ব্যক্তির সঙ্গে প্রথম পরিচিত হয়েছিলাম, উনি খুব সুন্দর ব্যক্তি।' ঠিক যেমন, আমি যখন কোন গোষ্ঠীগত প্রচার দলের (congregational) সদস্যদের সঙ্গে মিলিত হই, তখন অনেকেই তারা আমাকে বলেন, প্রথম কে তাদের গ্রন্থ বিতরণ করেছিলেন সেটা তাদের মনে আছে।

ভক্তেরা গ্রন্থ বিতরণ করার মাধ্যমে কৃষ্ণের সঙ্গে সাধারণ মানুষের পরিচয় ঘটাচ্ছে, তারা কৃষ্ণকে প্রদান করছে। মানুষ সেই গ্রন্থ পাঠ করছে, আর সঙ্গে সঙ্গে তাদের পারমার্থিক জীবনের শুরু হচ্ছে। তাই কখনও কখনও গ্রন্থ বিতরণকারী ভক্তদের বর্ত্ম-প্রদর্শক-গুরু বলা হয়, অর্থাৎ যে, মানুষকে শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থ বিতরণের মাধ্যমে পথ প্রদর্শন করছে। তাই এটি একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। মানুষের সঙ্গে আমরা কিভাবে, কতখানি প্রীতির সম্পর্কে সম্পর্কিত হতে পারি সেই গুণমানের উপর আমাদের তাই জোর দেওয়া উচিত। যে সকল মানুষের সঙ্গে আমাদের ভালো সম্পর্ক গড়ে উঠবে, যারা আগ্রহী, তাদের নাম ঠিকানা আমাদের চিঠি পত্র পাঠাবার ঠিকানার তালিকায় রাখা উচিত এবং তাদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ রাখা উচিত। তারা হয়তো আরও গ্রন্থ পেতে চায়—'ও, আমি এই বইটি পড়েছি, এখন আমি আরেকটি বই পড়তে চাই।' আমাদের তাদের সঙ্গে সর্বদা যোগাযোগ রেখে চলতে হবে, যাতে তারা ভবিষ্যতে ভক্ত হতে পারেন এবং একইভাবে তারাও

যাতে গ্রন্থ বিতরণ করে এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনকে ছড়িয়ে দিতে আমাদের সাহায্য করতে পারেন।

সারা পৃথিবী জুড়ে আমাদের ইসকনের গ্রন্থ বিতরণকারীদের সঙ্গে হাজার হাজার মানুষের সংযোগ ঘটছে। প্রতিটি সাত সেকেন্ডে একটি করে গ্রন্থ বিতরিত হচ্ছে অর্থাৎ প্রতি সাত সেকেন্ডে একজন করে মানুষ কেউ না কেউ পারমার্থিক গ্রন্থ লাভ করছেন। আমি জানি না এক মাসে কতজন মানুষ তার সদ্ব্যবহার করছে। কিন্তু এটা ঠিক ভক্তেরা অসংখ্য মানুষের সংস্পর্শ লাভ করছে। আমাদের তাই এরকম একটি ব্যবস্থা রাখা উচিত যাতে আমাদের সঙ্গে পরিচিত হওয়া মানুষদের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখে তাদেরকে পারমার্থিক গ্রন্থ পাঠে উৎসাহিত ও প্রশিক্ষিত করা যায়।

গ্রন্থ বিতরণের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অতিথি পরায়ণও হতে হবে। একজন গ্রন্থ-বিতরক হয়তো কাউকে গ্রন্থ প্রদান করে আমাদের মন্দির দর্শন করার জন্য আমন্ত্রণ জানালো। এরপর সেই লোকটি একদিন আমাদের কোন একটি মন্দিরে গেল, কিন্তু মন্দিরের কেউই তাকে তেমন পাত্তা দিল না বা তাকে অভ্যর্থনা করার বিষয়টি অনুভব করলো না। এটা ঠিক নয়। কেননা আমাদের উদ্দেশ্যটি হচ্ছে গ্রন্থ বিতরণের মাধ্যমে মানুষকে ভক্তে পরিণত করা। এমন অনেক ভক্ত আছেন, যারা কেবলমাত্র শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থ পাঠ করে ভক্ত হয়েছেন। এরকম অনেক কাহিনী রয়েছে। অনেক মানুষই গ্রন্থ বিতরণের মাধ্যমে শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থের সংস্পর্শে আসছেন, কিন্তু তাদের সঙ্গে যদি আমরা ভালো ব্যবহার, সুন্দর ব্যবহার না করি তাহলে তারা কৃষ্ণভাবনামৃতকে গ্রহণ করতে দেরী করবে, হয়তো সেটি নিত্যত নয়, কিন্তু কিছু সময়ের জন্য হলেও দেরী হয়ে যাবে। তাই এখন আমরা মন্দিরের ভক্তদের অতিথিপরায়ণ হবার এবং মানুষের সঙ্গে সুন্দর সম্পর্ক গড়ে তোলার ব্যাপারে প্রশিক্ষণ দেবার চেষ্টা করছি।

সম্ভবত ভবিষ্যতে আমরা এ ব্যাপারে একটি নির্দেশিকা গ্রন্থ প্রকাশ করবো, কিভাবে অত্যন্ত সদর্থকভাবে মানুষের সঙ্গে প্রথম যোগাযোগ করতে হবে। কেননা ভক্তগণের গ্রন্থ বিতরণের উদ্দেশ্যই হলো মানুষের সঙ্গে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের আজীবন সম্পর্ক গড়ে তোলা শুরু করা। ভক্তের গ্রন্থ বিতরণের ফলে একজন সাধারণ মানুষ যখন সেই গ্রন্থটি পাঠ করে, তখন সে মনে মনে এই কথাও ভাবে যে "আমি সত্যি এক সুন্দর ব্যক্তির সঙ্গে মিলিত হয়েছিলাম।" শ্রীল প্রভুপাদ বলতেন যে তাঁর গ্রন্থ যেহেতু ভক্তগণের দ্বারা

বিতরিত হয় তাই জনসাধারণের মধ্যে ভক্তদের এক গভীর প্রভাব বা গুরুত্ব রয়েছে আর সেইজন্যই ভক্তগণ হচ্ছেন বিশেষ ব্যক্তি। শ্রীল প্রভুপাদ বিশেষ করে আমাদের মন্দিরগুলির কাছাকাছি বাস করা অধিবাসীদের ভক্তে পরিণত করার কথা বলতেন এবং শ্রীল প্রভুপাদ গৃহে কৃষ্ণভাবনামৃত অনুষ্ঠানও করতেন। ১লা জুন ১৯৬৯ তারিখে লেখা তাঁর একটি চিঠিতে শ্রীল প্রভুপাদ লিখছেন "আমাদের আশেপাশের অঞ্চল থেকে যে যুবক যুবতীরা আমাদের মন্দিরের কার্যাবলীতে সাহায্য করতে আসছে, এটি আমাদের বিভিন্ন প্রচেষ্টাসমূহের শুভ ফল। আমাদের মন্দির কেন্দ্রগুলি শুরুই হয়েছে কিভাবে প্রতিটি ঘরে ঘরে তারা ছোট মন্দির গড়ে তুলতে পারে আমাদের মন্দিরের আশেপাশের অধিবাসীদের সে বিষয়ে উপস্থাপনা করার জন্য।"

আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রথম কাজটিই হলো মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তোলা, সংস্পর্শ স্থাপন করা। অসংখ্য নতুন মানুষদের সঙ্গে কারা যোগাযোগ স্থাপন করতে সক্ষম? ভক্তদের মধ্যে গ্রন্থ বিতরকদের সঙ্গে নতুন নতুন মানুষদের যোগাযোগ হয়। তারা অর্থাৎ সেইসব নতুন মানুষেরা যদি আগ্রহী হয়, তাহলে আমরা তাদের নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর, ই-মেল ইত্যাদি নিয়ে রাখব, যাতে পরেও তার সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়। অনেকের কাছে কাজটি ঝামেলার মনে হলেও, সেটি আমাদের করতে হবে, কেননা কে বলতে পারে হয়তো সেই নতুন লোকটিই একদিন এই হরেকৃষ্ণ আন্দোলনের এক ভক্ত হয়ে উঠবে না? একবার যদি কোন আগ্রহী বা প্রীতিভাবাপন্ন মানুষের ঠিকানা নিয়ে রাখা যায় তাহলে পরে তার সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়। যদি গ্রন্থ বিতরকের মানুষের সঙ্গে যোগাযোগের সময় না থাকে, তাহলে 'ভক্তিবৃক্ষ', 'নামহট্ট' ইত্যাদি গোষ্ঠীগত প্রচারক ভক্তরা সেই কাজটি করতে পারে। এইজন্য যে গ্রন্থ-বিতরণকারীর সঙ্গে আগ্রহী লোকটির প্রথম পরিচয় হয়েছিল সেই গ্রন্থ-বিতরণকারী একটি পরিচিতি-মূলক পত্র লিখে দেবে যেটি নিয়ে অন্য কোন প্রচারক সেই লোকটির কাছে যাবে। নতুবা একদম নতুন একজন অপরিচিত ভক্ত বা প্রচারক হঠাৎ করে সেই লোকটির কাছে উপস্থিত হলে সে অবাক হতে পারে বা তার অস্বস্তি বোধ হতে পারে। সেই পরিচিতিমূলক পত্রটির বয়ানটি হবে এরকম, 'মহাশয়/মহাশয়া, আপনার সঙ্গে আমার অমুক জায়গায়, অমুক রাস্তায় যখন আমরা গ্রন্থ বিতরণ করছিলাম, তখন পরিচয় হয়েছিল। আশা করি আপনি আমাদের কাছ থেকে যে গ্রন্থটি সংগ্রহ করেছেন, সেটি আপনার ভালো লেগেছে এবং এই কৃষ্ণভাবনামৃত দর্শনে

আপনি কৌতুহলী। আমি যেহেতু গ্রন্থ-বিতরণ করে নানা স্থানে ভ্রমণ করি, তাই আপনার সঙ্গে দেখা করার সময় পাচ্ছি না। তাই আমার এক সহযোগী অমুক চন্দ্র অমুককে আপনার সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য পাঠালাম। আশা করি আমার সহযোগীর সঙ্গে কথা বলে আপনার ভালো লাগবে। হরে কৃষ্ণ। ইতি--অমুক দাস।" চিঠিটিতে অবশ্যই যে ভক্তকে পাঠানো হলো তার নাম উল্লেখ করতে হবে।

এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন একটি দলগত সংহতির বিষয়। কোন ভক্ত যদি কারো সঙ্গে পরিচিত হবার পর তার সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রেখে তাকে কৃষ্ণভাবনামৃতে উৎসাহিত করতে পারে তো সেটি খুবই ভালো কথা। তা না হলে অন্য কোন ভক্ত সেই পরিচিত মানুষটির সঙ্গে এইভাবে যোগাযোগ রাখবে, তার সঙ্গে আলোচনা করবে। ধৈর্য সহকারে তার প্রশ্নসমূহের উত্তর দেবে, তাকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানাবে ইত্যাদি।

আমাদের অনেক প্রাক্তন ব্রহ্মচারীরা রয়েছে, যারা গৃহস্থ ধর্ম গ্রহণ করেছে এবং এখন তারা পরিবারের সঙ্গে বসবাস করছে, কিন্তু তবুও তারা গ্রন্থ বিতরণ করছে। বিবাহ হওয়া এবং মন্দিরের বাইরে বাস করার অর্থ এই নয় যে তারা কেউ গ্রন্থ বিতরণ করতে পারবে না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পবিত্র হরিনাম সংকীর্তন আন্দোলনে সকলেই, সে মন্দিরের পুরোহিতই হোক আর অন্য কোন সেবকই হোক সকলেই একই সংস্কৃতির অঙ্গ এবং গ্রন্থ বিতরণ হচ্ছে আমাদের সেই সংস্কৃতির একটি অংশ।

একবার আমি সাইবেরিয়ায় বারনৌল উৎসবে যোগ দিতে গিয়েছিলাম। সেখানে উপস্থিত সকল ভক্তদের মধ্যে প্রবচন দান কালে আমি জিজ্ঞাসা করলাম 'আপনারা কতজন মন্দিরে বাস করেন?' কিন্তু কেউই দেখলাম হাত ওঠালো না। আমি ভাবলাম আমার প্রবচন যিনি সাইবেরিয়ার ভাষায় অনুবাদ করছিলেন তিনি হয়তো আমার কথা বুঝতে পারেন নি। তাই আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম 'আপনারা কতজন মন্দিরে বাস করেন?' কিন্তু এবারেও কেউ হাত তুললো না। সব চুপ। এবার আমি যখন তিনবারের বার জিজ্ঞাসা করলাম 'আপনারা কতজন মন্দির বাস করেন?' তখন তাদের একজন উত্তরে জানালো, "মহারাজ, আমাদের সাইবেরিয়ায় একটিই মাত্র ছোট মন্দির আছে আর সেখানে মাত্র পাঁচজন ব্রহ্মচারী থাকতে পারে। তাই এখানে আমরা যারা উপস্থিত রয়েছি, ব্রহ্মচারী, মাতাজী, গৃহস্থ প্রত্যেকেই গৃহে থাকি এবং সকলেই গ্রন্থ বিতরণ করি।"

এই হলো ইসকন। সমবেত ভক্ত-মণ্ডলীর প্রচার। ভক্তগণ যেমন গ্রন্থ বিতরণ করবেন, তেমনই মানুষকে ভক্তে পরিণত করবেন। মানুষকে ভক্তে পরিণত করার প্রথম পদক্ষেপই হলো গ্রন্থ বিতরণ। যেমন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর করতেন। তিনি রাত্রে গ্রন্থ রচনা করতেন এবং দিনের বেলা গ্রন্থ বিতরণ করতেন। তিনি সারা পৃথিবী জুড়ে গ্রন্থ প্রেরণ করতেন।

মনে রাখতে হবে গ্রন্থ বিতরণের মাধ্যমে মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ এবং সেই যোগাযোগকে লালন করে মানুষকে ভক্তে পরিণত করতে হবে যাতে সকলেই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনকে গ্রহণ করে ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারে।

হরেকৃষ্ণ!

শ্রীমৎ ভক্তিচারু স্বামী মহারাজের

প্রদত্ত প্রবচন

ভবসাগর পার হবার বিশাল জাহাজ "ইসকন"

রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করে ছ'বছরের রাজপুত্র ধ্রুব তাঁর তপস্যার জন্য বনে গমনের সময়ে তাঁর গুরুদেব নারদ মুনির আদেশ সর্বান্তঃকরণে পালন করেছিলেন। ধ্রুব মহারাজ মধুবনে পৌছে, যমুনা নদীতে স্নান করেছিলেন এবং গভীর মনোযোগ সহকারে সেই রাত্রে উপবাস করেছিলেন। তারপর দেবর্ষি নারদের উপদেশ অনুসারে তিনি পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনায় মগ্ন হয়েছিলেন। (ভাগবত ৪/৮/৭১)

শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ এই বিশেষ শ্লোকের তাৎপর্যে লিখেছেন, ধ্রুব মহারাজ তাঁর গুরুদেব দেবর্ষি নারদের উপদেশ অনুসারে আচরণ করেছিলেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তীও উপদেশ দিয়েছেন যে, আমরা যদি ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে চাই, তা হলে আমাদের অবশ্যই অত্যন্ত নিষ্ঠাপূর্বক শ্রীগুরুদেবের নির্দেশ পালন করতে হবে। সেটিই হচ্ছে সিদ্ধি লাভের উপায়। সিদ্ধিলাভের ব্যাপারে উৎকণ্ঠিত হওয়ার কোন কারণ নেই, কেননা কেউ যদি গুরুদেবের উপদেশ পালন করেন, তা হলে তিনি অবশ্যই সিদ্ধিলাভ করবেন। গুরুদেবের আদেশ কিভাবে পালন করা যায়, সেটিই আমাদের একমাত্র চিন্তা হওয়া উচিত। গুরুদেব তাঁর প্রতিটি শিষ্যকে বিশেষ আদেশ প্রদানে অত্যন্ত পারদর্শী, এবং শিষ্য যদি গুরুদেবের আদেশ পালন করে, তা হলে সেটিই হচ্ছে সিদ্ধি লাভের আদর্শ পন্থা।

ধ্রুব মহারাজও গুরুদেবের আদেশ পালন করেছিলেন কোনও রকম প্রশ্ন না করে। পারমার্থিক জীবনে সাফল্য লাভের এইটিই একমাত্র পন্থা। পারমার্থিক জীবনের শুরু হয় গুরু পাদাশ্রয়ের মাধ্যমে। যখন শ্রদ্ধার উদয় হয়, তখন ভগবানের প্রতি বিশ্বাস আসে। ভগবান যে রয়েছেন, তিনি যে সবকিছু পরিচালনা করছেন, তিনি যে পরম ঈশ্বর, তিনি যে পরম পুরুষ, সেই বিশ্বাসের উদয় হয়।

সেই বিশ্বাসের ফলেই আমরা জানতে পারি যে, এই জগতে আমাদের যে জীবন, সেইটিই সবকিছু নয়। এই জীবনের পূর্বে আমরা ছিলাম এবং এই জীবনের পরেও আমরা থাকব। আর যেভাবে আমরা আচরণ করব, সেই অনুসারে আমরা তার ফল ভোগ করব। যেভাবে জীব কর্ম করে, সেই কর্ম অনুসারে সে তার ফল ভোগ করে।

অতএব এই জীবনে আমরা যেভাবে আচরণ করছি, যে কাজগুলি করছি, সেই বিষয়ে আমাদের খুব সতর্ক থাকা উচিত যাতে আমরা এমনভাবে আচরণ করি যার ফলে আমাদের উন্নতিই হয়। অবনতি যেন না হয়। আমরা যদি অন্যায়ভাবে আচরণ করি, অবৈধভাবে আচরণ করি, তা হলে সেই অন্যায় আচরণের ফলে আমাদের দণ্ডভোগ করতে হবে। সেই দণ্ডটি কি রকম? অন্যায় আচরণের ফলে আমরা অধঃপতিত হব, নিম্নগামী হব। আমরা যতই নিম্নগামী হব, ততই আমরা দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করি। আর যত আমরা ঊর্ধ্বগামী হই, ততই আমরা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করব।

এমন নয় যে, এই জীবনটাই সবকিছু বা এই জীবনটা শেষ হয়ে গেলেই বুঝি সব শেষ হয়ে গেল। সেটা মূর্খের বিচার। তাই মূর্খেরা মনে করে, যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ, ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ। এটা মূর্খের বিচার–যদ্দিন বেঁচে আছি, চুরি করে হোক, ডাকাতি করে হোক, ঋণ করে হোক, লোক ঠকিয়ে হোক, ভাল করে থাকব, ভাল করে খাব। কেননা, দেহটা যখন ভস্মীভূত হয়ে যাবে, তখন সব শেষ হয়ে যাবে। ভস্মীভূত দেহের পাপপুণ্য কি আছে? এটা চার্বাক মুনির বিচার।

কিন্তু যারা বুদ্ধিমান, তারা জানে যে, এই জীবনটাই সব কিছু নয়। এই জীবনের সমাপ্তি হলে জীবের অস্তিত্বের সমাপ্তি হয় না। আমরা এই জীবনের পরেও থাকব—মৃত্যুর পরেও থাকব। মৃত্যুর পরেও আমাদের পুনরাগমন হবে। মৃত্যুর পরে আমরা আর একটি শরীর প্রাপ্ত হব।

তবে কি ধরনের শরীর প্রাপ্ত হব এবং কি ধরনের জীবনযাপন করব, সেটা নির্ধারিত হবে আমাদের বর্তমান কার্যের ধারা অনুসারে। আমরা যদি এই জন্মে, এই জীবনে যথাযথভাবে আচরণ করি, তা হলে পরবর্তী জীবনটি সুখের হবে এবং আমরা আমাদের পরবর্তী জীবনে একটি উন্নততর শরীর প্রাপ্ত হব। শুধু পরবর্তী জীবনেই নয়, এই জীবনটিও সুখের হবে।

এটা আমাদের মনগড়া কথা নয়। আমাদের ব্যবহারিক জীবনেও আমরা দেখতে পাই এবং শাস্ত্রেও সেই কথা নির্ধারিত হয়েছে, সত্য বলে প্রতিপন্ন হয়েছে। ভগবদ্ভক্তির পন্থাটি এত সুন্দর যে, যাঁরাই এটি অনুসরণ করেন, তাঁরা যেখানেই থাকেন, মহানন্দে থাকেন।

ধ্রুব মহারাজ ছ'বছরের একটি শিশু। সে রাজপুত্র, রাজার ছেলে। কিন্তু সে রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করে গেছে কোথায়? বনে। বনে তো নানারকম কষ্ট পাওয়ার কথা। কিন্তু ধ্রুব মহারাজ আনন্দেই আছেন। ভক্ত গৃহে থাকে বা

বনে থাকে, সে সর্বত্রই মহা আনন্দে থাকে। "গৃহে বা বনেতে থাকো, 'হা গৌরাঙ্গ' বলে ডাকো।"

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন, "গৃহে থাক, বনে থাক, সদা 'হরি' বলে ডাক।" যেখানেই হরিনাম, সেখানেই আনন্দ। শ্রীল প্রভুপাদও তাই বলেছেন, "Chant Hare Krishna and Be Happy" হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন কর এবং মহা আনন্দে থাকো।

এইটিই হচ্ছে ভগবদ্ভক্তির সরল পন্থা। আর যারা ভগবদ্ভক্তির পন্থা অবলম্বন করেনি, তারা যেখানেই থাকুক, সেখানেই তারা অসুখী। তারা প্রাসাদে থাকলেও অসুখী, তারা বনে থাকলেও অসুখী। তারা যেখানে থাকে সেখানেই তারা অসুখী। তারা অভাবে থাকলেও অসুখী, ঐশ্বর্যে থাকলেও অসুখী।

এটিই হচ্ছে জড়বাদী বা সংসারে আসক্ত ব্যক্তিদের অবস্থা। কিন্তু যারা কৃষ্ণভক্ত, তারা সর্ব অবস্থাতেই মহা আনন্দেই থাকে।

এখন, এই যে ভক্তির পন্থা, তার জন্য প্রথম কথাটি হচ্ছে আদৌ শ্রদ্ধা। ভগবান যে আছেন, এই বিশ্বাস যাদের আছে—তাদের বলা হয় আস্তিক। যারা মনে করে ভগবান নেই, তাদের বলা হয় নাস্তিক।

যাঁরা ভক্ত, তাঁরা বিশ্বাস করেন ভগবান আছেন, এবং আমাদের এই জীবনের পরেও আমাদের অস্তিত্ব থাকবে, এই জীবনের কর্ম অনুসারে আমাদের পরবর্তী জীবন নির্ধারিত হবে, তাঁরা অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে এই জীবনটি যাপন করবেন।

সাবধানতার সঙ্গে কিভাবে জীবনযাপন করতে হয়? প্রথমে এমন কারও আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়, যিনি আমাদের পথ প্রদর্শন করতে পারবেন। যেমন, আমরা যখন কোনখানে যাই, এবং সেই জায়গাটিতে কিভাবে যেতে হয়, আমরা যদি না জানি, তা হলে কি করতে হয় আমাদের? আমাদের কাউকে জিজ্ঞাসা করতে হয়—যে পথের সন্ধান জানে।

যেমন, আপনারা আজ মায়াপুরে এসেছেন। আপনারা হয়তো অনেকেই জানতেন না কিভাবে আসতে হয়। এলেন কি করে? এমন কাউকে আশ্রয় ভরসা করেছেন, যে পথ জানে। যে পথ জানে, সে অনায়াসে আপনাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে আসতে পারবে। আপনি নিশ্চিন্তে তাঁকে অনুসরণ করে মায়াপুরে পৌছে গেছেন—পথে কোনও অসুবিধা হয় নি। কিন্তু সেরকম কাউকে যদি না পেতেন, তা হলে কি হত? অসুবিধা হত।

এখন, যদি আমরা ভগবদ্ধামে যেতে চাই, ভগবানের কাছে ফিরে যেতে চাই, তা হলে এমন কাউকে প্রয়োজন, যে পথ চেনে, যে আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। আর সেইরকম কোনও ব্যক্তির যদি সন্ধান আমরা পাই, তা হলে দুশ্চিন্তার কোনও কারণ থাকে না। তখন আমরা অনায়াসে ভগবানের কাছে পৌছে যেতে পারব।

ভগবানের কাছে পৌছতে গেলে প্রথমে কি করতে হবে? প্রথমে আমাদের এই সংসাররূপ যে সমুদ্র, সেই ভবসাগর উত্তীর্ণ হতে হবে। সাগর পার হতে হলে কিসের দরকার? এমন নৌকোয় উঠতে হবে, যে-নৌকোর কাণ্ডারী, বা কর্ণধার, সে ভাল করে নৌকোটা চালাতে পারে।

এই সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হতে হলে গুরুরূপ কর্ণধারের প্রয়োজন। ভাল নৌকোয় যখন কেউ উঠে বসেন, তখন আর কোনও চিন্তা থাকে? কাণ্ডারী ভাল আছে, নৌকোটাও মজবুত আছে, অতএব আর ভাবনা কি? সুতরাং আমি নৌকোতে বসে থাকব আর পরপারে পৌছে যাব।

এখন, সেই নৌকাটি হচ্ছে এই আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ, ইস্‌কন। নৌকো তো নয়, বিশাল এক জাহাজ! এই জাহাজের কর্ণধার হলেন শ্রীল প্রভুপাদ। ইস্‌কন সেই জাহাজ! এই জাহাজে উঠে বসলে আমরা যথাসময়ে গন্তব্যস্থলে পৌছে যাব। গন্তব্যস্থল হল ভগবদ্ধাম।

কিন্তু যদি এই জাহাজ থেকে আমরা মাঝপথে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে সাঁতরাতে যাই, যদি মনে করি জাহাজটা তেমন ভাল নয়, তাহলে ভবসাগর পার হওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকবে না। অতএব খুব সাবধানে আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের মধ্যে আশ্রয় নিয়ে শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম যথাযথভাবে অবলম্বন করে পারমার্থিক জীবনে আমাদের এগুতে হবে।

সেটা যদি আমরা করতে পারি, তা হলে যথাসময়ে আমরা ভগবদ্ধামে অবশ্যই পৌছতে পারব। যেহেতু শ্রীল প্রভুপাদ ইস্‌কনের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য তাই যাঁরাই এই সংঘে যোগদান করেন, তাদের সকলেরই তিনি শিক্ষাগুরু। শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষাকে আশ্রয় করেই সমস্ত গুরুরা এবং সমস্ত ভক্তরা অন্যদের পথ প্রদর্শন করে থাকেন। যদি আমরা শ্রীল প্রভুপাদের আশ্রয়ে থেকে আমাদের ভক্তিজীবন অনুশীলন করি, তা হলে আমাদের কোনও অসুবিধা হবে না।

এইভাবে গুরু পরম্পরায় ভগবদ্ভক্তির যে পন্থা আমরা পেয়েছি, এটি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পরম কৃপা। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং গুরুরূপে এসেছিলেন শ্রীচৈতন্য

মহাপ্রভুরূপে। কারণ গুরুর পদাশ্রয় গ্রহণ করলে সর্বপ্রকার অনর্থ নিবৃত্ত হয়। আপনারা সকলে সেইভাবে ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করুন।

মহাবদান্য অবতার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করে শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥

(ভাঃ ১১/৫/৩২)

অর্থাৎ, যাঁর মুখে সর্বদা কৃষ্ণ নাম, যাঁর অঙ্গকান্তি অকৃষ্ণ, অঙ্গ, উপাঙ্গ, অস্ত্র ও পার্ষদ পরিবেষ্টিত সেই মহাপুরুষকে বুদ্ধিমান মানুষেরা সংকীর্তন যজ্ঞের দ্বারা আরাধনা করেন।

ভগবান যদিও কলিযুগে প্রচ্ছন্নভাবে অবতরণ করেন। অর্থাৎ নিজের স্বরূপ গোপন করে অবতরণ করেন। তবুও এই শ্লোক এবং শাস্ত্রোক্ত অন্যান্য বহু শ্লোকের বর্ণনার মাধ্যমে তাঁকে চিনতে পারা যায়। উপরোক্ত শ্লোকটি বিচার করলে সেই কৃষ্ণ যে স্বয়ং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে না।

"কৃষ্ণবর্ণং", শব্দটির অর্থ হচ্ছে, কৃ-ষ্ণ এই দুটি বর্ণ-নিরন্তর যাঁর মুখে উচ্চারিত হয়, অথচ ত্বিষা-অকৃষ্ণ অর্থাৎ তাঁর অঙ্গকান্তি অকৃষ্ণ। ভগবান চারটি যুগে চারটি ভিন্ন বর্ণে আবির্ভূত হন। সে সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে কৃষ্ণ-বলরামের নামকরণের সময় গর্গমুনি বলেন—

আসন্ বর্ণস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্নতোহনুযুগং তনূঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥

(ভাঃ ১০/৮/১৩)

অন্য তিনটি যুগে ভগবান শ্বেত, রক্ত ও পীতবর্ণ ধারণ করে অবতরণ করেন; এখন দ্বাপর যুগে তিনি কৃষ্ণবর্ণ প্রাপ্ত হয়েছেন। অতএব অকৃষ্ণ বর্ণ বলতে শ্বেত, রক্ত ও পীত এই তিনটি রঙের যে কোনো একটিকে বোঝাতে পারে,

কিন্তু ইতিপূর্বে সত্য ও ত্রেতা যুগে তিনি যথাক্রমে শ্বেত ও রক্তবর্ণ ধারণ করে অবতরণ করেছেন। তাহলে বাকী রইল কেবল পীতবর্ণ, অতএব অকৃষ্ণ বর্ণ বলতে এখানে পীত বর্ণকেই নিশ্চিতরূপে ইঙ্গিত করা হয়েছে। সে সম্বন্ধে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে বলেছেন—

"অকৃষ্ণবরণে তাঁর কহে পীতবরণ"।

তাঁর 'অঙ্গ' হচ্ছেন অদ্বৈত আচার্য এবং নিত্যানন্দ প্রভু। 'উপাঙ্গ' শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ, 'অস্ত্র'—হরিনাম, এবং 'পার্ষদ'—গদাধর, স্বরূপ দামোদর প্রভৃতি।

যজ্ঞৈঃ—যজ্ঞ সমূহের দ্বারা। এই শ্লোকের টীকায় শ্রীজীব গোস্বামী লিখেছেন, যজ্ঞ শব্দের অর্থ পূজার সম্ভার। সংকীর্তনপ্রায়ৈঃ, অর্থাৎ সঙ্কীর্তন প্রধান। বহু ব্যক্তি মিলিত হয়ে যখন শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, লীলাদির কীর্তন করলে তাকে বলা হয় সঙ্কীর্তন। ভগবান শ্রীনারায়ণ বলেছেন—

"নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগীনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ ॥"

"হে নারদ, আমি বৈকুণ্ঠে থাকি না, যোগীদের হৃদয়েও থাকি না; আমার ভক্তেরা যেখানে আমার নাম, গুণ, লীলাদি কীর্তন করেন, আমি সেখানেই থাকি।" অর্থাৎ ভক্তদের শ্রীমুখে তাঁর নিজের নাম, গুণ, লীলাদির কীর্তন শুনলে ভগবানের যত আনন্দ হয়, বৈকুণ্ঠে বা যোগীদের হৃদয়ে অবস্থান করে তিনি তত আনন্দ পান না। ভগবানের আনন্দ বিধানের জন্যই ভক্তরা ভগবানের সাক্ষাতে তাঁর নাম, গুণাদির কীর্তন করেন। "যজন্তি হি সুমেধসঃ"—সুবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিগণ এই নাম সংকীর্তনের দ্বারা তাঁর আরাধনা করেন।

এই পীতবর্ণ স্বয়ং ভগবান হচ্ছেন রাধাকৃষ্ণের মিলিত স্বরূপ, অর্থাৎ শ্রীরাধার কুঙ্কুমাক্তকাঞ্চন বর্ণে আচ্ছাদিত স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীরাধার ভাব ও অঙ্গকান্তি সুবলিত কৃষ্ণ স্বরূপ—শ্রীরাধা ও কৃষ্ণের মিলিত তনু।

তাঁর এই অবতরণ প্রচ্ছন্ন; অর্থাৎ নিজের পরিচয় গোপন করে তিনি অবতরণ করেছেন। স্বয়ং ভগবান তাঁর ভগবত্তা গোপন করে ভক্তভাব অবলম্বন করে এই কলিযুগে নিজেকে প্রকাশ করেছেন। এই রূপে তিনি প্রতি কলিযুগে আসেন না। এক হাজার চতুর্যুগে ব্রহ্মার এক দিন হয়।

অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে।
ব্রজের সহিতে হয় কৃষ্ণের প্রকাশে ॥

অষ্টাবিংশতি দিব্যযুগের দ্বাপর যুগের শেষভাগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর নিত্য ব্রজধামের সমস্ত উপকরণ সহ এই জড় জগতে অবতরণ করেন। সেই লীলা

বিলাসের পর কৃষ্ণ ভাবেন—"বহুকাল আমি জগতের মানুষকে প্রেমভক্তি দান করিনি, অথচ প্রেমভক্তি বিনা জগতের কোনো অস্তিত্ব থাকতে পারে না। জড় জগতে শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে সকলে আমার আরাধনা করে। কিন্তু এই বিধি ভক্তির অনুশীলনের মাধ্যমে ব্রজের ভক্তদের প্রেমভাব লাভ করা যায় না। তাই আমি কলিযুগের যুগধর্ম নাম-সংকীর্তন প্রবর্তন করার মাধ্যমে জগতকে প্রেমানন্দে উদ্বেলিত করে নৃত্য করাব। ভক্তের ভাব অবলম্বন করে আমি সকলকে ভক্তিযোগে ভগবানের সেবা করার শিক্ষা দেব। আমি আমার অন্তরঙ্গ ভক্তদের সঙ্গে পৃথিবীতে অবতরণ করে বহুবিধ আনন্দময় লীলা বিলাস করব।" এইভাবে চিন্তা করে পরমেশ্বর ভগবান কলিযুগে প্রথম সন্ধ্যায় নবদ্বীপে অবতীর্ণ হলেন।

স্বয়ং ভগবানের এইভাবে অবতরণের দুটি কারণ রয়েছে, একটি বহিরঙ্গা, অন্যটি অন্তরঙ্গা। তার অবতরণের বহিরঙ্গা কারণটি হচ্ছে কলিযুগের যুগধর্ম নাম সংকীর্তন প্রচার এবং ভগবৎ-প্রেম বিতরণ। আর অন্তরঙ্গা কারণটি সম্বন্ধে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে আদিলীলার চতুর্থ পরিচ্ছেদে বলেছেন—

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা-
ত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥
(চৈঃ চঃ আঃ ৪/২৩০)

শ্রীরাধার প্রেমের মহিমা কীরকম, ঐ প্রেমের দ্বারা শ্রীরাধা আমার যে অদ্ভুত মাধুর্য আস্বাদন করেন, সেই মাধুর্যই বা কিরকম এবং আমার মাধুর্য আস্বাদন করে শ্রীরাধা যে সুখ অনুভব করেন, সেই সুখই বা কিরকম—এই সমস্ত বিষয়ে জানবার জন্য লোভ জন্মানোর ফলে শ্রীরাধার ভাবযুক্ত হয়ে শ্রীকৃষ্ণরূপ চন্দ্র শচীগর্ভসিন্ধুতে আবির্ভূত হয়েছেন।

শ্রীকৃষ্ণ একসময় বিচার করেছিলেন—"সমস্ত জগৎ আমার থেকে আনন্দ লাভ করে, এমন কেউ কি আছে যে আমাকে আনন্দ দান করতে পারে? যার মহিমা আমার থেকে শত শত গুণে অধিক, সেই কেবল আমার মনকে আনন্দিত করতে পারে। এই জগতে আমার থেকে অধিক গুণসম্পন্ন কেউ নেই, কেবল রাধার মধ্যেই তা আছে বলে মনে হয়।

"যদিও আমার সৌন্দর্য কোটি কোটি কন্দর্পের সৌন্দর্যকে পরাভূত করে, যদিও আমার এই সৌন্দর্যের সমান অথবা তার থেকে অধিক সৌন্দর্য সমন্বিত

আর কেউ নেই, এবং আমার এই সৌন্দর্য ত্রিভুবনের আনন্দ বিধান করে, তবুও রাধাকে দর্শন করে আমার চোখ জুড়িয়ে যায়। যদিও আমি সমস্ত জগতের সুখের কারণ, তবুও রাধার রূপ ও গুণ আমার জীবন-স্বরূপ। এইভাবে রাধার প্রতি আমার অনুরাগ আমি অনুভব করতে পারলেও, যখন আমি বিচার করে দেখি, তখন সব বিপরীত বলে মনে হয়।

"রাধাকে দর্শন করে আমার চোখ জুড়ায়, কিন্তু আমাকে দেখে রাধা অধিক সুখ অনুভব করে চেতনা হারায়। আমার মিলনে রাধা যে আনন্দ আস্বাদন করে, তা শতমুখে বর্ণনা করেও আমি শেষ করতে পারি না। আমাদের লীলা বিলাসের পর যখন আমি তার অঙ্গের মাধুরী দর্শন করি তখন আমি সুখে মগ্ন হয়ে নিজেকে ভুলে যাই। অন্যের মিলনে আমি যে সুখ পাই, রাধার সঙ্গসুখ তার থেকে শত শত গুণ অধিক।

"তা বিবেচনা করে আমি বুঝতে পারি আমার মধ্যে এমন কোনো এক রস আছে, যা আমার মোহিনী রাধাকেও সম্পূর্ণভাবে বশীভূত করে। আমার থেকে রাধা যে সুখ পায়, সেই সুখ আস্বাদন করার জন্য আমি সর্বদাই উৎসুক।

"রাধার প্রেমের মহিমা, ঐ প্রেমের দ্বারা রাধা আমার যে অদ্ভুত মাধুর্য আস্বাদন করে, এবং সেই মাধুর্য আস্বাদন করে রাধা যে সুখ অনুভব করে, এবং সেই সুখই বা কিরকম—এই তিনটি বাসনা আমার পূর্ণ হয়নি। রাধার ভাব ও কান্তি অবলম্বন না করলে এই তিনটি বাসনা পূর্ণ হবে না। তাই রাধার ভাব ও অঙ্গকান্তি অবলম্বন করে আমি অবতীর্ণ হব।"

শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে তার পিতা-মাতা এবং গুরুজনদের অবতরণ করালেন। তারপর শ্রীরাধার ভাব ও অঙ্গকান্তি অবলম্বন করে তিনি নিজে শচীমাতার গর্ভরূপ ক্ষীর সমুদ্র থেকে পূর্ণচন্দ্রের মতো নবদ্বীপে প্রকাশিত হলেন।

দুর্জনগণের পাপ খণ্ডনের জন্য শ্রীশচীতনয়ের আবির্ভাব

আজ আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব তিথি উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আমরা সকলে সমবেত হয়েছি। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পুণ্য পবিত্র ধাম, শ্রীমায়াপুরধামে আমরা মিলিত হতে পেরেছি, এ আমাদের বিশেষ

সুকৃতির ফল। এই শ্রীমায়াপুরধামেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, যিনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ থেকে অভিন্ন, যিনি শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকার মিলিত তনু থেকে ভিন্ন নন—তিনিই আবির্ভূত হয়েছিলেন শ্রীমতী শচীমাতার পুত্রসন্তান রূপে।

এই উপলক্ষ্যে আমি শুধু একটি মহাজনবাক্য পড়ে শোনাতে চাই—এটি তদানীন্তন সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত শ্রীল সার্বভৌম ভট্টাচার্য রচনা করেছিলেন। তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ বৈদান্তিক পণ্ডিত, তাঁকে সেই যুগের বেদান্ত দর্শনের সর্বোত্তম ভাষ্যকার রূপে বিবেচনা করা হতো। আর তা ছাড়া তিনি ছিলেন এক বিশিষ্ট কবি। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং তাঁর পার্ষদবর্গের মহিমা কীর্তনমূলক বহু ভক্তিগীতি তিনি রচনা করেছিলেন। তাঁর সেই শ্রীশচীতনয়াষ্টকম্ বা শ্রীশচীসূতাষ্টকম্ ছিল এই ধরনের ভাবসম্বলিত—

উজ্জ্বল-বরণ-গৌরবর দেহং
বিলসিত-নিরবধি-ভাব-বিদেহম্।
ত্রিভুবন-পাবন-কৃপায়াঃ লেশং
তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্ ॥ ১ ॥

যাঁর উজ্জ্বল বরণ, গৌরবর্ণ সুন্দর দেহখানি নিরবধি অসীম ভাবসমূহে বিশেষরূপে উপচিত হয়ে শোভা পাচ্ছে, যাঁর কৃপা ত্রিলোক পবিত্র করে সেই (কলিযুগপাবনাবতারী রাধাকৃষ্ণমিলিততনু ভগবান) শ্রীশচীতনয়কে প্রণাম করি।

গদ-গদ-অন্তর-ভাববিকারং
দুর্জন-তর্জন-নাদ-বিলাসম্।
ভব-ভয়-ভঞ্জন-কারণ-করুণং
তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্ ॥ ২ ॥

যাঁর বাক্য গদগদ, অন্তর ভাববিকারে দ্রবীভূত, যাঁর হুঙ্কারে (সিংহনাদে) দুর্জনগণ ভীত হয়, যাঁর করুণা সংসারভীতি খণ্ডন করে, সেই শ্রীশচীতনয়কে প্রণাম করি।

অরুণাম্বর-ধর-চারু-কপোলং
ইন্দু-বিনিন্দিত-নখচয়-রুচিরম্।
জল্পিত-নিজগুণ-নাম-বিনোদং
তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্ ॥ ৩ ॥

যাঁর পরিধানে অরুণবসন, যাঁর সুন্দর গণ্ডদেশ ও নখকান্তি চন্দ্রকে নিন্দা করে, যিনি নিজের (শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের) নাম, গুণ ও লীলা কীর্তন করেন অথবা নিজ নাম গুণকীর্তনে উল্লসিত হন, সেই শ্রীশচীতনয়কে প্রণাম করি।

বিগলিত-নয়ন-কমল-জলধারং
ভূষণ-নবরস-ভাববিকারম্।
গতি-অতি-মন্থর-নৃত্য-বিলাসং
তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্ ॥ ৪ ॥

যাঁর নয়নপদ্ম থেকে জলধারা বিগলিত হচ্ছে, নব নব অপ্রাকৃত রসাস্বাদজনিত ভাববিকারসমূহ যাঁর ভূষণ, যাঁর গমন অতি ধীর, যাঁর নৃত্য বিচিত্র, সেই শ্রীশচীতনয়কে আমি প্রণাম করি।

চঞ্চল-চারু-চরণ-গতি-রুচিরং
মঞ্জীর-রঞ্জিত পদযুগ-মধুরম্।
চন্দ্র-বিনিন্দিত-শীতল-বদনং
তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্ ॥ ৫ ॥

যাঁর চঞ্চল পদের গমনভঙ্গি মনোহর, (মঞ্জীর) নূপুর যাঁর পদদ্বয়ের (মাধুর্য) শোভা সম্পাদন করছে, যাঁর বদন চন্দ্র অপেক্ষা শীতল, সেই শ্রীশচীতনয়কে প্রণাম করি।

ধৃত-কটি-ডোর-কমণ্ডলু-দণ্ডং
দিব্য-কলেবর মুণ্ডিত-মুণ্ডং।
দুর্জন কল্মষ-খণ্ডন-দণ্ডং
তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্ ॥ ৬ ॥

কটিদেশে ডোর (কৌপিন-বহির্বাস), হস্তে দণ্ড, কমণ্ডলু প্রভৃতি ভূষণে বিভূষিত যাঁর দিব্য কলেবর, মস্তক মুণ্ডিত, যাঁর দণ্ড (ধারণ) দুর্জনগণের পাপ খণ্ডনের জন্য, সেই শ্রীশচীতনয়কে প্রণাম করি।

ভূষণ ভূরজ-অলকাবলিতং
কম্পিত-বিম্বাধরবর-রুচিরম্।
মলয়জ-বিরচিত-উজ্জ্বল-তিলকং
তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্ ॥ ৭ ॥

ধরণীর ধূলি নির্মিত অলকাসমূহ যাঁর ভূষণ, যাঁর বিম্বফলের মতো অধর কম্পিত হচ্ছে, যাঁর ললাটে উজ্জ্বল মলয়জ-চন্দনের তিলক শোভা পাচ্ছে, সেই শচীতনয়কে আমি প্রণাম করি।

নিন্দিত-অরুণ-কমলদল-লোচনং
আজানুলম্বিত-শ্রীভুজযুগলম্।
কলেবর কৈশোর নর্তকবেশং
তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্ ॥ ৮ ॥

যাঁর নেত্রযুগল রক্তপদ্মের পত্রতুল্য, বাহুযুগল জানুদেশ পর্যন্ত আলম্বিত, কিশোর-শরীর, নর্তকবেশ, সেই শ্রীশচীতনয়কে আমি প্রণাম করি।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এমন এক সময়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন, যখন অন্ততপক্ষে বঙ্গদেশের এই অঞ্চলটির অতিশয় অবনতি ঘটেছিল। কেবলমাত্র বঙ্গদেশের এই অংশটিই নয়, প্রকৃতপক্ষে সমগ্র ভারতেই নিদারুণ অবনতি হয়েছিল এবং ভারতবর্ষ এক সঙ্কটময় অবস্থার মধ্যে দিয়ে চলেছিল, আর যে কেউ অনুমান করতে পারবে যে, সেই সময়ে পৃথিবীর অবস্থাও হয়ে উঠেছিল বিশেষ দুর্বিপাকগ্রস্ত।

পাঁচশ বছর আগে যখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আবির্ভূত হন, তখন ভারতবর্ষ ছিল মুসলমান কবলিত। কলিযুগ শুরু হওয়ার আগে, ভারতবর্ষে বৈদিক সংস্কৃতি চর্চা করা হতো এবং ভারতবর্ষের শাসকরাই সমগ্র পৃথিবী শাসন করতেন। সমগ্র সসাগরা এই পৃথিবীর সর্বশেষ সম্রাট ছিলেন পরীক্ষিৎ মহারাজ। আর পরীক্ষিৎ মহারাজের শাসনকাল থেকেই কলিযুগের সূচনা হয় এবং অবনতি শুরু হয়। অধর্মের ব্যাপকতা শুরু হয় এবং ধর্ম লোপ পেতে থাকে। অল্প দিনের মধ্যেই বৈদিক সংস্কৃতি বিলুপ্ত হয়, অথচ সেই বৈদিক সংস্কৃতি যা পূর্বে ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেছিল সমগ্র পৃথিবীতে, তা আসুরিক প্রভাবে লোপ পেতে থাকে।

প্রকৃতপক্ষে ধর্মের বিলুপ্তি ঘটেছিল ব্রাহ্মণ বংশজাত আসুরিক মানুষদেরই অত্যাচারে এবং কলিযুগের বিশৃঙ্খলার সুযোগে। ব্রাহ্মণ বংশজাত ঐ সমস্ত আসুরিক মানুষগুলিই ব্রাহ্মণ ধর্ম ও সংস্কৃতিকে বস্তুত ধ্বংস করে ফেলে। এই অপকর্মটি তারা করেছিল কলির প্ররোচনায়—যাতে কলির অনুপ্রবেশ সহজসাধ্য হয় এবং অধর্মের কায়েম হয়।

তারই ফলে, ভারতবর্ষ কেবল যে সমগ্র পৃথিবীর আধিপত্য থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ে, তাই নয়—ভারতবর্ষ ক্রমে বৈদিক সংস্কৃতি-বিরোধী মুসলমানদেরও নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে পড়েছিল। বাস্তবিকই, মুসলমানেরা সুনির্দিষ্টভাবেই প্রতিজ্ঞা করেছিল যে, তারা ভারতবর্ষের বৈদিক সংস্কৃতির একেবারে বিপরীতধর্মী কার্যকলাপে প্রবৃত্ত হয়ে ঐ সংস্কৃতির ঐতিহ্য ধ্বংস করে দেবে।

এই সম্পর্কে একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে—বৈদিক সংস্কৃতিতে ক্ষত্রিয়েরা গোঁফ রাখত, আর এই বৈদিক ধারার বিরোধিতা করবারই উদ্দেশ্যে মুসলমানেরা তাদের গোঁফ ফেলে দিয়ে দাড়ি রাখতে শুরু করেছিল।

তেমনই, বৈদিক সংস্কৃতি অনুযায়ী গাভীকে অতি পবিত্র প্রাণী রূপে গণ্য করা হয়ে থাকে আর মুসলমানেরা সেই গাভীকেই হত্যা করে বৈদিক সংস্কৃতির উপরে আঘাত হানতে শুরু করেছিল। প্রকৃতপক্ষে, মুসলমানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কোরানের মধ্যে কোথাও উল্লেখ করা নেই যে, মুসলমানদের গাভী হত্যা করে জীবন ধারণ করতেই হবে। বরং, কোরান গ্রন্থে গাভীকে মর্যাদাই দেওয়া হয়েছে। আর, তা ছাড়া, গাভী হত্যার কোনও প্রশ্নই মুসলমানদের সংস্কৃতিতে উত্থাপনের অবকাশ ছিল না, কারণ মুসলমানদের আদি উৎপত্তিস্থান মধ্যপ্রাচ্যের মরু অঞ্চলে গাভী বলে কোনও প্রাণীই ছিল না। যদিও বা সেখানে কারও কাছে একটি গাভী থাকত, তবে তাঁকে লাখপতি ধনী বলে গণ্যমান্য করা হতো।

কিন্তু সেই মুসলমানেরা যখন ভারতবর্ষে এল, তারা বৈদিক সংস্কৃতিকে নষ্ট করে ফেলার মতলবে এমন একটা নীতি নির্ধারণ করল, যা বৈদিক সভ্যতার সম্পূর্ণ বিরোধী। ব্রাহ্মণেরা মাথার পিছনে শিখা রাখেন, তাই তার বিরুদ্ধাচরণ দেখিয়ে মুসলমানেরা তাদের মাথার সামনে চুলের ঝুঁটি রাখতে শুরু করেছিল। তাই লক্ষ্য করা গেছে, তারা বৈদিক সংস্কৃতির সম্পূর্ণ বিরুদ্ধাচরণ করবার মনোবৃত্তি নিয়েই এদেশে সব কিছু করতে শুরু করে।

এই কারণেই মুসলমানেরা নির্বিচারে ব্রাহ্মণ হত্যা করে দারুণ মজা পেত এবং এমন একটা সময় এসেছিল, যখন এইভাবে সারা ভারতবর্ষ মুসলমানদের পদানত হয়ে পড়ে এবং তখনই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অবতীর্ণ হন। সেই সমস্ত হিন্দুরা, অর্থাৎ বৈদিক সংস্কৃতির ধারক ও বাহকেরা মুসলমানদের অত্যাচারে পর্যুদস্ত হয়ে পড়েছিল।

তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আগমন হয় এবং তাঁর আগমনের সময়ে বঙ্গদেশ ছিল মুসলমান শাসনাধীন। এইভাবে অতি সংকটকালে, অতি কঠিন সময়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আবির্ভূত হয়ে প্রকৃতপক্ষে আমাদের দেখিয়েছেন যে, তিনি যে-পথ অনুসরণ করতে শিক্ষা দিয়েছেন, আমরা নির্ভয়ে সেই পথ অনুসরণ করে ভগবানের বাণী প্রচার করে চললে কোনও বিষয়েই চিন্তিত হবার কোনও কারণ নেই।

আমাদের জীবদ্দশাতেই আমরা তার প্রমাণ দেখতে পেয়েছি, আমাদের অভিজ্ঞতা হয়েছে—ইতিমধ্যেই কয়েক বছর আগেও আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের ভক্তরা কিভাবে রাশিয়াতে নির্যাতিত হয়েছেন, কিন্তু দেখেছি, ভক্তরা নানাভাবে অত্যাচারিত হলেও, হতোদ্যম হননি। তাঁরা কৃষ্ণকথা প্রচার

চালিয়ে গেছেন, কারণ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁদের অনুপ্রেরণা দিয়েছেন তাঁদের অন্তর থেকে। সেই প্রেরণা তাঁদের প্রাণে এমনই অসামান্য শক্তির সঞ্চার করেছে, যার ফলে দেখতে না দেখতে নাস্তিক কম্যুনিস্ট সরকার উৎখাত হয়ে গেছে রাশিয়া থেকে—কেবল রাশিয়া থেকেই নয়—সমগ্র পৃথিবীর অন্যান্য সমস্ত দেশ থেকেই নাস্তিকতার বিলুপ্তি ঘটতে শুরু করেছে।

অতি সঙ্কটময় পরিস্থিতির মাঝে স্বয়ং আবির্ভূত হয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আমাদের এই উপদেশ উপলব্ধি করবারই সুযোগ দিয়েছেন যে, সঙ্কটকালেই ধীর স্থির থেকে দৃঢ় মনোভাবাপন্ন হয়ে তাঁর বাণী প্রচার করে যেতে হবে। তা হলে ক্রমেই বৈদিক সংস্কৃতি কেবলমাত্র এই বঙ্গদেশেই নয়, বিশ্বব্যাপী আবার মাথা তুলে দাঁড়াবে এবং বিশ্ববাসীর সমূহ অবনতি রোধ করতে পারবে।

অত্যন্ত দুর্লভ প্রেম করিবারে দান

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বর্ণনা করেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু জীবদের প্রতি দয়া করে অত্যন্ত দুর্লভ কৃষ্ণপ্রেম দান করার জন্য অবতীর্ণ হয়েছেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি'।
স্বপার্ষদ স্বীয় ধাম সহ অবতরি ॥'
অত্যন্ত দুর্লভ প্রেম করিবারে দান।
শিখায় শরণাগতি ভকতের প্রাণ ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ব্রজলীলা বিলাস করার পর তিনি এই কলির প্রথম সন্ধ্যায় আবির্ভূত হয়েছেন ভক্তরূপে।

ভগবান এই অবতারে তাঁর ভগবত্তা প্রকাশ করে আসেননি। তিনি এসেছেন ভক্তরূপে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতী রাধারাণীর ভাব এবং অঙ্গকান্তি অবলম্বন করে অবতীর্ণ হয়েছেন এই নবদ্বীপ মায়াপুরে।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রাধাকৃষ্ণ নহে অন্য" শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে রাধাকৃষ্ণের কোন পার্থক্য নেই। তারা অন্য কেউ নন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যই

হচ্ছেন রাধাকৃষ্ণের মিলিত তনু। রাধা এবং কৃষ্ণ যখন একত্রীভূত হন তখন তিনিই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু। শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণ যখন রাধারাণীর অঙ্গকান্তি এবং ভাব অবলম্বন করে...শ্রীমতী রাধারাণীর অঙ্গকান্তি হচ্ছে তপ্ত কাঞ্চনের মতো, কাঁচা সোনার মতো এবং শ্রীমতী রাধারাণীর অন্তরের ভাব হল ভক্তির মহাভাব। তাঁর অঙ্গকান্তি ও ভাব অবলম্বন করে শ্রীকৃষ্ণ যখন আসেন, তখন তিনিই হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু।

শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। ঠিক তেমনই শ্রীকৃষ্ণের ধাম বৃন্দাবন এবং এই মায়াপুরের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। বৃন্দাবন হচ্ছে এই জড় জগতের ঊর্ধ্বে চিন্ময় জগৎ। সেই চিন্ময় জগতের সর্ব্বোচ্চ স্থান। এই জড় এবং চিৎ জগতের যে ভূগোল Geography বা তার বর্ণনা করে বলা হচ্ছে, এই জড় জগতের ঊর্ধ্বে হচ্ছে বিরজা অর্থাৎ কারণ সমুদ্র। এই ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করে যদি আমরা যাই তবে কারণ সমুদ্র দেখতে পাব। সেই কারণ-সমুদ্রের ঊর্ধ্বে ব্রহ্মজ্যোতি। এভাবে সেই ব্রহ্মজ্যোতিতে অসংখ্য বৈকুণ্ঠলোক রয়েছে। চিন্ময় জগতে অসংখ্য বৈকুণ্ঠ লোক রয়েছে। সেই বৈকুণ্ঠের সর্বোচ্চ স্থান বা সর্ব্বোচ্চ স্তর হচ্ছে গোলোক বৃন্দাবন। সেই গোলোকের একদিক হচ্ছে বৃন্দাবন এবং অপর দিক হচ্ছে নবদ্বীপ। গোলোকের একটি প্রকোষ্ঠ বৃন্দাবন এবং আর একটি প্রকোষ্ঠ নবদ্বীপ। শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে যে লীলাবিলাস করছেন তারই প্রতিরূপ এই নবদ্বীপ। বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজগোপিকাদের সঙ্গে রাস লীলা-বিলাস করছেন তাঁর পার্ষদদের সঙ্গে। আর সেই কৃষ্ণ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রূপে তাঁর পার্ষদদের সঙ্গে সংকীর্তন লীলা বিলাস করছেন। তিনি বৃন্দাবনে যে কৃষ্ণপ্রেম আস্বাদন করছেন, নবদ্বীপে তিনি সেই প্রেম বিতরণ করছেন। পার্থক্য কেবল একই লীলার দুটি দিক। এক লীলায় শ্রীকৃষ্ণ প্রেম আস্বাদন করছেন, আর অন্য লীলায় সেই প্রেম বিতরণ করছেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে। তিনি মাধুর্যলীলায় কৃষ্ণপ্রেম বা প্রেমভক্তি আস্বাদন করছেন আর নবদ্বীপে ঔদার্যলীলায় অত্যন্ত উদারভাবে তিনি সেই প্রেম বা প্রেমভক্তি বিতরণ করছেন। বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের যে লীলা সেটি সর্বোত্তম বা সর্বশ্রেষ্ঠ।

জয় জয়োজ্জ্বল-রস সর্বরসসার।
পরকীয়া ভাবে যাহা ব্রজেতে প্রচার॥

রস হচ্ছে আনন্দ আস্বাদনের বা সম্পর্ক স্থাপনের ভিত্তি। যে বস্তুটির দ্বারা ভাবের বিনিময় হয় বা সম্পর্ক স্থাপন হয় সেটিই হচ্ছে রস। এখন সমস্ত রসের

মধ্যে এই রস বারো প্রকার। তার মধ্যে ৫টি মুখ্য এবং ৭টি গৌণ। ৫টি মুখ্যরস হচ্ছে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর। আর ৭টি গৌণরস—হাস্য, অদ্ভুত, বীর, রৌদ্র, ভয়ানক, করুণ, বীভৎস্য। এখন এই ১২টি রসের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ—'জয় জয় উজ্জ্বলরস সর্বরস সার।'

সমস্ত রসের যে সারাতি সার সেইটি ব্রজে 'পরকীয়া ভাবে যাহা ব্রজেতে প্রচার।'

সেই বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের যে লীলা তা মাধুর্য-উজ্জ্বল রসের প্রকাশ। এখন সেই ব্রজের সম্পদটি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে নবদ্বীপে তা বিতরণ করছেন ওদার্য রসে। তিনি অকাতরে কোন রকমের যোগ্যতা-অযোগ্যতা বিচার না করে সেই বস্তুটি তিনি সকলকে দান করছেন। এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলাস্থলী হচ্ছে এই মায়াপুর। নবদ্বীপ হচ্ছে ৯টি দ্বীপ। এই দ্বীপটি ভগবদ্‌ধাম। আর তার রূপটি—

"সহস্রপত্রকমলং গোকুলাখ্যং মহৎপদম্"—গোকুল সেটি সহস্র পত্র সমন্বিত, হাজার হাজার পাপড়ি সমন্বিত একটি পদ্মের মতো। এই পদ্মের মাঝখানে রয়েছে একটি কোরক। কোরকের চারপাশে প্রথম পংক্তিতে রয়েছে ৮টি পাপড়ি বা পত্র। সেই কোরকটি হচ্ছে এই অন্তর্দ্বীপ বা মায়াপুর। আর তার চার পাশে ৮টি পাপড়ি হচ্ছে আটটি দ্বীপ—সীমন্ত দ্বীপ, গোদ্রুম দ্বীপ, মোদদ্রুম দ্বীপ, জহ্নুদ্বীপ, কোলদ্বীপ, ঋতুদ্বীপ ও রুদ্রদ্বীপ। এই অন্তর্দ্বীপের ঠিক মাঝখানে রয়েছে যোগপীঠ। সেই যোগপীঠে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আবির্ভূত হয়েছেন। যেটি হচ্ছে তাঁর জন্মলীলা স্থান। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই নবদ্বীপে লীলা বিলাস করেছেন তাঁর প্রথম ২৪ বছর। অর্থাৎ তাঁর জন্মলীলা থেকে কৌমারলীলা। বাল্যলীলা, কৌমার লীলা, কৈশোর লীলা এভাবে গার্হস্থ্য লীলা। গার্হস্থ্য লীলার পর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করেন ২৪ বছর বয়সে। সেই সন্ন্যাস লীলায় মহাপ্রভু বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করেন এবং বিশেষভাবে তিনি জগন্নাথপুরীতে অবস্থান করেছিলেন। বাকি ২৪ বছরের মধ্যে ৬ বছর তিনি ভ্রমণ লীলা করেন। আর বাকি ১৮ বছর তিনি জগন্নাথপুরীতে ছিলেন। শ্রীজগন্নাথপুরীতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর যে লীলা সেটি বিপ্রলম্ভের পরাকাষ্ঠা। শ্রীকৃষ্ণের বিরহে ভক্তের যে আকুলতা, কৃষ্ণের বিরহে রাধারাণীর যে আকুলতা, সেই আকুলতাটি চৈতন্য মহাপ্রভু জগন্নাথপুরীতে আস্বাদন করেন। এইভাবে বিপ্রলম্ভ ভাব প্রকাশ করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আমাদের শিক্ষা দিলেন কিভাবে ভক্ত হতে হয়। সম্ভোগ আর

বিপ্রলম্ভ—প্রেমের সম্পর্ক। মহাপ্রভু দেখিয়ে গেলেন বিপ্রলম্ভই হচ্ছে ভগবদ্ভক্তি আস্বাদনের সর্বশ্রেষ্ঠ স্তর। এবং সেই বিপ্রলম্ভ ভাব অবলম্বন করে বা সেই বিরহে আকুল হয়ে ভগবানের প্রতি ভক্তি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রদর্শন করে গেছেন। সেই বস্তুটি শ্রীল প্রভুপাদ সারা পৃথিবী জুড়ে বিতরণ করে গেছেন। আপাতদৃষ্টিতে যদিও ইস্‌কনের উদ্দেশ্য হচ্ছে কৃষ্ণভক্তি প্রচার করা কিন্তু সেই প্রচারকার্য সাধনের সময় এককালে কৃষ্ণের কৃপায় শুদ্ধভক্তির প্রকাশ হৃদয়ে হবে এবং সেটিই হচ্ছে জীবনের চরম লক্ষ্য। সুতরাং যারা এই কৃষ্ণভক্তি অর্জন করতে পারে তাদের বুঝতে হবে এটি এক মহা সৌভাগ্যের ফল স্বরূপ। অত্যন্ত অমূল্য কোন সম্পদ লাভ করলে যেমন আমরা নিজেদের অত্যন্ত ভাগ্যবান বলে মনে করি। এই ব্যাপারেও আমাদের অত্যন্ত ভাগ্যবান বলে মনে করতে হবে। যে কি এক চরম সৌভাগ্যের ফলে আজ এমন একটি দুর্লভ বস্তু লাভ করতে পেরেছি। এখন সেই দুর্লভ সম্পদটি যথাযথভাবে আগলে রেখে সন্তর্পণে অর্থাৎ অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে সম্পর্কটিকে আগলে রেখে সম্পত্তিটির সদ্ব্যবহার করতে হবে। এই সম্পত্তির কাছে অন্য সব কিছু অত্যন্ত তুচ্ছ, নগণ্য হয়ে যায়। কৃষ্ণ ভক্তির কাছে কৈবল্যং নরকায়তে—মুক্তি নরক সদৃশ বলে মনে হয়। ত্রিদশপুরাকাশপুষ্পায়তে—স্বর্গসুখকে আকাশ কুসুম বলে মনে হয়। দুর্দান্ত-ইন্দ্রিয়-কালসর্পপটলী প্রোৎখাত দংষ্ট্রায়তে—অদম্য, দুর্দমনীয় এই সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি যাকে কিছুতেই বশ করা যায় না। যে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য সর্বদা লালায়িত হয়ে কত রকমের অকার্য কুকার্য করা হয়ে থাকে। কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায় যখন এই কৃষ্ণভক্তি লাভ হয় তখন সেই ইন্দ্রিয়গুলি দাঁত ভাঙা সর্পের মতো মনে হয়। প্রোৎখাত দংষ্ট্রায়তে। বিষধর সাপের দাঁতগুলি যদি ভেঙে দেওয়া হয়, তখন কি আর ভয় থাকে! ঠিক তেমন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায় যখন কৃষ্ণভক্তি লাভ হয় ইন্দ্রিয়গুলি প্রকৃষ্টরূপে উৎখাত-দন্ত সাপের মতো হয়ে যায়। সেগুলি তখন ক্ষতি করতে পারে না। ইন্দ্রিয়গুলির কার্যকলাপ থাকে কিন্তু তা থেকে কোনো রকমের ভয়ের কিছু থাকে না। এমনই এক অপূর্ব সুন্দর সম্পদ হচ্ছে এই কৃষ্ণভক্তি। যা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায় আজকে আমরা লাভ করতে পেরেছি। এখন এই সম্পদটিকে আমাদের যথাযথভাবে সদ্ব্যবহার করতে হবে। নিজে গ্রহণ করাটাই যথেষ্ট হবে না। নিজে গ্রহণ করে সেটি অন্যদের কাছে বিতরণ করতে হবে। এই কাজটি মহাপ্রভু স্বয়ং দিয়ে গেছেন। এই দায়িত্বভার। মহাপ্রভু বলছেন "যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ উপদেশ।" যাকে

দেখ তাকে কৃষ্ণের বাণী, কথা উপদেশ দাও। ভগবদ্গীতায় যে কথাগুলি শ্রীকৃষ্ণ বলে গেছেন সেই কথাগুলি প্রচার কর। জীবকে এই বস্তুটি দান কর। তার ফলে শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন হন। শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলেছেন যারা কৃষ্ণভক্তির প্রচার করে তারা তাঁর সবচাইতে প্রিয়। অতএব শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি সাধনের জন্য অথবা কৃষ্ণের কৃপালাভের জন্য আমাদের এই কৃষ্ণভক্তি প্রচারে যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত এবং আমাদের যতটুকু ক্ষমতা সেই ক্ষমতা অনুসারে আমাদের প্রচার করতে হবে। কারো ক্ষমতা অনেক বেশী থাকে সে অনেক ব্যাপক ভাবে প্রচার করবে। যাদের ক্ষমতা কম তারা অল্প বা স্বল্পভাবে প্রচার করবে। কিন্তু প্রচার আমাদের সকলকে করতে হবে।

কতলোক মায়াপুরে আসে। তারা অনেকেই কৃষ্ণভক্তি লাভ করেনি। তাদের কাছে আমরা গিয়ে বলতে পারি। শ্রীকৃষ্ণ কে? শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কে? মহাপ্রভুর যে দান সেটি কিরূপ অদ্ভুত। কি অপূর্ব সুন্দর, কি দুর্লভ বস্তু। কখনও মনে করা উচিত নয় যে, আমি কি করে প্রচার করব। না যতটুকু জান ততটুকু প্রচার কর। কৃষ্ণ—ভগবান, এটুকুই যদি আমরা বোঝাতে পারি তাহলেই হবে। এ সম্পর্কে একটি দৃষ্টান্ত আমার মনে পড়ে। শ্রীল প্রভুপাদ তখন ভারতবর্ষে। প্রভুপাদের সঙ্গে তাঁর সচিব শ্যামসুন্দর প্রভু এবং তার স্ত্রী মালতীও রয়েছে, শ্যামসুন্দর ও মালতীর একটি ছোট্ট মেয়ে ছিল—সরস্বতী। সরস্বতীর বয়স তখন ৬ বছর। একদিন একজন মন্ত্রী প্রভুপাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। যখন প্রভুপাদের সঙ্গে কথা বলার জন্য অপেক্ষা করছিলেন তখন সরস্বতী গিয়ে মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে শুরু করল। সরস্বতী তাকে জিজ্ঞাসা করে 'তুমি জান কৃষ্ণ কে?' সেই মন্ত্রী বলেন—'জানি না।' সরস্বতী বলে—'ও! তুমি জান না কৃষ্ণ কে? কৃষ্ণ ভগবান।' প্রভুপাদ যখন এই কথাটি শুনলেন তখন তিনি খুব প্রসন্ন হন। তিনি বললেন, দেখ কৃষ্ণভাবনামৃতের পথটি এমনি। যতটুকু আমরা জানি ততটুকুই বলতে হয়। অন্তত এটা আমরা জানি যে, কৃষ্ণ ভগবান। কৃষ্ণ ভগবান—এই বিশ্বাসটুকুই যদি আমাদের হয়ে থাকে, এটা আমরা সারা জগতের কাছে প্রচার করতে পারি।

একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য। অথচ আমরা যখন এই পৃথিবীর সর্বত্র দেখি তখন কি দেখি? তারা কি নিজেকে কৃষ্ণের ভৃত্য বলে মনে করছে? তারা সকলে মনে করছে তারা সকলের প্রভু। আর কৃষ্ণ কে? তারা মনে করে কৃষ্ণ এক ঐতিহাসিক ব্যক্তি। অতএব ভেবে দেখো কত বড় একটা কাজ পড়ে আছে। এখন এই কাজগুলি কে করবে? তাই আমাদের প্রচার করতে হবে।

প্রচারের পদ্ধতি হচ্ছে যদি হৃদয় জয় করা যায়, তখন যা বোঝানো হয় সেটিই সকলে গ্রহণ করবে। তাই সর্বাগ্রে আমাদের চেষ্টা করতে হবে হৃদয় জয় করা। প্রচার মানে হচ্ছে সেই দুর্লভ বস্তুটি তাদের দান করা। মানুষ কতভাবে দুঃখ কষ্ট ভোগ করছে। কিন্তু এই বস্তুটি লাভ করলে তাদের সমস্ত দুঃখ-কষ্টের নিরসন হবে। তাই কৃষ্ণভক্তি প্রচারের এত প্রয়োজন।

মন লাগামটি কৃষ্ণের হাতে দিন

বিভিন্ন দেবতারা বিভিন্ন গ্রহ নক্ষত্রের অধ্যক্ষতা করলেও প্রকৃতপক্ষে এগুলি ভগবানেরই নির্দেশনায় সম্পাদিত হয়। কিন্তু হিরণ্যকশিপু স্বর্গলোক অধিকার করার ফলে সে সমস্ত স্বর্গীয় ব্যবস্থাপনাগুলিও অধিকার করে বসেছিল। ফলে পবনদেব আর বায়ুর পরিচালনা করছিলেন না, ইন্দ্র বারি বর্ষণের কার্য পরিচালনা করছিলেন না এবং অগ্নিদেব আগুনের পরিচালনা করছিলেন না। সেগুলি পরিচালনা করছিল হিরণ্যকশিপু। তার ফল কি হয়েছিল? তারফলে আপাতদৃষ্টিতে দেখা যায় যে হিরণ্যকশিপুর ব্যবস্থাপনায় এমন সুন্দরভাবে প্রকৃতি পরিচালিত হচ্ছিল যে, সমস্ত ঋতুতেই সমস্ত বৃক্ষলতা ফলে ফুলে শোভিত ছিল। যেমন এখন আমরা দেখতে পাই যে, সমস্ত ঋতুতেই সব কিছু পাওয়া যায়। আগে একটি বিশেষ সময়ে ফুলকপি বাঁধাকপি পাওয়া যেত। কিন্তু এখন প্রায় সারা বছর ধরেই ফুলকপি বাঁধাকপি পাওয়া যায়, তেমনি পটল, পালং শাক এগুলি একটি বিশেষ সময়ে পাওয়া যেত, কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে এই সমস্ত শাক-সব্জিগুলি সারা বছর ধরেই পাওয়া যায়। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় এটা খুব ভাল হচ্ছে, প্রকৃতপক্ষে তা নয়। বিশেষ ঋতুতে বিশেষ ফল ফুল শাক সব্জি হওয়ার ফলে সেগুলির একটি বিশেষ প্রভাব ছিল সেই ঋতু অনুযায়ী। কিন্তু সে প্রভাবগুলি নিয়ন্ত্রণ করেন কে? ভগবানের নির্দেশনায় সেগুলি নিয়ন্ত্রণ করেন ভগবানের দ্বারা নিয়োজিত যে সমস্ত অধ্যক্ষ রয়েছেন, তাঁরা। কিন্তু যখন আসুরিক সভ্যতার বিকাশ হয়, যার প্রতীক হচ্ছে হিরণ্যকশিপু, তখন আসুরিক সভ্যতার প্রভাবে কি হয়? গূঢ় কারণটি বা গূঢ় প্রয়োজনটির ব্যাপারে তারা মাথা ঘামায় না, তারা আপাত কারণটি নিয়েই ব্যস্ত

থাকে। আপাতদৃষ্টিতে সারা বছরই যদি সব রকমের ফুল, সব রকমের ফল পাওয়া যেত তাহলে ভালই হতো বলে মনে হয় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেটা ভাল নয়। চরম বিচার্য বিষয় ভগবান যেভাবে করেছেন সেই ভাবে চলাটাই আমাদের পক্ষে মঙ্গলজনক, সকলের পক্ষেই মঙ্গল জনক। কিন্তু যারা ভগবদ্‌বিদ্বেষী তারা ভগবানের নিয়মটি উল্টে দিয়ে তাদের নিজেদের নিয়ম প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু তার ফলে কি হয়, একটা সময়ে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়ে একটা প্রচণ্ড ধ্বংসাত্মক পরিস্থিতি গড়ে ওঠে। যেমন ভগবানের নিয়মে যারা ভারতবর্ষের মতো দেশে জন্ম গ্রহণ করে, তারা তাদের পুণ্যের ফলে এদেশে জন্ম গ্রহণ করে এবং ভারতবর্ষের মতো দেশে জন্ম গ্রহণ করার ফলে প্রকৃতির নিয়মেই নানারকম সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায়। যেমন ভারতবর্ষে প্রকৃতির দান অত্যন্ত বহুল পরিমাণে বর্ষিত হয়। ভারতবর্ষ এমন একটি দেশ যেখানে অনায়াসে সব কিছু লাভ হয়। জীবনযাত্রা অত্যন্ত সরল, সহজ, এখানে প্রাকৃতিক পরিবেশ এমন যে এখানে গাছের তলায় শুয়ে রাত কাটানো যায়। খোলা আকাশের নীচে শুয়ে অনেক মানুষ এখনও ভারতবর্ষে দিন কাটায়। শ্রীল প্রভুপাদ নিজেও গরমের সময় ছাদের উপরে খোলা আকাশের নীচে ঘুমাতেন, ঘরে ঘুমাতেন না এবং ভারতবর্ষের মতো দেশে যে কোন জায়গায় গেলেই প্রচুর পরিমাণে খাবার পাওয়া যায়। গ্রামের দিকে গেলে ফল মূল শাক সব্জি এগুলি অনায়াসে পাওয়া যায়। কিন্তু পৃথিবীর অন্যান্য যে দেশগুলি—ইউরোপ, আমেরিকা সেখানে মানুষ সেইভাবে জীবন যাপন করতে পারে না। ইউরোপ আমেরিকায় কেবল গ্রীষ্মকালটাতেই একটুখানি গরম, তাছাড়া অন্যান্য সময় এতো ঠাণ্ডা যে বাইরে শোয়ার কথা, এমন কি গ্রীষ্মকালেও, কেউ ভাবতে পারে না। শীতের সময় তো প্রচুর তুষারপাত হয়। সুতরাং হিটিং এর ব্যবস্থা না থাকলে মানুষ মরে যাবে তাই এখানে জীবন অত্যন্ত কঠিন ছিল। কিন্তু আসুরিক সভ্যতার প্রভাবে ঐ খানের জীবনটা সরল হয়ে গেছে আর ভারতবর্ষের মতো দেশে জীবনটা অত্যন্ত কঠিন হয়ে গেছে। এখন ভারতবর্ষের লোকেরা মনে করে এটা অত্যন্ত দরিদ্র দেশ কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষ সবচাইতে ঐশ্বর্য মণ্ডিত। কিন্তু আধুনিক তথাকথিত সভ্যতার বিচারে ধন-সম্পদের মাপকাঠি কি? কল কারখানা এবং যান্ত্রিক প্রগতি। এখন ওদের দেশে অর্থাৎ পাশ্চাত্যে যান্ত্রিক প্রগতির প্রয়োজন রয়েছে কিন্তু ভারতবর্ষে যান্ত্রিক প্রগতির তেমন প্রয়োজন নেই। সাধারণভাবে জীবন যাত্রা নির্বাহের জন্য আমাদের এখানে বিশাল বিশাল যন্ত্র তৈরী করার কোন প্রয়োজন হয় না।

পক্ষান্তরে অত্যন্ত সরলভাবে অত্যন্ত সহজভাবে এখানে মানুষ অনায়াসে জীবন যাত্রা নির্বাহ করতে পারে। ভারতবর্ষের মতো জায়গায় কারও যদি দু'বিঘে জমি থাকে, একটা পরিবারের খুব অনায়াসে ভরণ পোষণ হয়ে যায়। দু'বিঘে জমি আর একটা থাকার বাড়ি। এটা যদি থাকে তাহলে একটা পরিবারে অনায়াসে এখানে ভালমতো বেঁচে থাকতে পারে। এটা শ্রীল প্রভুপাদেরই কথা, "দু বিঘে জমি, দুটো গরু আর একটা বাড়ি" আর কোন কিছু ভাবতে হবে না। কিন্তু আমেরিকা ইউরোপের মতো জায়গায় দু'বিঘে কেন ২০০ বিঘে জমি থাকলেও যন্ত্রের সাহায্য ছাড়া বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। কেননা সেই জমিতে কি চাষ করবে? শীতের সময় সমস্ত জমি বরফে ঢাকা থাকে, বসন্তে বরফ গলতে শুরু করে তারপর গ্রীষ্মের সময় একটু খানি গরম পড়ে।

এ তো গেল ইউরোপ আমেরিকার কথা, সেখানের পরিস্থিতি তো তাও ভাল, এখন শাস্ত্রে বলা হয়েছে—যারা অত্যন্ত পাপী, যারা মহাপাপী তাদের জন্ম হয় মরুভূমিতে অর্থাৎ এখন যা আরব অর্থাৎ মধ্য-প্রাচ্যের দেশগুলি, সেই দেশগুলো হচ্ছে মরুভূমি এবং সেই মরুভূমিতে জন্ম কাদের হয়? যারা মহা পাতকী তাদের জন্ম হয় মরুভূমিতে। মরুভূমিতে জন্ম হওয়ার ফলে তাদের প্রচণ্ড কষ্ট স্বীকার করতে হয়। একে তো সেখানে প্রচণ্ড গরম, দ্বিতীয়ত সেখানে খাবার নেই, জল নেই, প্রচণ্ড কষ্টকর তাদের জীবন। কিন্তু আজকে দেখতে পাচ্ছি, যে দেশগুলি মরুভূমি সেই দেশগুলিই সবচেয়ে ধনী হয়ে গেছে। এইভাবে কলির প্রভাবে সমস্ত পরিস্থিতিটা উল্টে গেছে। এটাই কলিযুগের প্রভাব অর্থাৎ অধর্মের যুগ। অন্যান্য যুগে মানুষের ধর্মের প্রভাবে সুখ ভোগ হয় আর অধর্মের প্রভাবে দুঃখ ভোগ হয়। কিন্তু কলিযুগ যেহেতু অধর্মের যুগ তাই অধর্মের প্রভাবে সুখ ভোগ হয়, আর ধর্মের প্রভাবে দুঃখ ভোগ হয়। সেইজন্য আরব এবং মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলি এত ধনবান হয়ে উঠেছে এত বিত্তশালী হয়ে উঠেছে। আর ভারতবর্ষ দারিদ্র্যে পর্যবসিত হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে তারা সুখে থাকলেও চরমে তাদের জীবন অত্যন্ত দুঃখময়। টাকা পয়সা থাকলেই কি সুখ হয়? পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য দেশগুলিতে আমরা দেখতে পাই, টাকা পয়সা যার যত বেশী আছে তার জীবন তত বেশী দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। মানুষ সেখানে রাতে ঘুমাতে পারে না, সাধারণতঃ দিনেও ঘুমাতে পারে না। তাই তাদের নানারকম মাদকদ্রব্য নিয়ে ঘুমাতে হয়। শুধু ঘুমানোই নয়, তাদের বেঁচে থাকাটাও মাদ্রকদ্রব্য ছাড়া দুষ্কর। আর সেই সমস্ত মাদকদ্রব্য শুধু মদ-মদিরাই নয়, তা অত্যন্ত উগ্রস্তরের বিষাক্ত মাদকদ্রব্য।

যারা বুদ্ধিমান তারা ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ন্ত্রিত করে জীবনযাপন করবে। আর যারা নির্বোধ তারা ইন্দ্রিয়ের দাস হয়ে জীবনযাপন করে। ইন্দ্রিয়ের দাস হয়ে জীবনযাপন করলে তার যতো কিছুই প্রাপ্তি হোক না কেন পরিণামে তার তৃপ্তি হয় না। আর অতৃপ্তি হচ্ছে দুঃখের কারণ। যদি কারও কাছে কিছু নাও থাকে কিন্তু অন্তরে তিনি যদি তৃপ্তি হন তাহলে তিনি সুখেই আছেন, আর যদি কারও কাছে সবকিছু থাকা সত্ত্বেও যদি তিনি অন্তরে অতৃপ্ত হন তাহলে তিনি দুঃখেই আছেন। তাহলে সুখ বা দুঃখের মূল কারণটি হচ্ছে তৃপ্তি এবং অতৃপ্তি, অন্তরে সন্তুষ্টি এবং অশান্তি। অন্তরে যিনি সন্তুষ্ট তার কাছে যদি কিছু নাও থাকে তবুও তিনি সুখী। আর অন্তরে যিনি অতৃপ্ত, অন্তরে যিনি অসন্তুষ্ট, অন্তরে যিনি অশান্ত, তার কাছে সবকিছু থাকলেও তিনি অসুখী। হিরণ্যকশিপুর মাধ্যমে আমরা দেখতে পাচ্ছি, যদিও সে প্রচণ্ড ক্ষমতাশালী হয়েছিল, ত্রিভুবন জয় করেছিল, স্বর্গের দেবতাদের স্বর্গ থেকে বিতাড়িত করে তার দাসের দাসে পরিণত করেছিল, হিরণ্যকশিপুর স্বর্গের দেবতাদের দিয়ে তার বাড়ির কাজ করাতো, কেউ তার ঘর মুছতো, কেউ তার বারান্দা ঝাড়ু দিত, কেউ তার জল বয়ে আনতো, স্বর্গের দেবতাদের দিয়ে সে তার নিজের কাজগুলি করাতো, এত ক্ষমতাশালী সে হয়ে গিয়েছিল। সে ত্রিভুবন জয় করে ত্রিভুবনের সমস্ত কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও হিরণ্যকশিপু অতৃপ্ত। কারণ সে তার ইন্দ্রিয়ের দাসে পরিণত হয়েছে। যারা ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব করে, যারা গো-দাস তারা সর্ব অবস্থাতেই অতৃপ্ত থাকে, কেন না ইন্দ্রিয়ের অবস্থাটিই এই রকম। ইন্দ্রিয় সব সময়ই ভোগ চাইছে। সে সর্বদাই বলে আমি এটা চাই আমি ওটা চাই। কিন্তু সে যতই পায় কখনও কি সে তৃপ্ত হয়? এই সম্বন্ধে বলা হয়েছে—আগুনে যেমন ঘি ঢালার ফলে কখনও আগুন নেভানো যায় না, ঠিক তেমনি ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করার মাধ্যমেও ইন্দ্রিয়গুলিকে তৃপ্ত করা যায় না।

না জাতো কামান্ উপভোগেন সংযতে। অর্থাৎ উপভোগের দ্বারা কখনই ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করা যায় না বা তৃপ্ত করা যায় না। অগ্নিতে যেমন ঘি ঢালার ফলে সেই আগুনটি কখনই নেভানো যায় না। ঘি ঢেলে কি আগুন নেভানো যায়? পক্ষান্তরে কি হয়? যত ঘি ঢালবে ততই আগুন বাড়তে থাকবে। আগুন উদ্দীপ্ত হয়ে উঠবে। অর্থাৎ যারা ইন্দ্রিয় উপভোগের মাধ্যমে তৃপ্তি সাধন করতে চায় তারা কখনই তৃপ্ত হতে পারে না।

তাহলে আমরা যদি প্রকৃতপক্ষে সুখী হতে চাই তবে আমাদের কি করতে হবে? ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব করার পরিবর্তে ইন্দ্রিয়কে সংযত করতে হবে। আমরা

যদি ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব করি, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় যা চায় তা যোগান দেওয়ার জন্য যদি আমরা তৎপর হই, তাহলে আমরা কোন দিনই সুখ ভোগ করতে পারব না। জড় জাগতিক জীবন মানে হচ্ছে ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব করা। চোখ বলছে আমাকে এটা দাও, তখন সঙ্গে সঙ্গে সে সেটা পাওয়ার জন্য তৎপর হচ্ছে। তাহলে সে কার দাসত্ব করছে? ইন্দ্রিয় বলছে আমাকে এটা দাও তখন সে সেটা পাওয়ার জন্য ছুটছে। তেমনি স্পর্শ ইন্দ্রিয় বলছে আমি এটা চাই, ঘ্রাণ ইন্দ্রিয় বলছে আমি এটা চাই, জিহ্বা ইন্দ্রিয় বলছে আমি এটা চাই এবং কর্ণ ইন্দ্রিয় বলছে আমি এটা চাই। এখন সেই বেচারা এই পাঁচ ব্যক্তির দাসত্ব করতে গিয়ে হিম-সিম খাচ্ছে। এক জনের দাসত্ব করাই কঠিন, আর পাঁচ জনের দাসত্ব করা, বিশেষ করে যখন পাঁচ জন এক সঙ্গে দাবী করতে থাকে, তখন তার অবস্থাটা কি রকম হয়? অতএব আমরা কি ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব করব, না ইন্দ্রিয়কে সংযত করব? ইন্দ্রিয় সংযম করার উপায়টি কি? ইন্দ্রিয় সংযমের উপায়টি হচ্ছে যেমন—আমাদের দেহটিকে যদি একটি রথের সঙ্গে তুলনা করি, ইন্দ্রিয়গুলিকে যদি পাঁচটি ঘোড়ার সঙ্গে তুলনা করি, পঞ্চ ইন্দ্রিয় পাঁচটি ঘোড়া, তাহলে এই রথটি কিভাবে আমাদের চালাতে হবে? ঘোড়াগুলিকে সংযত করার জন্য লাগাম দরকার। লাগামটি কি? মন। তাহলে এই মন দিয়ে ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করতে হবে। লাগাম ছাড়া কি ঘোড়াগুলি সামলানো যায়? আবার লাগামটাকে সংযত করতে হলেও একজন সুদক্ষ সারথি বা চালক প্রয়োজন। তাহলে এখানে সারথি কে? বুদ্ধি হচ্ছে সারথি, আবার বুদ্ধি নিজে নিজেও যথার্থ সারথ্য করতে পারে না। বুদ্ধি কি করে? যথার্থ সারথি কে? কৃষ্ণ। আমাদের বুদ্ধিটি যদি কৃষ্ণকে অর্পণ করি তাহলে ইন্দ্রিয়গুলি পরিচালিত হবে মনের দ্বারা। তাই ভগবদ্‌গীতার নির্দেশটি কি পাচ্ছি আমরা? মনটাকে কৃষ্ণকে অর্পণ কর—"মন্মনা ভব" তাহলে লাগামটা কৃষ্ণের হাতে তুলে দাও। লাগামটা যদি কৃষ্ণের হাতে তুলে দেওয়া হয় তাহলে ইন্দ্রিয়গুলি সংযত হবে। রথটা চলবে ঠিকমতো। দেহরূপ রথটা যদি ঠিকমতো চলে তাহলে আমাদের গন্তব্য স্থানটি কোথায়? ভগবদ্ধামে। অতএব প্রকৃত বুদ্ধিমানের কাজ কি? লাগামটি কৃষ্ণের হাতে তুলে দেওয়া। অতএব সেই জন্যই বলা হয়েছে মন্মনা ভব। "মন্মনা" হতে হলে কি করতে হবে? "মদ্ভক্ত" কৃষ্ণের ভক্ত না হলে মনটা শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে অর্পণ করা যাবে না। আবার যদি ভক্ত হই তাহলে কি হবে? "মদ্‌যাজি" যজনা করতে হবে। "মাম নমস্কুরু" কৃষ্ণের চরণে প্রণতি নিবেদন করে নিজেকে সর্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে অর্পণ করতে হবে।

ভগবদ্‌গীতায় বলা হয়েছে—

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ততে কামকারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্ ॥

(গীতা ১৬/২৩)

—অর্থাৎ যারা শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করে কামাচারে প্রবৃত্ত হয় তারা সিদ্ধি সুখ বা পরাগতি লাভ করতে পারে না।

—তাই যারা বুদ্ধিমান তারা শাস্ত্রবিধি অনুসরণ করবেন। এই যুগের শাস্ত্র বিধি হচ্ছে—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

(বৃহন্নারদীয়পুরাণ ৩/৮/১২৬)

এবং সেই সঙ্গে চারটি ধর্ম আচরণ—তপঃ, দয়া, শৌচ ও সত্য পালন করতে হবে আর সেটি পালনের জন্য আমিষ আহার, নেশা, অবৈধ যৌনসঙ্গ ও দ্যূতক্রীড়া বর্জন করতে হবে। ফলে যারা বুদ্ধিমান তারা শাস্ত্র অনুযায়ী জীবনযাপন করবেন। আর সেটা করতে সাধু সঙ্গে থাকতে হবে। সেই জন্য বলা হয়েছে কখনই ভক্তসঙ্গ ছেড়ে যেও না। সর্বদাই সাধুসঙ্গে বা ভক্তসঙ্গে থেকে ভগবানের সেবা কর। যদি সাধুসঙ্গ ছেড়ে আমরা চলে যাই, আমাদের ভগবদ্ভক্তি অনুশীলন করা দুষ্কর হয়ে উঠবে। ক্রমে ক্রমে আমরা মায়ার কবলিত হব।

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্বশাস্ত্রে কয়।
লব মাত্র সাধুসঙ্গে সর্বসিদ্ধি হয় ॥

শাস্ত্র শব্দটির অর্থ যা আমাদের কার্যকলাপকে নিয়ন্ত্রিত করে। শাস্ত্রবিধি কখনও লঙ্ঘন করা যায় না। কর্তব্য এবং অকর্তব্য নির্ধারণে শাস্ত্রই প্রমাণ। অতএব শাস্ত্র অনুসারে আচরণ করা কর্তব্য।

শাস্ত্রসম্মত বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন

শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধের ষড়বিংশতি অধ্যায়ে পুরাকালে রাজা পুরঞ্জনের মৃগয়ায় গমন এবং তার ফলে তাঁর মহিষীর ক্রোধ সম্পর্কে শ্রীনারদ মুনির বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বর্ণনা রয়েছে।

এই অধ্যায়টিতে ভারতবর্ষে প্রাচীনকালের রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সম্বন্ধে একটি খুব সুন্দর তত্ত্ব পাওয়া যায়। এক সময়ে রাজা বর্হিষৎ যখন তাঁর রাজকার্য থেকে অবসর গ্রহণের কথা বিবেচনা করছিলেন, তখন তিনি বিভিন্ন প্রকার যজ্ঞ অনুষ্ঠানের সকাম কর্মে নিযুক্ত ছিলেন।

অবশ্য, বিভিন্ন প্রকার যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা মানুষ উচ্চতর গ্রহলোকে বা স্বর্গলোকে উন্নীত হতে পারে, কিন্তু ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার মুক্তি তাতে লাভ হয় না।

তাই, দেবর্ষি নারদ যখন দেখলেন যে, ধ্রুব মহারাজের বংশধর এই রাজা প্রাচীনবর্হিষৎ এইভাবে সকাম কর্মের দ্বারা পথভ্রষ্ট হচ্ছেন, তখন তিনি তাঁর প্রতি কৃপাপরায়ণ হয়েছিলেন, এবং তিনি নিজে এসে জীবনের পরম লক্ষ্য যে ভক্তিযোগ, সেই সম্বন্ধে তাঁকে উপদেশ দেন। শ্রীনারদ মুনি কিভাবে মহারাজ প্রাচীনবর্হিষৎকে পরোক্ষভাবে রাজা পুরঞ্জনের রূপক কাহিনী শুনিয়ে ভক্তিযোগের উপদেশ দিয়েছিলেন, তা এখানে অতি আকর্ষণীয়ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

এক সময়ে পুরঞ্জন নামে এক রাজা তাঁর মহৎ ধনুক ও অক্ষয় তূণীর গ্রহণ করে এবং স্বর্ণনির্মিত বর্মে সজ্জিত হয়ে, একাদশ সেনাপতি সহ পাঁচটি দ্রুতগামী অশ্বচালিত রথে পঞ্চপ্রস্থ নামক বনে গমন করেছিলেন।

যদিও রাজা পুরঞ্জনের পক্ষে এক পলকের জন্যও তাঁর প্রিয়তমা মহিষীর সঙ্গত্যাগ করা অসম্ভব ছিল, তবুও মৃগয়া করার বাসনায় অত্যন্ত অনুপ্রাণিত হয়ে, তিনি মহাগর্বে তাঁর ধনুক ও বাণ গ্রহণ করে, তাঁর পত্নীর কথা চিন্তা না করে বনে গিয়েছিলেন।

শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ এই আচরণের তাৎপর্য বর্ণনা প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতে লিখেছেন—স্ত্রী-শিকারও এক প্রকার শিকার। বদ্ধ জীব কখনই এক স্ত্রীতে সন্তুষ্ট হয় না। যাদের ইন্দ্রিয় অত্যন্ত অসংযত, বিশেষ করে তারা বহু স্ত্রী শিকার করবার চেষ্টা করে। রাজা পুরঞ্জন যে তাঁর ধর্মপত্নীর সঙ্গ-পরিত্যাগ করে বনে মৃগয়া করতে গিয়েছিলেন, তা বদ্ধ জীবের ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য বহু রমণী শিকার করার চেষ্টার প্রতীক।

রাজা যেখানেই যান না কেন, সব সময় তাঁর মহিষীকে তাঁর সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার কথা, কিন্তু রাজা বা বদ্ধ জীব যখন ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের বাসনায় অত্যন্ত প্রভাবিত হয়ে পড়ে, তখন আর তার ধর্মনীতির কথা মনে থাকে না। পক্ষান্তরে, সে তখন মহাগর্বে আসক্তি ও বিরক্তিরূপ ধনুক ও বাণ গ্রহণ করে।

আমাদের চেতনা সর্বদাই এই দু'ভাবে কাজ করছে—ঠিকভাবে এবং ভুলভাবে। মানুষ যখন রজোগুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তার মর্যাদার গর্বে অত্যন্ত গর্বিত হয়, তখন সে ঠিক পথ পরিত্যাগ করে ভুল পথ গ্রহণ করে।

ক্ষত্রিয় রাজাদের কখনও কখনও বনে গিয়ে হিংস্র পশুদের বধ করার উপদেশ দেওয়া হয়, যাতে তাঁরা কিভাবে বধ করতে হয়, তা শিখতে পারেন। তার উদ্দেশ্য কখনই ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধন নয়। পশুমাংস আহার করার জন্য পশুহত্যা করা মানুষদের জন্য নিষিদ্ধ।

শ্রীল প্রভুপাদ এইভাবে রাজা পুরঞ্জনের কাহিনীর তাৎপর্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমাদের বুঝতে সাহায্য করেছেন যে, এই কাহিনীটি এক বদ্ধ জীবাত্মার কাহিনী। এই কাহিনীর মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে, কিভাবে জীবাত্মা জড়জাগতিক পাপময় প্রকৃতির কবলে অধঃপতিত হয়ে থাকে এবং কিভাবে ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির সর্বপ্রকার প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়। বাস্তবিকই, জড়জাগতিক জীবমাত্রেরই সমগ্র জীবন এইভাবে ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির বাসনার ওপর ভিত্তি করেই সাধারণত গড়ে ওঠে।

ভাগবতে বর্ণিত এই রাজা পুরঞ্জনের রূপক কাহিনীটি একটি শরীররূপী নগরের মতোই, যার মধ্যে ভোগতৃপ্তির বাসনায় জর্জরিত জড় জীব এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় কেবলই বিচরণ করে চলেছে। আর এইভাবে ভ্রমণ করতে করতে সৌভাগ্যবশত সে হয়ত কখনও একটি মানবদেহ লাভ করে থাকে, বিশেষত ভারতবর্ষের মতো এই পুণ্য দেশে মানবদেহ ধারণ করা তো অতীব সৌভাগ্যের লক্ষণ।

ভারতভূমিতে মানবদেহ লাভ করে জন্মগ্রহণের মস্ত বড় সুযোগ এই যে, এই পুণ্যভূমিকে পারমার্থিক জীবনচর্যা অনুশীলনের সর্বপ্রকার সুবিধা সহ অনুকূল ক্ষেত্র খুঁজে পাওয়া যায়। স্মরণাতীত কাল থেকেই যে-দেশে পারমার্থিক জীবনচর্যার সর্বপ্রকার আয়োজন রয়েছে, যে-দেশে চিন্ময় জীবনধারার বিশেষ সুযোগ-সুবিধার মাধ্যমে কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনের অতুলনীয় অবকাশ রয়েছে, সেই দেশটি হল ভারতবর্ষ।

কিন্তু বর্তমান কলিযুগে সেই ভারতভূমি আজ অপ্রকটিত। সেই ভারতভূমি আজ হিন্দুস্থানে পরিণত হয়েছে। তবে আবার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং তাঁর শুদ্ধ ভক্তবৃন্দের কৃপায়, বিশেষত শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের কৃপায়, আবার সেই বিস্মৃত ভারতভূমির পারমার্থিক জীবনচর্যার সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা সমগ্র জগতের আপামর জনসাধারণের কাছে সহজলভ্য হয়ে উঠেছে।

অর্থাৎ আজ সারা পৃথিবীর মানুষ আজ এই ভারতভূমি থেকে একদা উৎসারিত কৃষ্ণভাবনামৃতের আস্বাদন গ্রহণের ব্যাপক সৌভাগ্য অর্জনে সক্ষম হচ্ছে। জগদ্বাসী কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে আত্মমগ্ন হবার পথ খুঁজে পেয়েছে। কলিযুগের আগে মানুষদের কাছে এই সুযোগ সহজলভ্য ছিল না, কিন্তু আজ তা সকলের নাগালে এসে গেছে।

তাই যখনই কোনও মানুষ এদেশে বা বিদেশে যেখানেই হোক, কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনের সুযোগ লাভ করে, তখনই বুঝতে হবে যে, জীবনের চরম লক্ষ্যে উপনীত হবার দুর্লভ সৌভাগ্য তার আয়ত্ত হতে চলেছে। তার ফলে তার সকল প্রকার জড়জাগতিক বন্ধন থেকে মুক্তিলাভের এবং চিন্ময় জগতে ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ আসন্ন হয়েছে।

মনুষ্যজন্ম হল চুরাশি লক্ষ বিভিন্ন প্রকার জীবযোনির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, একথা সুবিদিত। কারণ এই মনুষ্যজন্মেই জীবাত্মা তার চিন্ময় চেতনার পরিধি এক অপরিমিত বিস্তারিত ক্ষেত্রে প্রসারিত করবার দুর্লভ ক্ষমতার অধিকারী হয়ে উঠতে পারে আর তার ফলে চিন্ময় সত্তার স্বরূপ তথা পরম পুরুষোত্তম ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি করবার যোগ্যতা অর্জনের সামর্থ্য লাভ করে। এই পরম সুযোগ বা সামর্থ্য অন্য কোনও জীবদেহের মাধ্যমে সম্ভব হয় না।

এমন কি উচ্চতর গ্রহলোকের অধিবাসী তথা দেব-দেবীরা মানবদেহ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর শরীরের অধিকারী হলেও এবং নানাপ্রকার অচিন্তনীয় সুযোগ-সুবিধা ভোগের যোগ্যতা অর্জন করলেও, মানবদেহ ঐ সকল দেব-দেবীর শরীর অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলে বৈদিক শাস্ত্রে স্বীকৃত হয়েছে। এর দুটি কারণ রয়েছে। একটি কারণ হল—মানুষ তার চেতনার পরিধি অপরিমিত বিস্তারিত ক্ষেত্রে প্রসারিত করবার সামর্থ্য লাভ করে থাকে, যেটি দেব-দেবীরা পারে না। অন্য কারণটি হল এই যে, মানুষ তার কর্মফল ভস্মীভূত করে ফেলতে পারে, যে-ক্ষমতা দেব-দেবীদেরও থাকে না।

এই দুটি কারণেই মানুষ ইহজীবনেই পরমেশ্বর ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত হয়ে উঠতে পারে। মানুষের ক্ষুদ্র জীবৎকালেই তার কোটিজন্মের সকল কর্মফল ভস্মীভূত করে ফেলতে পারে, আত্মপরিতৃপ্তির সর্বপ্রকার বাসনা নিশ্চিহ্ন করে দিতে সক্ষম হয়, আর মানুষ তার চেতনার পরিধি এমনই সুদূর বিস্তারী করে তুলতে সমর্থ হয় যে, তার ফলে অচিন্ত্য অনন্ত পরমেশ্বর ভগবানের স্বরূপ সত্তাও তার উপলব্ধির আয়ত্ত হতে পারে। পরম পুরুষোত্তম ভগবান অচিন্ত্য, পরমেশ্বর ভগবান অনন্ত, তিনি পরমতত্ত্ব—সে ক্ষেত্রে আমরা কীটাণুসম,

আমাদের সত্তা সীমাবদ্ধ এবং আমাদের বিবিধ পারিপার্শ্বিক দুষ্ট পরিবেশের প্রভাবে সদাসর্বদা আঘাতে প্রতিঘাতে জর্জরিত হয়ে রয়েছি।

কিন্তু তা সত্ত্বেও, মানুষ পরম পুরুষোত্তম ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। পরমেশ্বর ভগবান এক মহাসমুদ্রের মতো। আর আমরা জীবাত্মারা সেই তুলনায় ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ধূলিকণার মতো আমরা মহাসমুদ্রে একবিন্দু জলের মতো। এখন, এই এক বিন্দু জলের পক্ষে কখনই ধারণা করা সম্ভব নয় যে, মহাসমুদ্রটি কী বিশাল! বিন্দুর পক্ষে সিন্ধুর স্বরূপ উপলব্ধি এক অসম্ভব ব্যাপার তো বটেই। তা সত্ত্বেও মানুষ তার চেতনার চিন্ময় বিকাশ সাধনের মাধ্যমে সেই দুঃসাধ্য কাজটি অনেক ক্ষেত্রেই করতে পারে।

অবশ্য শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত রাজা পুরঞ্জনের কাহিনী থেকে আমরা লক্ষ্য করেছি, ইন্দ্রিয়সুখলোভে ব্যাপৃত হওয়ার ফলে তিনি তাঁর চেতনার বিকাশ সাধনে ব্যর্থ হয়েছিলেন। মানবদেহ লাভকরা সত্ত্বেও রাজা পুরঞ্জন সেই সুযোগের অপব্যবহার করেছিলেন।

তবে রাজা পুরঞ্জনের সৌভাগ্য এই যে, তাঁর গুরুদেব শ্রীনারদ মুনির আশীর্বাদে এবং সুপরামর্শে সৎবুদ্ধি সম্পন্ন হওয়ার ফলে, পরবর্তী জন্মে স্ত্রীত্ব প্রাপ্তির মাধ্যমে চেতনার উন্মেষ ঘটেছিল। ইহজীবনে দেহসুখভোগে সদাসর্বদা লিপ্ত হয়ে থাকার ফলে, রাজা পুরঞ্জনকে পরজন্মে এক নারীদেহ ধারণ করতে হয়েছিল। তাঁর অত্যধিক স্ত্রীসম্ভোগেচ্ছার পরিণাম স্বরূপ তাঁকে স্ত্রীরূপে আবার জন্মগ্রহণ করতে হয়েছিল।

ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাই বলেছেন, মৃত্যুকালে মানুষ যেভাবে চিন্তাভাবনা করে, পরজন্মে সেইভাবেই সে অন্য একটি শরীর লাভ করে। মৃত্যুকালে আমাদের যেমন চিন্তাধারা হয়, ঠিক সেই মতোই পরজন্মে শরীর প্রাপ্তি হয়।

এইভাবে শ্রীনারদমুনি রাজা প্রাচীনবর্হিষৎকে এক রূপক কাহিনীর মাধ্যমে রাজা পুরঞ্জনের কাহিনী শুনিয়ে বোঝাতে চেয়েছিলেন—কিভাবে এই দুর্লভ মানবদেহের যথার্থ সদ্ব্যবহার করা উচিত।

প্রবাদ আছে, যথার্থ বুদ্ধিমানেরা শুনে শেখে, যারা অল্পবুদ্ধিমান তারা দেখে শেখে, এবং হীনবুদ্ধি লোকেরা ঠেকে শেখে। আর বুদ্ধিহীন মানুষদের কথা তো বলে কাজ নেই, কারণ তারা কোন দিনই শেখে না।

তবে আমাদের এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের কাজ হল যথার্থ বুদ্ধিমান মানুষদের বিকাশ সাধন করা। রাজা পুরঞ্জনের কাহিনীর মাধ্যমে আমরা তাদের বোঝাতে চাই—কিভাবে এই মানব জন্মের পরিপূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করতে হয়।

রাজা পুরঞ্জনের কাহিনীর সারমর্ম হল এই যে, বদ্ধজীব তার ইন্দ্রিয় সুখভোগের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বিচরণ করতে থাকে জন্মজন্মান্তর ধরে আর তার সঙ্গীরূপে তাকে পথনির্দেশ করতে থাকে, তার বুদ্ধি—ভাগবতে যাকে রাজা পুরঞ্জনের রাণীরূপে বর্ণনা করা হয়েছে এবং এই রাণীরূপে রাণীরূপী মোহময়ী বুদ্ধির প্রভাবে রাজা পুরঞ্জন তথা মানবদেহধারী জীবাত্মা বিভিন্ন প্রকার সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রলোভনে মায়াচ্ছন্ন হয়ে থাকে, আর রাজা যেমন একটি নগরীর আধিপত্য লাভ করে সেখানে রাজত্ব করতে থাকে, তেমনি জীবাত্মাও তার দেহরূপী নগরীর আধিপত্যে মগ্ন হয়ে পড়ে। আর সেই নগরীর ন'টি দ্বার থাকে, ঠিক যেমন মানবদেহেও থাকে ন'টি দ্বার অর্থাৎ ন'টি ইন্দ্রিয়পথ।

রাজা পুরঞ্জনের নগরীতে রাণীকে সর্বদা চতুর্দিক থেকে সুরক্ষিত রাখত পাঁচটি মস্তকবিশিষ্ট একটি সর্প অর্থাৎ দেহের পঞ্চ বায়ুকে (প্রাণ, অপান, ব্যান, সমান ও উদান) এই সর্পটির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। কারণ সর্প কেবল বায়ু ভক্ষণ করে জীবন ধারণ করতে পারে। বায়ুর দ্বারা বাহিত প্রাণশক্তিকে এই রূপক কাহিনীতে দেহরক্ষী বলে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রাণশক্তি ব্যতীত কেউ এক পলকের জন্যও জীবিত থাকতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে, সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি প্রাণশক্তির অধীনেই কার্য করে। (ভাঃ ৪/২৫/২১)

রাজা পুরঞ্জনের রাণী হচ্ছেন বুদ্ধির প্রতীক এবং বুদ্ধির সাহায্যেই বিভিন্ন ইন্দ্রিয়কে কাজে লাগিয়ে মানবদেহ যত রকমের সুখভোগে লিপ্ত হতে উদ্যোগী হয়ে থাকে। কিন্তু এইভাবে সুখের অন্বেষণে বুদ্ধিকে পথপ্রদর্শক রূপে মেনে নিলে মানবদেহ যথার্থভাবে পারমার্থিক উচ্চতর জীবনচর্যায় কাজে লাগানো সম্ভব হয়ে ওঠে না।

তা হলে কিভাবে বুদ্ধির এই সুখান্বেষী প্রবৃত্তি রোধ করা যেতে পারে? অবশ্য বুদ্ধির এই প্রবৃত্তি হল জড়া প্রকৃতির নিয়মাধীন। তাই, এই প্রবৃত্তির মোকাবিলা করতে হলে, আমাদের নিজেদের বুদ্ধির ওপরে নির্ভরশীল না থেকে আমাদের কোনও প্রামাণ্য সদ্গুরুর নির্দেশানুসারে শাস্ত্রসম্মত বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলনে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। এই পথ অনুসরণ করলে তবেই মানবদেহ লাভের পরিপূর্ণ সার্থকতা অর্জন করা সম্ভব হয়ে উঠতে পারে।

সেই সঙ্গে অতীব মনোযোগ সহকারে সাধুসন্তের রচিত শাস্ত্রাদি থেকে উপদেশাবলী তথা অনুশাসনাদি শ্রবণ করে তা শ্রদ্ধা সহকারে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে যার ফলে পারমার্থিক সংস্কৃতি অর্জনের পন্থা অনুসরণ করা সহজ হয়ে ওঠে আর তার ফলে পারমার্থিক তত্ত্বের প্রতি বিশ্বাস সৃষ্টি হলে আরও ব্যাপকভাবে সাধুসঙ্গ লাভের অভিলাষ জাগতে পারবে।

এইভাবে সাধুসঙ্গ করতে করতে এক সময়ে এমন একজন বিশেষ শুদ্ধ ভক্তের সান্নিধ্যলাভ করা সম্ভব হয়ে উঠবে, যাঁর কৃপায় তাঁর পথনির্দেশে পারমার্থিক জীবনে বিকাশ লাভের সুযোগ উন্মোচিত হবে। তখন সেই শুদ্ধ ভক্তের কাছে আত্মনিবেদন করাই আমাদের কর্তব্য। সেই আত্মনিবেদনের মাধ্যমেই পারমার্থিক জীবনধারায় দীক্ষালাভ করা সম্ভব হয়। তখন শুরু হয় পারমার্থিক জীবনের যথার্থ বিকাশ।

পারমার্থিক জীবনে এইভাবে যিনি দীক্ষাপ্রদান করেন, তাঁকে গুরু বলে মানতে হয়। যথার্থ দীক্ষাগুরু হলেন পরমাত্মার প্রতিভূ স্বরূপ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যেক জীবাত্মার অন্তরে বিরাজ করে থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ ইচ্ছা করেন, প্রতিটি জীবাত্মা তার জড়জাগতিক জীবনের কর্তব্যকর্ম যথাশীঘ্র সম্ভব সম্পন্ন করে নিজ আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যাবে। তাই জীবাত্মা যেখানে যায়, ভগবান শ্রীকৃষ্ণও তাঁর সঙ্গে থাকেন, পরমাত্মারূপে। ঠিক স্নেহশীল পিতার মতোই পরমপিতা শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সন্তানরূপী জীবাত্মাকে কখনই নিঃসঙ্গ অবস্থায় যেন কোথাও যেতে দিতে চান না। পরম পিতা জানেন, তাঁর সন্তান নিজের নিরাপত্তা বিধান করতে যথার্থ সক্ষম নয়। তাই সন্তান স্বতন্ত্রভাবে ইতস্তত ভ্রমণ করতে আগ্রহী হলেও, পরমপিতারূপে পরমাত্মারূপী ভগবান সদাসর্বদা জীবাত্মার অন্তরে প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজমান থেকে তাকে ছায়ার মতো অনুসরণ তথা পথপ্রদর্শন করতে থাকেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে আমরা বর্জন করলেও তিনি আমাদের কখনই পরিত্যাগ করে থাকতে পারেন না।

এইভাবে জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার সদা বিচরণের তিনটি কারণ আছে। এক, জীবাত্মাকে পরমাত্মা সর্বদা অনুসরণ করতে চান। দুই, জীবাত্মাকে পরমাত্মা নিত্য পথপ্রদর্শন করতে চান। এবং তিন, পরমাত্মা প্রত্যেক জীবাত্মাকে নিজধামে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চান।

যথার্থ বুদ্ধিমান হওয়ার উপদেশ

শ্রীমদ্ভাগবতে রাজা পুরঞ্জনের রূপক কাহিনীতে বলা হয়েছে, এক সময় ঐ রাজা তাঁর মহৎ ধনুক ও অক্ষয় তূণীর গ্রহণ করে এবং স্বর্ণনির্মিত বর্মে সজ্জিত হয়ে, একাদশ সেনাপতি সহ পাঁচটি দ্রুতগামী অশ্বচালিত রথে পঞ্চপ্রস্থ নামে একটি বনে গিয়েছিলেন মৃগয়ার উদ্দেশ্যে।

সেই রথে তিনি দুটি বিস্ফোরক বাণ তাঁর সঙ্গে নিয়েছিলেন। সেই রথটির দুটি চক্র এবং একটি ঘূর্ণায়মান অক্ষ ছিল। সেই রথে তিনটি পতাকা, একটি রজ্জু, একজন সারথি, একটি উপবেশন স্থান, জোয়াল লাগানোর দুটি দণ্ড, পাঁচটি অস্ত্র এবং সাতটি আবরণ ছিল। সেই রথের গতি ছিল পঞ্চবিধ, এবং তার সামনে পাঁচটি বাধা ছিল। সেই রথের সমস্ত সাজসজ্জা ও অলঙ্করণ স্বর্ণনির্মিত ছিল।

শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ এই রূপক বর্ণনাটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে লিখেছেন, জীবের জড় দেহটি জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। দেহটি হচ্ছে রথ, এবং জীবাত্মা সেই রথের রথী। সেই কথা বিশ্লেষণ করে ভগবদ্গীতায় (২/১৩) বলা হয়েছে—দেহিনোহস্মিন্ যথা দেহে। দেহের যিনি মালিক তাঁকে বলা হয় দেহী, এবং তিনি দেহের অভ্যন্তরে হৃদয়ে অবস্থান করেন। জীবের সেই দেহরূপ রথটি পরিচালিত হয় একজন সারথির দ্বারা। সেই রথটি তিনটি গুণের দ্বারা নির্মিত হয়, যে সম্বন্ধে ভগবদ্গীতায় (১৮/৬১) বলা হয়েছে—যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া। 'যন্ত্র' শব্দটির অর্থ 'শকট'। এই যন্ত্র বা দেহটি জড়া প্রকৃতি প্রদান করেছে, এবং সেই রথের সারথি হচ্ছেন পরমাত্মা। সেই রথের রথী হচ্ছে জীবাত্মা। এটিই হচ্ছে বাস্তবিক অবস্থা।

জীব সর্বদাই সত্ত্ব, রজ, তম—এই ত্রিগুণের দ্বারা প্রভাবিত। সেই কথা ভগবদ্গীতায় (৭/১৩) প্রতিপন্ন হয়েছে।

ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈঃ—জীব জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের দ্বারা বিমোহিত। এই তিনটি গুণকে রাজা পুরঞ্জনের রথের তিনটি পতাকা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। পতাকার মাধ্যমে বোঝা যায়—রথের মালিক কে, তেমনই প্রকৃতির গুণের প্রভাব থেকে সহজেই বোঝা যায়—কোন্‌দিকে সেই রথটি চলছে। অর্থাৎ, যাঁর চোখ আছে, তিনি বুঝতে পারেন—প্রকৃতি কোন বিশেষ গুণের দ্বারা এই শরীর কোন্ দিকে চলেছে।

মানুষ ধার্মিক হতে চাইলেও তার দেহ তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়। শ্রীনারদ মুনি মহারাজ প্রাচীন বর্হিষতের কাছে রাজা পুরঞ্জনের রূপক কাহিনী বর্ণনার মাধ্যমে প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে, রাজা যদিও আপাতদৃষ্টিতে অত্যন্ত ধার্মিক ছিলেন, তবুও তিনি কিভাবে তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।

মৃগয়ার উদ্দেশ্যে রাজা পুরঞ্জনের বনগমন তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বিভিন্ন প্রকার ইন্দ্রিয় সুখভোগের প্রচেষ্টার প্রতীক। জড় দেহটি স্বয়ং ইঙ্গিত করে যে, প্রকৃতির তিনটি গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, জাগতিক বিষয় ভোগে জীব প্রবৃত্ত হয়ে রয়েছে।

দেহটি যখন তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়, তখন ভবরোগ অত্যন্ত প্রবল হয়। যখন তা রজোগুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়, তখনও তার রোগটি বেশ কঠিন। কিন্তু, দেহ যখন সত্ত্বগুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়। তখন ভবরোগের উপশম হয়।

বৈদিক শাস্ত্রাদিতে বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তা অবশ্যই সত্ত্বগুণের স্তরে অবস্থিত, কিন্তু এই জড় জগতে সত্ত্বগুণও কখনও কখনও রজ ও তমোগুণের দ্বারা কলুষিত হয়, তাই সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন মানুষেরাও কখনও কখনও তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়।

রাজা পুরঞ্জনও তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মৃগয়ায় গিয়েছিলেন। তিনি যে বনে মৃগয়া করতে গিয়েছিলেন, তার নাম হচ্ছে পঞ্চপ্রস্থ। এই পঞ্চপ্রস্থ বনটি ইন্দ্রিয়ের পাঁচটি বিষয়কে ইঙ্গিত করে। দেহে রয়েছে হস্ত, পদ, উদর, পায়ু এবং উপস্থ—এই পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়। এই সমস্ত কর্মেন্দ্রিয়গুলির সাহায্যে দেহ এই জড়জাগতিক জীবন উপভোগ করে।

রাজা পুরঞ্জনের রথটি পাঁচটি অশ্বের দ্বারা চালিত। সেইগুলি হচ্ছে পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের রূপক বর্ণনা—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক। এই সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি অতি সহজেই বিষয় ভোগের দিকে আকৃষ্ট হয়। তাই, ভাগবতে বলা হয়েছে, রাজা পুরঞ্জনের রথের অশ্বগুলি অতি দ্রুতগামী।

রথে রাজা পুরঞ্জন দুটি বিস্ফোরক অস্ত্র রেখেছেন, সেইগুলি হচ্ছে—অহংকার, অর্থাৎ 'আমি এই শরীর' এবং 'মমতা'—অর্থাৎ 'এই দেহের সম্পর্কিত সব কিছুই আমার।'

রথের চাকা দুটি হচ্ছে পাপ ও পুণ্য। রথটি তিনটি পতাকার দ্বারা সজ্জিত, যেগুলি প্রকৃতির তিনটি গুণের প্রতীক। পাঁচ প্রকার প্রতিবন্ধক হচ্ছে

দেহাভ্যন্তরের পাঁচটি বায়ুর প্রতীক। সেইগুলি হচ্ছে—প্রাণ, অপান, উদান, সমান ও ব্যান। দেহটি সপ্ত আবরণের দ্বারা আচ্ছাদিত। সেই সাতটি আবরণ হচ্ছে—চর্ম, মাংস, মেদ, মজ্জা, রক্ত, অস্থি ও শুক্র। জীব তিনটি সূক্ষ্ম জড় উপাদান এবং পাঁচটি স্থূল জড় উপাদানের দ্বারা আবৃত। এইগুলি জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার পথে প্রতিবন্ধক।

শ্রীমদ্ভাগবতে রাজা পুরঞ্জনের রথের বর্ণনায় যে রজ্জুর কথা আছে, সেটি মনকে ইঙ্গিত করে। রথের উপবেশনের স্থানটিকে 'নীড়' বলা হয়েছে—এই 'নীড়' শব্দটির দ্বারা পাখির বাসা বোঝায়—এখানে 'নীড়' মানে হৃদয় যেখানে জীবাত্মা এক স্থানে বসে থাকে। তার বন্ধনের কারণ হচ্ছে—শোক ও মোহ। এই জড় জগতে জীব সর্বদা এমন বস্তুর আকাঙ্ক্ষা করতে থাকে, যা সে কখনই পেতে পারে না। তাই সেটি হচ্ছে মোহ। এইভাবে মোহাচ্ছন্ন অবস্থায় থাকার ফলে, জীব সর্বদা শোক করে। তাই শোক ও মোহকে শ্রীমদ্ভাগবতে রাজা পুরঞ্জনের রথের জোয়াল বাঁধার দুটি দণ্ড রূপে বর্ণনা করা হয়েছে।

জীব পাঁচটি উপায়ের দ্বারা তার বিবিধ বাসনা চরিতার্থ করে, যেগুলি হচ্ছে পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়। স্বর্ণ, অলঙ্কার এবং শয্যা হচ্ছে জীবের রজোগুণের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার প্রতীক। যার কাছে প্রচুর ধনসম্পদ রয়েছে, সে বিশেষভাবে রজোগুণের দ্বারা পরিচালিত হয়। রজোগুণের দ্বারা পরিচালিত হয়ে মানুষ এই জড় জগতে কত কিছু ভোগ করতে বাসনা করে।

রাজা পুরঞ্জনের রূপক কাহিনীতে উল্লেখিত রাজার মৃগয়া গমনকালে এগারজন সেনাপতির তাৎপর্য হচ্ছে দেহের দশটি ইন্দ্রিয় এবং মন। মন সর্বদা দশজন সেনাপতির সঙ্গে পরিকল্পনা করে, কিভাবে জড় জগৎকে উপভোগ করা যায়।

মৃগয়ার উদ্দেশ্যে রাজা পুরঞ্জন যে পঞ্চপ্রস্থ বনে গিয়েছিলেন তার অন্য একটি তাৎপর্য এই যে, রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ ও স্পর্শ—এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মাধ্যম বা তন্মাত্র সমন্বিত বন।

এইভাবে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের অদম্য আকাঙ্ক্ষা থেকে মুক্তি পেতে হলে, শ্রীনারদ মুনির পরামর্শ মতো ভগবানের শরণ গ্রহণ করতে হবে। হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ কীর্তনের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধির পথে অগ্রসর হতে হবে।

এই রূপক কাহিনীর মাধ্যমে শ্রীনারদ মুনি সুস্পষ্টভাবে রাজা প্রাচীন বর্হিষৎকে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, জড়জাগতিক বাসনা যথাসম্ভব সংযত করতে হলে ভগবদ্ভক্তির পন্থা গ্রহণ করতে হয়। সর্বদা পরমেশ্বর ভগবান

শ্রীকৃষ্ণের কৃপা প্রার্থনা করতে হয় যেন তিনি অনুগ্রহ করে মানুষের এই বাসনাবদ্ধ জীবনধারা থেকে মুক্ত হওয়ার শুভ চেতনা জাগরিত করেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে এইভাবে প্রার্থনা জানালে তিনি তাতে সাড়া দেন।

ভগবানের করুণালাভের একটি সহজ পন্থা হল ভক্তসঙ্গ। ভগবান সুযোগ করে রেখেছেন যাতে আমরা সদ্গুরুর সান্নিধ্য লাভ করতে পারি। ভগবানের কৃপায় এই সমস্ত সুযোগই মানুষের জীবনে আসে এবং বুদ্ধিমানের মতো শ্রদ্ধা সহকারে তা গ্রহণ করতে হয়। আমরা যদি যথার্থভাবে ভগবদ্ভক্তদের সঙ্গ সান্নিধ্য রক্ষা করে আমাদের জীবনধারা গড়ে তুলতে পারি, তা হলে ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির মায়ামোহ আমাদের কখনই কেশাগ্র স্পর্শ করতেও পারবে না।

বাস্তবিকই, এই জড় জগতের বিপুল কলুষতার মধ্যেও পরম মঙ্গলময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উপরোক্ত সুযোগ সুবিধার বহুবিধ ব্যবস্থা করে রেখেছেন এবং সেইগুলির সদ্ব্যবহার করার শুধুমাত্র চাই আমাদের আন্তরিক প্রচেষ্টা। তার সুফল আপনা হতেই আমাদের জীবনে প্রতিভাত হতে দেখা যাবে। সেই শুভফল "আনন্দাম্বুধিবর্ধনম্" রূপে আমরা অবশ্যই লাভ করতে পারব। প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং—তখন প্রত্যেকটি কাজে ভগবানের নাম স্মরণের অমৃত আস্বাদন করতে পারব পরিপূর্ণ ভাবে। আমাদের তখন উপলব্ধি হবে যেন আনন্দের মহাসমুদ্রে অবগাহন করছি। এই অমৃতময় আনন্দের বৃদ্ধি ক্রমশই আমাদের জীবনে অপূর্ব দিব্য অনুভূতি সৃষ্টি করতে থাকবে।

এই থেকেই বোঝা যায়, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমাদের কল্যাণবিধানে কত কিছু ব্যবস্থা করে রেখেছেন। এখন আমাদের কর্তব্য—সেই সকল সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করে মানবজীবন সার্থক করে তোলা। মানবজীবন শুধুমাত্র ইন্দ্রিয় উপভোগের মাধ্যমে পশুর মতো যাপন করে গেলেই চলবে না—মানবজীবনে সুবর্ণ সুযোগ কাজে লাগিয়ে দিব্য পারমার্থিক উন্নতির পথ সুগম করে তুলতে হবে।

ভাগবতে রাজা পুরঞ্জনের কাহিনীতে রয়েছে, তিনি ইন্দ্রিয় সুখভোগের অন্তহীন বাসনা নিয়ে সারা পৃথিবী ভ্রমণ করে এমন একটি জায়গা খুঁজছিলেন, যেখানে তাঁর সমস্ত বাসনা পূর্ণ হতে পারে। কিন্তু তিনি তেমন জায়গা খুঁজে পাননি।

মহান্ বৈষ্ণব কবি শ্রীল বিদ্যাপতি গেয়েছেন—

তাতল সৈকতে বারিবিন্দু সম, সুত-মিত-রমণী সমাজে।

আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে ইন্দ্রিয় সুখভোগের বাসনাকে এখানে ঠিক যেন মরুভূমিতে এক বিন্দু জলের মতো বর্ণনা করা হয়েছে। মরুভূমির

তৃষ্ণা নিবারণের জন্য সমুদ্রের প্রয়োজন, কিন্তু সেখানে যদি এক বিন্দু জল ঢালা হয়, তাতে কি লাভ হয়? তেমনই, জীবেরা হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন অংশ—বেদান্ত-সূত্রে যাদের "আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ" বা পূর্ণ আনন্দময় বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সেই পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন অংশ হওয়ার ফলে, জীবও পূর্ণ আনন্দের অন্বেষণ করছে।

কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কখনই সেই আনন্দ লাভ করা যায় না। বিভিন্ন জন্মযোনিতে ভ্রমণ করে জীব বিভিন্ন প্রকারের শরীর লাভের মাধ্যমে একটু-আধটু সুখ উপলব্ধি করতে পারে, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের পূর্ণ সুখভোগ কোনও জড় শরীরের মাধ্যমেই সম্ভব নয়।

তাই পুরঞ্জন বা জীব বিভিন্ন প্রকার শরীরে ভ্রমণ করে কেবল সুখভোগের প্রচেষ্টায় সর্বত্র নিরাশ হয়েছিল। অর্থাৎ, জড়ের দ্বারা আচ্ছাদিত চিৎ-স্ফুলিঙ্গ কখনই জড়জাগতিক জীবনের কোন পরিবেশেই পূর্ণরূপে ইন্দ্রিয়সুখ উপভোগ করতে পারে না।

ব্যাধের বংশীধ্বনিতে মগ্ন হয়ে, হরিণ কিছুকালের জন্য আনন্দ উপভোগ করতে পারে, কিন্তু তার পরিণাম অবশ্যই মৃত্যু। তেমনই, মাছ তার জিভের তৃপ্তি সাধনে অত্যন্ত দক্ষ, কিন্তু সে যখন ধীবরের টোপ গেলে, তখন তার জীবনের অবসান ঘনিয়ে আসে।

এমন কি, হাতিও যে অতি বলবান, সে-ও হস্তিনীর সাথে মৈথুনের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার লালসায় তার স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে সে বন্দীদশা ভোগ করে।

প্রত্যেক যোনিতে জীব তার ইন্দ্রিয়সুখ চরিতার্থ করবার জন্য শরীর লাভ করে, কিন্তু তার ইন্দ্রিয়গুলি সে একসঙ্গে উপভোগ করতে পারে না। মানবজীবনে জীব তার সব কয়টি ইন্দ্রিয়কে বিকৃতভাবে উপভোগ করবার সুযোগ পায়, কিন্তু তার ফলে তাকে এত বিড়ম্বনা ভোগ করতে হয় যে, চরমে সে বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। মানুষ যতই তার ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের চেষ্টা করে, ততই সে জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়।

সেই জন্যই রাজা পুরঞ্জনের মতো সব মানুষই বিশাল ঐশ্বর্য সম্পদসহ রাজ্য লাভ করে আরামে থাকতে চায়। মানুষ দিব্য পারমার্থিক সম্পদ লাভের উপযোগিতা বুঝতে চায় না। জীবাত্মার নানা প্রকার কামনা বাসনা থাকে, কিন্তু তা থাকলেই তো চলবে না। আমাদের বাসনাগুলি চরিতার্থ করতে হলে, আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে যথাযথভাবে কাজে লাগানোর সঠিক পদ্ধতি আয়ত্ত করতে হয়।

প্রকৃত বুদ্ধির সাহায্যেই মানুষ ভাল-মন্দ যাচাই করতে শেখে—কিভাবে যথার্থ সুখভোগের বিষয় নির্বাচন করতে হয়। এই বুদ্ধিকেই ভাগবতে রাজা পুরঞ্জনের রাণী রূপে রূপকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। ঐ রাণীর মাধ্যমেই রাজা পুরঞ্জন তাঁর যাবতীয় বাসনা চরিতার্থ করতে চেয়েছিলেন।

বুদ্ধি যেমন জড়জাগতিক বিষয়ে আবদ্ধ থাকে, তেমনি যথার্থ পারমার্থিক বুদ্ধি চিন্ময় জগতের সব বন্ধন থেকে মানুষকে মুক্ত করতে পারে। পারমার্থিক বুদ্ধি বলতে বোঝায়—আমাদের ইন্দ্রিয়ের সব কর্মক্ষমতা অন্তরে বিরাজমান পরম সখা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানে নিয়োজিত করার সদিচ্ছা। ভগবানের সেবায় সকল বুদ্ধিবৃত্তি সমর্পণ করতে পারলেই যথার্থ ভক্তি জাগে।

অতএব যে মানুষ পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাচিন্তায় মনপ্রাণ সমর্পণ না করে, তাকে বুদ্ধিমান বলা শক্ত। সেই সমর্পিতপ্রাণ ভক্তি জাগে সদ্‌গুরুর অধীনে আত্মনিবেদন করতে পারলে।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে সেইজন্যই তাঁর শ্রীগুরুদেব বলেছিলেন যে, নির্বোধের মতো কেবলমাত্র জড়জগৎকে উপভোগ করতে মেতে থাকলেই মুক্তিলাভ সম্ভব হয় না। নিজেকে যথার্থ বুদ্ধিমান বলতে পারে সেই মানুষই, যে শ্রীভগবানের কাছে সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন করতে পেরেছে এবং জড় সুখভোগ থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রাখতে শিখেছে।

আগুনের মধ্যে লোহাটিও আগুন হয়ে যায়

শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের ৬ষ্ঠ স্কন্ধের অন্তর্ভুক্ত ২য় অধ্যায়ে বৈকুণ্ঠদূতেরা যমদূতদের কাছে শ্রীভগবানের পবিত্র নাম জপের মহিমা বর্ণনা করেছেন। সেখানে বিষ্ণুদূতেরা বলেছেন, "এই যুগে ভগবদ্ভক্তদের মধ্যেও অনেক পাপকর্ম করা হয়ে থাকে, ফলে, অপাপবিদ্ধ মানুষকেও যমালয়ে শাস্তি ভোগের জন্য যেতে হয়। দেশের জনগণ যারা সহায়-সম্বলহীন হয়ে দেশের সরকারের কৃপার ওপরে নির্ভর করে থাকে নিরাপত্তা ও শান্তির ভরসায়। কিন্তু সেই

সরকারই যদি এই সহায়হীনতার সুযোগ নিয়ে নাগরিকদের ক্ষতি করতে চায়, তবে তারা যাবে কোথায়?"

এই প্রসঙ্গে বিষ্ণুদূতেরা কান্যকুব্জ (বর্তমান কনৌজ) শহরের অধিবাসী ব্রাহ্মণ সন্তান অজামিলের পাপময় জীবনে কৃষ্ণনামের অত্যাশ্চর্য শুভ পরিণাম ব্যক্ত করেছেন।

অজামিলের মা-বাবা তাকে বেদ পুরাণাদি অধ্যয়ন করিয়ে, বিধিবদ্ধ জীবন যাপনে শিক্ষিত করে তোলেন। কিন্তু অজামিল তার পূর্বজন্মের কর্মফলে সম্ভাবনাময় এক ব্রাহ্মণ সন্তান হয়েও ঘটনাচক্রে এক বারনারীতে আসক্ত হয়ে পড়ে।

তার ফলে, সেই বারনারীর গর্ভে অজামিল দশটি পুত্রসন্তান লাভ করে। তাদের মধ্যে সর্বশেষ কনিষ্ঠ পুত্রটির নাম দেওয়া হয়েছিল 'নারায়ণ'।

অজামিলের মৃত্যু শয্যায় যমদূতেরা যখন তার পাপকর্মের শাস্তিদানের জন্য যমালয়ে তার আত্মাকে টেনে নিয়ে যেতে এসেছিল, তখন অজামিল মৃত্যুভয়ে এবং বিকটাকার যমদূতদের দেখে মহা আতঙ্কে চিৎকার করে 'নারায়ণ' বলে তার কনিষ্ঠ পুত্রটিকে ডেকে উঠেছিল, কারণ সেই পুত্রটিই ছিল তার সবচেয়ে প্রিয়পুত্র।

এইভাবে সে মৃত্যুকালে ভগবান বিষ্ণু তথা শ্রীনারায়ণের নাম স্মরণ করতে পেরেছিল, যদিও তা ভক্তিভরে ভগবানের নাম স্মরণ করা নয়।

কিন্তু শ্রীনারায়ণের পবিত্র নামটি আকুলভাবে উচ্চারণ করা মাত্রই তৎক্ষণাৎ ভগবান শ্রীবিষ্ণুর আজ্ঞাবাহকেরা সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন।

তখন যমদূত এবং বিষ্ণুদূতদের মধ্যে আলোচনার সূত্রপাত হয়েছিল বলে শ্রীমদ্ভাগবতে তিনটি অধ্যায়ব্যাপী বিস্তারিত বর্ণনা সহ তাৎপর্য ব্যাখ্যাত হয়েছে।

শ্রীভগবানের পবিত্র নামের সর্বশক্তিমত্তা বিষয়ক সেই আলোচনা শ্রবণ করার ফলে মহাপাপী অজামিল পাপমুক্ত হয়েছিল এবং সে উপলব্ধি করতে পেরেছিল—পাপকর্মের সুদূরপ্রসারী কর্মফল কী ভয়ানক এবং সেই সঙ্গে আরও একটি সত্য তার হৃদয়ঙ্গম হয়েছিল যে, ভগবদ্ভক্তির প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভগবানের মহিমা শ্রবণ কীর্তন করবার সুযোগ পেলে মহাপাপীও কিভাবে অচিরে জীবনের সর্বোত্তম সার্থকতা অর্জন করতে পারে।

অজামিলের মৃত্যুকালে একবার মাত্র আকুলভাবে 'নারায়ণ' নাম উচ্চারণ করার ফলে বিষ্ণুদূতেরা উপস্থিত হয়ে যমদূতদের বাধা দিয়ে বলেছিলেন,

"একটিবার শ্রীনারায়ণের নাম গ্রহণ করে অজামিল তার পাপজীবনের কর্মফল থেকে মুক্ত হয়ে গেছে। শুধুমাত্র ইহজীবনের পাপের কর্মফলই নয়, বিগত অনেক অনেক হাজার হাজার পূর্বজন্মের সমস্ত পাপের কর্মফলও তার খণ্ডিত হয়ে গিয়েছে। এই ভাবেই তার সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়ে গিয়েছে।

"কেউ যদি শাস্ত্রবিধি অনুসারে বিভিন্ন সংস্কারাদি উদ্‌যাপনের মাধ্যমে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে উদ্যোগী হয়, তা হলে তার সমস্ত পাপের কর্মফল বাস্তবিকই খণ্ডিত হয়ে যেতে পারে না—কিন্তু যদি কেউ ভক্তিভরে আকুলভাবে পরমেশ্বর ভগবানের পবিত্র নাম জপ কীর্তন করে, তা হলে মুহূর্তের মধ্যেই তার সমস্ত পাপের কর্মফল মুছে যেতে পারে। শ্রীভগবানের পবিত্র নাম জপের মাধ্যমে তাঁর মহিমা স্মরণ করতে পারলে সৌভাগ্য লাভ হয়। অতএব অজামিল নিঃসন্দেহে সমস্ত পাপের কর্মফল থেকে মুক্ত হয়েছে এবং যমরাজের কাছে তার শাস্তিভোগের আর দরকার নেই।"

এই বলে বিষ্ণুদূতেরা অজামিলকে যমদূতের বন্ধন থেকে মুক্ত করে তাকে বৈকুণ্ঠধামে সসম্মানে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন।

অজামিলের এইভাবে ভগবানের নাম স্মরণ করা নিতান্তই 'নামাভাস' মাত্র। কিন্তু তারও মহিমা ভাগবতে বর্ণনা করা হয়েছে এই কাহিনীর মাধ্যমে।

অজামিল তার এই অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যলাভে বিস্মিত হয়েছিল এবং ভগবানের নাম গ্রহণের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করে বিষ্ণুদূতদের কাছে তার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছিল। সেই সঙ্গে অজামিল তার পূর্বকৃত পাপকর্মাদির জন্য তীব্র অনুশোচনা ব্যক্ত করেছিল।

বিষ্ণুদূতের সান্নিধ্যলাভের ফলে অজামিল তার স্বরূপ শুদ্ধ চেতনা ফিরে পেয়েছিল এবং সর্বস্ব পরিত্যাগ করে হরিদ্বারে গিয়ে ভগবদ্ভক্তি সেবায় অনন্যমনা হয়েছিল এবং সে নিত্য ভগবৎ-চিন্তায় আত্মনিয়োগ করে। পরে, বিষ্ণুদূতেরা তাকে স্বর্ণ-সিংহাসনে পরমাদরে উপবেশন করিয়ে বৈকুণ্ঠলোকে নিয়ে গিয়েছিলেন।

বিষ্ণুদূতেরা এই প্রসঙ্গে যমদূতদের তিরস্কার করে বলেছিলেন, "ভগবানের আশ্রয় যে গ্রহণ করেছে, তাকে শাস্তিদানের যে কোনও প্রচেষ্টাই নিতান্ত অধর্ম। অবশ্য, ধর্মাচরণের জন্য যারা ভারপ্রাপ্ত, তারা অনেকেই অপাপবিদ্ধ মানুষকে অযথা এইভাবে শাস্তি প্রদান করে থাকে, তা প্রায়ই দেখা যায়।"

সাধারণ মানুষ ধর্ম আর অধর্মের পার্থক্য খুব ভালভাবে বুঝতে পারে না। যথার্থ জ্ঞানবুদ্ধিবর্জিত নিরীহ মানুষেরা ঠিক যেন প্রভুর কোলে মাথা রেখে শুয়ে

থাকা অজ্ঞ পশুদেরই মতো। দেশের নেতারা যদি বাস্তবিকই সহৃদয়তার সঙ্গে এই ধরনের অজ্ঞ মানুষদের প্রতি কৃপাপরবশ হন এবং তাদের ভগবদ্ভক্তির পথ প্রদর্শন করতে পারেন, তবে মানুষ সহজে ধর্মপথে অবিচল থাকতে শেখে।

ভগবানের কাছে আত্মসমর্পণ করলে ভগবান "সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি" (গীতা ১৮/৬৬) বলে পাপীতাপীকে উদ্ধার করবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন—তেমনি, সকল দেশের নেতাদেরও জনগণকে ভরসা দেওয়া উচিত যে, সকলে ভক্তিভরে ভগবানের নাম স্মরণ করে সকল কাজে প্রবৃত্ত হলে তাদের সকল ত্রুটি মার্জনা করা হবে।

কারণ আগুন যেভাবে শুকনো ঘাসকে পুড়িয়ে ছাই করে দেয়, তেমনি ভগবানের পবিত্র নামও অজান্তে উচ্চারণ করলেও, অবধারিতভাবে সর্বপাপ ক্ষয় করতে পারে।

কোনও ওষুধের যথার্থ অন্তর্নিহিত গুণাবলীর বিস্তারিত পরিচয় না জেনেও মানুষ ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় সেই ওষুধ গ্রহণ করলে, তার সুফল সে লাভ করতে যেমন পারে, তেমনই ভগবানের পবিত্র নামের মহিমা কিভাবে চিত্তশুদ্ধি আনে, তার রহস্য না বুঝলেও, ভগবানের নাম জপ করলে তার সুফল লাভ অবশ্যম্ভাবী।

বৈষ্ণবেরা নিত্য ভগবানের নাম জপ করেন এবং পরম ভক্তিভরে ভগবানের মহিমা স্মরণ করে থাকেন বলে, তাঁরাও এইভাবে বিষ্ণুদূতের কাছে সুরক্ষা লাভের অধিকারী হন। এই কারণেই কোনও বৈষ্ণবজনের শাস্তিবিধান মহা অপরাধ বলে শাস্ত্রে স্বীকৃত হয়েছে।

অজামিল অবশ্য নারায়ণের নাম স্মরণে এতখানি সৌভাগ্য লাভে যথেষ্ট বিস্মিত হয়ে অনুশোচনা করেছিল—সে কেন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণপুত্র হওয়া সত্ত্বেও বারনারী সংসর্গের মাধ্যমে পুত্র সন্তান সৃষ্টির মতো গর্হিত পাপকর্মে লিপ্ত হয়েছিল।

ভগবদ্ভক্তি এইভাবেই পাপময় পরিবেশে মানুষের মনে অনুশোচনা জাগিয়ে তাকে সৎপথে আকৃষ্ট করে থাকে। কৃষ্ণভাবনা এইভাবেই মানুষকে অনুশোচনার মাধ্যমে আত্ম উপলব্ধির পথে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। অজামিল একবারমাত্র শ্রীনারায়ণের নামাভাসের ফলে বিষ্ণুদূতদের কৃপা লাভের মাধ্যমে এইভাবে অনুশোচনা এবং আত্ম উপলব্ধির পরম সুযোগ পেয়েছিল।

বৈদিক সভ্যতা সংস্কৃতি অনুযায়ী, ভগবদ্ভক্ত তথা যথার্থ ব্রাহ্মণের সর্বপ্রকার রক্ষণাবেক্ষণ তথা সুরক্ষার বিধান দেওয়া হয়েছে। সেইভাবে বৃদ্ধ মানুষ,

স্ত্রীলোক, শিশু এবং গাভীদেরও সুরক্ষা প্রদান করা সংস্কৃতিবান সমাজে প্রত্যেকেরই একান্ত কর্তব্য।

মানুষকে বোঝানো উচিত যে, ভগবদ্‌বিমুখ হলে ভগবানের কৃপা থেকে তারা বঞ্চিত হয়। তখন মায়াপিশাচীর কবলিত হতে হয় এবং মতিচ্ছন্ন হতে শুরু করে। তার ফলে মানুষ জড় জগতকে ভোগ করতে চায়—যেমন হয়েছিল অজামিলের।

কেবল ব্রাহ্মণ হলেই হল না—নিত্য ভগবদ্ সেবায় ভক্তিভরে আত্মনিয়োগ করা দরকার। তা না হলে ব্রাহ্মণত্বের অহঙ্কার জাগে এবং সেই অহঙ্কারের পরিণামই হল—'আমি ভোক্তা'। এই ভাবের উদয়। তা থেকেই আসে ভোগ বুদ্ধির বন্ধন। মনের মধ্যে ভোগতৃষ্ণা জাগলে মন বহির্মুখী হয়ে সব কিছু ভোগের পেছনে ছুটতে চায়। তার ফলে ভগবানের কথা স্বভাবতই মানুষ ভুলে যায়।

ভগবদ্‌মুখী হলে, কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে থাকলে মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার থেকে মানুষের মুক্তি হয়। এই কারণেই গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উপদেশ দিয়েছেন—মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু। (গীতা ১৮/৬৫) ভগবানের চিন্তায় চিত্ত স্থির করতে হয়, ভগবানের ভক্ত হতে হয়, ভগবানের পূজা করতে হয় এবং ভগবানকে নমস্কার জানাতে হয়—এইভাবে ভগবানের আশীর্বাদ লাভ করা যায়, যার ফলে ভগবান সর্ব বিষয়ে মানুষকে রক্ষা করেন।

এইভাবে নিত্যনিয়ত ভগবানের চিন্তায় নিবিষ্ট থাকলে জড় মন হয়ে যায় চিন্ময় চেতনাবিশিষ্ট শুদ্ধ, এবং তাতে স্বরূপসিদ্ধি লাভ হয় অর্থাৎ জড় দেহটি সূক্ষ্ম দেহের স্বরূপে অবস্থিত হয়। তখন ভোগের ইচ্ছা থাকে না, অহঙ্কার থাকে না, 'আমি ভোক্তা'। এই দুষ্ট মনোভাব থাকে না।

এইভাবে যিনি স্বরূপসিদ্ধি লাভ করেন, তাঁর দেহটিও চিন্ময় হয়ে ওঠে। আগুনে একটি লোহা থাকলে সেটি আর লোহা থাকে না—আগুন হয়ে যায়।

তাই মানুষকে মনে করিয়ে দিতে হবে যে, আমাদের এই দেহটি ভগবান সৃষ্টি করেছেন ভগবানেরই সেবার জন্য। সুতরাং ভগবৎ সেবার মাধ্যমেই এই জড় দেহ সার্থকতা অর্জন করতে পারে—একথা সর্বযুগে সর্বদেশে শ্রেষ্ঠ ভগবদ্ভক্তেরা বারে বারে বলে গিয়েছেন।

আমরা সকলেই ভগবানের দাস—একথা মানুষকে মনে করিয়ে দিতে হবে—নিত্য কৃষ্ণদাস। যিনি আমাদের সব কিছু দিয়েছেন, তাঁর দাসত্ব স্বীকার করলেই ভাল। শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ আমাদের

এই অমূল্য উপলব্ধি অর্জনে সাহায্য করেছেন। সেই শিক্ষা থেকে আমরা যেন বঞ্চিত না হই।

ভগবানের দিব্যনাম কীর্তনের গুরুত্ব

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

"বিবাদ ও শঠতায় পরিপূর্ণ এই কলিযুগে মুক্তিলাভের একমাত্র উপায় হচ্ছে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র সংকীর্তন করা। এ ছাড়া আর কোন গতি নাই, এ ছাড়া আর কোন গতি নাই, এ ছাড়া আর কোন গতি নাই।"

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বৃহন্নারদীয় পুরাণ থেকে এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করে বলেছেন যে, এই কলিযুগে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করা ছাড়া পরমার্থ লাভের আর কোন উপায় নেই। অন্যান্য অনেক আধ্যাত্মিক পন্থা আছে যেগুলি পারমার্থিক উন্নতির সহায়ক, কিন্তু এই কলিযুগে সেগুলি কার্যকরী নয়। "নাস্ত্যেব" কথাটির অর্থ হচ্ছে—আর কোন গতি নাই। এই শব্দটি পরপর তিনবার ব্যবহার করে আর যে কোন গতি নেই সেটির উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

ধ্যান, যজ্ঞ ও বিগ্রহ অর্চন এই পারমার্থিক কর্মগুলি ফলপ্রসূ হয় যখন তার সঙ্গে ভগবানের দিব্যনাম কীর্তন করা হয়। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন যে, বিগ্রহ অর্চনের মাধ্যমে হৃদয় নির্মল হয়, যদি সেই সঙ্গে কীর্তন করা হয়, কারণ এটি আমাদেরকে ভগবানের সাথে সরাসরি যুক্ত করে। আমাদের জড় দৃষ্টিতে বিগ্রহকে যেমন কাঠ, পাথর অথবা ধাতুর মতো মনে হয়, প্রকৃতপক্ষে তেমনটি নয়। বিগ্রহ সম্পূর্ণ চিন্ময় এবং ভগবান থেকে অভিন্ন।

আমরা দেখতে পাই যে, ভগবানের দিব্যনাম কতই না গুরুত্বপূর্ণ, যা সঙ্গে না থাকলে অন্যান্য পারমার্থিক পন্থাগুলি কার্যকরী হয় না। যখন আমরা মহামন্ত্র কীর্তন করি, তখন অন্যান্য পারমার্থিক কর্মগুলির প্রয়োজন হয় না। তাই "হরের্নাম হরের্নাম হরের্নাম"—এভাবেই তিনবার বলা হয়েছে—ভগবানের দিব্যনাম, ভগবানের দিব্যনাম, ভগবানের দিব্যনাম কীর্তনই একমাত্র পন্থা। আর কোন গতি নাই, আর কোন গতি নাই, আর কোন গতি নাই।

শ্রীল প্রভুপাদ মহামন্ত্র কীর্তন সম্পর্কে অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। তাঁর মূলনীতি ছিল—'হরেকৃষ্ণ' কীর্তন করুন এবং 'সুখী হউন'। সকলেই সুখী হতে চায়। আমরা সুখের জন্য কত রকমের পন্থার উদ্ভাবন করি, কিন্তু সুখী হওয়ার একমাত্র পন্থা হচ্ছে হরেকৃষ্ণ কীর্তন করা। জপ করার সময় আমাদের সুখে থাকার প্রয়াস করা বা অন্য কিছু পাওয়ার আশা করা উচিত নয়। ভক্তরা অর্থ উপার্জন অথবা জড় সুখভোগের পরিমাণ বৃদ্ধি করার জন্য আগ্রহী নন। তাঁরা ভগবানের দিব্যনামের উচ্চতর রস আস্বাদন করেন, ফলে স্বাভাবিক ভাবেই তাঁরা জড় জগতের নিম্নতর রসের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হন।

মানুষ অর্থের জন্য একে অপরকে হত্যা করে, কিন্তু যখন আমরা কৃষ্ণভাবনামৃতের রস আস্বাদন করি, তখন সেই অর্থের মূল্য গৌণ হয়ে যায়। যখন আমাদের কাছে কোন অর্থ আসে, সেটিকে আমরা কৃষ্ণের সেবায় লাগাই, কিন্তু অর্থ উপার্জনের জন্য আমাদের পথ থেকে সরে যাওয়া উচিত নয়। তাই উচ্চতর রস আস্বাদন করা গুরুত্বপূর্ণ, যেটি হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনের মাধ্যমে লাভ হয়ে থাকে।

যখন ভক্তরা পারমার্থিক জীবনের উৎসাহ হারিয়ে ফেলে, তখন আমাদের বুঝতে হবে যে, তারা জপ করা বন্ধ করে দিয়েছে। যদি কেউ নিষ্ঠা সহকারে জপ করতে থাকেন, তবে তিনি কখনই কৃষ্ণভাবনামৃতের পন্থা ত্যাগ করতে পারেন না। যাঁরা নিষ্ঠা সহকারে ষোল মালা জপ করেন, তাঁরা যে কোন অবস্থায় থাকুক না কেন, তাঁরা পারমার্থিক অগ্রগতি লাভ করবেন। তাই অবহেলা না করে প্রত্যহ ষোল মালা জপ করা উচিত, যদি সম্ভব হয় সকালে জপ করাই ভাল।

সব সময় মনে রাখতে হবে, জপই হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেবা। অন্যান্য কর্মগুলি হচ্ছে গৌণ। ভগবানের দিব্যনাম ভগবান থেকে অভিন্ন। যখন আমরা শুদ্ধনাম জপ করব, তখন আমরা শুধু শ্রীকৃষ্ণকেই দর্শন করব না, বরং তাঁর লীলা, তাঁর পরিকর এবং তাঁর সমগ্র ধাম দর্শন করতে পারব। আমরা এখানে এসেছি কৃষ্ণের সেবার জন্য, আর তাঁকে সেবা করার সর্বোচ্চ পন্থা হচ্ছে নিরাপরাধে তাঁর দিব্যনাম কীর্তন করা।

জপ তিন প্রকার ঃ নাম-অপরাধ—নাম-অপরাধ হচ্ছে দশবিধ। অপরাধযুক্ত নাম থেকে যদি মুক্ত না হওয়া যায়, তবে তা থেকে বৈষ্ণব অপরাধের প্রবণতা সৃষ্টি হয়, আর তার ফলে পারমার্থিক জীবন থেকে পতন ঘটায়।

যখন আমাদের হৃদয় কামনা-বাসনায় পূর্ণ থাকে, আর মুখে 'হরেকৃষ্ণ' জপ করছি, প্রকৃতপক্ষে তখন আমাদের হৃদয় বলছে, 'ধনং দেহি, জনং দেহি' অর্থাৎ ধন, জন, সুন্দরী স্ত্রী কামনা করছি। ভগবান আমাদের প্রার্থনায় সাড়া দেবেন, আর আমাদের জড় কামনা-বাসনা পূরণ করে দেবেন। নাম-অপরাধের ফলে ধর্ম, অর্থ ও কাম লাভ হয়। তাই যখন নাম-অপরাধের ফলে জড় জাগতিক সাফল্য লাভ হয়, তখন আমাদের অবশ্যই সতর্ক থাকা উচিত যাতে করে সেগুলি আমাদেরকে কৃষ্ণভাবনামৃতের পন্থা থেকে দূরে না নিয়ে যায়।

পদ্মপুরাণে বলা হয়েছে যে, নাম-অপরাধ থেকে মুক্ত হওয়ার একমাত্র পন্থা হচ্ছে নিরন্তর জপ করা। সমস্ত প্রকার অপরাধ, এমন কি নাম প্রভুর চরণে যে অপরাধ তাও মুক্ত হওয়া যায় একমাত্র ভগবানের নামের আশ্রয় গ্রহণ করার মাধ্যমে।

নামাভাস—নামাভাসের ফলে মুক্তি লাভ হয়। অষ্টাঙ্গযোগীরা মুক্তিলাভের আশায় যোগের মাধ্যমে এমন কি নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস পর্যন্ত বন্ধ করে দেন। এভাবেই কঠোর তপশ্চর্যার ফলে কদাচিৎ কেউ কেউ মুক্তি লাভ করেন। সেই একই মুক্তি লাভ হয় নামাভাসের ফলে।

শুদ্ধনাম—শুদ্ধ নাম উচ্চারণের ফলে অপরাধ সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়। শুদ্ধ নাম কৃষ্ণপ্রেম দান করে, যা মুক্তির চেয়ে অনেক দূরের বস্তু। যখন কোন যুবক-যুবতী ভালবাসার বন্ধনে জড়িয়ে পড়ে, তখন তারা যে আনন্দ লাভ করে, তা শুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেমের বিকৃত ও ক্ষণিক প্রতিফলন মাত্র। কৃষ্ণপ্রেম হচ্ছে নিত্য, অবর্ণনীয় পারমার্থিক আনন্দে নিমগ্ন হওয়া।

আমাদের সমস্ত চাওয়া-পাওয়া হরিনামের জন্য হওয়া উচিত। প্রাথমিক অবস্থায় আমাদের কামনা থাকে জড়, তারপর আসে মুক্তি (জড়-জাগতিক দুঃখকষ্টের নিবৃত্তি)। আর মুক্তিকে অতিক্রম করার পর তখনই কেবল আমরা শুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেমের স্তরে আসতে পারব। তাই যে কোনও পরিস্থিতিতে কখনও জপ বন্ধ করা উচিত নয়। শ্রীল প্রভুপাদ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, যদি আমরা শুধু ষোল মালা জপ ও চারটি নিয়ম পালন করি, তা হলে আমরা ভগবৎ-ধামে ফিরে যাব।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপালাভের মূল্য

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সব সময়ে একটা লাঠি হাতে করে থাকতেন, এবং কলির প্রভাব ধ্বংস করতেন। সেই জন্যই তো তিনি এসেছিলেন। কৃষ্ণভাবনার যে কল্পবৃক্ষ, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু হচ্ছেন তার কাণ্ড স্বরূপ। আমি প্রার্থনা করি যেন আমি তাঁর ভজনা করতে পারি। ঠিক যেমন গাছের সমস্ত ভারটাই কাণ্ডের ওপরে নির্ভরশীল, তেমনি সমস্ত জীবের কৃষ্ণভাবনা কৃষ্ণপ্রেম নির্ভর করে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর ওপর। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা ব্যতীত আমরা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের কৃপা লাভ করতে পারি না এবং এই শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ হচ্ছেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু—শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলিত রূপ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে যেতে হলে আমাদের যেতে হবে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর মাধ্যমে। সেটা খুব সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী।

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে গিয়েছিলেন। মহাপ্রভু বৃন্দাবন যাচ্ছিলেন এবং তখন শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভুর বাড়িতে থেমেছিলেন। সন্ন্যাস নেওয়ার পর তিনি বৃন্দাবন অভিমুখে যাচ্ছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু তাঁকে ভুল পথে চালালেন, নিয়ে গেলেন গঙ্গার তীরে এবং বার্তা পাঠিয়েছিলেন শ্রীঅদ্বৈত আচার্যকে যে, তাঁরা যেন গঙ্গার ধারে এসে মহাপ্রভুকে নিয়ে যান, শুকনো কাপড় যেন নিয়ে আসেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু তখন মহাপ্রভুকে বললেন যে, এই গঙ্গা হচ্ছে যমুনা। এইভাবে মহাপ্রভুকে ভুল পথে নিয়ে গিয়ে নবদ্বীপে নিয়ে এসেছিলেন। তিন দিন ধরে মহাপ্রভু হাঁটছিলেন বৃন্দাবনের দিকে কিন্তু কোনও অগ্রগতি হয়নি। তিনি যদি আট মাইল যেতেন তো ৮ মাইল আবার পিছিয়ে আসতেন, এইভাবে এগিয়ে পিছিয়ে এগিয়ে পিছিয়ে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু তাঁকে গঙ্গা তীরে নিয়ে আসেন।

মহাপ্রভু গঙ্গাকে যমুনা বলে মনে করছেন, তিনি ভাবলেন তিনি বৃন্দাবন পৌঁছে গেলেন। আর যমুনা ভেবে তিনি নদীর জলে ঝাঁপ দিয়েছেন; তারপর শ্রীঅদ্বৈত আচার্য নৌকো করে এসেছেন; মহাপ্রভু তাঁকে দেখে বললেন, আরে, তুমি এখানে বৃন্দাবনে এলে কি করে!

শ্রীঅদ্বৈত আচার্য মহাপ্রভুকে বললেন, তুমি যেখানে থাকবে, সেটাই তো বৃন্দাবন।

তখন মহাপ্রভু বুঝতে পারলেন—তিনি বৃন্দাবনে যাননি, তিনি নবদ্বীপেই আছেন শান্তিপুরের অপর পাড়ে আছেন।

তাই শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভুর বাড়িতে নিয়ে আসা হল তাঁকে। সেই খবর ছড়িয়ে পড়ল যে, মহাপ্রভু এসেছেন এবং এই খবর নবদ্বীপে পৌঁছে গেল চন্দ্রশেখরের মাধ্যমে, আর সমস্ত ভক্তরা এলেন মহাপ্রভুকে দর্শন করতে, শচীমাতাও গেলেন।

সেই সময়ে সপ্তগ্রামের রাজপুত্র রঘুনাথ দাস গোস্বামী হরিদাস ঠাকুরের কৃপায় মহান ভক্ত হয়ে গেছেন মহাপ্রভুর। তিনি মহাপ্রভুর কাছে এলেন এবং তাঁর অভিলাষ প্রকাশ করলেন যে, তিনি মহাপ্রভুর সঙ্গে যাবেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁকে তিরস্কার করে বললেন, না, ঐভাবে মর্কট-বৈরাগ্য প্রকাশ করো না, ঘরে ফিরে যাও এবং গৃহস্থালিতে মন দাও।

তখন রঘুনাথ দাস গোস্বামী ঘরে ফিরে গেলেন। তার কয়েক বছর পর শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা লাভ করলেন। যখন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু পানিহাটিতে ছিলেন, শ্রীরঘুনাথ গোস্বামী তখন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। শ্রীরঘুনাথ গোস্বামী তখন যুবক, আর শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু তাঁকে বললেন, 'তুমি চোর, তোমাকে দণ্ড দেব।' কেন তাঁকে চোর বললেন, কেন দণ্ড দেবেন? কারণ, মহাপ্রভু হচ্ছেন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সম্পত্তি। কিন্তু রঘুনাথ দাস গোস্বামী নিত্যানন্দ প্রভুর অনুমোদন ব্যতীতই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সেবা অনুরাগী হয়েছিলেন।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু হচ্ছেন আদি গুরু, তাই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে পেতে হলে তাঁর প্রতিনিধি শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর মাধ্যমে পেতে হবে। তিনি হচ্ছেন সদ্‌গুরু। যদি কেউ শ্রীকৃষ্ণ সান্নিধ্য পেতে চায় সদ্‌গুরুর আশীর্বাদ ব্যতীতই—তা হলে সে-ই চোর।

এখন শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী নিত্যানন্দ প্রভুর কাছে গেলেন, তিনি দণ্ড দেবেন বললেন। দণ্ড অন্য কিছু নয়, বরং তাঁর কৃপা। সেই কৃপা কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে পাওয়ার উপায়। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা না হলে আমরা কখনও শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণকে বা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে পেতে পারি না। যেহেতু শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু হচ্ছেন আদি গুরু, তাই আবার বলা হচ্ছে সদ্‌গুরুর কৃপা ব্যতীত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণকে বা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে আমরা পেতে পারি না।

তাই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু রঘুনাথ দাস গোস্বামীকে এই দণ্ড দিলেন যে, সে যেন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সমস্ত পার্ষদদের চিড়া আর দধি ভক্ষণ করায়, মহোৎসব করায়। এখনও পর্যন্ত প্রতি বছর সেই উৎসব হয় পানিহাটিতে—সেই লীলা স্মরণ করবার জন্য আমরা এই উৎসব পালন করি। সেইদিন সকাল

থেকে রাত পর্যন্ত চিড়া দই ফল দিয়ে বিভিন্ন মিষ্টান্ন মিশিয়ে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। তিরিশ থেকে চল্লিশ হাজার মানুষকে সেদিন এই প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা লাভ করার পর শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী যোগ্য হলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে লাভ করতে। তখন তিনি শ্রীজগন্নাথপুরীতে গেলেন। আর এই সময়ে মহাপ্রভু তাঁকে গ্রহণ করলেন। স্বরূপ দামোদরের হাতে অর্পণ করলেন—এইভাবে তাঁকে গ্রহণ করলেন। শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী শ্রীস্বরূপ দামোদরের সম্পত্তি হলেন। শ্রীরঘুনাথ গোস্বামী হচ্ছেন স্বরূপের রঘুনাথ। শ্রীচৈতন্যদেবের লীলায় শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু হচ্ছেন প্রধান ব্যক্তিত্ব যাঁর মাধ্যমে মহাপ্রভু কৃষ্ণভাবনা বিতরণ করেছিলেন।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু একটা খাল খুঁড়েছিলেন। কারণ, দিব্য প্রেমের যে সমুদ্র, কৃপাসিন্ধু—তা বন্ধ হয়েছিল। সমুদ্রের জল তো আমরা ভাগ করতে পারি না। যদি একটা খাল কেটে নিয়ে আসা যায়, তবে সেই সুযোগ নেওয়া যায়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সব সময়ে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গে আলোচনা করতেন। তিনি শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে জিজ্ঞেস করতেন, কিভাবে এই কলিযুগের পতিতদের উদ্ধার করা যায়। আর শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ইচ্ছা পূরণ করতে দ্বারে দ্বারে গিয়ে আমন্ত্রণ করতেন যে, অনুগ্রহ করে কৃষ্ণভাবনা গ্রহণ কর, ভিক্ষা করতেন যে, কৃষ্ণনাম হরিনাম কর।

শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর নিত্যানন্দ প্রভুর সেই লীলা বর্ণনা করেছেন—শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু দ্বারে দ্বারে যেতেন আর অনুরোধ করতেন, হরিনাম কর, তা হলে আমি দায়িত্ব নেব যাতে তুমি এই জড় জগতের সমুদ্র উত্তীর্ণ হতে পার। এই রকম বলতে বলতে তাঁর বাহুযুগল উত্তোলন করে যেতেন।

"যারে দেখে তারে কহে দন্তে তৃণ ধরি।
আমারে কিনিয়া লও, ভজ গৌরহরি ॥"

'তুমি যদি গৌরহরির ভজনা কর, তা হলে আমি তোমার ক্রীতদাস হয়ে যাব।' কী অপূর্ব ধরনের শর্ত তিনি দিয়েছেন—ভগবান নিজে বলছেন তিনি আমাদের ক্রীতদাস হয়ে যাবেন শুধুমাত্র যদি আমরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নাম উচ্চারণ করি, মহামন্ত্র জপ করি। এই বলে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ভূমিতে গড়াগড়ি যেতেন যেন সোনার পর্বত ধুলায় লুটাচ্ছে। এই ধরনের কৃপালু ছিলেন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন মহাবদান্য অবতার। তাঁর যে কৃপা বিতরণ তা প্রকাশিত হয় শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর মাধ্যমে। শ্রীনিত্যানন্দ-ত্রয়োদশীতে তাঁর আবির্ভাব তিথিতে আমরা যদি নিষ্ঠা সহকারে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা প্রার্থনা করি, তা হলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু খুব খুশি হবেন আমাদের ওপরে এবং আমরা সহজেই মহাপ্রভুর কৃপা লাভ করতে পারি।

ব্রহ্মচর্য পালনের সুফল

শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত আছে কিভাবে শুক্রাচার্যের অভিশাপে রাজা যযাতি অকাল বার্ধক্যে উপনীত হতে বাধ্য হয়েছিলেন।

যযাতি ছিলেন খুব প্রভাবশালী এক রাজা। একবার দৈত্যরাজ বৃষপর্বার কন্যা শর্মিষ্ঠা তার সখীদের সঙ্গে জলক্রীড়া করে উঠে পোশাক পরার সময়ে সখীদের সঙ্গে পোশাক বদলাবদলি হয়ে যায়। শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানী আর শর্মিষ্ঠা একে অপরের পোশাক পরে ফেলে। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য ছিলেন দৈত্যরাজা বৃষপর্বার পরামর্শদাতা।

দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য পারমার্থিক প্রগতি সংক্রান্ত পরামর্শ দেন না, যেটা হচ্ছে গুরুর মূল কর্তব্য। "যেই কৃষ্ণ তত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়"—গুরুর কাজই হচ্ছে, কিভাবে ভক্ত হওয়া যায় সেই উপদেশ দান করা।

আবার 'গুরু' শব্দটির আর একটি অর্থ হচ্ছে শিক্ষক, সুতরাং যে কোনও শিক্ষকই এক প্রকার গুরু হন।

শুক্রাচার্য দৈত্যদের শিক্ষা দেন কিভাবে জাগতিক ভোগবিলাসে আরও উন্নতি করা যায়, যদিও গুরুর কাজ এটা নয়। এই কারণেই বলী মহারাজ শুক্রাচার্যকে পরিত্যাগ করেছিলেন। তাঁর যুক্তি ছিল যে, যখন কোনও গুরু জানেন না করণীয় বা অকরণীয় কি এবং অনুচিত আচরণে শিষ্যকে ভুল পথে চালিত করেন—তখন সেই গুরুকে ত্যাগ করা উচিত। আধ্যাত্মিক উচ্চপদ থেকে যিনি পতিত হয়েছেন, তিনি—'পরিত্যাজ্যঃ'—এটাই শাস্ত্রীয় বিধি।

বৃষপর্বা রাজার কন্যা শর্মিষ্ঠা এবং শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানীর পোশাক যখন তাড়াহুড়োতে বদলাবদলি হয়ে যায়—শর্মিষ্ঠা ক্রুদ্ধ হয় দেবযানীর গায়ে

তার রাজকন্যার পোশাক দেখে। রাজার কন্যা হয়ে তার মধ্যে রজোগুণের প্রাবল্য ছিল এবং এই জাতির লোকেরা চট করে রেগে ওঠে।

শর্মিষ্ঠা তখন অপ্রিয় ভাষা ব্যবহার করে বলতে লাগল—'আমার পিতা তোমার পিতাকে পালন করেন, ঠিক যেমন পোষা কুকুর তার প্রভুর দ্বারা পালিত হয়, আর তুমি আমার পোষাক পরার স্পর্ধা করো?' এবং দেবযানীকে ধাক্কা মেরে একটি শুকনো কুয়োয় ফেলে দিয়েছিল। সেখানে দেবযানী কাঁদছিল।

ব্রাহ্মণ কন্যা হওয়ার ফলে তারও দৃঢ় অহমবোধ ছিল। সেই সময়ে রাজা যযাতি বনের মধ্যে শিকারে যাচ্ছিলেন। এক নারীর কান্না শুনে খুঁজে দেখলেন কুয়োর মধ্যে একটি অর্ধ বস্ত্রাবৃত মেয়ে পড়ে গেছে।

তিনি তাকে উদ্ধার করলেন। এবং যেহেতু বৈদিক কালে অনুশাসন ছিল যে, যদি কোনও পুরুষ কোনও রমণীর হাত ধরা অবধিও স্পর্শ করে, তা হলে এই বোঝাত যে, সে রমণী বিবাহিত। সুতরাং রাজা যযাতি দেবযানীকে গ্রহণ করলেন।

ভীষ্মদেবের ক্ষেত্রেও একই রকম ঘটনা ঘটেছিল। ভীষ্ম একবার কাশীরাজের তিন কন্যা অম্বা, অম্বিকা, অম্বালিকাকে তাদের হাত ধরে টেনে রথে তোলেন। অথচ অম্বা ছিল শল্য রাজার প্রণয়বদ্ধা। ভীষ্ম উপস্থিত হয়েছিলেন এই তিন রাজকন্যার স্বয়ংবর সভায় যেখানে তারা তাদের স্বামীদের মনোনয়ন করবে। সেখানে ভীষ্ম ঘোষণা করেন যে তাঁর ভাই বিচিত্রবীর্যই এদের বিবাহ করবে কারণ শীঘ্রই সে মহিষীসহ সিংহাসনে বসতে চলেছে। কিন্তু যেহেতু বৈমাত্রেয় ভাই বিচিত্রবীর্য খুব ছোট, তাই ভীষ্মদেব নিজে এসেছেন ভাইয়ের হয়ে তিন রাজকন্যাকে দাবী করতে—এরা তাঁর ভাই এবং পরিবারের উপযুক্ত হবে।

অম্বা তখন এসে জানিয়েছিল যে, সে শল্যকে তার হৃদয়দান করে ফেলেছে। ভীষ্ম তা স্বীকার করে নিয়েছিলেন। কিন্তু অম্বা যখন শল্যের কাছে গেল, শল্য অপমানিত বোধ করল এবং সেখানে উপস্থিত সমস্ত রাজাদের সাথে ভীষ্মের যুদ্ধ হলো।

ভীষ্ম একাই সবাইকে পরাজিত করেন। অম্বা যখন এসে শল্যকে বলে যে, সে আসলে শল্যকেই বিবাহ করতে চেয়েছিল এবং সেজন্যই ভীষ্ম তাকে যেতে দিয়েছে, তখন শল্য খুব সুন্দর একটা কথা বলেছিলেন—যে, সিংহ কখনও অন্য কোনও জন্তুর দ্বারা নিহত প্রাণী নিজের আহার হিসাবে গ্রহণ করে না।

কেবলমাত্র শিয়াল, কুকুর এবং হায়নারাই সিংহের দ্বারা নিহত পশুর মাংস খেয়ে থাকে। সিংহ নিজের শিকার নিজেই করে।

শল্য জানাল যে, ভীষ্ম অম্বাকে দাবী করে, এখন তার কাছে ফেরত পাঠিয়ে উপকার করা দেখাচ্ছেন—'আমি তোমাকে গ্রহণ করব না'। অম্বা এই কথা শুনে ভীষ্মদেবের কাছে ফিরে আসতে ভীষ্ম জানালেন তিনি আজীবন ব্রহ্মচর্য পালনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, তিনি তা ভঙ্গ করতে পারেন না।

সুতরাং এইভাবে ভীষ্ম অম্বাকে অস্বীকার করেছিলেন যদিও তাঁর উচিত ছিল তাকে গ্রহণ করা যেহেতু তিনি অম্বাকে হাত ধরে তুলেছিলেন।

সেই রকমই, রাজা যযাতি দেবযানীকে কুয়ো থেকে হাত ধরে টেনে তোলে এবং তখন সে স্নান থেকে উঠে প্রায় অনাবৃত ছিল এবং এটি আরও একটি বিবেচ্য বিষয়—কোনও সতী রমণী কখনও স্বামী ছাড়া অন্য কারো সামনে বস্ত্র ত্যাগ করে না। সুতরাং এই বিচারেও বলা যায়, যযাতিই দেবযানীর স্বামী হয়েছিল।

তাই দেবযানী যযাতির কাছে আবেদন করল তাকে গ্রহণ করার জন্য। কিন্তু অনুমতি নেওয়া দরকার। তাই তারা শুক্রাচার্যের কাছে গেল। রীতি হচ্ছে—নিম্নবর্ণের কোনও পুরুষ উচ্চবর্ণের কোনও নারীকে বিবাহ করতে পারে না, কারণ উচ্চবর্ণের নারীকে মাতৃস্বরূপা জ্ঞান করা হয়। দেবযানী ছিল উচ্চবর্ণের এবং রাজা যযাতি ক্ষত্রিয় রাজা হওয়ায় ব্রাহ্মণের চেয়ে নিম্নবর্ণের ছিল। কিন্তু শুক্রাচার্য রাজী হন একটি ভিত্তিতে।

শর্মিষ্ঠা যখন দেবযানীকে অপমান করে আঘাত দেয়, শুক্রাচার্য তা জানতে পেরে রাজ্য ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন। শুক্রাচার্য চলে যাওয়ায় রাজা বৃষপর্বা সঙ্কটে পড়েন এবং তিনি গিয়ে শুক্রাচার্যকে ফিরিয়ে আনেন। কিন্তু শুক্রাচার্য আসতে রাজী হন একটা শর্তে যে, শর্মিষ্ঠা তাঁর কন্যা দেবযানীর পরিচারিকা হয়ে থাকবে।

রাজা যযাতি যখন দেবযানীকে বিবাহ করেন, শুক্রাচার্য তাঁকে উপদেশ দিয়েছিলেন, যযাতি যেন কখনও শর্মিষ্ঠার প্রতি হীনদৃষ্টি না দেন এবং তার সাথে শারীরিক সম্পর্ক না রাখেন। কারণ শুক্রাচার্য জানতেন, শর্মিষ্ঠা রাজার কন্যা হওয়ায় অত্যন্ত সুন্দরী ছিল এবং যযাতি স্বাভাবিকভাবে তার প্রতি আকৃষ্ট হতেই পারেন।

কিন্তু সময় যেতে, শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানী তার পিতার কাছে ফিরে আসে এবং যা ঘটেছে তার বিবরণ দেয়। শুক্রাচার্য তখন যযাতিকে অভিশাপ

দেন যে, যেহেতু তিনি তাঁর সতর্কবাণী উপেক্ষা করেছেন, তিনি অকাল বার্ধক্য প্রাপ্ত হবেন এবং তার ফলে রাজা যযাতি বুড়ো হয়ে যান।

যযাতি শুক্রাচার্যের কাছে মিনতি জানান এই অভিশাপ তুলে নেবার জন্য। শুক্রাচার্য বলেন, যা দিয়ে ফেলেছি তা ফেরানো যায় না, তবে যদি তোমার কোনও পুত্র তোমার বার্ধক্য গ্রহণ করে তা হলে তুমি মুক্ত হবে।

ভাগবতের এই অংশে এই ঘটনাটিই বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, রাজা যযাতি তাঁর পাঁচ পুত্রের কাছে প্রস্তাব রাখেন। প্রথম চারজন রাজী হয়নি। কিন্তু কনিষ্ঠ পুত্র তার বাবার বার্ধক্য গ্রহণ করতে সম্মত হয় এবং যদিও পুরু ছিল এক অল্প বয়স্ক বালক, সে তখন বৃদ্ধ হয়ে যায়।

এই কাহিনীর তাৎপর্য এই যে, সময় বা জরার কন্যাই হলো বার্ধক্য, নাম কালকন্যা। সময় আমাদের বৃদ্ধ হতে বাধ্য করে। এই কালকন্যা জীবকে বা কাহিনীর পুরঞ্জনকে মোহিত করে।

এই প্রসঙ্গে আর একটি বিবরণ আছে। সময়ের এই কন্যা, কালকন্যা একবার নারদ মুনিকে বিবাহ করতে চায়। কিন্তু নারদ মুনি তাকে ফিরিয়ে দেন, ফলে নারদ মুনি একটি বরদান প্রাপ্ত হন যে, তিনি কোনও দিন বৃদ্ধ হবেন না।

এই থেকে ব্রহ্মচর্যের গুরুত্বও নির্দিষ্ট হয়। যখন কেউ 'সময়'-এর প্রভাবকে প্রত্যাখ্যান করে, বা প্রলোভনকে জয় করে তখন সময় তার প্রভাব সেই ব্যক্তির ওপর রাখতে পারে না।

এখানে আমরা ভীষ্মদেবের ব্রহ্মচর্যের দৃঢ়তাও তুলনা করতে পারি। তাঁর বাবার ইচ্ছা পূরণার্থে ভীষ্ম প্রতিজ্ঞা নিয়েছিলেন তিনি কখনও বিবাহ করবেন না। এজন্য পিতা শান্তনুর কাছে ভীষ্ম ইচ্ছামৃত্যুর বরদান পেয়েছিলেন।

দেখা যাচ্ছে, যখন কেউ ব্রহ্মচর্য, সংযম পালন করে চলে, তখন সে কালের প্রভাবের শিকার হয় না। তার দেহত্যাগ মর্মান্তিক হয় না। সে মরতে বাধ্য হয় না। কিছু সূক্ষ্মতর গুণাবলী তার আয়ত্তে আসে—সুতীক্ষ্ম স্মৃতি, বুদ্ধিমত্তার বিকাশ ইত্যাদি। ব্রহ্মচর্য পালনের সুফল এমনই সুদূরপ্রসারী।

শুধু ব্রহ্মচারীই নয়, পারমার্থিক পথে গৃহস্থরাও ব্রহ্মচর্যের সুফলের অধিকারী হতে পারে। গৃহস্থ যখন কেবলমাত্র প্রজন্ম প্রসারণের উদ্দেশ্যেই মিলিত হয় তখন তা করা হয় এক কর্তব্য পালনের মনোভাব এবং এইভাবে যারা আচরণ করে তারাও একপ্রকার ব্রহ্মচারী।

সুতরাং আধ্যাত্মিক জীবনে সে ব্রহ্মচারী হোক বা গৃহস্থ হোক বা বানপ্রস্থী বা সন্ন্যাসী—সকলেরই উদ্দেশ্য তার জীবনীশক্তিকে উর্ধ্বমুখী, পরমার্থমুখী করে পরিচালিত করা। জড়মুখী করে জীবনীশক্তিকে চালিত করলে তা ক্ষয় হয়ে যায় এবং জীবনীশক্তিবিহীন জীব স্বভাবতই মৃতের সমান।

পুরঞ্জনের কাহিনীর ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে, সে কেবলই ভোগ করতে চেয়েছিল। তার ফলে যবনরাজের আক্রমণে সে পড়ে। এই যবনরাজেরই সহচরী হচ্ছে কালকন্যা—সময় বা কালের কন্যা। সে যখন পুরঞ্জনকে আলিঙ্গন করে, পুরঞ্জনের সমস্ত জীবনীশক্তি লোপ পায়।

মানবরূপী জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য আছে—ভগবানের নাম কীর্তন মাধ্যমে নিজেদের উন্নত করার এক অসামান্য সুযোগ। অন্যান্য জীবজন্তু কেবল দেহকেই যথাসর্বস্ব বোঝে—খাওয়া, ঘুম, আত্মরক্ষা, মৈথুন। মানব দেহ পেলে এসবের উর্ধ্বে উঠে কৃষ্ণভাবনাযুক্ত হওয়ার সুযোগ মেলে। কিংবা তারও আগে আসে 'অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা'—নিজের সম্বন্ধে জানা, পারমার্থিক বিষয়ে জিজ্ঞাসা, আমি কি, আমার করণীয় কি। এই কৌতূহলই কৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় জ্ঞানে পৌছে দেয় যদি একজন সদ্গুরুর দ্বারা চালিত হওয়া যায়।

সুতরাং সিদ্ধান্ত পাওয়া যাচ্ছে যে, 'মানব-জীবন পেলে, একজন সদ্গুরুর সন্ধান করা আবশ্যক, যিনি সেই পারমার্থিক গন্তব্যে পথ দেখাতে পারেন। সেটাই অমরত্ব লাভ। তা না হলে, দেহকে ভোগ করিয়ে দেহকে নষ্ট করা হবে। আত্মার বিনাশ নেই।

বেদের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানকে জানা

কলিযুগের মানুষদের অধঃপতিত অবস্থার কথা চিন্তা করে ব্যাসদেব বেদকে সহজবোধ্য করার কথা বিবেচনা করেন। পূর্ণরূপে বেদকে জানা না হলে বেদের প্রকৃত তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নয়। বেদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানকে জানিয়ে দেওয়া। যতক্ষণ পর্যন্ত বেদের মাধ্যমে সেই ভগবানকে জানা না যাচ্ছে ততক্ষণ বেদের মূলতত্ত্ব জানা হয় না। তাই বেদকে

গাভীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। গাভীর মুখ্য প্রয়োজনীয়তা হচ্ছে তার দুধের জন্য। কিন্তু গাভীর দুধ না গ্রহণ করে যদি তার ঠ্যাং অথবা শিং নিয়ে টানাটানি করা হয়, তাহলে তাতে কোন লাভ হয় না। তেমনই বেদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জানিয়ে দেওয়া এবং যতক্ষণ পর্যন্ত সেই কার্যটি সাধিত না হচ্ছে ততক্ষণ বেদ অনুশীলনে কোন লাভ হয় না। শ্রীকৃষ্ণ নিজেই ভগবদ্গীতায় বলেছেন, "বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যো" অর্থাৎ, সমস্ত বেদে একমাত্র জ্ঞাতব্য বিষয় হচ্ছি আমি। সেই সূত্রে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে বলা হয়েছে—

সর্বশাস্ত্রে কহে কৃষ্ণভক্তির ব্যাখ্যান।
জ্ঞান, যোগ, তপো-ধর্ম নাহি মানে আন ॥

সমস্ত শাস্ত্রে কৃষ্ণভক্তির ব্যাখ্যাই করা হয়েছে, কর্ম, জ্ঞান, যোগ ইত্যাদির যে বর্ণনা শাস্ত্রে পাওয়া যায় তা আনুষঙ্গিক। কৃষ্ণভক্তির অনুকূল অঙ্গরূপে সেগুলির উপযোগিতা। কৃষ্ণকেন্দ্রিক না হলে সেগুলি অনুশীলনের ফলে কোন লাভ হয় না। পক্ষান্তরে ক্ষতিই হয়।

বেদকে সাধারণত তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে, কর্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড এবং উপাসনা কাণ্ড। কর্মকাণ্ডে বর্ণনা করা হয়েছে, কিভাবে কর্ম করার ফলে কর্ম বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়। কর্ম যখন নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য সাধিত হয় তখন সেই কর্মের ফল জীবকে জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখে। অর্থাৎ কেউ যখন স্বার্থ সিদ্ধির জন্য কর্ম করে তখন সেই কর্মের ফল তাকে ভোগ করতে হয় এবং সেই কর্মফলই হচ্ছে তার বন্ধন। পুণ্য কর্মের ফলে সে সুখ ভোগ করে এবং পাপ কর্মের ফলে সে দুঃখ ভোগ করে। এই সুখ এবং দুঃখ, উভয়ই বন্ধন। কিন্তু কর্ম যখন ভগবানের উদ্দেশ্যে সাধিত হয়, তখন সেই কর্মের ফল ভগবান গ্রহণ করেন, তাই সেই কর্মের ফলে কোনো বন্ধনের সৃষ্টি হয় না। পক্ষান্তরে সেই কর্ম, বন্ধন-মুক্তির কারণ হয়। এইভাবে বেদের কর্মকাণ্ড অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে, কিভাবে ভগবানের উদ্দেশ্যে এবং ভগবানের প্রতিনিধি দেবতাদের উদ্দেশ্যে কর্মফল উৎসর্গ করার মাধ্যমে কর্ম-বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়।

জ্ঞানকাণ্ডের উদ্দেশ্য হচ্ছে যথার্থ জ্ঞানের মাধ্যমে ভগবানকে জানার পন্থা প্রদর্শন করা। ভগবান জড়াতীত বস্তু, তাই জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাঁকে জানা কখনই সম্ভব নয়। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য বলেছেন, অচিন্ত্য খলু যে ভাবাঃ ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ। যে তত্ত্ব আমাদের চিন্তার অতীত, তর্কের দ্বারা কখনো

তার সম্বন্ধে জানা যায় না। সুতরাং সেই তত্ত্বকে জানতে হয় শাস্ত্রের মাধ্যমে। শাস্ত্রে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং যা বর্ণনা করা হয়েছে সেই সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক না করে, শ্রদ্ধাবনত চিত্তে এবং সরল বিশ্বাসে সেগুলি গ্রহণ করতে হবে। শাস্ত্রে যদি বলা হয় যে ভগবানের গায়ের রঙ নীল, তাহলে, কারও গায়ের রঙ নীল হতে পারে কিনা, তা নিয়ে তর্ক না করে মেনে নিতে হবে যে ভগবানের গায়ের রঙ নীল। এইভাবে শাস্ত্রের বর্ণনা অনুসারে ভগবানকে জানার পন্থা অবলম্বন করতে শিক্ষা দেওয়াই হচ্ছে জ্ঞানকাণ্ডের উদ্দেশ্য। জ্ঞানকাণ্ডে যে বহু শাখায় জ্ঞানের আলোচনা করা হয়েছে তাতে এইটিই কেবল বোঝানো হয়েছে যে জ্ঞানের দ্বারা ভগবানকে জানা যায় না। তাই জ্ঞানের প্রয়াস ত্যাগ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কেননা এই জ্ঞানের মাধ্যমে লাভ কিছুই হয় না, কেবল জঞ্জালই বেড়ে যায়।

এইভাবে জ্ঞানের স্তর অতিক্রম করা গেলে শুরু হয় ভগবানের উপাসনা। তা বর্ণিত হয়েছে, বেদের উপাসনা কাণ্ডে। এবং এই উপাসনা কাণ্ডই হচ্ছে বেদের মূল শিক্ষা। যাতে ভগবানের রূপ, গুণ, লীলা ইত্যাদি পূর্ণরূপে বর্ণনা করে ভগবানকে আরাধনা করার বা ভালোবাসার পথ প্রদর্শিত হয়েছে।

মায়ার বন্ধন থেকে মুক্তি

এই জড়া প্রকৃতি হচ্ছে অনিত্য। এর অর্থ হচ্ছে এটি কোন এক সময়ে সৃষ্টি হয়েছে এবং পরে তা বিনাশ প্রাপ্ত হবে।

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্ বিপরিবর্ততে ॥

"হে কৌন্তেয়, আমার অধ্যক্ষতার দ্বারা ত্রিগুণাত্মিকা মায়া এই চরাচর বিশ্ব সৃষ্টি করে। প্রকৃতির নিয়মে এই জগৎ পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি হয় এবং ধ্বংস হয়।" (ভগবদ্গীতা ৯/১০)

যারই জন্ম হয়েছে তার অবশ্যই মৃত্যু হবে। যা কিছুই সৃষ্টি হয়েছে তা অবশ্যই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে এবং যা কিছু ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে তা অবশ্যই পুনরায় সৃষ্টি হবে। এটিই হচ্ছে এই জড় জাগতিক প্রকাশের প্রকৃতি।

খণ্ড ও সামগ্রিক বিভিন্ন ধরনের প্রলয় বা ধ্বংস রয়েছে। অনন্ত দেবের অগ্নি সীমার মধ্যে, যা স্বর্গলোক পর্যন্ত ধাবিত হয়, খণ্ড প্রলয় ঘটে থাকে। যখন অনন্তদেব অগ্নিশ্বাস ত্যাগ করেন স্বর্গ পর্যন্ত সমস্ত সৃষ্টি ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। আর যখন সংহার-কর্তা ভগবান শিব নৃত্য শুরু করেন তখন সামগ্রিক প্রলয় হয়। তিনি যখন নৃত্য করেন, তাণ্ডব নৃত্য, সমগ্র সৃষ্টি লয় প্রাপ্ত হয়। অণু-পরমাণুসমূহ বিদীর্ণ হয়ে সৃষ্টি লয় প্রাপ্ত হয়।

যখন ব্রহ্মার মৃত্যু হয় এবং যখন মহাবিষ্ণু মায়া হতে তাঁর দৃষ্টি প্রত্যাহার করেন তখনও প্রলয় ঘটে থাকে। আরেক ধরনের প্রলয় হচ্ছে ব্যক্তিগত প্রলয়—মৃত্যুর সময় যা ঘটে থাকে। যখন কারোর মৃত্যু হয় তার কাছে সমগ্র সৃষ্টিরই লয় হয়। এছাড়া যুদ্ধের আকারেও বৃহদায়তন ধ্বংস সাধিত হয়।

কৃষ্ণ এই জড়া প্রকৃতি ধ্বংসের কত রকম আয়োজন করে রেখেছেন। কিন্তু এই ধরনের বিনাশশীল জড় সৃষ্টির অতীত আরেকটি সৃষ্টি রয়েছে, আরেকটি প্রকৃতি, আর সেটি হচ্ছে নিত্য। পরমেশ্বর ভগবান সেই নিত্য অবিনাশী বাস্তবতায় নিত্যত অবস্থান করেন।

পরস্তস্মাত্তু ভাবোহন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ ।
যঃ স সর্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি ॥

"আর একটি প্রকৃতি রয়েছে, যা নিত্য এবং ব্যক্ত ও অব্যক্ত বস্তুর অতীত। ব্রহ্মা থেকে স্থাবর জঙ্গম আদি সমস্ত প্রকাশ বিনষ্ট হলেও তা বিনষ্ট হয় না।" (ভগবদ্‌গীতা ৮/২০)

জীবও নিত্য শাশ্বত। অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো, ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে। "তিনি (আত্মা) জন্মরহিত, শাশ্বত, নিত্য এবং প্রাচীন। শরীর নষ্ট হলেও আত্মা কখনো বিনষ্ট হয় না।" (ভগবদ্‌গীতা ২/২০)

পরমেশ্বর ভগবানের অবিচ্ছেদ্য অংশ হওয়ায়, জীবাত্মাও পরমেশ্বর ভগবানের চিন্ময় গুণাবলীর একই দিব্য গুণে বিভূষিত। জীবাত্মার যখন চিন্ময় প্রকৃতি থেকে পতন হয় সে তার চিন্ময় গুণাবলী হারিয়ে ফেলে। জীবাত্মার স্বাভাবিক অবস্থানটি হচ্ছে চিন্ময় প্রকৃতিগত। কিন্তু জীবাত্মা যখন তার স্বাধীনতাকে কৃষ্ণের থেকে বিচ্ছিন্নভাবে উপভোগ করার জন্য ব্যবহার করে সে তার চিন্ময় প্রকৃতিতে অবস্থান করার অধিকার হারায়।

কৃষ্ণ-ভুলি' সেই জীব অনাদি—বহির্মুখ ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ ॥

অর্থাৎ "কৃষ্ণকে ভুলে জীব অনাদিকাল ধরে জড়া-প্রকৃতির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে রয়েছে। তাই মায়া তাকে এই জড় জগতে নানা প্রকার দুঃখ প্রদান করছে।" (শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত মধ্য ২০/১১৭)

"সংসার-দুঃখ।" দুঃখ অর্থ হচ্ছে দুর্দশা বা যন্ত্রণা আর সংসার অর্থ হচ্ছে সমাজ, পরিবার ও বন্ধুত্ব ইত্যাদির ভিত্তিতে যে জড় জাগতিক লিপ্ততা। পরিবার, বন্ধুবান্ধব ও সমাজের প্রসারিত স্বার্থপরতার মাধ্যমে বদ্ধ জীব এই জড়া প্রকৃতিকে ভোগ করার চেষ্টা করে। সে এই জড়া প্রকৃতিকে ভোগ করার বিভিন্ন ধরনের আয়োজন করে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তার আয়োজনগুলি হচ্ছে দুঃখ ভোগ করার আয়োজন। আর এটিকেই বলা হচ্ছে সংসার। জীব ভোগ করার চেষ্টা করছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, তাদের ভোগ করার উদ্যম সত্ত্বেও তারা তাদের দুঃখ দুর্দশাকে বর্ধিত করছে।

কৃষ্ণ-বহির্মুখ হইয়া ভোগ-বাঞ্ছা করে ।
নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে ॥

অর্থাৎ "যখনই জীব কৃষ্ণ বিমুখ হয় আর কৃষ্ণহীনভাবে আনন্দ উপভোগের আকাঙ্ক্ষা করে, মায়া অমনি তাকে জড়িয়ে ধরে।" (প্রেমবিবর্ত)

এইভাবে জীব জড়া প্রকৃতির মধ্যে পতিত হয় আর এই জড়া প্রকৃতির মধ্যস্থ প্রত্যেকেই হচ্ছে সেই একই ভুলের বলি। কিভাবে জীব কৃষ্ণের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ভোগ করতে ইচ্ছুক হয় সে কথা এই শ্লোকে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। 'বহির্মুখ' কথাটির অর্থ হচ্ছে মুখ ঘুরিয়ে নেওয়া। 'বহিঃ' অর্থ হল বাইরের দিকে বা অন্য কোন দিকে। দুটো ভাব রয়েছে। উন্মুখ আর বহির্মুখ। উন্মুখ অর্থ হচ্ছে নির্দিষ্ট দিকে মুখ করে থাকা আর বহির্মুখ অর্থ হল নির্দিষ্ট দিক হতে মুখ ঘুরিয়ে নেওয়া। আমরা হয় কৃষ্ণের দিকে মুখ করে থাকতে পারি অথবা কৃষ্ণের দিক হতে মুখ ঘুরিয়ে নিতে পারি। জীবাত্মারূপে আমাদের কৃষ্ণের দিকে মুখ করে তাঁকে দর্শন করার কথা। কিন্তু কোন এক সময় আমরা কৃষ্ণের দিক হতে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিলাম। আর যখন আমরা সেটি করি, আমরা কৃষ্ণের বহিরঙ্গা শক্তিকে দর্শন করি।

সমস্ত কিছুই হচ্ছে কৃষ্ণের শক্তির প্রকাশ। আমরা যখন কৃষ্ণকে দর্শন করি আমরা কৃষ্ণের সঙ্গে থাকি। কিন্তু যখনই আমরা কৃষ্ণ হতে দৃষ্টি অন্য দিকে নিক্ষেপ করি তখন আমরা তাঁর বহিরঙ্গা শক্তিকে দর্শন করি। আর কৃষ্ণের বহিরঙ্গা শক্তির প্রকৃতিটি কি?

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্ ।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ ॥

"হে মহাবাহো (অর্জুন), এই নিকৃষ্টা প্রকৃতি ব্যতীত আমার আর একটি উৎকৃষ্টা প্রকৃতি রয়েছে। সেই প্রকৃতি চৈতন্য স্বরূপা ও জীবভূতা; সেই শক্তি থেকে সমস্ত জীব নিঃসৃত হয়ে এই জড় জগতকে ধারণ করে আছে।" (ভগবদ্গীতা ৭/৫)

এখানে 'জগৎ' শব্দটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। আক্ষরিক অর্থে এর মানে হচ্ছে যা অনবরত চলমান অর্থাৎ জড়া প্রকৃতি। একটি নদীর প্রবহমানতাও জগতের আর একটি উদাহরণ হতে পারে। নদী কোন সময়েই থেমে থাকে না। তেমনি সময়ের রথে আরোহণ করে এই জড়া প্রকৃতিও নিরন্তর প্রবহমান।

"যয়েদং ধার্যতে জগৎ" কথাটির অর্থ হল এই নিরন্তর প্রবাহিত জড়া প্রকৃতিকে জীবাত্মা ধারণ করছে। জীবাত্মা হচ্ছে উৎকৃষ্টা শক্তি আর এই জড় জগত হচ্ছে নিকৃষ্টা শক্তি। তাই যখনই কোন উৎকৃষ্টা জীবাত্মা নিকৃষ্টা জড়া শক্তির সংস্পর্শে আসে, তার মধ্যে জড়া প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব করার আকাঙ্ক্ষা জাগরিত হয়। নিকৃষ্টা শক্তির উপর আধিপত্য করাই হচ্ছে উৎকৃষ্টা শক্তির স্বভাব। এটি জীবাত্মার স্বাভাবিক প্রবণতা আর তার ফলে সে প্রথম জড় আচ্ছাদন অহংকার দ্বারা আবৃত হয়। অহংকারের অর্থ হচ্ছে ভুল বা ভ্রান্ত পরিচয়। জীবের মূল পরিচয় হল, সে হচ্ছে কৃষ্ণের নিত্য দাস। এ কথা ভুলে গিয়ে সে জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য করার চেষ্টা করে আর সেটিই হচ্ছে তার প্রকৃত পরিচয় হারিয়ে ভ্রান্ত পরিচয়ে অবস্থান করার কারণ। একজন ভৃত্য হওয়ার পরিবর্তে সে প্রভু হওয়ার চেষ্টা করে। সে তখন পরিকল্পনা করে কিভাবে এই জড়া প্রকৃতিকে শোষণের মাধ্যমে সে সুখ উপভোগ করবে। এই পরিকল্পনা তখন তাকে জড়া প্রকৃতির দ্বিতীয় আচ্ছাদন 'বুদ্ধি' প্রদান করে। অতঃপর জড়া প্রকৃতির তৃতীয় আচ্ছাদন 'মন' দ্বারা আবৃত হয়ে তার চেতনা অনবরত জড়া প্রকৃতির বিষয় সমূহের দিকে ধাবিত হয়।

এইভাবে মন, বুদ্ধি ও অহংকার দ্বারা নির্মিত তার একটি সূক্ষ্মদেহ গড়ে ওঠে এবং এই সূক্ষ্ম দেহটি থেকে সে একটি বাহ্য ইন্দ্রিয়সম্পন্ন দেহ লাভ করে জড়া প্রকৃতির কার্যক্রমের মধ্যে পূর্ণরূপে নিয়োজিত হয়ে পড়ে। এই জড়া প্রকৃতিতে প্রতিটি জীবাত্মা তার সূক্ষ্ম ও বাহ্য ইন্দ্রিয়গত দেহ দ্বারা আবদ্ধ। এছাড়াও আরও বিভিন্ন স্তরের বন্ধন রয়েছে। এইভাবে জড়া প্রকৃতির মধ্যেকার বিভিন্ন বস্তুকে অধিকার করে সে ভোগ করার চেষ্টা করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তার অধিকারগুলি হচ্ছে তার বিভিন্ন বন্ধন। সে আরও এবং আরও অধিকার উপভোগ করার চেষ্টা করে। ফলে সে আরও এবং আরও বদ্ধ হয়ে পড়ে।

বন্ধন মানেই হচ্ছে দুঃখ কষ্ট ভোগ। তাই যদি কেউ সত্যি সত্যিই আনন্দ লাভ করতে ইচ্ছুক হয় তাকে বন্ধন মুক্ত হতে হবে। আর কিভাবে কেউ মুক্ত হতে পারে? কেবলমাত্র তার যা কিছু আছে সেসব ত্যাগ করেই কি কেউ মুক্ত হতে পারে? না। মুক্ত হবার একমাত্র উপায় হচ্ছে সমস্ত কিছু তার প্রকৃত মালিকের কাছে নিবেদন করা। যদি কেউ বলে "আমি আমার সমস্ত টাকা পয়সা পরিত্যাগ করব", তবুও তার পক্ষে সেই বন্ধন মুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। সে বাহ্যত তা ত্যাগ করলেও অন্তঃস্থ আসক্তি থেকেই যায়। সে সেটি ত্যাগ করা সত্ত্বেও তার মনে স্মৃতিটি তখনও থেকে যায়। কেউ হয়ত তার পরিবারকে ত্যাগ করে ধ্যান করার জন্য বনে চলে গেল, কিন্তু তার মন যদি তখনও তার স্ত্রী ও পরিবার ইত্যাদির কথা ভাবতে থাকে তাহলে সেটি হচ্ছে প্রবঞ্চনা। তাই মুক্ত হবার শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে সমস্ত কিছু তার আসল মালিক, কৃষ্ণকে নিবেদন করা আর প্রকৃতপক্ষে আমরা যার সঙ্গে সম্পর্কিত সেই কৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলার মাধ্যমে জীবনের পরম স্বাদ আস্বাদন করা। সেটি কেবলমাত্র কৃষ্ণভাবনামৃতের মাধ্যমেই সম্ভব। উৎকৃষ্ট স্বাদ প্রাপ্ত হলে আমরা নিকৃষ্ট স্বাদ ত্যাগ করতে পারব।

বিষয়া বিনিবর্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে ॥

"দেহবিশিষ্ট জীব ইন্দ্রিয় সুখ ভোগ নিবৃত্ত হতে পারলেও ইন্দ্রিয় সুখ ভোগের আসক্তি থেকেই যায়। কিন্তু উচ্চতর স্বাদ আস্বাদন করার ফলে সেই বিষয় তৃষ্ণা থেকে তিনি চিরতরে নিবৃত্ত হন।" (ভগবদ্গীতা ২/৫৯)

"পরম দৃষ্ট্বা নিবর্ততে" অর্থাৎ কৃষ্ণের সঙ্গে আমাদের প্রেমময়ী সম্পর্কের উচ্চতম স্বাদ প্রাপ্ত হওয়ার দ্বারা আমরা নিম্নতম স্বাদকে "বর্জম্" অর্থাৎ বর্জন করতে পারি। এবং আমাদের যা কিছু আছে তার সমস্তটি তাঁকে নিবেদন করার মাধ্যমে কৃষ্ণের সঙ্গে আমাদের প্রেমময়ী সম্পর্কটি আমরা গড়ে তুলতে পারি। সমস্ত কিছু কৃষ্ণের জন্য ত্যাগ করার পন্থাটিই হচ্ছে কৃষ্ণভাবনামৃতের পন্থা। এখানে ত্যাগের অর্থ হচ্ছে কৃষ্ণকে অর্পণ করা। সমস্ত কিছুই আসলে তাঁর, একথাটি ভালোভাবে হৃদয়ঙ্গম করে, সমস্তকিছু কৃষ্ণকে অর্পণ করে আমরা আমাদের আসক্তি থেকে মুক্ত হতে পারি।

সমস্ত কিছুই কৃষ্ণের। তাই সমস্তকিছু অবশ্যই তাকে নিবেদন করতে হবে। হ্যাঁ, আমরা আমাদের অর্থের প্রতি আসক্ত, তাই আমরা তা কৃষ্ণকে নিবেদন করলাম। হ্যাঁ, আমরা আমাদের পরিবারের প্রতি আসক্ত, আমরা তাই

আমাদের পরিবারের সদস্যদের কৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত করলাম। আমরা আমাদের দেহের প্রতি আসক্ত, তাই আমরা আমাদের দেহকে কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে নিবেদন করলাম। আমাদের সমস্ত আসক্তিগুলোকে কৃষ্ণকে নিবেদন করার মাধ্যমে আমরা মুক্ত হয়ে যাই। একজন ভক্তই হচ্ছে একমাত্র ব্যক্তি যিনি জড় আসক্তি থেকে মুক্ত হয়ে আনন্দময় হতে পারেন।

আমেরিকায় জনগণের জীবনযাত্রার মান ও আয় ইত্যাদি বিষয়ে কিভাবে একটি পরিসংখ্যান গ্রহণ করা হচ্ছিল সে বিষয়ে কিছুদিন আগে আমাকে বলা হল। এ বিষয়ে পরিসংখ্যান গ্রহণকারী এক মহিলা একজন তরুণ ব্রহ্মচারী ভক্তের সাক্ষাৎকার নিচ্ছিলেন। সেই মহিলা তাকে তার মাসিক বা সাপ্তাহিক আয় কত এ বিষয়ে প্রশ্ন করছিলেন। ভক্তটি জানালো তার কোন আয় নেই। মহিলাটি তখন তাকে তার সম্পত্তির বিষয়ে প্রশ্ন করলেন। আপনার কোন বাড়ি আছে কি? না। আপনার কোন গাড়ি আছে কি? না। আপনার স্ত্রী রয়েছে? না। আপনার কোন মেয়ে বন্ধু আছে? না। আপনার কোন ব্যাঙ্ক একাউন্ট আছে? না। ব্রহ্মচারী ভক্তের সমস্ত উত্তর হল 'না'। হঠাৎই সেই প্রশ্নকারী মহিলা তীক্ষ্ণস্বরে বলে উঠলেন, "তাহলে আপনি এত সুখী কেন?"

সেই মহিলা জানতেন না যে কোনকিছুর অধিকারী না হওয়াটাই সুখী হওয়ার একমাত্র পথ। জড় প্রকৃতিতে সকলেই মনে করে যে তাদের যদি কোনকিছু না থাকে তাহলে তারা আনন্দ উপভোগ করতে পারবে না। তারা ভাবে যে আনন্দ উপভোগ করার জন্য কারোর অবশ্যই কিছু থাকতে হবে। এই জাগতিক ধারণাটি সম্পূর্ণ ভুল।

যেভাবেই হোক না কেন, আমরা যখন পারমার্থিক স্তরে, প্রকৃত বাস্তবতায় অবস্থান করি, আমরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারি যে প্রকৃতপক্ষে আমাদের কোনকিছুর অধিকারী হওয়ার প্রয়োজন নেই। সবকিছুই সেখানে রয়েছে, আর সবকিছুরই অধিকারী হচ্ছেন কৃষ্ণ, যিনি আমাদের ভালোবাসেন।

একটি শিশু হয়ত কোন কিছুর অধিকারী না হতে পারে, কিন্তু যদি তার বাবার অর্থ থাকে তাহলে শিশুটিকে অর্থের জন্য কোন চিন্তা করতে হয় না, তার বাবাই তার সমস্ত প্রয়োজনের যোগান দেয়। পারমার্থিক স্তরে এই সচেতনতা জাগরিত হয় যে সবকিছুর মালিকই হচ্ছেন কৃষ্ণ আর কৃষ্ণ হচ্ছেন আমার পিতা, আমার বন্ধু, আমার প্রেমিক, আমার সবকিছু। আমরা যখন সেটি হৃদয়ঙ্গম করব, কেবল তখনই আমরা কৃষ্ণের উপরে নির্ভর করতে পারব। আমাদের যা প্রয়োজন, কৃষ্ণ আমাদের তার সবকিছুই প্রদান করবেন, তাহলে আমরা কেন বিচ্ছিন্নভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করব?

আপনি কি কল্পনা করতে পারেন, কৃষ্ণের উপর নির্ভরশীল প্রত্যেকে কতটা ভারমুক্ত এবং উদ্বেগহীন? কেবলমাত্র কৃষ্ণকে গ্রহণ করার মধ্যেই ব্যাপারটি লুকিয়ে আছে।

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥

"সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল আমার শরণাগত হও। আমি তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করব। সে বিষয়ে তুমি কোন দুশ্চিন্তা করো না।" (ভগবদ্গীতা ১৮/৬৬)

প্রকৃতপক্ষে আসক্তি হচ্ছে বন্ধন যা এই জড় প্রকৃতিতে আমাদের বেঁধে রাখে। এমন নয় যে আমাদের হাত পা বেঁধে রাখা হয়, কিন্তু আমরা আমাদের হৃদয়ের দ্বারা আবদ্ধ থাকি। কেউ হয়ত তার স্বামী বা স্ত্রীর প্রতি আসক্ত। সেটির প্রকৃত অর্থ কি দাঁড়ায়? এর অর্থ হচ্ছে তার স্ত্রী বা স্বামী তাকে এই জড় প্রকৃতিতে খুব সুন্দরভাবে বেঁধে রেখেছে। কেউ হয়ত তার অর্থ, তার গৃহ বা তার গাড়ির প্রতি আসক্ত। এই ধরনের অসংখ্য বন্ধন রয়েছে।

আমরা যখন কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে পরমেশ্বর ভগবান কৃষ্ণকে গ্রহণ করি তখন জাগতিক আসক্তির সকল বন্ধনই ছিন্ন হয় এবং আমাদের হৃদয়ের সকল সংশয়ের বিনাশ হয়। কেবলমাত্র কৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে আনন্দময় হয়ে ওঠা তাই খুবই সহজ। আমরা তৎক্ষণাৎ মুক্ত ও আনন্দিত হব। কৃষ্ণভাবনামৃতে কোন কর্ম নেই। আমরা কেবলমাত্র কৃষ্ণের লীলাসমূহে অংশগ্রহণ করছি। লীলা শব্দটি ক্রীড়ার সমার্থক। তাই ভক্তগণ কেবলমাত্র ক্রীড়া করেন।

আমরা যখন মঙ্গলারতিতে উপস্থিত থাকার জন্য প্রত্যুষে ঘুম থেকে উঠি, সেটি কি কোন কর্ম? যদি আমাদের সঠিক চেতনাটি না থাকে তবে সেটি কর্ম। কিন্তু যদি সেটি কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে করি, সেটি অত্যন্ত আনন্দের। আমরা যখন নৃত্য কীর্তন করি সেটি কি আমরা কর্মের জন্য করি? না। আনন্দবশতঃ কেউ নৃত্য করে। যখন আমাদের হৃদয়ের অভ্যন্তরস্থ আনন্দ আমাদের দেহে প্রকাশিত হয়, সেটিকেই নৃত্য বলা হয়।

চিন্ময় প্রকৃতিতে কেবল সঙ্গীত ও নৃত্য রয়েছে। পারস্পরিক কথোপকথন, যে কোন কথা বলা সকলই সঙ্গীতময়। চিন্ময় আকাশে সকলেই গান করছেন আর সেখানে প্রতিটি মুহূর্তেই নৃত্য রয়েছে। চিন্ময় প্রকৃতি এমনই আনন্দময়। শ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় আমাদের কেবলমাত্র সকল আসক্তিকে কৃষ্ণের কাছে

সমর্পণ করার মাধ্যমে আমরা নিজেদেরকে সেই চিন্ময় প্রকৃতিতে রূপান্তরিত করার অপূর্ব সুযোগ লাভ করেছি। আমরা এই পন্থাটি গ্রহণ করব কি না সেটি আমাদের উপর নির্ভর করছে। শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন যে এক মিনিটের মধ্যে, না এক মিনিটও নয়, এক সেকেণ্ডের মধ্যে কেউ নিজেকে কেবলমাত্র কৃষ্ণের কাছে পূর্ণ আত্মসমর্পণের মাধ্যমে চিন্ময় প্রকৃতিতে রূপান্তরিত করতে পারেন।

যত শীঘ্র আমরা কৃষ্ণের জন্য আমাদের আন্তরিক প্রেম গড়ে তুলতে পারব তত শীঘ্র আমরা বৃন্দাবনে গতি প্রাপ্ত হব। আমাদের দেহটি এখানে থাকলেও, আমরা চিন্ময় আকাশে অবস্থান করব। সেটিই আমাদের উদ্দেশ্য আর সেইজন্যই আমরা এখানে রয়েছি। সেই কৃষ্ণপ্রেম গড়ে তুলে চিন্ময় আকাশে ফিরে যাবার জন্য আমরা সকলে ইসকনে যোগদান করেছি।

জড় জীবন ও আধ্যাত্মিক জীবন

বিভিন্ন প্রকার জীবেদের মধ্যে রয়েছে কিছু পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ, সরীসৃপ এবং এই সমস্ত জীব সমাজের সর্বোচ্চ স্তরে রয়েছে মনুষ্য সমাজ। যখন জীব মনুষ্য শরীর প্রাপ্ত হয় তখন সে একটি মস্ত বড় সুযোগ লাভ করে। সেই সুযোগটি হচ্ছে সে তার চেতনাকে বিকশিত করে ভগবানকে জানতে পারে যেটা আর কোন জীবের মধ্যে সম্ভব নয়। এই বিভিন্ন স্তরের জীবদের চেতনা অনুসারে তাদের বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত করা হয়েছে। কিছু জীবের চেতনা আচ্ছাদিত হয়ে রয়েছে। যেমন—গাছপালা।

সূর্যরূপ কৃষ্ণের কিরণ লাভ করলে, শ্রীগুরুদেব রূপ জলের আশ্রয়ে থাকলে এবং সূর্যের কিরণ রূপ কৃষ্ণের করুণা বা কৃষ্ণের প্রতি উন্মুখ হলে তার সেই চেতনা বিকশিত হতে পারে। তাই আমরা এখানে সহজেই দেখতে পাই যে, মানুষের চেতনা আর পশুদের চেতনার মধ্যে পার্থক্য তখনই সাধিত হয় যখন মানুষ ভগবানের দিকে উন্মুখ হয়। তা না হলে মানুষ একটি পশু। বৈদিক শাস্ত্রে তাই বলা হয়েছে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষ ভগবন্মুখী হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে মানুষ বলে গণনা করা যায় না, তাকে বলা হয়েছে নরাধম। নরের শরীরটি মানুষের ঠিকই কিন্তু তার চেতনাটি মানুষের স্তরে আসেনি। নরের

অধম অর্থাৎ নরের স্তর থেকে তারা অধম স্তরে রয়েছে। অতএব মানুষকে তখনই মানুষ বলে গণনা করা যায়, যখন মানুষ ভগবন্মুখী হয়, কেননা তখনই তার চেতনা বিকশিত হতে শুরু করে। তা না হলে মানুষও সেই সঙ্কুচিত স্তরে থেকে যাবে। বৈদিক শাস্ত্রে বা বেদান্ত সূত্রে তাই বলা হয়েছে "অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা" অর্থাৎ এখন যেহেতু তুমি মনুষ্য শরীর লাভ করেছ তাই তোমাকে ব্রহ্ম সম্বন্ধে জানতে হবে, আধ্যাত্মিক তত্ত্ব উপলব্ধি করতে হবে, ভগবানের সঙ্গে তোমার নিত্যসম্পর্ক পুনঃস্থাপন করতে হবে। এই বৈদিক সংস্কৃতিই হচ্ছে ভারতের বৈশিষ্ট্য। অন্যান্য দেশের সঙ্গে ভারতের পার্থক্যটি কোথায়? পৃথিবীতে তো অনেক দেশ রয়েছে তার মধ্যে এই ভারত-ভূমিকে কেন পবিত্র ভূমি বা ধর্মক্ষেত্র বলে বিবেচনা করা হচ্ছে? তার কারণ এই ভারতবর্ষে বৈদিক সংস্কৃতির অনুশীলন হয়, এই ভারত-ভূমিতে যারা মনুষ্য জন্ম লাভ করে তারা ভগবদ্ তত্ত্ব জ্ঞান লাভের একটি মস্ত বড় সুযোগ পায়। তাই এই ভারত-ভূমিকে এক বিশেষ পবিত্র ভূমি বলে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। ভারত শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'ভা' মানে যোগী আর 'রত' হচ্ছে যে স্থানের বা যে ভূমির মানুষেরা জ্ঞানের জ্যোতিতে রত, সেই দেশটিকে বলা হয় ভারতবর্ষ। জ্যোতি বলতে প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানের আলোককেই বোঝানো হয়। এই যে সাধারণ বৈদ্যুতিক আলো বা আগুনের আলো এটা ঠিক প্রকৃত আলোক নয়, প্রকৃত আলোক হচ্ছে জ্ঞানের আলোক এবং এই যে বিশেষ স্থানটি এই স্থানের মানুষদের জ্ঞানের আলোক রত থেকে সেই আলোকে উদ্ভাসিত হওয়াই কর্তব্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আজকের ভারতবাসীরা সেই কাজটি করছে না, তারা পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ করছে, তারা পাশ্চাত্যের আবর্জনাগুলি সংগ্রহ করছে। তার ফলে আজকের এই দেশের যে কি অবস্থা হয়েছে তা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন।

জড়বাদ আর অধ্যাত্মবাদ দুটি বিপরীত ধর্মীয় বস্তু। জড়বাদের বাইরে চাকচিক্য রয়েছে কিন্তু সেই বস্তুটি অন্তসারশূন্য। জড়বাদের বাইরের চাকচিক্য দেখে লালায়িত হয়ে মানুষ তার পেছনে সুখ ভোগের জন্য ছোটে, কিন্তু চরমে তারা দুঃখ ছাড়া আর কিছু পায় না। আর অধ্যাত্মবাদ বা ধর্মের পথ অবলম্বন করলে, বা ভগবানের শরণাগতির পথ অবলম্বন করলে প্রথম দিকে হয়তো একটু কষ্ট হয় কিন্তু তার পরিণতিটি অত্যন্ত আনন্দদায়ক। এখন আপনারা বিচার করুন কোন্ পথটি আপনারা গ্রহণ করবেন? যার প্রথমে চাকচিক্য এবং সুখের ইঙ্গিত রয়েছে, হাতছানি রয়েছে, কিন্তু চরমে সেটি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর একটি

রূপ নিয়ে আমাদের সর্বনাশ সাধন করে সেই পথটি গ্রহণ করবেন? না যে পথটি গ্রহণ করলে আমাদের পরম কল্যাণ সাধিত হয়? প্রাথমিক শুরু স্তরে সেই পথটি হয়তো একটু কঠিন, একটু কষ্টদায়ক বলে মনে হতে পারে কিন্তু চরমে তা আমাদের নিত্য আনন্দ প্রদান করবে। সরল কথায় বলা যায় যে, জড় সুখভোগের যে জীবন তা প্রথমে অমৃতের মতো বলে মনে হয় কিন্তু চরমে সেটি বিষে পরিণত হয়। আর আধ্যাত্মিক জীবনটি প্রথমে বিষবৎ মনে হতে পারে কিন্তু চরমে তা আমাদের অমৃতত্ত্ব দান করে। এখন আমাদের বিবেচনা করতে হবে আমরা কোন্ পথটি গ্রহণ করব। দুর্ভাগ্যবশতঃ আজকের জগতে যে শিক্ষাব্যবস্থা তাতে আধ্যাত্মিক জীবনের কোন রকম শিক্ষা নেই, তারা সমস্ত জড় বিষয় নিয়েই মেতে রয়েছে, জড় বিষয় নিয়েই নানা রকমের শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে, জড় বিষয় নিয়েই নানা রকম গবেষণা হচ্ছে। কিন্তু এই জড়ের অতীত জড়াতীত যে চিন্ময় জগৎ রয়েছে সেই জগতের কোন আলোচনা বা শিক্ষা আজকে হচ্ছে না, এটি আমাদের চরম দুর্ভাগ্য।

ভারতবর্ষের মানুষেরা আজ আর জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত হতে অনুপ্রাণিত হচ্ছে না, তারা অন্ধকারের গভীরতম প্রদেশে ঝাঁপ দিচ্ছে। তারই ফলে আজ কেবল ভারতবর্ষেই নয় সারা পৃথিবীতে এই দুর্দশার সৃষ্টি হয়েছে, কারণ এই যে জ্ঞানের আলোক সেই জ্ঞানের আলোক এই ভারতবর্ষই পৃথিবীকে দান করতে পারে। যেহেতু ভারতবাসীরা সেই কর্তব্যটি সম্পাদন করছে না তাই আজ সারা পৃথিবী অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে।

তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সমস্ত ভারতবাসীদের বললেন—"ভারত-ভূমিতে হইল মনুষ্য জন্ম যার, জন্ম সার্থক করি কর পরোপকার"। এই ভারত ভূমিতে যারা মনুষ্য জন্ম লাভ করেছে এবং যারা করবে তারা যেন তাদের জন্ম সার্থক করে পরোপকার ধর্মটি গ্রহণ করে। নিজের স্বার্থ চিন্তায় মগ্ন না থেকে কি করে অন্য সকলের মঙ্গল হবে সেই উদ্দেশ্য সাধনে তারা যেন ব্রতী হয়। সেই পরোপকারের ধর্মটি কিরকম? সেকথা বিশ্লেষণ করে মহাপ্রভু বললেন—"যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ উপদেশ, আমার আজ্ঞায় গুরু হইয়া তার' এই দেশ।" তুমি যাকে দেখ, যার সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হয়, যার সঙ্গে তোমার পরিচয় হয় তাকে তুমি কৃষ্ণ উপদেশ দাও, কৃষ্ণ যে উপদেশগুলি দিয়েছেন সেই উপদেশটি দাও, ভগবদ্গীতায় ভগবান যেকথা বলেছেন সে কথা তাদের শোনাও, শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান সম্বন্ধে যে কথা বলা হয়েছে সেই কথাগুলি তুমি তাদের শোনাও। এই দায়িত্বটি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রতিটি ভারতবাসীকে দিয়ে

গেছেন এবং ভারতবাসীরা যদি তাদের সেই কর্তব্যটি সম্পাদনে ব্রতী হন, সচেষ্ট হন তাহলে কেবল ভারতবর্ষেরই নয় আজকের সারা পৃথিবীর এক আমূল পরিবর্তন সাধিত হবে। দেহাত্মবুদ্ধিতে আচ্ছন্ন থেকে জীবন যাপন করলে চরমে কি লাভ হবে? দেহটির মৃত্যু যখন হবে তখন এই দেহটিকে নিয়ে আমরা যা কিছু করেছিলাম তা সব শেষ হয়ে যাবে।

এই সূত্রে আমার একটি ঘটনা বা একটি স্থানের কথা মনে পড়ে। ইটালিতে রোম শহরে যেটি হচ্ছে খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বীদের মূল পীঠস্থান ভ্যাটিকান। ঐটি রোমান ক্যাথলিকদের মূল পীঠস্থান। সেখানে একটি গীর্জা আছে, আজ থেকে প্রায় চোদ্দ পনেরোশ বছর আগে সেই গীর্জাটি স্থাপিত হয়েছিল। সেই গীর্জার যারা পুরোহিত বা প্রিষ্ট তাদের মৃত্যুর পর দেহটি রেখে দেওয়া হয়। তাদের দেহ আমাদের মতো পোড়ানো হয় না। আর এই সমস্ত পুরোহিত বা প্রিষ্টদের দেহাবশেষ অর্থাৎ অস্থিগুলি সেখানে জমিয়ে রাখা হয়। তাহলে আপনারা ভেবে দেখুন হাজার হাজার মানুষের অস্থি গত চোদ্দ/পনেরোশ বছর ধরে সঞ্চিত হয়েছে কত মানুষের অস্থি সেখানে থাকতে পারে। আবার সেই সমস্ত অস্থি দিয়ে তারা নানা রকম নক্সা করেছে। হাড়ের ফুল, হাড় দিয়ে নানা রকম সমস্ত সাজ সজ্জা করা হয়েছে। আর সেটা দেখে যখন বেরোনো হয় বা বেরোবার মুখে একটি কঙ্কাল রয়েছে অর্থাৎ মাথা, পাঁজর, হাত, পা এই সমস্ত হাড়গুলি সমন্বিত একজন সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং তার পাশেই লেখা রয়েছে—"তুমি আজ যা, একসময় আমি তা ছিলাম, আর আমি এখন যা একদিন তুমি তাতে পরিণত হবে।" একদিন আমরা সকলেই একটি কঙ্কালে পরিণত হব। আমাদের দেহের চরম পরিণতি তাই, একদিন সব শেষ হয়ে যাবে।

এই যে চামড়া, মাংস, মেদ যেগুলিকে আমরা দেহের সৌন্দর্য বলে মনে করছি, যাকে আমি আমার দেহ বলে মনে করছি, যাকে আমরা স্বরূপ বলে মনে করছি মৃত্যুর পর সেগুলি সব হয় পচে গলে যাবে, তা নয়তো ক্রিমি কীটেরা খাবে, শকুনি, কুকুরের ভক্ষণ হবে, আর যদি আগুনে পোড়ানো হয়, তাহলে কয়েক ঘন্টার মধ্যে সেগুলি ভস্মে পরিণত হবে। এখন এই যে অনিত্য দেহটি। এই দেহটা নিয়ে ব্যস্ত থাকাটা কি বুদ্ধিমানের কাজ? না। কিন্তু জড়বাদে এই দেহটি সব, এই দেহের ভিতরে যে একটি আত্মা রয়েছে এবং সেই আত্মার উপস্থিতির ফলে যে এই দেহটি সজীব রয়েছে সে কথা তারা বিচার করে না, করতে পারে না। এখন পাশ্চাত্যের সভ্যতা হচ্ছে সেই সভ্যতা

যেখানে আত্মার স্বীকৃতি দেওয়া হয় না, কেবল দেহ সর্বস্ব জীবন যাপন। কিন্তু আমাদের দেশে সকলেই জানে যে, আত্মাই হচ্ছে আমাদের স্বরূপ এবং দেহটি হচ্ছে সেই আত্মার একটি আবরণ। এই যে আমি আছি, আমি বেঁচে আছি, এই আমিত্ব বোধটি কোথা থেকে আসছে? আত্মা থেকে আসছে, চেতনা থেকে আসছে। চেতনা আসছে কোথা থেকে? চেতনা আসছে আত্মা থেকে। যেহেতু চেতনাটি দেহের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে তাই আমরা দেহটি সম্বন্ধে সচেতন এবং দেহটিকে আমার স্বরূপ বলে মনে করছি। কিন্তু যখন আমরা ঘুমিয়ে পড়ি তখন আমার দেহে চেতনা থাকে না, কিন্তু আমি থাকি। ঘুমিয়ে যখন স্বপ্ন দেখি তখন কে দেখে? মন বুদ্ধি অহংকার দিয়ে গঠিত সূক্ষ্ম শরীর, সেই সূক্ষ্ম শরীরে আমরা স্বপ্ন দেখি। আর এই জড় শরীরটি সম্বন্ধে বলা হয়েছে একটি স্থূল শরীর। মাটি, জল, আগুন, বায়ু ও আকাশ এই পাঁচটি স্থূল পদার্থ দিয়ে এই স্থূল শরীরটি গঠিত হয়েছে। এখন আমাদের এই স্থূল এবং সূক্ষ্ম শরীরের উর্ধ্বে যে আত্মা সেই আত্মা থেকেই চেতনা আসছে এবং সেই আত্মাই হচ্ছে আমার আমি। এই আত্মাকে জানার যে চেষ্টা সেই চেষ্টাকে বলা হচ্ছে আধ্যাত্মিক অনুশীলন বা অধ্যাত্ম চেতনা। আধি আত্মিক অর্থাৎ আত্মার সম্বন্ধীয় যে চেতনা সেটি হচ্ছে অধ্যাত্ম জ্ঞান।

দিব্য জ্ঞান কি?

আমাদের স্বরূপে আমরা কৃষ্ণের নিত্য দাস। স্বস্তি স্ব-অস্তি অর্থাৎ আমাদের স্বরূপে স্থিতি, সেটি হচ্ছে প্রকৃত স্বস্তি। যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা আমাদের স্বরূপে অধিষ্ঠিত হতে পারব ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা প্রকৃত শান্তি লাভ করতে পারব না। আমাদের প্রকৃত পরিচয় হল আমরা সব ভগবানের নিত্য দাস।

"দিব্য জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্বন্তি পাপস্য সংক্ষয়ম্।" দিব্যজ্ঞান প্রদান করার ফলে এবং গ্রহণের ফলে পাপের ক্ষয় হয়। দিব্য জ্ঞানম্-এর 'দি' এবং সংক্ষয়ম্-এর 'ক্ষ' এই দুটি অক্ষরের যোগে হয় 'দীক্ষা'।

শ্রীগুরুদেব দিব্যজ্ঞান দান করেন এবং তার ফলে এই দিব্যজ্ঞান গ্রহণকারী শিষ্যের পাপের ক্ষয় হয়। এই দিব্য জ্ঞান লাভের ফলে ভগবৎতত্ত্ব জ্ঞান হৃদয়ে প্রকাশিত হয় আর সেই ভগবত্তত্ত্ব জ্ঞান হচ্ছে জীবের এক মাত্র কাম্য।

জড় জগৎ এবং চিজ্জগৎ—দুটি জগৎ রয়েছে। আমরা জড় জগতে রয়েছি, কিন্তু এই নাশমান, ক্ষয়শীল, অনিত্য জড় জগতের উর্ধ্বে একটি নিত্য, শাশ্বত আনন্দময় জগৎ রয়েছে, সেই জগৎ থেকে আমরা সকলে এসেছি। আমাদের স্বরূপে আমরা চিন্ময় আত্মা এবং এই চিন্ময় আত্মা জড় জগতের বস্তু নয়, আত্মা হল চেতন জগতের বস্তু। সেই চিন্ময় জগৎ থেকে সমস্ত আত্মা এসেছে, আমরা সকলে এসেছি। আমাদের প্রকৃত আলয় সেই চিন্ময় ভগবদ্ধাম যেখানে ভগবান নিত্য বিরাজ করেন তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদদের নিয়ে। এই জড় জগৎ থেকে সেই চিন্ময় জগতে ফিরে যাবার যে পন্থা সেটি গুরু-শিষ্য পরম্পরা ধারায় অনাদি কাল থেকে প্রবাহিত হচ্ছে। সৃষ্টির আদিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ব্রহ্মাকে এই দিব্যজ্ঞান দান করেন। ব্রহ্মা ভগবানকে হৃদয়ঙ্গম করে বা ভগবানকে জেনে ভগবান সম্বন্ধে যে কথাগুলি বলে গেছেন সেটি হচ্ছে "ব্রহ্ম-সংহিতা"। সৃষ্টির আদিতে প্রথম সৃষ্ট জীব ব্রহ্মাকে ভগবান স্বয়ং এই দিব্য জ্ঞান দান করেন, ব্রহ্মা সেই দিব্যজ্ঞান দান করেন তাঁর পুত্র নারদ মুনিকে, নারদ মুনি সেই জ্ঞান দান করেন ব্যাসদেবকে, ব্যাসদেব তা প্রদান করেন মধ্বাচার্যকে। এইভাবে গুরু-শিষ্য পরম্পরা ধারায় এই দিব্যজ্ঞান প্রবাহিত হচ্ছে। এই জ্ঞান প্রাপ্তির উপায় হচ্ছে শ্রীগুরুদেবের চরণাশ্রয় করে এই জ্ঞান লাভ করা। গুরুদেবের কাছ থেকে শিষ্য এই জ্ঞান প্রাপ্ত হন, যথাসময়ে শিষ্য গুরু হয়ে তাঁর শিষ্যকে সেই জ্ঞান দান করেন, তাঁর শিষ্য আবার কালক্রমে গুরু হয়ে তাঁর শিষ্যকে এই জ্ঞান দান করেন। এই গুরু এবং শিষ্যের পারস্পরিক জ্ঞান প্রদান এবং গ্রহণের যে ক্রিয়া সেটিকে বলা হয় গুরু-শিষ্য পরম্পরা। পরম্পরাক্রমে এই জ্ঞান প্রবাহিত হচ্ছে। অতএব এই জ্ঞান প্রাপ্ত হতে হলে আমাকে এমন কোন ব্যক্তির কাছে যেতে হবে যাঁর কাছে এই জ্ঞান রয়েছে এবং তিনিই এই জ্ঞান প্রদান করতে পারেন।

ভগবদ্‌গীতাতে (৪/৩৪) ভগবান সেই কথা অর্জুনকে বলছেন যে, তুমি যদি এই জ্ঞান প্রাপ্ত হতে চাও তাহলে

তদ্‌বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥

অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর, যে বস্তুটি জড় জগতের অতীত সেই বস্তুটি জড় ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নয়, প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তা আমরা উপলব্ধি করতে পারি না। সেই বস্তুটি পাবার উপায় হচ্ছে যার কাছে তা আছে তার কাছে যেতে হবে প্রকৃষ্টরূপে নিজেকে সমর্পণ করে। যেমন ছাত্র যদি কোন শিক্ষকের কাছে শিক্ষালাভ করতে চায় তাহলে শিক্ষকের কাছে তাকে আত্মসমর্পণ করতে হবে, নিজে বিনীত হয়ে তাঁকে যথাযথ সম্মান প্রদান করে এই জ্ঞানটি প্রাপ্ত হতে হবে। ঐকান্তিকভাবে তাঁর কাছে প্রশ্ন করতে হবে এবং সেবার দ্বারা তাঁর সন্তুষ্টি বিধান করতে হবে। তার ফলে তিনি তখন সেই জ্ঞান দান করবেন, তিনি সেটি দান করতে পারেন কারণ তাঁর কাছে সেই বস্তুটি রয়েছে—এটিই হচ্ছে পন্থা।

আবার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই সেখানে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন—ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবান্ অহম্ অব্যয়ম্—এই জ্ঞানটি আমি সূর্যদেব বিবস্বানকে দান করেছিলাম, বিবস্বান মনবে প্রাহ—বিবস্বান তাঁর পুত্র বৈবস্বত মনুকে দান করেন, মনু ইক্ষ্বাকবে অব্রবীৎ—এবং মনু তা ইক্ষ্বাকুকে দান করেন। এবং পরম্পরা প্রাপ্তম্ ইমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ—এইভাবে পরম্পরার মাধ্যমে এই যোগটি রাজর্ষিদের মাধ্যমে প্রবাহিত হচ্ছে। কিন্তু স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ—কালক্রমে এই যোগটি নষ্ট হয়ে যাওয়ায় কৃষ্ণ আবার এসে ভগবদ্গীতার মাধ্যমে এই জ্ঞানটি প্রদান করলেন। অতএব এটিই হচ্ছে দিব্য জ্ঞান লাভের উপায়। অর্থাৎ এই দীক্ষার মূল বিষয়টি হচ্ছে দিব্য জ্ঞান। অনুষ্ঠানটি আনুষঙ্গিক কিন্তু প্রকৃত বস্তুটি হচ্ছে দিব্য জ্ঞান এবং এই দিব্য জ্ঞানটি যদি লাভ না হয় তাহলে দীক্ষা অর্থহীন। সেই দিব্য জ্ঞান যাতে আমরা অর্জন করতে পারি সেই চেষ্টা আমাদের করতে হবে এবং সেইজন্য এই দীক্ষার আয়োজন। আবার বলা হচ্ছে "দীক্ষা কালে শিষ্য করে আত্মসমর্পণ, সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম।" দীক্ষার সময় শিষ্য তার গুরুদেবের কাছে নিজেকে সমর্পণ করে, তখন এই যে সমর্পিত আত্মা যে শিষ্য গুরুদেবের প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে কৃষ্ণ তাকে গ্রহণ করেন। যে মাত্রায় আমরা আত্মসমর্পণ করব সেই অনুসারে কৃষ্ণ আমাদের গ্রহণ করবেন। যদি আমরা পুরোপুরিভাবে আত্মসমর্পণ করি তাহলে কৃষ্ণ তা গ্রহণ করবেন।

গুরুদেব কৃষ্ণের প্রতিনিধি, তিনি কোন বিশেষ অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি নন। তাঁর একমাত্র যোগ্যতা হচ্ছে তিনি সৎগুরুর শিষ্য এবং তিনি তাঁর

গুরুদেবের কাছ থেকে জ্ঞানটি প্রাপ্ত হয়েছেন। অর্থাৎ তিনি একজন সৎগুরুর শিষ্য এবং তাঁর কাছ থেকে এই জ্ঞান নিষ্ঠা সহকারে গ্রহণ করেছেন। গুরুদেব উদ্ধার করেন না, গুরুদেবের মাধ্যমে শিষ্য উদ্ধার লাভ করে। উদ্ধার কর্তা হচ্ছেন কৃষ্ণ। গুরুদেব তাঁর প্রতিনিধি। যেমন কোন প্রতিনিধির কাছে গেলে এবং তিনি যদি যথাযথভাবে প্রতিনিধিত্ব করেন তাহলে সেই বস্তুটি পাওয়া যাবে। যেমন আমি যদি একটা Ambassadar গাড়ী কিনতে চাই এবং তার প্রতিনিধির কাছে আমার Order-টা পেশ করে তাকে যদি আমি চেক দিই তাহলে আমার কাছে গাড়ীটা পৌছবে কিনা? নিশ্চয়ই পৌছবে। এর জন্য Hind Motor-এর মালিকের কাছে গিয়ে আমার চেকটা দিতে হবে না। আমাকে Order-টা পেশ করতে হবে Hind Motor-এর Sales Representative এর কাছে। সে যদি যথাযথ প্রতিনিধি হয় তাহলে তার মাধ্যমে আমি বস্তুটি প্রাপ্ত হব। গাড়িটি কিন্তু ওই প্রতিনিধির নয়, গাড়ীটি মালিকের, কিন্তু যেহেতু তিনি কোম্পানীর প্রতিনিধিত্ব করছেন তাই তাঁর মাধ্যমে বস্তুটি আমরা পেতে পারি।

তেমনই আমরা কৃষ্ণের কৃপা লাভ করতে চাই আর গুরুদেব কৃষ্ণের প্রতিনিধিত্ব করছেন। এইভাবে দেখা যাচ্ছে তিনি হচ্ছেন কৃষ্ণের ভক্ত। তাই গুরুদেবের যোগ্যতা হচ্ছে তিনি হলেন কৃষ্ণভক্ত।

কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয় ॥

তিনি ব্রাহ্মণ হোন, শূদ্র হোন, সন্ন্যাসী হোন, যাই হোন না কেন, তাতে কিছু যায় আসে না। তাঁর প্রকৃত যোগ্যতা হচ্ছে যে তিনি কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, তিনি কৃষ্ণকে জানেন। আর কৃষ্ণকে কিভাবে জানা যায় সে সম্পর্কে ভগবান অর্জুনকে গীতায় বলছেন—ভক্তহসি মে সখা চেতি—আমি এই রহস্য তোমার কাছে উন্মোচন করছি, বা সবাইয়ের কাছে ব্যক্ত করছি। আমি কে এটা তোমাকে আমি জানাচ্ছি। কারণ তুমি আমার ভক্ত, তা না হলে তোমাকে জানাতাম না। ভগবানকে কে জানতে পারে? যিনি ভগবানের ভক্ত তিনি জানতে পারেন, অন্যথায় ভগবানকে জানা সম্ভব নয়। তাই "যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়।" গুরুর যোগ্যতাই হচ্ছে যে, তিনি কৃষ্ণ তত্ত্ববেত্তা অর্থাৎ তিনি কৃষ্ণের ভক্ত। তাই এইভাবে যদি গুরুদেবের কাছে আত্মসমর্পণ হয়, কৃষ্ণের যথাযথ প্রতিনিধির কাছে যদি আত্মসমর্পণ হয় তাহলে কৃষ্ণ তাকে গ্রহণ করেন।

এতক্ষণ গুরুদেবের যোগ্যতা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা হল, এখন শিষ্যের যোগ্যতা কি? শিষ্য কথাটির অর্থ হচ্ছে যে শাসন গ্রহণ করতে প্রস্তুত। গুরুদেবের কাজ হচ্ছে শাসন করা, শিষ্যকে শাসানো, আর শিষ্যকে প্রস্তুত থাকতে হবে গুরুদেবের কাছ থেকে সেই শাস্তিটি গ্রহণ করার জন্য। গুরুদেব আমাকে শাসন করলে আমি গুরুদেবকে ত্যাগ করে চলে গেলাম সে শিষ্য নয়। গুরুদেব যখন মিষ্টি মধুর কথা বলবেন তখন তাঁর কাছে থাকব, তাঁর কথা শুনব, আর যেই গুরুদেব আমার ভুলত্রুটিগুলো দেখতে শুরু করলেন, আমাকে শাসন করতে শুরু করলেন, তখন আমার মন ভেঙ্গে গেল এই রকম অবস্থা যার হবে সে শিষ্য নয়। আমাদের মনে রাখতে হবে শিষ্য মানে যে শাসন গ্রহণ করতে প্রস্তুত। তাই দীক্ষা নেওয়ার আগে সকলকে বিচার করে নিতে হবে যে, শাসন মানতে প্রস্তুত কিনা।

এখন আমরা বিচার করি দিব্য জ্ঞানটি তাহলে কি? দিব্য জ্ঞান মানে হচ্ছে 'কৃষ্ণতত্ত্বজ্ঞান'। কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় জ্ঞান হচ্ছে দিব্য জ্ঞান। আর কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় জ্ঞান মানে—কৃষ্ণের রূপ সম্বন্ধীয় জ্ঞান, কৃষ্ণের গুণ সম্বন্ধীয় জ্ঞান, কৃষ্ণের লীলা সম্বন্ধীয় জ্ঞান, কৃষ্ণের ধাম সম্বন্ধীয় জ্ঞান, কৃষ্ণের পার্ষদ সম্বন্ধীয় জ্ঞান, কৃষ্ণের ভক্ত সম্বন্ধীয় জ্ঞান, কৃষ্ণের পরিকর সম্বন্ধীয় জ্ঞান। এগুলিই হচ্ছে দিব্য জ্ঞান। এগুলি জড় জগতের বিষয় নয় এগুলি চিজ্জগতের বিষয় এবং চিজ্জগতের যা কিছু বিষয় তা হচ্ছে দিব্য জ্ঞান।

এই জড় জগতের জ্ঞানটি জড়জ্ঞান বা অজ্ঞান, কিন্তু প্রকৃত জ্ঞান কি? তা হল ভগবদ্‌তত্ত্ব জ্ঞান। সেই জ্ঞানটি লাভ করার পর সে জ্ঞানটির যখন উপলব্ধি হয় সেটি হল বিজ্ঞান বা বিশেষ জ্ঞান। কৃষ্ণ কে? তা আমরা Theoretically জানলাম কিন্তু Practically উপলব্ধি ছাড়া ততক্ষণ পর্যন্ত সেটি কেবল জ্ঞান, কিন্তু যখন সেই দিব্য জ্ঞান হৃদয়ে প্রকাশিত হয় তখন সেটিকে বলা হয় বিজ্ঞান। যারা দীক্ষা লাভ করতে চায় তাদের সেই দিব্য জ্ঞান বা বিজ্ঞান প্রাপ্ত হবার প্রয়াসী হতে হবে। অতএব আমাদের বিচার করে দেখতে হবে এই যে দীক্ষা এটি কেবল মাত্র একটি অনুষ্ঠান নয়।

আসুরিক লোকেরা সর্বদা ভগবানের বিরোধী

অহংকার বল দর্প কাম ক্রোধ ইত্যাদির বশবর্তী হয়ে আসুরিকভাবাপন্ন ব্যক্তিরা তাদের এবং অন্যের দেহে যে ভগবান রয়েছেন সেই ভগবানের প্রতি বিদ্বেষ পরায়ণ হয়। সকলের দেহেই ভগবান পরমাত্মারূপে বিরাজমান।

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।

গীতায় ভগবান বলছেন তিনি প্রতিটি জীবের হৃদয়ে পরমাত্মারূপে বিরাজ করছেন। "সর্বভূতানাম্‌" সমস্ত ভূতে অর্থাৎ সমস্ত জীবে ভগবান পরমাত্মারূপে বিরাজমান। কিন্তু এই শ্লোকে বলা হচ্ছে যে যারা আসুরিক ভাবাপন্ন তারা সেকথা বুঝতে না পেরে পরস্পরের প্রতি ও ভগবানের প্রতি বিদ্বেষ পরায়ণ হয় এবং প্রকৃত ধর্মের নিন্দা করে। প্রকৃত ধর্ম শব্দটির অর্থ হচ্ছে ভগবানকে ভালোবাসার যে স্বাভাবিক প্রবণতা প্রতিটি জীবের মধ্যে রয়েছে সেটা প্রকাশ করা। ধর্ম মানে কতকগুলি আচার-আচরণ ও সংস্কারের অনুসরণ নয়। ধর্মের অর্থ হচ্ছে আমাদের সকলের হৃদয়ে যে ভালোবাসার প্রবৃত্তি রয়েছে সেই প্রবৃত্তিটিকে যথার্থ বস্তুতে অর্পণ করা। সকলেরই হৃদয়ে ভালোবাসার প্রবণতা রয়েছে। সকলেই কাউকে না কাউকে ভালোবাসতে চায়, কিন্তু সেই ভালোবাসার বস্তুটি কি? এই যে আমাদের হৃদয়ে প্রেম রয়েছে, সেই প্রেমের আস্পদ কি? প্রেমাস্পদ কি? সেই সকলের প্রেমাস্পদ হচ্ছেন ভগবান। এখন এই যে ভগবানকে ভালোবাসার যে স্বাভাবিক বৃত্তি সেই বৃত্তিটির ঠিকানাকে বলা হয় ধর্ম। ভগবানকে ভালোবাসা হচ্ছে আমাদের ধর্ম। কিন্তু আমরা যদি ভগবানকে ভাল না বেসে তাঁর প্রতি বিদ্বেষ পরায়ণ হই তা হলে সেটি হচ্ছে প্রকৃত ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ। প্রকৃত ধর্ম হচ্ছে ভগবানকে ভালোবাসা। আর আমি যদি ভগবানকে ভালো না বেসে বিদ্বেষপরায়ণ হই, ভগবানকে না মানি, ভগবানকে ত্যাগ করি, তাহলে তা হচ্ছে প্রকৃত ধর্ম থেকে বিচ্যুত হওয়া। আসুরিক ভাব। সুর এবং অসুর এই দুটি শব্দ রয়েছে। অসুরদের পরিণতি কি হয় সেটা ভগবান ভগবদ্‌গীতার ষোড়শ অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন। অসুর কারা? "অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং চ সংশ্রিতাঃ।"

অহংকার শব্দটি হচ্ছে আমাদের বিকৃত পরিচয়। আমাদের প্রকৃত পরিচয় কি?

জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস।

আমাদের প্রকৃত স্বরূপ হচ্ছে আমরা কৃষ্ণের প্রকৃত দাস বা নিত্য সেবক। এখন সেই প্রকৃত স্বরূপটি যখন বিকৃত হয়ে যায় তখন তাকে বলা হয় অহংকার। আমার স্বরূপ সম্বন্ধে প্রত্যেকের যে একটা ধারণা যে আমি কৃষ্ণের দাস না হয়ে যদি মায়ার উপর প্রভুত্ব করার বা আধিপত্য করার চেষ্টা করি বা জড় জগৎকে ভোগ করার চেষ্টা করি সেইটিই হচ্ছে অহংকার। এটা আমাদের ভ্রান্ত পরিচিতি। আমার প্রকৃত পরিচয় একটা বিকৃত পরিচয়কে প্রকাশ করে বা বিকৃত পরিচয় স্থাপনা করে।

বলং শক্তি—এই শক্তি কি? প্রকৃতপক্ষে আমাদের কোন শক্তি নেই। জীবের কোন কিছু করার ক্ষমতা নেই। কিন্তু ভগবানের কৃপায় জীব পরম শক্তিমান, তাঁর শক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে জীব কিছু করার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়। এখন এই যে বল, সেটি আমার বল নয়। আমার যা কিছু ক্ষমতা তা ভগবানের কৃপার প্রকাশ। কিন্তু সেটা না বুঝে আমরা মনে করি আমি অত্যন্ত বলবান, আমার অনেক ক্ষমতা আছে এবং আমি অনেক কিছু করতে পারি। সেই ক্ষমতা দিয়ে আমি কি করব? আমি এই জগৎটিকে ভাল করে ভোগ করব। সেই যে প্রবণতা সেইটিই হচ্ছে বলের বিকৃত প্রকাশ।

দর্প ঃ আমার অনেক ক্ষমতা রয়েছে, আমি অনেক কিছু করতে পারি। আমার মনের মধ্যে একটা অভিমান আছে। সেটি হচ্ছে দর্প।

কাম ঃ কাম শব্দটির অর্থ কি? জড়জগৎকে ভোগ করার বাসনা।

আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥

অর্থাৎ কাম শব্দটির অর্থ হল—নিজের ইন্দ্রিয় তৃপ্তির বাসনা। নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি অর্থাৎ এই জড়জগৎকে ভোগ করে ইন্দ্রিয় তর্পণের দ্বারা যে সুখ ভোগের চেষ্টা সেটাকে বলা হয় কাম। অর্থাৎ নিজের ইন্দ্রিয় তৃপ্তি সাধনের যে প্রবণতা সেটি হচ্ছে কাম, আর কৃষ্ণের ইন্দ্রিয় তৃপ্তি সাধনের যে চেষ্টা সেটি হচ্ছে প্রেম। সাধারণত এই জড় জগতে কামকে প্রেম বলে মনে করে। এই জড় জগতে প্রকৃতপক্ষে প্রেম নেই। রয়েছে কাম। ভগবানকে ভালবাসার যে প্রবণতা সেটাই হচ্ছে প্রেম। কিন্তু নিজের ইন্দ্রিয় তৃপ্তি সাধনের যে চেষ্টা সেটাই এই জগতে প্রেম বলে প্রচারিত হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে সেটি প্রেম নয়। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে এইভাবে ব্যাখ্যা করছেন ঃ

কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়ের প্রীতি সাধনের যে চেষ্টা সেটিকে বলা হয় প্রেম। কাম ও প্রেমের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে।

কাম অন্ধতম আর প্রেম নির্মল ভাস্কর।

কাম আমাদের অন্ধকারের গভীরতম জায়গায় নিয়ে যায়। আর প্রেম নির্মল সূর্যের মতো। সূর্য যখন ওঠে তখন কি অন্ধকার থাকে? ঠিক তেমনই কৃষ্ণরূপে যখন সূর্যের উদয় হয়, কৃষ্ণের প্রেম যখন হৃদয়ে প্রকাশিত হয় তখন সমস্ত অন্ধকার দূর হয়ে যায়। বেদে বলা হয়েছে যে, "তমসো মা জ্যোতির্গময়।"

অর্থাৎ অন্ধকার থেকে আলোকে যাও, সেই অন্ধকারটি হচ্ছে কামের অন্ধকার। আর সেই আলোকটি হল কৃষ্ণপ্রেমের আলোক। যতই আমরা কৃষ্ণের কাছে যাব ততই অজ্ঞানের অন্ধকার দূর হয়ে যাবে এবং তত বেশি করে কৃষ্ণপ্রেমের আলোকে এবং দিব্যজ্ঞানের আলোকে আমাদের হৃদয় আলোকিত হবে।

কৃষ্ণ—সূর্যসম; মায়া হয় অন্ধকার।
যাঁহা কৃষ্ণ তাঁহা নাহি মায়ার অধিকার॥

কৃষ্ণ হচ্ছেন সূর্যের মতো আর মায়া হচ্ছে অন্ধকার। মায়া কি? এই জড় জগতকে বাস্তব বলে যে সুখভোগ করার চেষ্টা সেটি হচ্ছে মায়া। মায়া শব্দটির দুটি বিশ্লেষণ হয়, একটি 'মা' অপরটি 'য়া'। মা মানে 'না' আর য়া মানে 'যা'। অর্থাৎ যা নয়, যে বস্তুটি প্রকৃতপক্ষে তা নয় সেই বস্তুটিকে অন্য আর একটি বস্তু বলে মনে করাকে বলা হয় মায়া। যেমন মরুভূমিতে জল নেই, কিন্তু মরীচিকা দেখে মনে হয় যেন সেটা জল। এখন মরীচিকার পেছনে ছুটলে আমাদের তৃষ্ণার প্রকোপ কখনও নিবৃত্ত হবে না। এই জড় জগতে তেমনি সুখ নেই, আনন্দ নেই, কিন্তু আমরা সকলে সেই আনন্দ পাওয়ার জন্য ছুটছি। এই জড় জগতে আনন্দের অন্বেষণ করে কখনও আনন্দ পাওয়া যায় না। মনে হয় এখানে আনন্দ আছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নেই। অতএব সেটি মায়া। মায়ার আর একটি সংজ্ঞা হচ্ছে "মিয়তে অনয়াঃ।" "মিয়তে" মানে মাপার চেষ্টা। এখানে সকলে কি করছে? তার ইন্দ্রিয়ের দ্বারা মাপার চেষ্টা করছে। সব কিছুকে তার ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য করে সেটিকে গ্রহণ করে তার মাধ্যমে আনন্দ উপভোগ করার চেষ্টা করছে। সেটি হচ্ছে মায়া। আবার মায়ার আর একটি বিশ্লেষণ হচ্ছে—মায়া হল কৃষ্ণের অনুপস্থিতি। যেমন সূর্যের অনুপস্থিতিতে অন্ধকার। আলোকের অনুপস্থিতিতে অন্ধকার। অন্ধকারের প্রকৃতপক্ষে কোন

সত্তা নেই, কিন্তু যেখানে আলোকের অভাব সেখানটাই অন্ধকার। আলোক যখন আসে তখন অন্ধকার থাকে না। তাই কৃষ্ণ বৈমুখ্য হচ্ছে মায়া।

কৃষ্ণ-বহির্মুখ হইয়া ভোগবাঞ্ছা করে।
নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে॥
পিশাচি পাইলে যেমন মতিচ্ছন্ন হয়।
মায়ামুগ্ধ জীবের হয় সে ভাব উদয়॥
কৃষ্ণ-ভুলি' সেই জীব অনাদি বহির্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুখ॥

কৃষ্ণ-বহির্মুখ হলেই মায়া আসবে। কৃষ্ণের অনুপস্থিতিতে মায়ার প্রকাশ। যখন আমরা কৃষ্ণকে ভুলে থাকি তখন আমাদের নিকটস্থ মায়া জাপটিয়া ধরে। মায়ার কাজ কি? মায়ার কাজ হচ্ছে জীবকে দণ্ড দেওয়া। মহামায়া কৃষ্ণ-বহির্মুখ জীবকে দণ্ড দিচ্ছে। মহামায়া দুর্গাদেবী কি করছেন? মহিষাসুরকে মর্দন করছেন। কি দিয়ে? ত্রিশূল। ত্রিতাপ দুঃখ। আধি আত্মিক, আধি দৈবিক ও আধি ভৌতিক এই ত্রিতাপ দুঃখে জীবকে বা মহিষাসুরকে তিনি সংহার করছেন। এইভাবে মায়া জীবদের দণ্ডদান করছেন। মায়ার বিশ্লেষণ আর এক্‌ভাবে করা যায়। অর্থাৎ মায়া কি? সেটি আমরা এইভাবে বুঝতে পারি। সূর্যের উল্টোদিকে মুখ করে দাঁড়ালে তখন আমরা কি দেখতে পাই? আমাদের ছায়াটাকে দেখতে পাই। তাহলে এই ছায়াটা কে সৃষ্টি করেছে? আমরা সৃষ্টি করেছি। সূর্যের অভাব যেখানে অন্ধকার সেখানে, সেইটিই হচ্ছে ছায়া। কিন্তু আমি আমার মুখটা যদি ঘুরিয়ে সূর্যের দিকে দেখি তখন কি আর ছায়াটা দেখতে পাব? ঠিক তেমনই কৃষ্ণ-বিমুখ হলে মায়া জীবকে প্রভাবিত করে।

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥

কৃষ্ণ বলছেন, এটি আমার মায়া এবং গুণময়ী মানে ত্রিগুণাত্মিকা। আর সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিনগুণ সমন্বিতা। এখন এই যে ত্রিগুণাত্মিকা মায়া, দৈবী এবং কৃষ্ণের মায়া তাকে অতিক্রম করা অসম্ভব। মামেব যে প্রপদ্যন্তে। "প্রপদ্যন্তে" মানে—আমাতে যে প্রপত্তি করে। সেই এই মায়া অনায়াসে উত্তীর্ণ হয়ে যেতে পারে।

কৃষ্ণের শরণাগত হলে তখন আর এই মায়া থাকবে না। যিনি মহামায়ারূপে আমাদের দণ্ড দিচ্ছিলেন সেই মায়া তখন যোগমায়া রূপে

আমাদের কৃষ্ণলীলায় প্রবেশ করাবেন। মায়া অসুরদের প্রতি এক রকম আচরণ করবেন। আর ভক্তদের প্রতি আর এক রকম আচরণ করবেন। যেমন পুলিশ, একই পুলিশ চোরগুলিকে দণ্ড দেয়, আর চোরেরা পুলিশকে দেখলে ভয়ে পালায়। খুব ভয় পায়। আর যে সাধু অর্থাৎ সৎ ব্যক্তি সে যখন বিপদে পড়ে তখন সেই পুলিশ এসে তাকে সাহায্য করে। একই পুলিশ দুই রকম মনোভাবের জন্য, দুই রকম প্রবৃত্তির জন্য দুই রকম আচরণ করে। কারোর কাছে সে শত্রু এবং কারোর কাছে সে বন্ধু। অতএব জীব যখন কৃষ্ণ-উন্মুখ হয় তখন সেই মায়াই জীবকে কৃষ্ণের কাছে নিয়ে যায়। যোগমায়া রূপে তিনি কৃষ্ণের লীলায় জীবকে প্রবেশ করার অধিকার প্রদান করেন। সেই যোগমায়া বৃন্দাবন লীলায় হচ্ছেন পৌর্ণমাসী। যেমন নাটক যখন হয় তখন পরিচালক সমস্ত নাটকের ব্যবস্থাপনা করেন। ঠিক তেমনই যোগমায়া কৃষ্ণের সমস্ত লীলার আয়োজন করেন। কে কোন্ ভূমিকায় অভিনয় করবে সে সমস্ত ব্যবস্থা যোগমায়া করেন। পৌর্ণমাসী সেই আয়োজন করেন। এইভাবে জীব যখন কৃষ্ণ-উন্মুখ হয় তখন তার সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার নিবৃত্তি হয়। জীব যতক্ষণ কৃষ্ণ-বিমুখ থাকে ততক্ষণই তার অশান্তি, দুঃখ-দুর্দশা থাকে। জীব যখন নিজের ইচ্ছায় কিংবা অসৎ প্রবৃত্তির জন্য কৃষ্ণ-বহির্মুখ হয়, তখন সেইটিকে বলা হয় আসুরিক প্রবৃত্তি। এগুলি পরে কৃষ্ণ বর্ণনা করছেন। পরের শ্লোকে কৃষ্ণ বলছেন—

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু॥ (১৬/১৯)

"সেই বিদ্বেষী, ক্রূর ও নরাধমদের আমি এই সংসারেই অশুভ আসুরী যোনিতে অবিরত নিক্ষেপ করি।"

আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্॥ (১৬/২০)

"হে কৌন্তেয়! জন্মে জন্মে অসুরযোনি প্রাপ্ত হয়ে, সেই মূঢ় ব্যক্তিরা আমাকে লাভ করতে অক্ষম হয়ে তার থেকেও অধম গতি প্রাপ্ত হয়।"

অতএব এখন আমাদের উপর নির্ভর করছে আমরা অসুর হব, না কৃষ্ণভক্ত হব। আমরা যদি কৃষ্ণ-উন্মুখ হই, তাহলে আমরা কৃষ্ণভক্ত হতে পারব। আর আমরা যদি কৃষ্ণ-বিমুখ হই তাহলে অসুর হয়ে যাব। কেউ কি অসুর হতে চায়? কেউ চায় না। কিন্তু প্রবৃত্তি অনুসারে কেউ না চাইলেও সে অসুর হয়ে যায়।

ভগবান ভগবদ্‌গীতা দিয়েছেন আমাদেরই প্রকৃত মঙ্গল সাধনের জন্য। এই জ্ঞান দিয়ে তিনি আমাদেরই পরম কল্যাণ সাধন করেছেন। তিনি বলছেন কেন তোমরা এই জড় জগতে দুঃখ পাচ্ছ। অনায়াসে তোমরা ফিরে আসতে পার। সে উপায়টি কি?

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু ।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥ (৯/৩৪)

আসুরিক ভাবাপন্ন মানুষেরা সর্বদাই ভগবানের মহত্ত্বের বিরোধিতা করে এবং তারা শাস্ত্রের নির্দেশ পালন করতে চায় না। শাস্ত্র এবং পরম পুরুষোত্তম ভগবান উভয়ের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ। তাদের কথিত জড় প্রতিষ্ঠা, তাদের সঞ্চিত সম্পদ, তাদের শক্তি-সামর্থ এগুলিই হচ্ছে তাদের এই মনোভাবের কারণ। তারা জানে না যে তাদের এই জীবনটি পরবর্তী জীবনকে গড়ে তোলার এক মহান সুযোগ। সেটি না জেনে তারা অন্য সকলের প্রতি এবং প্রকৃতপক্ষে নিজেদের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হয়। সে অপরের শরীরের প্রতি হিংস্র আচরণ করে এবং তাদের নিজেদের শরীরের প্রতিও হিংস্র আচরণ করে। তারা পরম নিয়ন্তা পরমেশ্বর ভগবানের কোন উপকার করে না। কারণ তাদের কোন জ্ঞান নেই। শাস্ত্র ও ভগবানের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে তারা ভগবানের অস্তিত্বের জন্য নানা রকম কপট প্রমাণের অবতারণা করে এবং শাস্ত্রের নির্দেশ খণ্ডন করার চেষ্টা করে। তারা মনে করে যে সব রকম কর্ম করার শক্তি ও স্বাধীনতা তাদের রয়েছে। তারা মনে করে যেহেতু শক্তি সামর্থ্য বিদ্যায় কেউই তাদের সমকক্ষ নয়। তাই তাদের যা ইচ্ছা তাই করে। তাতে কেউই তাদের বাধা দিতে পারবে না। তাদের কোন শত্রু যদি ইন্দ্রিয় ভোগার্থে বাধা দিতে চেষ্টা করে, তখন তারা তাকে সমূলে বিনাশ করে। এইটি আসুরিক মনোভাবের পরিচয়।

কলির আক্রমণে কলহ

শ্রীমদ্ভাগবতে (৪/২৮/৩) রাজা পুরঞ্জনের উপমামূলক ও শিক্ষামূলক কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে, "ক্রমে কালকন্যা তার ভয়াবহ সৈন্যসামন্ত সহ রাজা পুরঞ্জনের নবদ্বার বিশিষ্ট নগরীর সমস্ত বাসিন্দাদের ওপর

আক্রমণ হানল, এবং তার ফলে তাদের সকলকে নিজ নিজ কার্যে সম্পূর্ণ অযোগ্য করে ফেলল।"

শ্রীল প্রভুপাদ দেখিয়ে দিয়েছেন যে, শ্রীমদ্ভাগবতের শিক্ষাগুলি আধ্যাত্মিক সত্যতার পরিচায়ক এক বিজ্ঞান। লোকে মনে করে, ধর্ম হল এক ধরনের বিশ্বাস। শ্রীল প্রভুপাদ এই মতবাদের তীক্ষ্ণ প্রতিবাদ করে বলেছেন যে, কৃষ্ণভাবনা একটি বিজ্ঞান, এটি কোনও অন্ধ বিশ্বাস নয়। যা কিছু আমাদের অভ্যাস করতে বলা হবে, তা অবশ্যই বিজ্ঞান, যেহেতু শাস্ত্র বলছে, সুতরাং আমাদের তা অনুসরণ করতে হবে—এটা বৈদিক অনুশাসন নয়। বৈদিক অনুশাসন হচ্ছে—আমাদের বিচার করার সুবিধা দেওয়া হয়েছে—আমাদের নিজেদের বুঝে নিতে হবে। কোন কিছু আমাদের পক্ষে উপকারী কিনা, তবেই তা গ্রহণ করা উচিত।

এখানে পুরঞ্জনের কাহিনী আপাতদৃষ্টিতে উপমামূলক হলেও আমাদের প্রত্যেকের জীবনেই তথ্যগতভাবে প্রযোজ্য। আমরা, যারা মানব শরীর ধারণ করেছি, তারা সকলেই এক-একজন পুরঞ্জন। মানব দেহ নামক এক নবদ্বার সমন্বিত নগরীতে বসবাস করছি, যে নগরী বা দুর্লভ মানব রূপী শরীর আমরা বহু বহু সম্ভাবনার পরে প্রাপ্ত হয়েছি—'লব্ধা সুদুর্লভম্ ইদম্ বহু সম্ভবান্তে"—এই সম্ভাবনাটি সুদুর্লভ।

মনুষ্য শরীর লাভ করাটা দুর্লভ কারণ এই দেহে বিশেষ বিশেষ কিছু সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়েছে—আমাদের চেতনাকে অপরিমিত সীমায় প্রসারিত করতে পারি। বিশেষ উন্নত বুদ্ধিমত্তার অবদান রয়েছে একমাত্র এই মনুষ্য শরীরেই। বুদ্ধিমত্তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি সম্পদ, কারণ বুদ্ধির দ্বারাই মনকে জড় বস্তু থেকে নিবৃত্ত করে আত্মার প্রতি নিবদ্ধ করা যায়। ইন্দ্রিয়সমূহ মনকে টেনে নিয়ে যায় ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুর দিকে, এবং এইভাবেই মানুষ জড়জাগতিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে।

মন হচ্ছে চেতনার বাহক। আমরা যদি আমাদের চেতনাকে মনের চিন্তা ভাবনা ধ্যান ধারণার মাধ্যমে ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ের দিকে ধাবিত করি—তা হলে সেটা হবে বন্ধনের কারণ। কিন্তু বুদ্ধি হল সেই সুযোগ, যেটাকে ব্যবহার করে চেতনাকে শ্রীকৃষ্ণের চরণের দিকে আকৃষ্ট করাতে পারি। 'বুদ্ধিযোগ' হল কৃষ্ণভাবনাযুক্ত বুদ্ধিমত্তা। 'যোগ' শব্দটির তাৎপর্য হল, যে-বুদ্ধি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আসক্ত।

পুরঞ্জন মানব শরীর প্রাপ্ত হয়েছিল কিন্তু সেই সুযোগ সে কাজে লাগায়নি। যতক্ষণ না মানুষ কৃষ্ণভাবনা গ্রহণ করছে, সে পুরঞ্জনের মতোই থাকবে। মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত হওয়াটা অনেকটা রাজকন্যার সাথে বিবাহ হওয়ার মতো। আমরা কেউ রাজা না হতে পারি, কিন্তু যদি রাণীর সাথে বিবাহ হয়, তবে রাজাই হয়ে যাই। আপনা-আপনিই রাণী পাই, রাজ্য পাই—নবদ্বার বিশিষ্ট দেহ-রাজ্যটি। সেই সূত্রে সমস্ত সুযোগ সুবিধাও পাওয়া হয়ে যাচ্ছে। এই নয়টি দ্বার সমন্বিত দেহ-নগরীটি বিশেষভাবে সুরক্ষিত—একটি পঞ্চফনা বিশিষ্ট সর্পের দ্বারা। অর্থাৎ পাঁচটি প্রাণবায়ু—প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান, উদান। প্রাণ বায়ু দেহের মধ্যস্থ আত্মাকে সুরক্ষিত রাখে। অপান বায়ু রেচনক্রিয়ায় অর্থাৎ বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাষণে নিয়োজিত। ব্যান বায়ুর কাজ হল দেহের স্নায়ুতন্ত্রকে ধারণ করা এই ইন্দ্রিয়গুলিকে চালনা করা। এইভাবে এই পাঁচ বায়ুর ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই মানব দেহের সমস্ত কার্যকলাপ সম্ভব হয় এবং দেহকে আত্মার বসবাস যোগ্য সুরক্ষিত স্থান করে তোলে ও দেহকেও সামর্থ্যপূর্ণ রাখে।

অবশেষে সময়ের কন্যা—কালকন্যা এই শরীরে আক্রমণ হানে। যতই শক্ত সামর্থ্য শরীর হোক না কেন, কালকন্যা এলেই সমস্ত শক্তি নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়, অর্থাৎ বৃদ্ধাবস্থার আগমন হয়। বৃদ্ধাবস্থা হল কালকন্যার আলিঙ্গন। সৈন্যসামন্তসহ কালকন্যা তার আক্রমণ হানে, এবং বৃদ্ধাবস্থার সাথে আসে যতরকমের বাধা বিপত্তি ফলে দেহ হয়ে পড়ে অকেজো। যে পাঁচ বায়ু এতকাল ধরে দেহের রক্ষা করে এসেছে তারাও হার স্বীকার করে, এবং তারপর পুরঞ্জনকে যবন সৈন্যরা টেনে হিচড়ে তার শরীর-নগরী থেকে বার করে নিয়ে যায়।

পুরঞ্জনের এই গল্পে একটা উদাহরণ পাওয়া যায়, যেটা আমাদের আলোচ্য ভাগবতের (৪/২৮/৩) এই শ্লোকের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক—একবার কালকন্যা উপযুক্ত পতির সন্ধানে নারদ মুনির কাছে উপনীত হয় এবং বিবাহের প্রস্তাব দেয়। নারদ মুনি তাতে সম্মত হননি। ফলে আমরা দেখি নারদ মুনি চিরযৌবন ও অমরত্ব লাভ করেছেন।

সময়ের প্রকোপ বা কালকন্যার আঘাত হানা থেকে কিভাবে পার পাওয়া যেতে পারে? তার উপায় হল ব্রহ্মচর্য। শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন যে যত অক্ষম, বৃদ্ধ বয়সের লক্ষণাদি তার মধ্যে তাড়াতাড়ি প্রকাশিত হয়, আবার যখন কেউ ব্রহ্মচারী হয়, যৌবন তার সাথে দীর্ঘকাল থাকে, সময় তার ওপর সহজে প্রভাব ফেলতে পারে না।

এটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, আধ্যাত্মিক জীবন ব্রহ্মচর্যের নীতির ওপরই ভিত্তি করে আছে। শুধুমাত্র দৈহিক ধর্মই নয়, সমস্ত ধর্মমতই এই কথা মানে—খ্রিস্টান ধর্মেও একই কথা বলা হচ্ছে। আজ খ্রিস্টানরা তা মানছে কি মানছে না, সেটা প্রশ্ন নয়। বর্ণাশ্রমের চারটি আশ্রমও ব্রহ্মচর্যের ওপর ভিত্তি করে আছে। এমন কি গৃহস্থরাও ব্রহ্মচারী, কারণ তারা আধ্যাত্মিক জীবন অনুশীলন করছে এবং তাদের স্ত্রীদের সাথে তাদের সঙ্গ কেবলমাত্র প্রজন্ম সৃষ্টির উদ্দেশ্যে—একটি দায়িত্ব পালনের মনোভাব নিয়ে—অন্য কোনও পরিকল্পনায় নয়।

আবার দেখা যায়, কলির দুর্দমনীয় প্রভাবে অধর্ম তার দাপটে এগিয়েই চলেছে। কলি ও অধর্ম দুই বন্ধু। অধর্মকে স্থাপন করার কাজে কলি কৃতকার্য হয়েছে। আমিষ আহার, অবৈধ সঙ্গ, নেশা করা, জুয়াখেলা ইত্যাদি অধার্মিক কাজকর্ম চারিদিকে প্রতিনিয়তই কিভাবে বেড়ে চলেছে—তা দেখে আমরা একথা অনুমান করতে পারি। এই কাজ হাসিলের জন্যই কলি অবৈধ সঙ্গের সূচনা ও বৃদ্ধি সাধন করে।

আজকের জগতের বক্তব্য—যৌনতাই হল জীবনের চরম লক্ষ্য। শ্রীল প্রভুপাদ বলছেন, প্রজন্ম সৃষ্টির উদ্দেশ্য ছাড়া আর সমস্ত যৌন সঙ্গই অবৈধ। অথচ কলি তারই প্রসার করে চলেছে। এমন কি স্বামী-স্ত্রীর সঙ্গেরও উদ্দেশ্য আজকাল হয়ে দাঁড়িয়েছে—সন্তানের জন্ম না দেওয়া। তারা বিভিন্ন রকম পদ্ধতি গ্রহণ করছে। যদি কখনও ঘটনাচক্রে গর্ভধারণ হয়ে যায় তো ভ্রূণহত্যা করে ফেলা হচ্ছে। এইভাবে, আজকের জীবন সম্পূর্ণ অর্থে অবৈধ সভ্যতার বিপরীত মুখী হয়ে উঠেছে।

কলির পরম শত্রু হলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং তাঁর সংকীর্তন আন্দোলন। এটা খুব আগ্রহ জাগানো বিষয়—কিভাবে কলি তার আক্রমণ হানছে এবং কিভাবে মহাপ্রভু তাঁর পাল্টা আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। মহাপ্রভু বিশেষ দক্ষতার সাথে একবার আক্রমণ হানছেন তাঁর সংকীর্তন আন্দোলন স্থাপনের মাধ্যমে, আবার তারপর কিছুকালের জন্য অন্তর্হিত থাকছেন—সংকীর্তন আন্দোলন প্রায় লুপ্তই হয়ে গিয়েছিল, শ্রীমায়াপুর ধাম ঢাকা পড়ে গিয়েছিল, সেই সাথে তাঁর শিক্ষাও হারিয়ে গিয়েছিল। তখন অপসম্প্রদায়ের প্রচারই তুঙ্গে উঠেছিল। তারপর শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এসে ধাম উদ্ধার করলেন, শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর এসে গৌড়ীয় মঠ স্থাপন করলেন। তাও এক সময়ে ভগ্নাবস্থা প্রাপ্ত হয়ে পড়ে—ভক্তরা নিজেদের মধ্যে বিবাদে মত্ত হয়।

শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ এসে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের মঠ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে তাঁর পরিকল্পনা ও স্বপ্ন পূরণ করেন সারা পৃথিবীতে সংকীর্তন আন্দোলন প্রচার করে।

কলি যখন চারটি অধর্মের উপায়ে কুপ্রভাব বিস্তার করতে ব্যর্থ হয়, তখন পঞ্চম উপায় হল অর্থ বা স্বর্ণের মাধ্যমে আঘাত হানা। সেখানেও যখন সে অকৃতকার্য হয়, তখন তার ভয়ানক মারণাস্ত্র বার করে—কলহ। "করালবদনক্রুরং কলিশ্চ কলহপ্রিয়।" শ্রীল প্রভুপাদ বলতেন, আমাদের এই আন্দোলনকে বাইরে থেকে কোনও ভাবে কেউ ধ্বংস করতে পারবে না। ধ্বংস হতে হলে তা হবে আমাদের নিজেদের মধ্যে, ভক্তদের মধ্যে কলহের কারণে। তার প্রমাণ রয়েছে পূর্ববর্তী গৌড়ীয় সংস্থাগুলির পরিণতিতে।

আমরা সঠিক রাস্তায় এসে পড়েছি—'অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা'। এখন আমাদের কাজ হবে বিপথগামী না হয়ে, সেই পথেই অবিচলিত ভাবে অগ্রসর হয়ে চলা।

শ্রীকৃষ্ণ উন্মুখ হতে প্রয়োজন পরমাত্মার সাহচর্য

ধ্রুব মহারাজ তাঁর মায়ের নির্দেশ অনুসারে পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে দর্শন করতে ইচ্ছুক হয়েছিলেন এবং তাঁর ঐকান্তিক নিষ্ঠার ফলে অবশেষে তাতে সফল হন। পরমেশ্বর ভগবান যখন ধ্রুবের সামনে আবির্ভূত হন, স্বভাবতই তখন ধ্রুব চেয়েছিলেন ভগবানের স্তুতিগান কীর্তন করতে। কিন্তু প্রথমে ধ্রুব একটু অস্বস্তিতে পড়েছিলেন, কারণ তিনি তখনও এক শিশু মাত্র, বুঝতে পারেননি হঠাৎ কি করণীয়। কিন্তু অশেষ করুণাময় ভগবান তাঁর শঙ্খটি ধ্রুবের মাথায় স্পর্শ করান এবং এই আশীর্বাদের ফলে ধ্রুব স্বয়ংসিদ্ধ ভাবে সুন্দর করে ভগবানের প্রার্থনা করতে সক্ষম হলেন।

গ্রন্থরাজ শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধের নবম অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে এই কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে, এবং এটি সর্বোৎকৃষ্ট শ্লোকগুলির অন্যতম। সুতরাং এইভাবে আমরা জানতে পারি, ভগবান কিভাবে ভক্তদের সাহায্য করতে

সর্বদাই প্রস্তুত, যেখানে ভক্তদেরই কাজ হল ভগবানের সেবা করা। প্রকৃতপক্ষে, ভক্তিযুক্ত সেবার মাধ্যমে যারা ভগবানের কাছে আত্মনিবেদন করতে উদ্‌গ্রীব, ভগবানও তাদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে সদা উদ্‌গ্রীব। অথচ, আমরা, জীবেরাই শ্রীকৃষ্ণের সেবা করতে দ্বিধাযুক্ত। এই ইচ্ছা বোধটুকু বাদে জীবের আর সমস্ত সুযোগ-সুবিধাই রয়েছে পরমেশ্বরের সেবা করার।

জীবাত্মা হল ভগবানের অংশ, এবং ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হতে পারলে জীবের অস্তিত্ব সার্থক হয় এবং সে তখন দিব্য, অপ্রাকৃত আনন্দ অনুভব করতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ তো সর্বদাই তাঁর ভক্তদের ইচ্ছা পূরণে আগ্রহী—বিশেষ করে চিৎ জগতে। চিৎ জগতে জীবাত্মার ইচ্ছাপূরণের সমস্ত আয়োজন রয়েছে—চিন্তামণি রয়েছে সেখানে। চিন্তামণি হল চিন্তা; অর্থাৎ মনে যা ভাবব তা পূরণ হবে। কল্পবৃক্ষ রয়েছে, যা জীবগণের সমস্ত বাসনা পূরণ করে থাকে, এবং সুরভী গাভীরা তাদের পর্যাপ্ত দানে সকল ইচ্ছা পূরণ করতে পারে।

সুতরাং চিজ্জগতে বসবাসকারীদের হয় কেবল শ্রীকৃষ্ণের সেবা করতে পারার আকাঙ্ক্ষা করা চাই, নয়তো সেবার জন্য কোনও কিছুর বাসনা করতে হয় যা এইভাবে সহজেই এবং সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণ হয়ে যায়। চিজ্জগতের কথা কি বলার আছে, এই জড় জগতেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভক্তদের এবং সকল জীবের বাসনা পূরণ করতে প্রস্তুত হয়ে আছেন। বরং জীবাত্মারাই শ্রীকৃষ্ণকে বাদ দিয়ে সমস্ত কিছু উপভোগ করেই চলতে চায়।

কিন্তু জীবগণের ইন্দ্রিয় তৃপ্তির ভোগ ইচ্ছা চিৎ জগতে সম্পন্ন হওয়া সম্ভব নয়। তাই শ্রীকৃষ্ণ সুন্দর ব্যবস্থা করে দিয়েছেন এই জড় জগৎ সৃষ্টি করে, এবং সেটি চালিত হচ্ছে গুণ কর্ম পদ্ধতি অনুসারে। জড় জগতে তিনটি গুণ আরোপ করা আছে, এবং তার নিয়ন্ত্রণে যে যেমন কর্ম করে, বাসনা অনুসারে সেই রকম ফল সে প্রাপ্ত হয়। এইভাবেই জীবগণ তাদের সব বাসনা পূরণ করে থাকে শ্রীকৃষ্ণেরই সরবরাহের ভিত্তিতে।

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, জীবাত্মারা যতই শ্রীকৃষ্ণকে বাদ দিয়ে ভোগ করতে চায়, ততই তারা দুর্নিবার কামনা-বাসনার জালে জড়িয়ে পড়ে, এবং ক্লেশ ভোগ করে। এইটাই জড় সৃষ্টির নিয়ম। যেহেতু পরিস্থিতিটাই কৃত্রিম এবং যেহেতু ব্যবস্থাটাই প্রাথমিকভাবে স্বাভাবিক নয়, সুতরাং সুখী হবার স্বাভাবিক ইচ্ছাটা পূরণ হওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না। তাই জানা দরকার যে, শ্রীকৃষ্ণকে ছাড়া সুখী হওয়া সম্ভব নয়। মূল উৎসকে ভুলে গিয়ে আমরা কোনও ব্যবস্থাকেই উপভোগ করতে পারি না, সুখী বোধ করতে পারি না। বরং আমাদের তথাকথিত সাধগুলি মেটাবার প্রচেষ্টায় আরও বেশি করে কষ্ট পেতে থাকি।

শ্রীকৃষ্ণকে বাদ দিয়ে যতই ভোগ করতে চাই, মায়া প্রকৃতি ততই আমাদের সাজা দিতে থাকে। এমন নয় যে, শ্রীকৃষ্ণ চান আমরা সাজা পাই; তিনি চান আমরা যেন বুঝতে পারি—আমাদের কৃত্রিম পরিকল্পনাগুলি কাজ করবে না, বদ্ধ জীবদের তিনি শেখাতে চান তাঁকে ছাড়া, তাঁর সেবা করা ছাড়া, শুধু নিজেদের ইন্দ্রিয় তৃপ্তি সাধনে কোনও স্থায়ী সুখ নেই, যে উপভোগ চাই তা ঐভাবে মিলবে না। এইভাবে তিনি চান যে, যে পরিকল্পনা কার্যকরী হবে না, তা যেন আমরা পরিত্যাগ করি, ইন্দ্রিয়তৃপ্তির পরিকল্পনাদি ত্যাগ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় মন দিই। যেইমাত্র এই কাজ করব, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জীবন আনন্দপূর্ণ হয়ে উঠবে, এবং এটাই হল শ্রীকৃষ্ণের দিব্য কার্যকৌশল। জড় সৃষ্টির উদ্দেশ্যই হল বদ্ধ জীবাত্মাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনজনিত ভয়ানক বন্ধন জাল থেকে মুক্তি দেওয়া।

ইন্দ্রিয় বাসনা চরিতার্থে জড়া প্রকৃতিকে শোষণ করা এবং তার ওপর আধিপত্য করার প্রবণতা ত্যাগ করতে হবে। যখন জীব বুঝতে পারে যে, এই জড় জগতে সুখ ভোগ সম্ভব নয়, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। সেই কারণেই শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মারূপে সকলের হৃদয়ে অবস্থান করছেন। সেইখান থেকেই তিনি এই সমস্তের আয়োজন করছেন।

আবার যখন জীবাত্মা চাইছে শ্রীকৃষ্ণকে ভুলে থাকতে, তাঁকে বাদ দিয়ে চলতে, শ্রীকৃষ্ণ সেই ব্যবস্থাও করে দেন—তারই নাম অবিদ্যা বা অজ্ঞান, এবং এই জড় জগতের নীতিই হল এই অজ্ঞানতা। শ্রীকৃষ্ণকে ভুলতে চাইলেই জীব এই অজ্ঞানতার শিকার হয়। কৃষ্ণ-বহির্মুখ হয়ে ভোগ বাঞ্ছা করলেই মায়া জাপটে ধরে। মায়া খুব নিকটেই অবস্থিত। আরও বলা হয়েছে—

"পিশাচী পাইলে যেন মতিচ্ছন্ন হয়।
মায়ামুগ্ধ জীবের হয় সে ভাব উদয়॥"

মায়ার কবলে পড়লে মানুষ আর সুস্থ মস্তিষ্কে বিচার-বুদ্ধিসহ কাজ করতে পারে না, তার মতিচ্ছন্ন অবস্থা হয়।

বদ্ধ, মতিচ্ছন্ন জীব শ্রীকৃষ্ণকে ত্যাগ করলেও, শ্রীকৃষ্ণ জীবকে ত্যাগ করেন না—সব সময়ে তার সাথে সাথে তিনি থাকেন পরমাত্মারূপে।

"সর্বস্য চাহম্ হৃদি সন্নিবিষ্ট" অথবা "ঈশ্বর সর্বভূতানাম্ হৃদ্দেশেহর্জুন..." গীতায় অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, তিনি পরমাত্মারূপে কিভাবে সকলের হৃদয়ে সদা বিরাজমান, এবং প্রাথমিকভাবে তিনি হলেন "উপদ্রষ্টা ও অনুমন্তা"—জীবের সকল কর্মের সাক্ষী তিনি এবং অনুমন্তা, অর্থাৎ অনুমোদনকারীও।

যেহেতু শ্রীকৃষ্ণের অনুমোদন ছাড়া কোনও কিছুই সম্ভব নয়, তাই তিনি স্বয়ং সকলের হৃদয়ে অবস্থান করে আছেন। সেখান থেকে তিনি জীবগণের বাসনাদি সমস্ত লক্ষ্য করছেন, এবং পূরণও করছেন।

যতক্ষণ জীব কামনা-বাসনার মধ্যে বদ্ধ অবস্থায় থাকছে, ততক্ষণ শ্রীকৃষ্ণ নিতান্তই দর্শকরূপে বিরাজ করে রয়েছেন এবং অপেক্ষা করছেন জীব কখনও তাঁর দিকে মনোযোগ দেবে। সকল জীবের হৃদয়ে তাঁর অবস্থান করার উদ্দেশ্য এইটাই। শ্রীকৃষ্ণ জীবকে সঙ্গ দান করে সেই মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করছেন, কখন জীব 'বহির্মুখ' অবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি 'উন্মুখ' হবে।

অণুমাত্রও ভিন্ন দর্শনে মহাভয় জাগবেই

পরমেশ্বর ভগবান জন্মরহিত হওয়া সত্ত্বেও তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা তিনি কপিল মুনি রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সমগ্র মানব জাতির কল্যাণার্থে দিব্যজ্ঞান প্রদান করার জন্যই তিনি অবতীর্ণ হয়েছিলেন। (ভাঃ ৩/২৫/১)

কর্দম মুনি বৈরাগ্য অবলম্বন করে যখন বনে গমন করেছিলেন, তখন তাঁর পুত্ররূপে কপিলমুনি তাঁর মাতা দেবহূতি (কর্দমমুনির পত্নী)-র প্রসন্নাত্মা বিধানের জন্য বিন্দু-সরোবরের তীরে অবস্থান করেন।

পিতার অনুপস্থিতিতে বয়স্ক পুত্রের মায়ের দায়িত্বভার গ্রহণ করে তাঁর যথাসাধ্য সেবা করা কর্তব্য, যাতে তিনি পতির বিচ্ছেদ অনুভব না করেন, আর বয়স্ক পুত্র তাঁর পত্নী এবং গৃহস্থালির দায়িত্বভার গ্রহণ করতে সক্ষম হওয়া মাত্রই পতির কর্তব্য গৃহত্যাগ করা। এটাই বৈদিক গার্হস্থ্য জীবনের সমাজবিজ্ঞান সম্মত প্রথা। মৃত্যুর সময় পর্যন্ত—গৃহের ব্যাপারে নিরন্তর যুক্ত থাকা কোনও মানুষের উচিত নয়।

যেহেতু দেবহূতির পতি কর্দমমুনি গৃহত্যাগ করেছিলেন, তাই দেবহূতি তাঁর উপযুক্ত পুত্র কপিলদেবের সৎ উপদেশ শ্রবণ করে দুশ্চিন্তার কবল থেকে ত্রাণ পেতে চেষ্টা করতেন।

কপিল মুনিকে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলে স্বীকার করা হয়। চিন্ময় জ্ঞানরূপী সূর্য-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ প্রকাশ হলেন কপিলমুনি (ভাগবত ৩/২৫/৯)। সূর্য যেমন বিশ্বের অন্ধকার দূর করে, তেমনই পরমেশ্বর ভগবানের আলোক যখন এইভাবে অবতার রূপে নেমে আসে, তখনই মায়ার অন্ধকার দূর হয়ে যায়। আমাদের চোখ রয়েছে, কিন্তু সূর্যের কিরণ না থাকলে আমাদের চোখের কোনই মূল্য নেই। তেমনই, পরমেশ্বর ভগবানের আলোক ছাড়া বা সদ্গুরুর কৃপা ছাড়া পারমার্থিক জীবনের কোন বস্তুই আমরা যথাযথভাবে দর্শন করতে পারি না।

দেবহূতির কাছে ভগবদ্ভক্তির ব্যাখ্যা (ভাগবত ৩/২৯ অধ্যায়) প্রসঙ্গে ভগবান কপিলদেব বলেছিলেন, "যে ব্যক্তি নিজের এবং অন্যের মধ্যে অণুমাত্রও ভিন্ন দর্শন করে, মৃত্যুর প্রজ্জ্বলিত অগ্নিরূপে আমি তার মহাভয় উৎপন্ন করি।" (শ্লোক ২৬)

সমস্ত প্রকার জীবের মধ্যে নানা প্রকার দৈহিক পার্থক্য রয়েছে, কিন্তু ভক্তের পক্ষে সেই পার্থক্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন জীবের মধ্যে ভেদভাব দর্শন করা উচিত নয়, ভক্তের কর্তব্য সর্বপ্রকার জীবের মধ্যে আত্মা এবং পরমাত্মাকে সমানভাবে অবস্থিত দর্শন করা।

অতএব, দান, সম্মান ও মৈত্রীপূর্ণ আচরণের দ্বারা সমস্ত জীবকে সম দৃষ্টিতে দর্শন করে, সমস্ত জীবের আত্মার স্বরূপে বিরাজমান ভগবানের পূজা করা উচিত।

ভগবান কপিলদেব তাঁর মাতা দেবহূতিকে তাই পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, যারা ভিন্নদৃশঃ অর্থাৎ ভেদদর্শী, যারা আপন এবং পর এই ভেদ দর্শন করে, তারা মায়াবদ্ধ জীব। যারা মায়ামুক্ত জীব, তাদের জীবন দর্শন "ঈশাবাস্যমিদম্ সর্বম্।" সব কিছুই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এবং তাঁর সঙ্গেই সব কিছু সম্পর্কিত। তাই তাদের দৃষ্টিতে কোনও ভেদভাব থাকে না।

যেমন, একটি পরিবারের বিভিন্ন সদস্যরা তাদের পরিবারগোষ্ঠীর পক্ষে যেটা ভাল, সকলেই সেই উদ্দেশ্যে কাজকর্ম করে, নিজেদের মধ্যে তারা কেউ কোনও ভেদ দর্শন করে না। সকলেই তারা বোঝে প্রত্যেকেই আপনজন। পরিবারের কেউ অনেক টাকা রোজগার করলে অন্যেরাও আনন্দ লাভ করে। কারণ সকলেরই তাতে ভাগ আছে, প্রত্যেকেরই তা থেকে কিছু না কিছু লাভ হয়।

কিন্তু যারা ভেদ দর্শন করে, তাদের মধ্যে অপর কেউ প্রচুর ধনসম্পত্তি লাভ করলে অন্য জনের মনে হয়—'ওঃ, ঐ লোকটার এত টাকা, আর আমার কিছু লাভ হল না!' তেমনি আপনজন কষ্ট পেলেও আমরা তো কষ্ট পাই—ভাবি, কেমন করে তাকে নিষ্কৃতি দিতে পারি।

শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ তাঁর প্রাঞ্জল জ্ঞানগর্ভ ভাগবত-ভাষ্যে (৩/২৯/২৬) তাৎপর্য বর্ণনা করে লিখেছেন, সমস্ত প্রকার জীবের মধ্যে নানাবিধ দৈহিক পার্থক্য রয়েছে, কিন্তু ভক্তের পক্ষে সেই পার্থক্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন জীবের মধ্যে ভেদভাব দর্শন করা উচিত নয়, ভক্তের কর্তব্য সর্বপ্রকার জীবের মধ্যে আত্মা এবং পরমাত্মাকে সমানভাবে অবস্থিত দর্শন করা। অর্থাৎ, দৃষ্টি থেকে ভেদভাব দূর হয়ে যাওয়াটাই হচ্ছে চিন্ময়ত্বের লক্ষণ। জড়ত্বের লক্ষণ হল—যত বেশি জড়মুখী হব, ভেদভাব তত বেড়ে যাবে, বিভেদ বিসম্বাদ ততই দেখা দেবে সমাজে।

যেমন, কিছুদিন আগেও ভারতবর্ষ এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশগুলিতেও যৌথ পরিবার ছিল-এক-একটা পরিবারে ১০০-২০০ জন করে সদস্য মিলেমিশে বিরাট পরিবারগোষ্ঠীর মতো বসবাস করত। তার আগে একটা পুরো গ্রামই একটা পরিবারগোষ্ঠীর মতো থাকত এবং সেই পরিবারের নামেই গ্রামটি পরিচিতি লাভ করত। সেই গ্রামের সকলের সুখ-দুঃখে সকলেরই সহানুভূতি জাগত। কিংবা গোটা দেশটাই রাজাকে কেন্দ্র করে নিজেদের একই পরিবারভুক্ত বলে মনে করত। অবশেষে ভগবানকে কেন্দ্র করে সারা বিশ্বটাই একটি বিশ্বপরিবার হয়ে উঠেছিল পুরাকালে।

অর্থাৎ "বসুধৈব কুটুম্বকম্"—এই যে, 'বসুধা' বা বসুন্ধরা অর্থাৎ পৃথিবী—এই সারা পৃথিবীটাই একটা কুটুম্ব, একটা পরিবার বলে বৈদিক শাস্ত্রের মাধ্যমে মানুষকে শেখানো হয়েছিল—আজকের দিনে সমাজবিজ্ঞানী তথা আধুনিক রাজনীতিবিদেরা যাকে 'ওয়ান ওয়ার্লড' থিয়োরি নাম দিয়ে যেন নতুন কিছু তত্ত্ব শোনাচ্ছেন বলে মনে করছেন।

এইভাবে দেখা যায়, ভারতীয় সনাতন মানবধর্মে "বসুধৈব কুটুম্বকম্" ভাবধারা অনুযায়ী, পৃথিবীর সকলেই একটা বিরাট পরিবারের মতো, আত্মীয় কুটুম্বের মতোই নিবিড় প্রীতিমূলক আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ রয়েছে—সেখানে সকলেই সকলের সাথে ভালবাসার সূত্রে সুসম্পর্কিত।

কেবল মানুষের ক্ষেত্রেই নয়, পশুপাখি গাছপালা কীটপতঙ্গ—সকলেই পরস্পরের সঙ্গে প্রীতির বন্ধনে সম্পর্কিত, এই কথা ভাবতে শেখানো হয়েছে

ভারতীয় বৈদিক শাস্ত্রসম্ভারে। ভগবানই এমনভাবে এই পৃথিবীটাকে সৃষ্টি করেছেন। একটু মনোনিবেশ সহকারে ভগবদ্ভক্তির মাধ্যমে ভাবলেই আমরা সেটা দেখতে পাই।

কারণ সকলেই ভগবানের বিভিন্ন অংশ, তাই সেই বিবেচনাতেও আমরা সকলের সঙ্গে পারস্পরিক আদান-প্রদানের মাধ্যমে সম্পর্কিত। আপাতদৃষ্টিতে দেখতে পাই—চলমান পশু পাখি কীটপতঙ্গের কথা ছেড়ে দিলেও—নিশ্চল গাছপালাদের সাথেও আমাদের জীবনধারা কতরকমে সম্পর্কিত হয়ে রয়েছে। যখন আমরা শ্বাস গ্রহণ করছি, তখন অক্সিজেন নিচ্ছি, আবার শ্বাস ছাড়ার সময় কার্বনডায়অক্সাইড ছাড়ছি—সেটি গাছেরা গ্রহণ করে নিচ্ছে এবং তার বদলে তারা অক্সিজেন ছেড়ে দিচ্ছে। ভগবানই তো গাছপালাগুলিকে এমন বিস্ময়কর কলাকৌশলে তৈরি করে দিয়েছেন।

এইভাবে পরম পিতা শ্রীকৃষ্ণের সন্তান সন্ততিরূপে, তাঁর অবিচ্ছেদ্য বিভিন্নাংশরূপে সকল জীব চিরকালের মতো পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত। কৃষ্ণ-সম্পর্ক না দেখলেও, ব্যক্তিগত সম্পর্ক বিচারেও গাছপালারা আমাদের কুটুম্ব। এইভাবে সারা পৃথিবী বাস্তবিকই একটা বিরাট পরিবার।

কিন্তু মানুষ যখন পরমেশ্বর ভগবান তথা পরম পিতা শ্রীকৃষ্ণকে ভুলে যায়, তখন তারা এই সম্পর্কের কথাও ভুলে যায়। আর যত বেশি তারা দূরে সরে যায় এই আধ্যাত্মিক সম্পর্ক বোধ থেকে, ততই 'আপন' ভাবটি হারিয়ে ফেলে।

তাই কলিযুগে আমরা দেখতে পাচ্ছি, বসুধার কথা ছেড়ে দিলেও, রাজ্য বা গ্রামের কুটুম্বতার কথা ছেড়ে দিলেও, একটা গৃহে সংসারেই একত্রে মানুষ থাকতে পারছে না-ছেলেরা বড় হয়ে বৃদ্ধ মা-বাবাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে, তাদের কোনই কৃতজ্ঞতা বোধ নেই। মা-বাবা তাদের কত কষ্ট করে বড় করে তুলেছে, সেই কথা ভুলে গিয়ে ভিন্ন হয়ে বসবাস করছে। তারপরে, যে-স্ত্রীকে নিয়ে সুখে ঘর বাঁধবে বলে বৃদ্ধ মা-বাবাকে ছেড়ে চলে এসেছিল, একদিন সেই স্ত্রীও তাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে।

ভগবানের প্রতি বিমুখ হলেই এই ধরনের ভিন্ন দর্শন জাগে। ভগবৎ-বিমুখতা মানেই জড় জগতের অস্থায়ী সুখের প্রতি আসক্ত। আমরা যত বেশি জড় সুখান্বেষী হব, ততই ভেদভাব বাড়বে।

তাই শ্রীমদ্ভাগবতে (৩/২৯/২৬) ভগবান কপিলদেবের উপদেশ লিপিবদ্ধ হয়েছে যে, মানুষ যখন নিজের এবং অন্যের মধ্যে অণুমাত্রও ভিন্ন দর্শন করে, তখর মৃত্যুর প্রজ্বলিত অগ্নিরূপে ভগবান তার হৃদয়ে মহাভয় উৎপন্ন করেন।

অর্থাৎ যারা জড় জগতের সুখ আহরণের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে রয়েছে, তারা তাদের জড় দেহটাকে স্বরূপ বলে মনে করছে এবং তারা ভুলে যাচ্ছে যে, একটা দিন তাদের ঐ দেহটাকে ছেড়ে চলে যেতেই হবে। যেহেতু তারা ঐ জড় দেহের সুখান্বেষণে অত্যন্ত আসক্ত, তাই তারা মৃত্যুকেও অত্যন্ত ভয় করে।

কিন্তু যাঁরা ভক্ত হয়েছেন, ভগবানের শরণাগত হয়েছেন, ভগবানকে নিত্য স্মরণ না করে কোন কাজই করেন না, তাঁরা ভালভাবেই উপলব্ধি করতে পারেন যে, জড় দেহটি জীবের স্বরূপ নয়। দেহটির নিরন্তর পরিবর্তন হচ্ছে—কৌমার, যৌবন ও জরার শেষে দেহান্তর হবেই হবে। তবু সেই পাঁচ বছরের শিশু আমি এবং আজকের আমি স্বরূপত একই ব্যক্তি। তাই যাঁরা ধীর, তত্ত্বজ্ঞানী, তাঁরা এই ব্যাপারে বিন্দুমাত্র মুহ্যমান হন না। পুরনো কাপড় ফেলে দিয়ে যেমন নতুন কাপড় পরতে হয়—ফেলে দেওয়া মানে মৃত্যু—তেমনি দেহ জীর্ণ হয়ে গেলে সেটি ত্যাগ করতেই হয়।

পুরনো কাপড় ত্যাগ করে নতুন কাপড় পেলে যেমন লোকে আনন্দ উপভোগ করে, তেমনি যাঁদের স্বরূপ জ্ঞান লাভ হয়েছে, তাঁরা কখনই জন্ম-মৃত্যুর ব্যাপারে দুঃখিত হন না। যার জন্ম হয়েছে, তার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। সেজন্য অনুশোচনার কোনই কারণ নেই। যাঁরা ভগবৎ তত্ত্ববেত্তা, তাঁদের এই জ্ঞানের স্ফুরণ ঘটে, তাঁরা তাই মৃত্যুভয়ে যেমন ভীত হন না, তেমনি কাউকে ভিন্ন দর্শনও করেন না।

জড় জগতের অস্থায়ী যশ প্রতিপত্তির লোভে মানুষের মধ্যে ঈর্ষাবোধ জাগ্রত হলে, জড় সুখের আকাঙ্ক্ষায় অত্যধিক লালায়িত হলে, ভয় জাগে বুঝি কেউ প্রাপ্তিযোগে বিঘ্ন ঘটাবে। তখন ভিন্ন বোধ জাগে, মহাভয়ে কাতর হয়ে আত্মরক্ষার জন্য মানুষ বৃথা চেষ্টা করতে থাকে।

অতএব, দান, সম্মান এবং সহনশীল মৈত্রীপূর্ণ আচরণের দ্বারা পৃথিবীর তথা সমাজের সমস্ত জীব, সমস্ত সম্প্রদায়, সমস্ত আত্মীয় স্বজন পাড়া প্রতিবেশীকে সম দৃষ্টিতে দর্শন করার শিক্ষা লাভ করতে হয় এবং সমস্ত জীবের আত্মার স্বরূপে বিরাজমান শ্রীভগবানের পূজা করা উচিত। (ভাঃ ৩/২৯/২৭)

ভগবানের আরাধনার মাধ্যমেই এই দর্শন শিক্ষা সহজে লাভ করা যায়। যার এই শিক্ষা লাভ হয়নি, সে মৃত্যুভয়ে সদাসর্বদা ভীত হয়ে থাকে—এই উপদেশ ভাগবতে স্বয়ং ভগবান কপিলদেব অবতাররূপে মানব সমাজকে দিয়ে গেছেন।

যারা এই সৎ উপদেশ লাভ করবার সুযোগ পায়নি, তারাই মৃত্যুকে ভয় পায়, তারা বলে, "মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে।" কিন্তু যতই এই ধরনের কবিতায় ভাব বিন্যাস করা হোক, মরতে হবেই—মরতে চাই না বলে ভয় পেলে বুঝতে হবে—ভগবানের উপদেশ তার কানে ঢোকেনি। অথচ বহু জড় সাহিত্যে এই কবিতাংশটি অনেকের বেশ ভাল লাগে যদিও এই কাব্যিক ছত্রটির অন্তর্নিহিত ভাবার্থ কোনও যথার্থ জ্ঞানের পরিচয় মোটেই বহন করে না।

কারণ 'মরিতে চাহিনা' যে বলে, সে মরণকে ভয় পায়, অতএব অবশ্যই সে ভগবৎ-বিমুখ। অবশ্য, অধিকাংশ মানুষই তাই। আর 'সুন্দর ভুবনে' কথাটিও অলীক বর্ণনা। শাস্ত্রমতে বাস্তবিকই এই ভুবনটি হল 'দুঃখালয়ম্ অশাশ্বতম্'। দুঃখময় আলয় এবং অশাশ্বত অর্থাৎ অনিত্য অস্থায়ী এই পৃথিবীকে 'সুন্দর' বলেন যে কবি, তিনি মানুষকে বৃথাই বিভ্রান্ত করেন, তা অবশ্যই বলতে হবে। এই সমস্ত সারতত্ত্ব ভালভাবে বুঝতে হলে উপযুক্ত জ্ঞানীর কাছে গীতা ভাগবতের কথা শুনতে হয় এবং নিত্য ভগবানের নামকীর্তন করতে হয়। এই শিক্ষা আমাদের সমাজে পুনরুজ্জীবিত করতে হবে। নচেৎ হানাহানি ভেদাভেদ পৃথিবীতে কমবে না। সকলের আত্মাকে ব্যষ্টি আত্মারূপে পরমেশ্বর ভগবানের সম্পর্কজ্ঞানে উপলব্ধি করা উচিত। ভাগবতে (৩/২৯/২৭) ব্যষ্টি আত্মার পূজা করার বিধি বর্ণনা করা হয়েছে সুস্পষ্টভাবে। বলা হয়েছে, অর্হয়েৎ দানমানাভ্যাস্ মৈত্র্যা অভিন্নেব চক্ষুষা। অর্থাৎ দান এবং সম্মান প্রদানের মাধ্যমে সকলের হৃদয়ে বিরাজমান ভগবানকে ভেদভাবরহিত হয়ে এবং মিত্রতামূলক আচরণের মাধ্যমে পূজা তথা শ্রদ্ধাভক্তি নিবেদন করা উচিত।

ভাগবতের এই অংশে দুটি সংস্কৃত শব্দ রয়েছে—দান এবং মান। যারা জাগতিক অথবা আর্থিক অবস্থায় আমাদের থেকে নিকৃষ্ট, তাদের দান করতে হয়। মান অর্থাৎ সম্মান উৎকৃষ্টকে দেওয়া উচিত। দান নিকৃষ্টকে দিতে হয়। এইভাবে সমাজের ভেদাভেদ দূর করার জন্য সমতা সৃষ্টির উদ্যোগ নিতে হবে সার্থক সুন্দর পদ্ধতিতে।

নিত্য আনন্দের পথনির্দেশ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যে-শিক্ষাটি আমাদের দিয়েছেন, সেটা সংকীর্ণ কোনও উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নয়। সেটি মহাপ্রভু শুধু বাঙালীদের জন্য দিতে আসেননি, মহাপ্রভু কেবল ভারতবাসীদের জন্য আসেননি। মহাপ্রভু কেবল পৃথিবীর মানুষদের জন্যও আসেননি। মহাপ্রভু এসেছিলেন সারা পৃথিবীর—কেবল পৃথিবীর নয়—সারা জগতের সমস্ত জীবের জন্য। 'জীবের নিস্তার লাগি নন্দসূত হরি'—জীবের নিস্তারের জন্য নন্দসূত যে শ্রীকৃষ্ণ, তিনিই গৌরসুন্দর রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

মহাপ্রভুর শিক্ষার কথা যখনই বলা হচ্ছে, তখন কোনও জায়গায় আপনি পাবেন না যে, ভারতবাসীদের জন্যই মহাপ্রভু এসেছিলেন, বা বাঙালীদের জন্য এসেছিলেন। পক্ষান্তরে, বারে বারে দেখবেন যে, সমস্ত জীবের কল্যাণের জন্যই মহাপ্রভু এসেছিলেন। কেননা, প্রতিটি জীবই হচ্ছে তাঁর সন্তান, প্রতিটি জীবই ভগবানের সন্তান এবং তাঁর সন্তানদের উদ্ধার করার জন্যই ভগবান অবতীর্ণ হন। সেই জন্য মহাপ্রভুর এই শিক্ষা প্রচারে, মহাপ্রভুর এই শিক্ষাধারায় কোনও রকম সংকীর্ণতা নেই। এটা সারা পৃথিবীর জন্য, সারা জগতের জন্য।

আমরা দেখতে পাই যে, মহাপ্রভুর মধ্যে সমস্ত প্রয়োজনীয় গুণগুলি রয়েছে। যে-গুণগুলির জন্য আমরা বিভিন্ন লোকের পূজা করি, সেই সমস্ত গুণগুলিই মহাপ্রভুর মধ্যে রয়েছে। পক্ষান্তরে, সেগুলি পূর্ণরূপেই রয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা মহাপ্রভুকে স্বীকার করি না। মহাপ্রভুকে মানতে গেলেই যেন আমাদের আঁতে ঘা লাগে। আমরা ইউরোপ, আমেরিকা, চীন, জাপান, এমন কি আফ্রিকার নেতাদেরও পূজা করতে রাজী আছি, কিন্তু আমাদের শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আরাধনায় যেন আমাদের আত্মসম্মানে লাগে।

আজকের মানুষের মনোভাব হয়েছে যে, আমাদের প্রগতিশীল হতে হবে। প্রগতিশীল হওয়া মানে কি? ঐ বাইরের সব আবর্জনাগুলো ধার করে আনা, কুড়িয়ে আনা!

আমাদের দেশের বৈদিক দৃষ্টিভঙ্গির বা বৈদিক নীতির কোন রকম সমাদর নেই। কিন্তু ওরা রাশিয়া, চীন, জাপান, জার্মানী, ইতালী—সব জায়গা থেকে এক-একটা মতবাদ নিয়ে আসছে। মার্কস-ইজম্, লেনিন্-ইজম্, হেন্-ইজম্,

তেন্-ইজ্‌ম্—এটাকেই আমরা আমাদের প্রগতি বলে দেখাই। কিন্তু এতে আমাদের কাজ কিছু হচ্ছে না। লোকের দুঃখ-দুর্দশা দিন দিন বেড়েই চলেছে।

কিন্তু আজ যদি আমরা মহাপ্রভুকে গ্রহণ করতাম, তা হলে আমাদের দুঃখ-দুর্দশার তখনি নিবৃত্তি হতো এবং তাঁর যে মতবাদ আমরা গ্রহণ করতাম, সেটা সর্বকালের, সর্বশ্রেষ্ঠ মতবাদ। মহাপ্রভু যে-জিনিসটি দিয়ে গেছেন, সেটি সর্বশ্রেষ্ঠ মতবাদ, সেটা সর্বশ্রেষ্ঠ সাম্যবাদ, সেটি সর্বশ্রেষ্ঠ নীতি, সেটি সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম—সেটি সব কিছুরই শিরোমণি।

এক কথায়, মহাপ্রভু যে-জিনিসটি দিয়ে গেছেন, সেটি সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তু। কিন্তু আমরা এতই মূর্খ যে, আমরা সেটা গ্রহণ করতে রাজী নই। তার কারণ—মূর্খ বলছি এই কারণে যে, মহাপ্রভু যে কে, সেটা জানবার কোনও রকম চেষ্টাই আমরা করি না।

মহাপ্রভুর নামে পদযাত্রা আন্দোলন বাংলায় চলছে, কিন্তু বাঙালীদের মধ্যে কতটুকুই বা সাড়া পড়েছে? আপনারা কয়েকজন কেবল আমাদের এই প্রচেষ্টায় সহযোগিতা করছেন; আমরা যেটা বলতে চাই, তার জন্য কিছুটা আগ্রহ প্রকাশ করছেন। কিন্তু অধিকাংশ লোকই সেটা মানতে চাইছে না। সুতরাং তার ফলে আমাদের কষ্ট বাড়ছে, দুঃখ-দুর্দশা বাড়ছে, পৃথিবীর মানুষের দুঃখ-দুর্দশা বেড়ে যাচ্ছে।

বিশেষ করে একটা জিনিস বিচার করে দেখুন—আমরা সকলেই আনন্দ চাই। প্রতিটি জীব, সে ধনী হোক, গরিব হোক, মানুষ হোক, পশু হোক, সকলেই কিন্তু আনন্দ চায়। সকলের জীবনে একটি প্রবল সত্য হচ্ছে আনন্দের অনুসন্ধান। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষাতে সেই আনন্দের পথনির্দেশই রয়েছে। তবে সেটি প্রথমে একটু কষ্টসাধ্য, বা বলা যায় প্রথমে বিষময়। কেননা বদভ্যাস ছাড়তে প্রথমে একটু কষ্টই হয়। যার ধরুন নেশা রয়েছে—বড় কিছু নেশার কথায় যাওয়ার দরকার নেই—ধরুন, যার সিগারেট খাওয়ার নেশা রয়েছে, তার পক্ষে সিগারেট-খাওয়াটা ছাড়া খুব কঠিন, কষ্টকর। কিন্তু যখন সে ছেড়ে দেয়, তখন সে ভাল অনুভব করে। সুতরাং প্রথমে তা বিষময় মনে হলেও, পরিণামে তা অমৃত।

তো এইভাবে আমাদের এই যে জীবন, তাতে কষ্টের কি আছে? যখন প্রকৃতপক্ষে কেউ বলে যে, আপনাদের এই যে, জীবন, আহা, না জানি আপনারা কত কষ্ট ভোগ করেন, তখন আমরা বলতে বাধ্য হই যে, আসলে কি জানেন তো, আমরা খুব আনন্দ উপভোগ করি। আমাদের জীবনে কোনই কষ্ট নেই। যেটি রয়েছে, সেটি হচ্ছে নিত্য আনন্দ।

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সেটা আপনারা বুঝতে পারবেন না। কিন্তু আপনারা যদি এসে কিছু দিন আমাদের সঙ্গে থাকেন, আমাদের এই জীবন যদি আপনারা অবলম্বন করেন, লোক দেখানোর জন্য নয়, আন্তরিকভাবে যদি আপনারা গ্রহণ করেন, তা হলে আপনারাও সেই আনন্দের স্বাদ পাবেন।

আর সেটা করতে হলে যে সব কিছু ছেড়ে দিতে হবে, তা নয়। পক্ষান্তরে, চারটি খারাপ কাজ ছেড়ে দিতে হবে। আর বাকি যা কিছু পাবেন, তা সবই আনন্দ এবং তার সুফলও হচ্ছে। আজকে ধরুন, আমাদের এই কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রচারের জন্য বহু পরিবার আজ নিরামিষাশী হয়ে গেছে। যারা, ধরুন, বছর খানেক আগে পর্যন্ত ভাবতে পারেনি বা বছর দুয়েক আগে পর্যন্ত ভাবতে পারেনি, যে, তারা মাছ মাংস খাওয়া ছেড়ে দিতে পারে।

আমি কিছুদিন আগে চণ্ডীগড়ে ছিলাম—সাত দিন ওখানে ছিলাম। এই সাতদিনে প্রায় ১৫টি পরিবার মাছ মাংস খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। ওদের অবশ্য আগে থেকেই সংস্কার ছিল, আগে থেকেই খেত না। কিন্তু ইদানিং তথাকথিত আধুনিক অসভ্যতার প্রভাবে, তারা মাছ-মাংস খাওয়া ধরেছিল। কিন্তু ওদের বোঝানো মাত্রই তারা ছেড়ে দিয়েছে। কেউ কেউ পেঁয়াজ রসুন খেত, নিরামিষাশী ছিল বাড়িতে কিন্তু পেঁয়াজ রসুন খেত। তারাও পেঁয়াজ রসুন খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে।

এখন পাঞ্জাবীদের পক্ষে এটা ছাড়াটা খুব একটা কঠিন নয়, কিন্তু বাঙালীদের পক্ষে ছাড়াটা খুবই কঠিন। কেননা বাঙালীরা অন্নপ্রাশনের সময় থেকেই মাছ খাওয়া শুরু করে। এত দিন ধরে, এত গভীর যে সংস্কার বা কুসংস্কার, সেটাকে সংশোধন করা সহজ নয়। কিন্তু তারাও করছে, তারাও ছেড়ে দিচ্ছে।

এখানে অনেকে আছেন, যাঁরা ছেড়ে দিয়েছেন। এটা কেন হচ্ছে? এর কারণ হচ্ছে, তাঁরা নিজেরাই অনুভব করছেন যে, হ্যাঁ, সত্যিই জিনিসটা তো আমাদের ভাল দিকেই নিয়ে যাচ্ছে। এখন, দেখুন, ভাল হতে সবাই চায়। যে-লোকটা মানুষ খুন করছে, সে-ও মনে করছে, আমি এটা ভালোর জন্যেই করছি।

দস্যু রত্নাকর, সে দস্যুবৃত্তি করতো। নারদ মুনি এসে যখন তাকে বললেন যে, জানো, তুমি কি করছো? এর জন্য তোমার কত পাপ হচ্ছে? উত্তরে রত্নাকর বলল, পাপ কেন হবে? এটা তো আমি ভালোর জন্যে করছি। আমি তো খুব ভালো কাজ করছি। ভাল কাজটা কি? না, আমি আমার পরিবার প্রতিপালনের জন্য করছি।

তখন নারদ মুনি বললেন, ঠিক আছে। পরিবার প্রতিপালনের জন্য যে করছো, কিন্তু পাপের ভাগী কি তোমার পরিবার পরিজনেরা হবে?

দস্যু রত্নাকর বলল, কেন হবে না? ওদের জন্যে আমি যখন করছি, তখন ওরা নিশ্চয় ভাগী হবে।

—তো, ঠিক আছে, তুমি গিয়ে ওদের জিগেস করে এসো।

রত্নাকর যখন গেল, তখন কেউই সম্মত হলো না পাপের ভাগী হতে।

এখন, রত্নাকর যেমন মনে করেছিল যে, সে দস্যুবৃত্তি করে সকলের ভালো করছে, ভালো কাজ করছে—এখনও তেমনি গুণ্ডা বদমাশেরা মনে করছে—আমরা তো ভালো কাজই করছি। রাজনৈতিক খুন আজকাল দৈনিক খবরের কাগজ খুললেই দেখা যায়। এখন যারা খুন করছে, তারা কিন্তু মনে করছে—আমি দেশের জন্যই করছি, আমি সকলের ভালোর জন্যেই করছি।

এইভাবে প্রতিটি লোকই যা করছে, সে মনে করে সে ভালোর জন্য করছে। কিন্তু যতক্ষণ না সে প্রকৃত ধর্মপথে অবস্থিত হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে কখনও ভালো কাজ করতে পারে না। যে ভগবানের ভক্ত নয়, সে ভালো কাজ করবে কি করে? তার সৎগুণ আসবে কোথা থেকে? অসৎ পথে যে চলেছে, তার মধ্যে সৎ গুণাবলী আসবে কোথা থেকে?

ভাগবত থেকে আত্মীয়তাবোধ জাগে

শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ে ব্রহ্মার পুত্র, মনুষ্যজাতির আদি পুরুষ, চতুর্দশ মনুর অন্যতম, ধর্মশাস্ত্রবক্তা স্বায়ম্ভুব মনু প্রজাতির তিন কন্যা এবং তাঁদের বংশাবলীর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। সেই তিন কন্যা ছিলেন আকূতি, দেবহূতি এবং প্রসূতি।

প্রথমা কন্যা আকূতির দুই ভাই ছিল, তা সত্ত্বেও রাজা স্বায়ম্ভুব মনু তাঁকে প্রজাপতি রুচির হস্তে সম্প্রদান করেছিলেন এই শর্তে যে, ঐ কন্যার গর্ভে যে পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করবে, তাকে মনুর পুত্ররূপে মনুকে প্রত্যর্পণ করতে হবে। স্বায়ম্ভুব মনু তাঁর পত্নী রাণী শতরূপার পরামর্শক্রমেই এই ব্যবস্থা করেছিলেন।

শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ এই ব্যবস্থার তাৎপর্য ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লিখেছেন, কোনও কোনও ক্ষেত্রে পুত্রহীন মানুষ তাঁর কন্যাকে এই শর্তে সম্প্রদান করে থাকেন, যাতে তাঁর পৌত্র রূপে ঐ কন্যার গর্ভজাত পুত্রটিকে তাঁর পুত্ররূপেই গ্রহণ করে তাঁর সম্পত্তির অধিকার দিতে পারেন। একে বলা হয় পুত্রিকা-ধর্ম, অর্থাৎ ধর্মীয় যাগযজ্ঞাদি সহকারে নিজপুত্র ছাড়াও অন্যজনের পুত্রকে গ্রহণ করা যায়।

কিন্তু এখানে আমরা মনুর অসাধারণ ব্যবস্থা লক্ষ্য করছি যে, তাঁর দুই পুত্র বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তিনি তাঁর প্রথমা কন্যাকে প্রজাপতি রুচির হস্তে সম্প্রদান করেছিলেন এই শর্তে যে, তাঁর কন্যার গর্ভজাত পুত্রটিকে তাঁরই পুত্রস্বরূপ প্রত্যর্পণ করতে হবে।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই প্রসঙ্গে অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, রাজা মনু জানতেন, পরম পুরুষোত্তম ভগবান স্বয়ং পুত্ররূপে আকূতির গর্ভে আবির্ভূত হবেন, কারণ তিনি ভগবানের কাছে অভিলাষ করেছিলেন যেন ভগবানকে তাঁর পুত্র এবং পৌত্ররূপে পেতে পারেন।

মনু মানবজাতির আদি আইন-প্রণেতা এবং তিনিই স্বয়ং যেহেতু পুত্রিকা-ধর্ম প্রবর্তন করেছিলেন, তাই আমরা মেনে নিতে পারি যে, মানবজাতিও সেই প্রথা গ্রহণ করেছিল। তাই, কারও নিজ পুত্র থাকলেও, নিজ কন্যার গর্ভে বিশেষ কোনও পুত্রলাভের অভিলাষ পূরণের উদ্দেশ্যে, আপন কন্যাকে সেই শর্তে সম্প্রদান করতেও পারেন। শ্রীল জীব গোস্বামীরও সেই অভিমত।

সংস্কৃত 'মানব' কথাটি এসেছে 'মনু' থেকে। মনুর সন্তান-সন্ততিদের নিয়েই মানবজাতি গড়ে উঠেছে। পিতার নামেই বৈদিক নিয়মে পুত্রের নামকরণ হয়। মনুর পুত্রেরা মানব, দনুর পুত্রেরা দানব, দিতির পুত্রেরা দৈত্য, এমনি।

মানবজাতির পিতাকে সৃষ্টি করেন সৃষ্টির প্রথম জীব ব্রহ্মা তাঁর মানস শক্তি বলে। সমস্ত মুনিঋষি এবং দেবতাদের এইভাবেই ব্রহ্মা সৃষ্টি করেছিলেন এবং চতুর্দশ মনুদেরও জীব সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ঐ একইভাবে সৃষ্টি করেছিলেন তাঁর মানস ইচ্ছাবলে।

অবশ্য পিতা ও মাতার দৈহিক মিলনের ফলে জীব সৃষ্টির প্রথম রীতি শুরু করেছিলেন স্বায়ম্ভুব মনু এবং তাঁর পত্নী শতরূপা। পিতামহ ব্রহ্মার দক্ষিণ পার্শ্ব থেকে সৃষ্টি হয়েছিলেন স্বায়ম্ভুব মনু এবং ব্রহ্মার বাম পার্শ্ব থেকে মানসবলে উদ্ভূতা হন শতরূপা। তাঁরাই মানবজাতির জন্ম দিতে শুরু করেন।

প্রথমে মনু যখন শতরূপার সাথে দৈহিক মিলনের উদ্দেশ্যে এগিয়ে আসেন, তখন শতরূপা অত্যন্ত লজ্জাবোধ করেছিলেন এবং বিব্রত হয়েছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন, আমরা একই পিতার দেহ থেকে উদ্ভূত হয়েছি এবং সেই সূত্রে আমরা ভাই-বোন, কিন্তু তিনি আমার সাথে দেহমিলন করতে চাইছেন।

তখন শতরূপা তাঁর ইচ্ছাবলে নিজের দেহের রূপ পরিবর্তন করে একটি অশ্বরূপ ধারণ করেছিলেন এবং মনুও সঙ্গে সঙ্গে একটি অশ্বরূপ ধারণ করেন। এইভাবে শতরূপা ও মনু ক্রমাগত আপন আপন দেহ রূপ পরিবর্তন করে দেহমিলনের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রজাতির সন্তান-সন্ততির সৃষ্টি করেছিলেন। শতরূপা শত শত রূপ ধারণ করতে পারতেন।

তবে মনুর বংশধর রূপে প্রথমে মানবজাতির সৃষ্টিই হয়েছিল। ইংরেজিতে 'ম্যান' কথাটিও 'মনু' নামের সঙ্গে সাদৃশ্য রক্ষা করছে দেখা যায়। শুধু ইংরেজি ভাষাতেই নয়, ইউরোপীয় অনেক ভাষাতেও 'ম্যান' বা মানুষ কথাটির প্রতিশব্দের সাথে 'মনু' শব্দটির সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। দুর্ভাগ্যের বিষয়, আজ মানুষ তার আদি জন্মসূত্রের ইতিবৃত্ত হারিয়ে ফেলেছে বলেই জানে না এবং মানে না যে, তারা সকলেই প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মার সন্তান।

এই জন্মসূত্র স্বীকার করলে বুঝতে কষ্ট হয় না যে, সমস্ত মানুষ আদিকাল থেকেই পরস্পরের সাথে কতখানি নিবিড়ভাবে আত্মীয়তার সম্পর্কে বদ্ধ। বৈদিক সংস্কৃতি সভ্যতার মূল শাস্ত্রসম্ভারের এটাই হলো বিস্ময়কর অবদান। কারণ এই সমস্ত ভাগবত আদি শাস্ত্রাদির মধ্যে আমরা যতই অবগাহন করি, যতই পুরাকালের ইতিবৃত্ত অনুধাবন করি, ততই এমন একটি শুদ্ধ মনোভঙ্গি গড়ে ওঠে, যাতে ক্রমশই আমরা সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে থাকি যে, আমরা প্রত্যেকেই, এই গ্রহলোকের প্রতিটি জীবই বাস্তবিকই পরস্পরের সাথে কতই গভীর আত্মীয়তার বন্ধনে জড়িত এবং চরম অনুসন্ধানে আমরা আমাদের চিন্ময় সত্তার উপলব্ধি অর্জন করে বুঝতে পারি যে, আমরা সকলেই চিন্ময় আত্মা। আমরা প্রত্যেকেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই বিভিন্নাংশ। এইভাবেই কৃষ্ণভাবনার মাধ্যমে পৃথিবীতে মানবজাতির ভাবধারায় চিন্ময় ঐক্য, মৈত্রী এবং সৌহার্দ্য ফিরিয়ে আনা খুবই সম্ভব। তাই আজ বিশ্বব্যাপী কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের এত জয়জয়কার।

সংস্কৃতে একটি প্রবাদ বাক্য খুবই জনপ্রিয়, তা হলো 'বসুধৈব কুটুম্বকম্'। 'বসুধা' মানে এই বসুন্ধরা, পৃথিবী। 'কুটুম্বকম্' মানে আত্মীয়স্বজন। এই পৃথিবীতে প্রতিটি জীবই পরস্পরের আত্মীয় স্বরূপ। কেবলমাত্র মানুষেরাই

নয়, জীবজন্তু সকলেও তাই। কারণ আমরা সকলেই একই পিতামহ ব্রহ্মা এবং তাঁরই মানসপুত্র মনুর বংশধর।

অবশ্য এ ছাড়া আরও একটা গভীর তাৎপর্য রয়েছে। সেই গভীর তাৎপর্যটি হলো এই যে, আমরা সকলে এই দেহগুলি নয়, আমরা হলাম চিন্ময় সত্তা এবং প্রত্যেকেই এক পরম চিন্ময় সত্তা পরম পুরুষোত্তম ভগবানের সৃষ্টি। সেই বিবেচনা থেকেও আমরা সকল জীবই পরস্পরের সাথে পরম আত্মীয়তার সম্পর্কে আবদ্ধ শাশ্বত কাল যাবৎ। এই উপলব্ধি যতই মানুষের অন্তরে আমরা পুনরুজ্জীবিত করে তুলতে পারবো, বসুন্ধরায় শান্তি মৈত্রী ততই সহজ হবে।

কিন্তু আজ কি চলেছে সভ্যতার নামে? মৈত্রীর নামে হানাহানি আর বিদ্বেষ। এটা কলির প্রভাব। কলিযুগের এই বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতি থেকে মানবসন্তান তথা সমস্ত জীবকুলকে রক্ষা করবার জন্য স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েছেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কলিযুগে যে সংকীর্তন আন্দোলনের প্রবর্তন করে গেছেন, তার মাধ্যমেই আজ আমরা সমগ্র জগতের জীবকুলকে যথার্থ মৈত্রীভাবে উদ্বুদ্ধ করতে উদ্যোগী হয়েছি। এই সংকীর্তন আন্দোলনের সাহায্যেই কলির বিভ্রান্তিকর প্রভাব দূর হয়ে যাবেই যাবে এবং সমগ্র বিশ্ব একই সূত্রে আবার গাঁথা হয়ে যাবে। সেই ভবিষ্যদ্বাণী স্বয়ং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু করে গেছেন—যত নগরাদি গ্রামে কৃষ্ণকথা প্রচারিত হয়ে যাবে।

প্রায় শতবর্ষ পূর্বে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরও বলেছিলেন, এমন একদিন আসবে, যখন বিশ্বের সকল ধর্মমত সংকীর্তন আন্দোলনের ধারা বেয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর চরণপদ্মে এসে মাথা নত করে একতাবদ্ধ হবে। এই ভবিষ্যদ্বাণী তিনি ১৮৯৬ সাল নাগাদ করেছিলেন এবং তা গ্রন্থাকারে প্রকাশিতও হয়েছে।

আজ আমরা দেখতেই পাচ্ছি, সেই ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সফলতার অভিমুখে এগিয়ে চলেছে। এখনও হয়তো সারা জগতে সর্বজাতি সর্বধর্মের মিলন ঘটেনি, কিন্তু ইসকনের মধ্যে তা সুস্পষ্টভাবে সার্থক সম্ভব হয়ে উঠেছে। ইসকনে বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন ধর্মের মানুষ সবাই এক সনাতন ধর্মের কাছে এসে মিলিত হয়েছেন—মিলিত হয়েছেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সংকীর্তন আন্দোলনের ছত্রছায়ায়।

এখন, যদি কোনও একটি নীতিসূত্র কোনও বিশেষ ক্ষেত্রে সুফল দেখায়, আর সেই ক্ষেত্রটিকে যদি আমরা ক্রমেই প্রসারিত করতে থাকি, তা হলে সেই

একই নীতিসূত্র একই সুফল অবশ্যাই সৃষ্টি করতে থাকবে প্রসারিত প্রয়োগক্ষেত্রে।

কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনের মাধ্যমে ইসকনের ক্ষেত্রপরিধির মধ্যে যদি এমন অভূতপূর্ব একতা আর মৈত্রী বন্ধন সৃষ্টি হতে পারে, তা হলে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন সারা পৃথিবীর প্রতি নগরাদি গ্রামে প্রসারিত হয়ে যেতে থাকলে সকল দেশের সকল সম্প্রদায়ের মানুষ অবশ্যই শ্রীল প্রভুপাদের চরণারবিন্দে এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে এসে মিলিত হবেই।

শ্রীল প্রভুপাদ বিশ্বব্যাপী যে চমৎকার বিপুল আয়োজনের সূচনা করে রেখেছেন, তা বৃথা যাবে না। তাঁর আয়োজনের মাধ্যমে, তাঁর আবির্ভাব শতবার্ষিকীর প্রাক্কালেই পৃথিবীতে সংকীর্তন যজ্ঞের প্রসারের ফলে যথার্থ শান্তির বার্তাবরণ গড়ে উঠবে। এই কলিযুগেই সত্যযুগের উন্মেষ ঘটবে। সারা পৃথিবীতে সবাই যথার্থ ধর্ম-ভাবে অনুপ্রাণিত হবে এবং হয়ে উঠবে প্রকৃতই ভগবদ্ভক্তি অভিমুখী।

মহাভারতের শিক্ষা

বিদুর ছিলেন ধৃতরাষ্ট্রের রাজসভার একজন মন্ত্রী। যদিও তিনি ছিলেন ধৃতরাষ্ট্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, কিন্তু তিনি অত্যন্ত জ্ঞানী ছিলেন। তিনি ছিলেন স্বয়ং মূর্তিমান. ধর্ম। তিনি ছিলেন ধর্মরাজ যমরাজের অবতার। তাই তিনি যথার্থভাবেই সর্বদা ধর্মের স্তরে অধিষ্ঠিত ছিলেন। অপরপক্ষে দুর্যোধন ছিল কলির অবতার, আর তার কাজই ছিল ধর্মকে পরাস্ত করে অধর্মের প্রতিষ্ঠা করা। তাই বারম্বার বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে পরামর্শ দিয়েছিলেন দুর্যোধনকে পরিত্যাগ করার জন্য। প্রকৃতপক্ষে দুর্যোধনের জন্মের পরেই তাকে পরিত্যাগ করার জন্য, দুর্যোধনকে হত্যা করার জন্য, বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে বলেছিলেন। কেন দুর্যোধনকে তার জন্মের পরেই হত্যা করা উচিত সে বিষয়ে যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত কারণও বিদুর প্রদর্শন করেছিলেন; কেননা তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে, দুর্যোধনের জন্মের পরে পরেই সমস্ত রকমের অশুভ লক্ষণসমূহ পরিস্ফুটিত হয়েছিল।

বিদুরের মতন ব্যক্তিগণ হচ্ছেন ত্রিকালজ্ঞ। সময়ের তিনটি স্তরকেই তাঁরা দর্শন করতে পারেন। কেবলমাত্র ভবিষ্যত নয়, তাঁরা অতীত, বর্তমান, সেই সঙ্গে ভবিষ্যতকেও দর্শন করতে পারেন। বিদুর দেখতে পেয়েছিলেন যে এই ব্যক্তিটি অর্থাৎ দুর্যোধন যে কেবলমাত্র তার সমগ্র পরিবারের বিনাশের কারণ হবে তাইই নয় এবং সে সমগ্র ক্ষত্রিয় কুলের বিনাশের কারণ হবে, এমনকি সে এই পৃথিবী গ্রহেরও বিনাশের কারণ হবে।

কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র তাঁর পুত্রস্নেহে এতটাই প্রভাবান্বিত ছিলেন যে তিনি বিদুরের বিজ্ঞ উপদেশ গ্রহণ করেন নি। শ্রীল প্রভুপাদ উল্লেখ করেছেন যে ধৃতরাষ্ট্র কেবল যে জাগতিকভাবেই অন্ধ ছিলেন তা নয়, তিনি পারমার্থিক দিক দিয়েও অন্ধ ছিলেন। তিনি কেবল দেহগতভাবেই অন্ধ ছিলেন না, তার পারমার্থিক দৃষ্টিও ছিল শূন্য। তাই তিনি কি ঠিক আর কি ভুল, কি করা উচিত আর কি করা উচিত নয় তা দর্শন করতে পারতেন না। ফলে ধৃতরাষ্ট্র সেই সময় বিদুরের উপদেশ গ্রহণ করেন নি।

বিভিন্ন সময়ে, বারংবার, ধৃতরাষ্ট্রকে বিদুর সেই একই উপদেশ প্রদান করে গেছেন। যখন দুর্যোধনেরা কুন্তীসহ পাণ্ডবদের হত্যা করার চেষ্টা করেছিল তখনও বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে বলেছিলেন "আপনার পুত্রের থেকে নিস্তার লাভ করুন। সে একটি মূর্তিমান অশুভ।" পাশা খেলায় প্রবঞ্চিত করে যখন পাণ্ডবদের সবকিছু কেড়ে নেওয়া হচ্ছিল এবং দ্রৌপদীকে টানতে টানতে রাজসভায় নিয়ে এসে সর্বসমক্ষে লাঞ্ছিত করা হচ্ছিল, বিদুর তখনও ধৃতরাষ্ট্রকে বলেছিলেন "আপনার পুত্রকে পরিত্যাগ করুন।"

দ্রৌপদী লাঞ্ছনার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য রাজসভায় সকলের কাছে আবেদন করেছিলেন। কিন্তু কেউই এই লাঞ্ছনার প্রতিবাদ করে উঠে দাঁড়াননি। কুরু বংশের সকল জ্যেষ্ঠ সদস্যরা তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। স্বয়ং পিতামহ ভীষ্মদেব সেখানে উপস্থিত ছিলেন। দ্রোণাচার্য উপস্থিত ছিলেন। ধৃতরাষ্ট্র তো উপস্থিত ছিলেনই। কিন্তু কেউই এই ঘৃণ্য, অমানবিক আচরণের প্রতিবাদ করেননি। একমাত্র বিদুর উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। সেই রাজসভায় দাঁড়িয়ে ধৃতরাষ্ট্রকে সাবধান করেছিলেন, "এখনও সময় আছে, দয়া করে এই ধরিত্রীকে অবমাননাকর বিনাশসাধন থেকে রক্ষা করুন। আপনার পুত্রকে ত্যাজ্য করুন।" কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র কর্ণপাত করেন নি।

এরপর আবার কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ সংঘটিত হতে চলার ঠিক পূর্বে, বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে উপদেশ প্রদান করলেন, "আপনি দয়া করে আপনার পুত্রটিকে

পরিত্যাগ করুন। সে ভালো নয়। সে একটি অন্ধ চক্ষুর মতো, যা কখনই কোন উদ্দেশ্য সাধন করে না। তেমনি দুর্যোধনও আপনার কোন উদ্দেশ্য সাধন করবে না, বরং আপনার দুর্দশার কারণ হবে। কেবল আপনারই নয়, সে সমগ্র পরিবারের বিনাশের কারণ হবে। সে কুলঘ্ন, যে অগ্নির মতো কুল বা বংশকে ভস্মীভূত করে। তাই দয়া করে তাকে পরিত্যাগ করুন।" ধৃতরাষ্ট্র বিদুরের কথা শুনলেন না। বরং, সেই সময় দুর্যোধন এসে কাকা বিদুরকে অত্যন্ত কর্কশ ভাষা প্রয়োগ করে অপমানিত করলেন। বিদুর গৃহত্যাগ করলেন। তিনি দেখলেন যে যা অবশ্যম্ভাবী তাকে আর এড়িয়ে থাকা সম্ভব নয়। তাই তিনি চলে গেলেন।

কেবল বিদুরই নন। বিদুরের মতো এই একই উপদেশ ধৃতরাষ্ট্রকে এমনকি গান্ধারীও প্রদান করেছিলেন। গান্ধারী ছিলেন দুর্যোধনের মাতা। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তিনি দুর্যোধনকে পরিত্যাগ করার পরামর্শ ধৃতরাষ্ট্রকে দিয়েছিলেন। দ্রৌপদী কিভাবে রাজসভায় লাঞ্ছিত হচ্ছেন, অপমানিত হচ্ছেন তা দর্শন করে গান্ধারী ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন। গান্ধারী রাজসভায় ছিলেন না। কিন্তু অন্দরমহল থেকে তিনি দ্রৌপদীর আর্ত-ক্রন্দন শুনতে পেয়েছিলেন; তাই তিনি দ্রুত জানালার কাছে ছুটে আসেন। বৈদিক সংস্কৃতি অনুসারে রাজসভায় সাধারণতঃ নারীগণ উপস্থিত থাকতেন না বা যেতেন না। কিন্তু কিছু ছোট ছোট জানালা ছিল, যা দিয়ে রাজসভায় কি হচ্ছে প্রয়োজন হলে তা তাঁরা দেখতে পারতেন। তাই গান্ধারী যখন দ্রৌপদীর আর্ত ক্রন্দন শ্রবণ করলেন, তখন তিনি জানালার কাছে চলে এলেন। যেহেতু গান্ধারীর চোখ দুটো সবসময় বাঁধা থাকতো, তাই তিনি দেখতে পেতেন না। কিন্তু দ্রৌপদীর আর্তক্রন্দন শ্রবণ করে এবং অন্যান্যদের কাছে বিস্তৃত জানতে পেরে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন রাজসভায় কি হচ্ছে। তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তৎক্ষণাৎ ধৃতরাষ্ট্রের কাছে রাজসভায় ছুটে গেলেন এবং নিবেদন করলেন যে "আমি এখানে আপনার কাছে একটি অনুরোধ নিয়ে এসেছি।"

ধৃতরাষ্ট্র উত্তর প্রদান করলেন, "বেশ বলো। আমি তোমার অনুরোধ রক্ষা করব।"

গান্ধারী বললেন, "ওকে পরিত্যাগ করুন।"

"কাকে?" ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করলেন।

গান্ধারী বললেন, "দুর্যোধনকে।"

ধৃতরাষ্ট্র কখনই আশা করতে পারেন নি যে একজন মাতা স্বয়ং তার সন্তানকে ত্যাজ্য করার কথা বলতে পারে। ধৃতরাষ্ট্র কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে রইলেন। ধৃতরাষ্ট্রকে ইতস্ততঃ করতে দেখে গান্ধারী প্রশ্ন করলেন "আপনি একজন রাজা। আপনার কোন প্রজা যদি কোন নারীকে লাঞ্ছিত করে, আপনি তখন কি করবেন?"

"আমি তাকে নির্বাসিত করব।" ধৃতরাষ্ট্র উত্তর দিলেন।

গান্ধারী বললেন, "আপনার পুত্র সেটিই করেছে, আপনি তাকে নির্বাসিত করুন।"

কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র তা করলেন না। তিনি যুক্তি দেখালেন, "না, না, শেষপর্যন্ত তুমি যা ভাবছ, ঠিক সেরকমটি নয়।"

তখন গান্ধারী বললেন, "দেখুন, আমি মা। আমি আমার গর্ভে তাকে দীর্ঘদিন ধারণ করেছি। আমি তাকে আমার আপন স্তন দুগ্ধ পান করিয়েছি। যখন তার ছোট ছোট হাত দুটো আমাকে জড়িয়ে ধরতো, মাতৃস্নেহে, বাৎসল্য রসে আমার হৃদয় পূর্ণ হয়ে উঠতো। সেই আমি আপনাকে এই আবেদন করছি, কিন্তু আপনি তার এতটুকু প্রয়োজন অনুভব করছেন না?"

তবুও ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীর আবেদন প্রত্যাখ্যান করলেন। এই হলো একজন পারমার্থিকভাবে অন্ধ ব্যক্তির আচরণ। তার চিন্তা ভাবনা, ধারণা ও বুদ্ধির মধ্যে স্বচ্ছতার অভাব থাকে।

এইজন্যই 'মহাভারত' আমাদের জন্য অত্যন্ত চমৎকার এক দৃষ্টি উন্মীলন প্রদায়ী জ্ঞান ভাণ্ডার। প্রকৃতপক্ষে মহাভারত কখন কি করা উচিত আর কখন কি করা উচিত নয় সে বিষয়ে আমাদের বিস্তৃতভাবে বর্ণনা প্রদান করে। আর এইভাবে ধীরে ধীরে শেষপর্যন্ত মহাভারত আমাদের কৃষ্ণ-শরণাগতির দিকে নিয়ে আসে। আমরা যখন কৃষ্ণ-শরণাগত হই তখন তাতে লাভটি কি? এবং আমরা যখন কৃষ্ণবিরোধী হই তখন তার অসুবিধাটি কি?

কেউ কৃষ্ণবিরোধী হলে, তার অন্তিম ফলটি অত্যন্ত অশুভ হয়ে ওঠে। সে কতটা ধার্মিক বা মহৎ সেটা কোন ব্যাপার নয়। চূড়ান্ত বিবেচনাটি হলো, সে কৃষ্ণ-শরণাগত কি না। এই শিক্ষাটিই 'মহাভারত' ও 'ভগবদ্গীতা'র মতো অপূর্ব শাস্ত্রে প্রধান মণিরত্নের মতো স্থাপিত হয়েছে।

আমরা দেখতে পাই যে বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে উপদেশ প্রদান করলেও, ধৃতরাষ্ট্র তা শ্রবণ করতে ইচ্ছুক ছিলেন না। তিনি তার পুত্রের প্রতি আসক্তির দ্বারা এতটাই প্রভাবিত ছিলেন। কেন? সেটি ইতিহাসই প্রকাশ করছে। ধৃতরাষ্ট্র

ছিলেন অত্যন্ত দুর্ভাগা। তিনি ছিলেন চন্দ্র বংশের রাজ পরিবারের জ্যেষ্ঠ পুত্র। স্বাভাবিকভাবেই পরিবারের জ্যেষ্ঠ পুত্রের রাজা হওয়ার কথা, কিন্তু তিনি রাজা হতে পারছিলেন না কেননা তিনি ছিলেন জন্মান্ধ। কিন্তু তার আশা ছিল, ঠিক আশা নয়, বলা ভালো দৃঢ় প্রত্যয় ছিল যে তিনি রাজা হতে না পারলেও, তার পুত্রই রাজা হবে। এই প্রত্যাশা ও বিশ্বাসকেই তিনি মনে মনে লালন করে বেঁচে ছিলেন। কিন্তু সময়ান্তরে তাঁর পুত্রের জন্ম হবার আগেই পাণ্ডুর পুত্রের জন্ম হলো। ফলে ধৃতরাষ্ট্র পুনরায় আশাহত হলেন। যদিও পাণ্ডু ধৃতরাষ্ট্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, কিন্তু পাণ্ডুর পুত্রই আগে জন্ম নিল। তাই বৈদিক প্রথা অনুযায়ী রাজ পরিবারের জ্যেষ্ঠ পুত্রই যেহেতু রাজা হতে পারেন, সেই ঐতিহ্য বা নিয়ম অনুযায়ী পাণ্ডুর পুত্র যুধিষ্ঠির মহারাজই সিংহাসনের স্বাভাবিক উত্তরাধিকারী। আর এইটিই ছিল দুর্যোধনের ঈর্ষার অন্যতম কারণ। যেহেতু সে রাজা হতে পারবে না, তাই শিশুকাল হতেই ধৃতরাষ্ট্র পুত্র দুর্যোধন ছিল অত্যন্ত ঈর্ষান্বিত। কেবল তাই-ই নয়, পাণ্ডবগণ, বিশেষ করে ভীম, শক্তিতে ও অন্যান্য গুণাবলীতে দুর্যোধনের চেয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ ছিলেন। সকল পাণ্ডবগণই ছিলেন অত্যন্ত সুবিখ্যাত। সকলেই তাদের ভালোবাসত ও শ্রদ্ধা করতো। বিশেষ করে ভীষ্ম ও দ্রোণ। দুর্যোধন সেটা সহ্য করতে পারতেন না। কেননা এই দু'জনেই ছিলেন সেই সময়ে তার জীবনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। ভীষ্মদেব ছিলেন পিতামহ এবং দ্রোণাচার্য ছিলেন তার অস্ত্রশিক্ষা-গুরু। অর্জুন সবদিক থেকেই দুর্যোধনকে ছাপিয়ে গিয়েছিলেন। শক্তিতে ভীমও তাকে ছাপিয়ে গিয়েছিলেন। তাই দুর্যোধন অত্যন্ত ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠেছিলেন। অন্যথায় দুর্যোধনেরও অনেক গুণাবলী ছিল। তিনিও ছিলেন অত্যন্ত মহৎ। কিন্তু তার শত মহত্ত্ব, তার শত গুণাবলীকে নষ্ট করে দিয়েছিল তার এই একটিই মাত্র দোষ—ঈর্ষা।

আবার, দুর্যোধনকে কলির অবতার বলা হয়ে থাকে। কলি কে? কলি হলো ঈর্ষা ও ক্রোধের পুত্র। তাই প্রকৃতপক্ষে দুর্যোধন ছিলেন ঈর্ষা ও ক্রোধের এক মিশ্র উৎপাদন। দুর্যোধন তাই অত্যন্ত ঈর্ষান্বিত থাকতেন, বিশেষ করে পাণ্ডবদের ক্ষেত্রে। কিন্তু এটি ছাড়া দুর্যোধন অনেক ভালো গুণে গুণান্বিত ছিলেন। অত্যন্ত ভদ্র ও উদার বা দানশীল। আর সেইজন্যই এত অসংখ্য মানুষ তাদের জীবন উৎসর্গ করার জন্য দুর্যোধনের পক্ষে যোগদান করেছিল।

দ্রোণাচার্য যখন পাণ্ডব ও কৌরবদের সঙ্গে তাঁর পুত্র অশ্বত্থামার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন, দ্রোণাচার্য আশা করেছিলেন যে স্বাভাবিকভাবেই অশ্বত্থামা

পাণ্ডবদের প্রতি আকর্ষিত হবে। কিন্তু পরিবর্তে দুর্যোধনের সঙ্গে অশ্বত্থামার একটি সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। এতটাই গভীর ছিল সেই বন্ধুত্ব যে, দুর্যোধনের জন্য অনেক ঘৃণ্য কাজও সে করেছিল। এইসব ঘৃণ্য কাজগুলির মধ্যে জঘন্যতম ছিল নিদ্রিত ব্যক্তিদের হত্যা; বিশেষত দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্রকে। অশ্বত্থামা কেবলমাত্র দুর্যোধনকে সন্তুষ্ট করার জন্যই এইসব করেছিল। অশ্বত্থামার জীবনের ব্রত, তার অস্তিত্বের উদ্দেশ্যই যেন ছিল কেবলমাত্র দুর্যোধনকে সন্তুষ্ট করা।

ঠিক একইভাবে কর্ণের প্রতি দুর্যোধনের উদার মনোভাবের জন্য, কর্ণও দুর্যোধনের কাছে বিক্রিত হয়ে গিয়েছিল। অনেক বৎসর কুরু রাজপুত্রদের অস্ত্রশিক্ষা প্রদানের পর, কুরু রাজপুত্ররা অস্ত্রশিক্ষায় কতখানি দক্ষতা অর্জন করল তা প্রদর্শনের জন্য দ্রোণাচার্য এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। সেই অনুষ্ঠানে সহসা কর্ণ এসে উপস্থিত। অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্যের বিচক্ষণ চোখ কর্ণকে একবার দেখেই বুঝতে পারল, অত্যন্ত শক্তিশালী এবং অত্যন্ত প্রতিভাধর এই কর্ণ। দ্রোণাচার্য সমস্যা সন্দিগ্ধ হয়ে কর্ণকে তাই জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার পরিচয় কি? কি নাম তোমার?" কর্ণ স্বীকার করলেন তিনি নিম্ন জাতের। সূত পুত্র। তখন দ্রোণাচার্য তাকে বললেন, "তুমি রাজপুত্রদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবে না। তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য তোমাকে সমগোত্রীয় হতে হবে। কোন্ সাহসে এখানে এসে তুমি রাজপুত্রদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করছো?"

ঠিক সেই সময়ে দুর্যোধন ঘোষণা করলেন, "ঠিক আছে, আমি ওকে অঙ্গ রাজ্য দান করছি।" এইভাবে তখন কর্ণকে অঙ্গরাজ্য দান করে দুর্যোধন তাকে ক্ষত্রিয় স্তরে উন্নীত করলেন।

তাহলে আমরা দেখতে পারছি যে, দুর্যোধনের অনেক ভালো গুণ ছিল। ফলে কর্ণের মতো বহু মানুষ তার প্রতি পূর্ণরূপে কৃতজ্ঞ ছিল। তাই, কর্ণ একজন অত্যন্ত মহান ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও, দুর্যোধনের সন্তোষবিধানের জন্য অত্যন্ত অধঃপতিত স্তরে নেমে যেতেও দ্বিধা করেনি।

এইজন্য শ্রীল প্রভুপাদ আমাদের নির্দেশ প্রদান করেছেন যে আমরা কি ধরনের সঙ্গ করছি সে বিষয়ে আমরা যেন অত্যন্ত সতর্ক থাকি। সঙ্গ করার ব্যাপারে আমাদের খুবই সাবধান থাকতে হবে। আমরা যদি অসৎ সঙ্গে অবস্থান করি, আমরা যতই ভালো হই না কেন সেটা কোন ব্যাপার নয়, সেই অসৎ সঙ্গের প্রভাব আমাদের উপর পড়বে। সুতরাং 'সঙ্গ' ব্যাপারটি অতি গুরুত্বপূর্ণ।

দুর্যোধন এইভাবে কর্ণকে জয় করেছিল। কর্ণের আর কি কথা, এমনকি মাদ্রীর ভ্রাতা, পাণ্ডবদের মামা শল্যকেও সে জয় করেছিল। শল্য কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পাণ্ডব পক্ষেই যোগদান করতে এসেছিলেন। কিন্তু দুর্যোধনের ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে অবশেষে কৌরব পক্ষে যোগদান করেন।

যুদ্ধ করার ক্ষেত্রে কর্ণের একটি সমস্যা ছিল। সেটি হলো, কর্ণ যখন জানতে পারল যে কৃষ্ণ হবেন অর্জুনের রথের সারথি, কর্ণ দুর্যোধনকে বললো, "দেখো, দুর্যোধন, কৃষ্ণের মতো একজন সারথি যদি অর্জুনের থাকে, তাহলে আমি তার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে সমর্থ হব না।" দুর্যোধন জিজ্ঞাসা করল, "তাহলে কে তোমার রথের সারথি হতে পারে?" কর্ণ বললো, "সবচেয়ে দক্ষ সারথি হচ্ছে মদ্ররাজ শল্য, কিন্তু সে পাণ্ডবদের মাতুল। তাকে কি করে পাওয়া যাবে?" এই কথা শুনে দুর্যোধন শল্যের সঙ্গে সাক্ষাতের আয়োজন করলেন। শল্য আগমন করলে পর, দুর্যোধন তার সঙ্গে এমন সুন্দর ব্যবহার করলেন যে তার সুহৃদরূপে শল্য দুর্যোধনের পক্ষে যোগদান করতে বাধ্য হলেন তার আপন ভাগ্নে পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য।

তো এইজন্য দুর্যোধনকে কেউ কেউ অত্যন্ত সুকৌশলি পরিকল্পক বলে অভিহিত করে থাকে। তার প্রতিটি আচরণ ও কাজের পেছনে কোন লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য অবশ্যই কাজ করতো, কিন্তু তবুও দুর্যোধন এমন উপায়ে সেইসব কাজ করতো যে সকলেই তাকে অত্যন্ত ভদ্র, সুন্দর ব্যক্তিত্ব বলে স্বীকার করতে বাধ্য হতো। তার ফলে অনেক মানুষ দুর্যোধনের পক্ষে যোগদান করেছিল। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ আয়োজিত হলে, পাণ্ডবগণের পক্ষে ছিল সাত অক্ষৌহিনী সেনা, কিন্তু কৌরব পক্ষে ছিল এগারো অক্ষৌহিনী সেনা। পাণ্ডবদের পক্ষে যারা ছিলেন তারা সকলেই ছিলেন রক্তের সম্পর্কে পাণ্ডবদের আত্মীয়, যেমন, দ্রুপদ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট ও অন্যান্যরা। কিন্তু কৌরব পক্ষে আত্মীয় স্বজন ছাড়াও এমন অসংখ্য মানুষ ছিল যারা কেবল দুর্যোধনের ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে যোগদান করেছিল। এইভাবে আমরা দেখতে পারি যে দুর্যোধনের অনেক ভালো গুণ থাকা সত্ত্বেও, কেবলমাত্র একটি জিনিস, তার ঈর্ষা দোষের জন্য শেষ পর্যন্ত দুর্যোধন ছিল এক মূর্তিমান অশুভ।

ঈর্ষা ক্রোধ আনয়ন করে। অতএব এই দুটির প্রভাবকে পরাস্ত করার জন্য আমাদের অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে। কেবলমাত্র পারমার্থিক অগ্রগতি সাধনের জন্যই নয়, এমনকি আমাদের যথার্থ জীবনযাপনেও। আর এই উদ্দেশ্যেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আগমন করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে শ্রীচৈতন্য

মহাপ্রভু এই জগতে অবতরণ করেছিলেন কলির প্রভাবকে প্রতিহত করার জন্য। কলির প্রভাবের ফল হচ্ছে কলহ, যা ঈর্ষা ও ক্রোধ থেকে উৎপন্ন হয়। তাই কলির আরেকটি নাম হচ্ছে মূর্তিমান কলহ।

"করালবদন ক্রূরঃ কলিশ্চ কলহ।" কলিকে অত্যন্ত বীভৎস দর্শন, অত্যন্ত দুর্নীতিপরায়ণ ও নৃশংস রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। সে অত্যন্ত অসৎ এবং সর্বদা কলহ উৎপন্ন করছে। কলহ সৃষ্টি করে, কলহের মাধ্যমে সকলকে বিভক্ত করে সে তার প্রভাব বিস্তার করে।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আমাদের সকলকে ভগবৎ-প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ করে, ঐক্যবদ্ধ করে কলির প্রভাব প্রতিহত করার জন্য অবতরণ করেছিলেন। পারস্পরিক ঈর্ষা বা ঘৃণার থেকে কলহের উৎপত্তি হয়। এখন আমরা কিভাবে ঈর্ষা বা ঘৃণাকে প্রতিরোধ করব? প্রেমের মাধ্যমে। প্রেম কি? সে সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে বর্ণনা করা হয়েছে "কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছা ধরে 'প্রেম' নাম।" পরমেশ্বর ভগবান কৃষ্ণের প্রীতি বা সন্তোষবিধানের চেষ্টাই হচ্ছে প্রেম। তাই সেই ভগবৎ-প্রেমের মাধ্যমে, ভগবানের শরণাগত হওয়ার মাধ্যমে, আমরা আমাদের জীবনে কলির প্রভাবকে প্রতিহত করতে পারব। ঈর্ষা ও ক্রোধ কলহের সৃষ্টি করে। আমরা কিভাবে ঈর্ষা ও ক্রোধকে দমন করব? নম্র বা বিনীত এবং সহ্যশীল হওয়ার মাধ্যমে। যারা ভগবৎ-বিজ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করেছেন তাঁরাই যথার্থ নম্র বা বিনীত এবং সহ্যশক্তিসম্পন্ন হন। কখনও কখনও আমরা ক্রুদ্ধ হওয়ার কারণ দেখাই। বিশেষ করে যদি কখনও কেউ আমার ভুলটি কোথায় তা দেখিয়ে দেবার বা তা সংশোধন করানোর চেষ্টা করেন, আমরা তৎক্ষণাৎ রেগে গিয়ে তাকে প্রশ্ন করি "আমার ভুল সংশোধন করার আপনি কে?" কিন্তু আমরা যদি রেগে না গিয়ে বিনীতভাবে ভাবি "হয়তো আমিই ভুল ছিলাম, তিনিই ঠিক", তাহলে আর ঝগড়ার বা কলহের সৃষ্টি হয় না।

আমরা ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠি। কেন আমরা ঈর্ষান্বিত হই? কিভাবে একজন আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ হয়ে উঠছে, তা দেখে আমরা ঈর্ষান্বিত হই। অন্যেরা উন্নতি করছে, তাদের সবাই প্রশংসা করছে, তারা এত যোগ্য হয়ে উঠেছে--এসব দেখে আমরা ঈর্ষান্বিত হই। "কেন আমি নই?" এই ভেবে আমরা যন্ত্রণাকাতর হই। "কেন তারা দেখছে না যে আমিও কতটা শ্রেষ্ঠ?"

ধৈর্য ধরুন। সঠিক সময়ে কৃষ্ণ আপনারও মহিমা কীর্তন করবেন। আজ হোক অথবা কাল। সকলেরই পূর্ণতার সময় বা তুঙ্গী অবস্থা আসবে।

আমাদের শুধু বিনম্র ও সহ্যের মনোভাব নিয়ে ভাবতে হবে যে যেহেতু সমস্ত কিছুই কৃষ্ণের ইচ্ছায় পরিচালিত হচ্ছে, তাই সবকিছু ঠিকই আছে। এই ধরনের কৃষ্ণভাবনামৃত থেকে এক অদ্ভুত শক্তি উৎপন্ন হয় যা আমাদের কলির প্রভাব থেকে দূরে রাখে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেই শিক্ষাই প্রদর্শন করে গেছেন। মহাভারতেরও সেটিই শিক্ষা।

•

ভগবানের নামের বিশেষত্বটি কোথায়?

বৈদিক হিসাব অনুযায়ী মহাকালের সীমার পরিমাপ করা হয়েছে যুগসমূহের মাধ্যমে। বেদে চারটি যুগের বর্ণনা করা হয়েছে—সত্য যুগ, ত্রেতা যুগ, দ্বাপর যুগ এবং কলি যুগ—আর এই সকল যুগেরা ঋতু আবর্তনের মতো বারবার আবর্তিত হতে থাকে। সত্য যুগের সময়সীমা ১৭,২৮০০০ বৎসর, ত্রেতা যুগের সময়সীমা ১২,৯৬০০০ বৎসর, দ্বাপর যুগের সময়সীমা ৮,৬৪০০০ বৎসর এবং কলিযুগের সময়সীমা ৪,৩২০০০ বৎসর।

সত্যযুগের মানুষেরা অত্যন্ত পুণ্যবান বা পবিত্র। তারা কখনও কোন পাপকর্ম করেন না বলা চলে। ত্রেতা যুগের মানুষদের মধ্যে পাপময় জীবনের প্রতি আগ্রহ দেখা দেয় এবং দ্বাপর যুগে তারা আরও বেশী পাপপ্রবণ হয়ে পড়ে। অবশেষে কলি যুগে ভগবৎ-ভক্তিহীনতা প্রায় সম্পূর্ণরূপে আধিপত্য বিস্তার করে। যুগ সমূহকে ঋতুদের সঙ্গে তুলনা করলে এই কলিযুগটি হচ্ছে শীতকালের মতো।

বৈদিক শাস্ত্রে যুগ চতুষ্টয়ের প্রত্যেকটির জন্য নির্দিষ্ট ধরনের ধর্মীয় পন্থা নির্দেশ করা হয়েছে। সত্য যুগের পন্থাটি হচ্ছে ভগবানের রূপে ধ্যান, ত্রেতা যুগের পন্থাটি হল ভগবানের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ নিবেদন, দ্বাপর যুগের পন্থাটি হল মন্দিরে ভগবানের শ্রীবিগ্রহের অর্চনা এবং কলিযুগের পন্থাটি হচ্ছে ভগবানের পবিত্র নামের কীর্তন। ভগবান এতই করুণাময় যে, যেহেতু পাপময় জীবন ক্রমবর্দ্ধিত হওয়ার প্রতিটি যুগেই মানুষের গুণ ক্রমহ্রাসমান, তিনি তাই প্রতিটি পরবর্তী যুগ-পন্থাকে ক্রমসহজতর করেছেন।

এখন এই কলিযুগটি হচ্ছে চারটি যুগের মধ্যে সবচেয়ে অধঃপতিত যুগ। আমাদের জীবনেই আমরা দেখতে পাচ্ছি মানুষ দিনকে দিন কিভাবে আরও পাপকর্মে রত হয়ে পড়ছে। মাংসাহার, জুয়া, মাদকদ্রব্য গ্রহণ এবং অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ—পাপের এই চারটি স্তম্ভই, চতুর্দিকে ক্রমাগত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে। আমরা দেখতে পারছি যে এই সমস্ত কার্যকলাপগুলি যত বৃদ্ধি পাচ্ছে এই জগতও ততই দুঃখময় হয়ে উঠছে। আর দুঃখ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য সকল শাস্ত্রই কৃষ্ণের পবিত্র নাম কীর্তনের নির্দেশ প্রদান করেছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে যে এই যুগে ভগবানের নাম কীর্তনই একমাত্র কর্তব্য। প্রভু যীশু বলছেন "আমাদের পিতার নাম কীর্তিত হোক।" একইভাবে মহম্মদ বলেছেন "আমাদের একমাত্র আল্লার মহিমাই বর্ণনা করা উচিত।" পৃথিবীর সমস্ত মহান ধর্মে এই নির্দেশ বারবার করে প্রদান করা হয়েছে।

এখন প্রশ্ন উঠে যে, "ভগবানের নামের বিশেষত্বটি কোথায়?" আমাদের শারিরীক পরিচয়ের স্বার্থে প্রদত্ত জড় শব্দ বিশিষ্ট কোন নামের মতো ভগবানের নামটি নয়। এ ধরনের পরিচয়ত্বের ভগবানের কোন প্রয়োজন নেই। তাঁর কোন জড় শারীরিক পরিচয় নেই। কেননা তিনি সম্পূর্ণরূপে চিন্ময়। কিন্তু তাঁর দিব্য অসীম গুণাবলী ও লীলা অনুসারে তাঁর অসংখ্য নাম রয়েছে।

উদাহরণ স্বরূপ বাইবেলে তাঁর যে নাম রয়েছে সেখানের তাঁকে "Almighty" অর্থাৎ পরমেশ্বর এবং "Omnipotent" অর্থাৎ সর্বশক্তিমান রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। তেমনিভাবে সংস্কৃতে, বৈদিক শাস্ত্রসমূহে তাঁর অসংখ্য নাম রয়েছে। কৃষ্ণ নামটির অর্থ হচ্ছে "সর্বাকর্ষক"। রাম শব্দটির অর্থ হচ্ছে "পরম আনন্দ প্রদাতা"।

যেহেতু ভগবানের কোন জড় গুণাবলী নেই তাই তাঁর নামও কোন জড় শব্দ নয়। এটি চিন্ময় এবং তাঁর থেকে অভিন্ন। আর যেহেতু ভগবান হচ্ছেন পরম, তাই তাঁর নামটিও হচ্ছে পরম। যখন কেউ তাঁর নাম কীর্তন করে তখন সে সরাসরিভাবে তাঁর সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করে। আমাদের জড় কলুষময় চেতনার জন্য, আমরা যখন কীর্তন করি তখন তাঁর উপস্থিতি হৃদয়ঙ্গম করতে পারি না।

কিন্তু যেহেতু তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, তাই তাঁর নাম গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে প্রার্থনার পন্থাটি হচ্ছে অত্যন্ত নিজজন সুলভ ও গভীর একটি প্রার্থনা। আমরা যদি ঐকান্তিকভাবে ভগবানের নাম জপ বা কীর্তন অনুশীলন করি তবে অচিরেই আমরা তাঁর উপস্থিতি হৃদয়ঙ্গম করতে পারব।

বৈদিক সাহিত্যে ভগবানের উদ্দেশে অনেক মন্ত্র ও প্রার্থনা রয়েছে কিন্তু মহা-মন্ত্র বা পরম প্রার্থনা রয়েছে এই একটিই। সেই মন্ত্র বা প্রার্থনাটি হচ্ছে—হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে/হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে—যা ভগবানের পরম গরিমাময় রূপ সমূহের উদ্দেশে এক সম্বোধন। কৃষ্ণ রূপে ভগবান হচ্ছেন সর্বাকর্ষক ব্যক্তিত্ব এবং রাম রূপে তিনি পরম আনন্দ প্রদাতা। এর অর্থটি হল "হে সর্বাকর্ষক পরমেশ্বর ভগবান, হে পরম ভোক্তা, দয়া করে আমাকে এই জড় অস্তিত্ব থেকে উদ্ধার কর। দয়া করে তোমার প্রেমময়ী ভক্তিতে আমাকে নিযুক্ত কর।"

আমাদের আকাঙ্ক্ষাসমূহ পূর্ণ করার জন্য ভগবানের কাছে আবেদন করার নামই প্রার্থনা। জাগতিক চেতনায় আমরা প্রার্থনা করি, "হে ভগবান, আমাকে খাদ্য দাও, হে ভগবান, আমাকে অর্থ দাও।" কিন্তু পারমার্থিক জীবনে কেউ নিজের জন্য এটা সেটা চাওয়ার পরিবর্তে, তার নিজের যা কিছু আছে সে ভগবানকে তা নিবেদন করতে চায়। সে ভগবানের সেবা করতে চায়। আর সে জন্যই হরেকৃষ্ণ মন্ত্রটি হচ্ছে সর্বোত্তম প্রার্থনা। এটি কখনই ভগবানের কাছে কোন স্বার্থযুক্ত দাবী জানায় না। এটি তাঁর ভক্তিপূর্ণ সেবায় নিযুক্তির জন্য তাঁর কাছে এক আবেদন মাত্র।

এই পবিত্র নাম কীর্তনের শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশে কৃষ্ণ এই যুগে এক অদ্ভূত রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। যদিও তিনি হচ্ছেন পরম অধীশ্বর, পরম ভোক্তা, সমস্ত ঐশ্বর্যসমূহের মালিক, কিন্তু এই যুগে তিনি এক ভিক্ষাজীবী সন্ন্যাসী—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন, সমস্ত ভারতবর্ষ পর্যটন করেছিলেন আর জ্ঞানীব্যক্তি, রাজা, ভিখারী সকলকেই দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে মহা-মন্ত্র কীর্তন করার কথা বলেছিলেন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যে ভগবান এটি কোন আবেগের বশে কথা বলা নয়। অথবা এমন নয় যে আমি তাঁর অনুগামী বলে আমি এই দাবী করছি। না। শ্রীমদ্ভাগবত, মহাভারত এবং অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থে তাঁর পরিচয় বর্ণনা করে বিস্তারিতভাবে তাঁর আবির্ভাবের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। শাস্ত্রে বর্ণিত হয়েছে যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবতরণ যুগধর্ম প্রবর্তনের জন্য। তাঁর প্রকটকালে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভবিষ্যতবাণী করেছিলেন যে ভগবানের নাম কীর্তনের এই সংকীর্তন আন্দোলন একদিন জগৎজুড়ে বিস্তারলাভ করবে। আর আজ সেটি সত্য হয়েছে। সমস্ত সাম্প্রদায়িক ধারণাগুলি এড়িয়ে গিয়ে যদি কেউ শ্রীচৈতন্য

মহাপ্রভুর প্রকৃত পরিচয় অবগত হওয়ার চেষ্টা করে, তাহলে সে সহজেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে যে তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যে ভারতে আবির্ভূত হয়েছিলেন সেটা কোন ব্যাপার নয়। ভগবান কোন ভৌগোলিক অবস্থানে সীমাবদ্ধ নন। তিনি সকলকে তাঁর কৃপা প্রদানের উদ্দেশে অবতরণ করেন। ভগবান যেখানেই আবির্ভূত হোন না কেন ঐকান্তিক ভক্ত ভগবানের অনুগমন করে থাকেন। ভক্তগণ হৃদয়ঙ্গম করেন যে প্রকৃতপক্ষে ভগবান বা তাঁর প্রতিনিধি দিব্য জগৎ থেকে আগমন করেন এবং তাঁরা কোন নির্দিষ্ট ভৌগোলিক ভূখণ্ডের সাধারণ জড় ব্যক্তি নন। এই পৃথিবীর যেখানেই এই ধরনের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব আবির্ভূত হোন না কেন সেই স্থানটি চিন্ময় জগতের বর্ধিত অংশ হয়ে যায়।

তবুও, পরমেশ্বর ভগবান একজন "ভারতীয়" বলে তাঁকে স্বীকার করায় যদি কারোর অসুবিধা থাকে, তো ঠিক আছে। আমাদের কথাতে কারুরই তাঁকে অন্ধভাবে স্বীকার করা উচিত নয়। কিন্তু অন্তত পক্ষে একবার তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবন ও শিক্ষা বিষয়ে অধ্যয়ন করতে পারেন এবং দেখতে পারেন যে সেটি তাঁর পারমার্থিক জীবনের জন্য কল্যাণকর কি না। সেটিই হল একটি বাস্তব পরীক্ষা।

আমরা যদি হৃদয়ঙ্গম করতে পারি যে ভগবানই হচ্ছেন আমাদের আদি ও পরম পিতা তাহলে এটি উপলব্ধি করা মোটেও কঠিন হবে না যে তিনি আমাদের তাঁর কাছে ফিরিয়ে নিতে চান। এমনকি তিনি যে আমাদের ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য বিভিন্ন আয়োজন করে রেখেছেন সেটি বুঝতে পারাও কঠিন হবে না। এই অধঃপতিত কলিযুগে যখন আমাদের পারমার্থিক দৃষ্টির সকল স্বচ্ছতাই হারিয়ে গেছে তখন তাঁর পবিত্র নামই হচ্ছে তাঁর কাছে আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার তাঁর কৃপাময় আয়োজন।

ভগবানের পবিত্র নাম জপ বা কীর্তন করার মাধ্যমে ভগবানের রূপ, ধাম, গুণসমূহ, কার্যকলাপ এবং পার্ষদগণকে হৃদয়ঙ্গম করা যায়। পারমার্থিক জ্ঞানে স্থিরতা প্রাপ্ত হয়ে কেউ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে যে সমস্তকিছুই হচ্ছে ভগবানের আর তাই সে পূর্ণরূপে তাঁর ভক্তিপূর্ণ সেবায় যুক্ত হয়। সেই উপলব্ধিই হচ্ছে সকল যুগের ধর্মের পূর্ণতা।

রায় রামানন্দ সংবাদ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা সমুদ্র থেকেও গম্ভীর। তাই তা সাধারণ মানুষের বোধগম্য নয়। মহাপ্রভু যদিও আদর্শ শিক্ষকরূপে নিজের আচরণের মাধ্যমে জীবকে শিক্ষা দিয়েছেন, তবুও তাঁর শিক্ষা আরও সহজ-সরল রূপে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদদের মাধ্যমে। আর তাঁর সমস্ত পার্ষদদের মধ্যে শ্রীল রামানন্দ রায় ছিলেন তাঁর অতি অন্তরঙ্গ। তাঁর মাধ্যমে তিনি তাঁর শিক্ষার নিগূঢ়তম তত্ত্ব প্রকাশ করে গেছেন। তাঁর কৃপার প্রভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রকৃত স্বরূপ সকলের কাছে প্রকাশিত হয়েছে।

সন্ন্যাস গ্রহণের পর শ্রীচৈতন্য মহপ্রভু যখন দক্ষিণ-ভারতে ভ্রমণ করেছিলেন, তখন গোদাবরী নদীর তীরে শ্রীরামানন্দ রায়ের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। দাক্ষিণাত্যের রাজ্যপাল রামানন্দ রায় এসেছিলেন পুণ্যতোয়া গোদাবরীতে স্নান করতে। সঙ্গে তাঁর অনেক লোকজন। বৈদিক বিধি অনুসারে স্নান-তর্পণ করে নদী থেকে উঠে এসে তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দর্শন করলেন—তিনি দেখলেন এক অপূর্ব সুন্দর সন্ন্যাসী। তাঁর অঙ্গকান্তি শত-সহস্র সূর্যের মতো উজ্জ্বল, পরণে অরুণ-বসন, সুবলিত প্রকাণ্ড দেহ, নয়ন-যুগল পদ্মফুলের মতো আয়ত। এক অপ্রাকৃত আনন্দে তাঁর হৃদয় ভরে উঠেছিল। তিনি তাঁকে দণ্ডবৎ প্রণতি নিবেদন করলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও চিনতে পেরেছিলেন তাঁর নিত্য সহচরকে।

পূর্বলীলায় যাঁরা ছিলেন তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন, ব্রজের সখা অর্জুন, বিশাখা ও ললিতা, তাঁরা এখন একত্রে শ্রীরামানন্দ রায়রূপে আবির্ভূত হয়েছেন। আনন্দে উদ্বেলিত হৃদয়ে মহাপ্রভু রামানন্দ রায়কে আলিঙ্গন করলেন। প্রেমাবেশে প্রভু ও ভৃত্য অচেতন হয়ে ভূমিতে পড়লেন। তাঁদের দুজনেরই দেহে রোমাঞ্চ, কম্প, অশ্রু, স্বেদ, পুলক, বিবর্ণ, আদি প্রেম বিকার প্রকাশিত হল, মুখে "কৃষ্ণ" নাম গদ্‌গদ স্বরে উচ্চারিত হতে লাগল। উপস্থিত সকলে অবাক হয়ে ভাবতে লাগলেন, কেন এই অপূর্ব সন্ন্যাসী এইভাবে একজন রাজপুরুষকে আলিঙ্গন করে প্রেমে অচেতন হয়েছেন, আর এই পণ্ডিত, গম্ভীর রাজপুরুষই বা কেন এইভাবে একজন সন্ন্যাসীর স্পর্শে প্রেমোন্মত্ত হয়েছেন। বহু লোকের সামনে তাঁরা আর সে দিন তাঁদের অন্তরের নিগূঢ় ভাব ব্যক্ত করলেন না।

সেদিন সন্ধ্যায় গোদাবরীর তীরে নির্জনে আবার তাঁদের সাক্ষাৎ হল। কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গণে শ্রীকৃষ্ণ শিক্ষকরূপে, গুরুরূপে অর্জুনকে বৈদিক তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা দিয়েছিলেন। গোদাবরীর তটে সেই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে রামানন্দরায়রূপী অর্জুনকে যেন প্রতীক্ষা করার ছলে প্রশ্ন করতে লাগলেন। মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করলেন—"রামানন্দ সাধ্যতত্ত্ব নির্ণয় করে শাস্ত্র থেকে কোন শ্লোক শোনাও।"

রামানন্দ রায় বললেন—"স্বধর্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হয়।" তিনি বিষ্ণুপুরাণ থেকে উল্লেখ করলেন—

বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যত্তত্তোষকারণম্ ॥

অর্থাৎ, পরমেশ্বর বিষ্ণু বর্ণধর্ম ও আশ্রমধর্মের আচার পরায়ণ মানুষদের দ্বারা আরাধিত হন। বর্ণাশ্রম আচার ব্যতীত তাঁকে সন্তুষ্ট করার আর কোন উপায় নেই।

ভগবানকে পরিতুষ্ট করাই সাধ্যতত্ত্ব। মানুষ তার স্বভাব অনুসারে নির্ণিত বর্ণধর্ম এবং অবস্থা অনুসারে নির্মিত আশ্রমধর্ম পালন করলেই ভগবান সন্তুষ্ট হন। মানুষের জন্ম, সংসর্গ ও শিক্ষা থেকে স্বভাবের উদয় হয়। স্বভাব অনুসারে বর্ণ স্বীকার না করলে কেউই যথাযথভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে পারে না। স্বভাব মূলত চার প্রকার—(১) ঈশ্বর ও বিদ্যাই যাঁদের স্বভাবগত বিষয়, তাঁরা--'ব্রাহ্মণ'; (২) শৌর্য ও রাজ্যশাসনই যাঁদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, তারা--'ক্ষত্রিয়'; (৩) কৃষি, পশুপালন ও বাণিজ্য যাঁদের স্বভাবগত কর্ম, তারা 'বৈশ্য' (৪) তিনটি বর্ণের সেবা করাই যাঁদের স্বভাব, তারা—'শূদ্র'। স্ব স্ব বর্ণধর্মে এবং অবস্থাক্রমে আশ্রমধর্মে ভগবানের আরাধনা করতে করতে মানুষের পারমার্থিক উন্নতি হয়। তাই ধর্ম-জীবনই মানুষের সমস্ত উৎকর্ষের মূল।

কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, "এহো বাহ্য, আগে কহ আর" অর্থাৎ, এটি বাহ্য বিচার, আমার প্রশ্নের উত্তর এই বিচার অতিক্রম করে আরও উর্ধ্বে যা আছে, তা বল। রামানন্দ রায় তখন বললেন—"কৃষ্ণে কর্মার্পণ" সর্বসাধ্য সার। এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় সে সম্পর্কে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপদেশের উদ্ধৃতি দিলেন—

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥

অর্থাৎ, হে কৌন্তেয়, তুমি যা কর, যা খাও, যা হোম কর, যা দান কর এবং যে তপস্যাই কর, সে সবই আমাকে অর্পণ কর।

কিন্তু এবারও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন—"এহো বাহ্য আগে কহ আর।"

তার উত্তরে রামানন্দ রায় বললেন,—"স্বধর্ম ত্যাগই সাধ্যসার", এবং সে সম্পর্কে শাস্ত্র প্রমাণ প্রদর্শন করে বললেন—

"সর্ব ধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥"

অর্থাৎ, সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল আমার শরণাগত হও, তা হলে আমি সমস্ত পাপ থেকে তোমাকে মুক্ত করব। তুমি শোক করো না।

কিন্তু এবারও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, "এহো বাহ্য, আগে কহ আর।"

রামানন্দ রায় বললেন—"জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি—সাধ্যসার" এবং ভগবদ্গীতার শ্লোকের উদ্ধৃতি দিলেন, ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি—অর্থাৎ, অভেদ ব্রহ্মবাদরূপ জ্ঞান-চর্চার দ্বারা আত্মা যখন প্রসন্ন হয়, তখন মানুষ সম্পূর্ণরূপে শোক ও বাসনা রহিত হয়, তারপর সে আমার পরাভক্তি প্রাপ্ত হয়।

এইভাবে রামানন্দ রায় প্রতিপন্ন করলেন যে কর্মমিশ্রা ভক্তির থেকে জ্ঞান-মিশ্রা ভক্তি শ্রেয়। কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিকেও সাধ্যসার বলে মেনে নিতে পারলেন না। তিনি বললেন, "এহো বাহ্য, আগে কহ আর।"

রামানন্দ রায় এবার বললেন, "জ্ঞানশূন্যা ভক্তি—সাধ্যসার।" এবং তার প্রমাণ স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত থেকে উদ্ধৃতি দিলেন—

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভির্
যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্ ॥
(শ্রীমদ্ভাগবত ১০/১৪/৩)

মহাপ্রভু এবার বললেন, "এহো হয়, আগে কহ আর।" মহাপ্রভু স্বীকার করলেন,—এখন সাধ্য নির্ণীত হল বটে, কিন্তু আরও উর্ধ্বে যা আছে বল।

এর তাৎপর্য এই যে বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন থেকে কেবল কর্মার্পণ শ্রেষ্ঠ; কর্মার্পণ থেকে স্বধর্ম ত্যাগ অর্থাৎ স্বীয় বর্ণ পরিত্যাগ করে সন্ন্যাসগ্রহণ শ্রেষ্ঠ। তার থেকে ব্রহ্মানুশীলনরূপ জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি শ্রেষ্ঠ হলেও, সে সবই বাহ্য, কেন না সাধ্যবস্তু যে শুদ্ধভক্তি, তা এই চার প্রকার সিদ্ধান্তে নেই। "আরোপসিদ্ধান্ত" ও "সঙ্গসিদ্ধা" ভক্তি কখনই শুদ্ধভক্তি বলে পরিচিত হয় না। "স্বরূপসিদ্ধা

ভক্তি" একটি সম্পূর্ণ পৃথক্ তত্ত্ব; তা কর্মার্পণ, কর্মত্যাগরূপ সন্ন্যাস ও জ্ঞান-মিশ্রা ভক্তি থেকে নিত্য পৃথক্। সেই শুদ্ধভক্তির লক্ষণ এই যে, তা অন্যাভিলাষিতা শূন্য, জ্ঞান-কর্মাদির দ্বারা অনাবৃত, এবং অনুকূলভাবে কৃষ্ণানুশীলনীয়। এটিই সাধ্যবস্তু; কেন না সাধ্য-অবস্থায় তা দেখা গেলেও সিদ্ধ অবস্থায় তা সম্পূর্ণ নির্মলভাবে প্রকটিত হয়।

রামানন্দ রায় তখন শান্ত রসাশ্রিত প্রেমভক্তির থেকেও উন্নত স্তরের দাস্যভক্তির কথা বললেন, "দাস্য-প্রেম সর্ব-সাধ্যসার।"

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সে কথা স্বীকার করলেন কিন্তু তা সত্ত্বেও বললেন, "এহো হয়, কিছু আগে আর।"

রামানন্দ রায় বললেন, "সখ্য-প্রেম—সর্ব-সাধ্যসার।"

মহাপ্রভু বললেন, "এহো উত্তম, আগে কহ আর।"

রামানন্দ রায় বললেন, "বাৎসল্য-প্রেম—সর্ব-সাধ্যসার।"

মহাপ্রভু বললেন, "এহো উত্তম, আগে কহ আর।"

রামানন্দ রায় তখন বললেন, "কান্তভাব প্রেম-সাধ্যসার। কৃষ্ণপ্রাপ্তির বহুবিধ উপায় আছে, এবং কৃষ্ণপ্রাপ্তির তারতম্যও বহু প্রকার রয়েছে, কিন্তু যাঁর যেই রস, তাঁর কাছে সেটিই সর্বোত্তম, কিন্তু তটস্থভাবে বিচার করলে তাদের মধ্যে তারতম্য আছে।"

রসের তারতম্য বোঝাবার জন্য তিনি একটি প্রাকৃত উদাহরণ দিলেন—আকাশ, বায়ু, আগুন, জল ও মাটি এই পঞ্চ মহাভূতে যেমন ক্রমশ গুণের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ, আকাশে কেবল শব্দগুণ, বায়ুতে শব্দ ও স্পর্শ, অগ্নিতে শব্দ, স্পর্শ ও রূপ, জলে শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস, এবং মাটিতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ। তেমনই শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসে ক্রমশ গুণ বৃদ্ধি হয়ে মধুর রসে পাঁচটি গুণই পরিপূর্ণরূপে প্রকাশ পায়। অতএব পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি "মধুর" বা "শৃঙ্গার" রসরূপ প্রেমেই পাওয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত হয়েছে যে মধুর রসোৎফুল্ল-প্রেমে কৃষ্ণ নিতান্ত বশ হন। শান্তরসে কৃষ্ণৈকনিষ্ঠতারূপ গুণটি দাস্যরসে মমতা যুক্ত হয়ে অধিক সমৃদ্ধ; আবার সখ্যরসে কৃষ্ণৈকনিষ্ঠতা ও মমতা বিশ্রম্ভের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অধিকতর প্রফুল্ল হয়েছে; বাৎসল্য রসে শান্ত-দাস্য-সখ্য রসের গুণ তিনটি স্নেহাধিক্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রতীয়মান হয়। কান্তভাবরূপে মধুর রসে ঐ চারটি গুণ সঙ্কোচশূন্য হয়ে অত্যন্ত মাধুরী লাভ করে। এইভাবে গুণাধিক্যের ফলে স্বাদাধিক্য বৃদ্ধি হয়। সুতরাং তটস্থ বিচারে মধুর রস সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

কৃষ্ণ যদিও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, যে যেভাবে তাঁকে ভজনা করবেন, তিনিও তাঁকে সেইভাবে ভজনা করবেন। কিন্তু এই প্রেমের অনুরূপ ভজনা শ্রীকৃষ্ণ করতে পারেন না। তিনি সেই ভক্তের কাছে তাই ঋণী হয়ে থাকেন।

মহাপ্রভু বললেন, "মধুর রসে এই কৃষ্ণপ্রেম অবশ্যই সাধ্যের চরম সীমা। কিন্তু এরও আগে যদি কিছু থাকে তা হলে কৃপা করে আমাকে বল।"

রামানন্দ রায় বললেন, "এরও আগে আর কিছু আছে কি না সে প্রশ্ন করতে পারে এমন কেউ এই জগতে আছে বলে আমি জানতাম না। মধুর রসাশ্রিত সমস্ত প্রেমিকাদের মধ্যে শ্রীমতী রাধারাণীর প্রেম সর্বশ্রেষ্ঠ। রাসলীলায় শ্রীকৃষ্ণ শতকোটি গোপীদের সঙ্গে নৃত্য করছিলেন। সেখানে তিনি নিজেকে অসংখ্য মূর্তিতে প্রকাশ করে দুজন গোপীর মধ্যে এক কৃষ্ণরূপে নৃত্য করছিলেন, কিন্তু মাঝখানে তিনি একা শ্রীমতী রাধারাণীর সঙ্গে নাচছিলেন। তারপর যখন অভিমান করে শ্রীমতী রাধারাণী রাসমণ্ডলী ছেড়ে চলে গেলেন তখন সেই শতকোটি ব্রজগোপীদের ছেড়ে রাধার অন্বেষণে বিলাপ করতে করতে বনে বনে তাঁকে খুঁজতে লাগলেন। অতএব শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীমতী রাধারাণীর প্রেমই সর্বশ্রেষ্ঠ।

এইভাবে শ্রীল রামানন্দ রায়ের মাধ্যমে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভগবদ্ভক্তির পরম উৎকর্ষতা প্রদর্শন করে শ্রীমতী রাধারাণীকে সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত বলে প্রমাণ করলেন।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের প্রকাশ

শ্রীজগন্নাথদেব, সুভদ্রাদেবী এবং বলদেবের রথযাত্রা মহোৎসব প্রতি বছর জগন্নাথপুরীতে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। জগন্নাথপুরীতে জগন্নাথদেব ভারতবর্ষের অতি প্রাচীন একটি মন্দিরে উপাসিত হন। জগন্নাথদেবের আবির্ভাবের চমকপ্রদ কাহিনী বৈদিক শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ হয়েছে। শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন নামে সূর্যবংশীয় এক পরম বিষ্ণুভক্ত রাজা মালবদেশের অবন্তী নগরীতে রাজত্ব করতেন। তিনি ভগবানের সাক্ষাৎ লাভ করবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হয়েছিলেন। ভগবানের প্রেরিত কোন এক বৈষ্ণব তখন শ্রীইন্দ্রদ্যুম্নের রাজসভায় উপস্থিত হয়ে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীনীলমাধবের কথা তাঁকে শোনালেন।

রাজা এই সংবাদ পেয়ে বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন ব্রাহ্মণকে নীলমাধবের অনুসন্ধানে প্রেরণ করলেন। কিন্তু সকলেই বিফল মনোরথ হয়ে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করলেন। একমাত্র রাজপুরোহিত শ্রীবিদ্যাপতি বহুস্থান ভ্রমণ করতে করতে শবর নামক একটি অনার্যজাতির দেশে উপস্থিত হলেন। সেই শবরপল্লীতে উপনীত হয়ে তিনি বিশ্বাবসু নামক এক শবরের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। বিশ্বাবসু তখন বাড়ীতে ছিলেন না, কিন্তু তাঁর যুবতী কন্যা ললিতা একাকিনী সেখানে ছিলেন। কিছুক্ষণ পরে গৃহস্বামী শবর গৃহে প্রত্যাবর্তন করে সেই ব্রাহ্মণকে দেখতে পেলেন এবং তিনি তাঁর কন্যা ললিতাকে আদেশ দিলেন সেই ব্রাহ্মণ অতিথির সেবা করবার জন্য। বিদ্যাপতি কিছুদিন বিশ্বাবসুর গৃহে অবস্থান করলেন এবং তারপর সেই শবরের বিশেষ অনুরোধে তিনি তাঁর কন্যার পানিগ্রহণ করলেন।

বিদ্যাপতি দেখতে পেলেন যে সেই শবর প্রতিদিন রাত্রে বাইরে চলে যান এবং তার পরদিন দুপুরবেলা গৃহে ফিরে আসেন, তখন শবরের শরীরে কর্পূর, কস্তুরী, চন্দন ইত্যাদির সুগন্ধ পাওয়া যায়। বিদ্যাপতি তাঁর পত্নী ললিতাকে তার কারণ জিজ্ঞাসা করলে ললিতা জানালেন যে তার পিতা প্রত্যেকদিন নীলমাধবের পূজা করতে যান।

এতদিন পরে নীলমাধবের সন্ধান পেয়ে বিদ্যাপতির আনন্দের সীমা রইল না। শবরের আদেশ লঙ্ঘন করেই ললিতা পতিকে নীলমাধবের কথা জানালেন। বিদ্যাপতি নীলমাধবের দর্শনপ্রাপ্তির জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। অবশেষে একদিন কন্যার বিশেষ প্রার্থনায় বিশ্বাবসু বিদ্যাপতির চোখ বেঁধে তাঁকে নীলমাধব দর্শনের জন্য নিয়ে গেলেন। বিশ্বাবসুর কন্যা স্বামীর বস্ত্রাঞ্চলে কতকগুলি সরিষা বেঁধে দিয়েছিলেন। বিদ্যাপতি পথে সেগুলি নিক্ষেপ করতে করতে চলতে লাগলেন। যখন বিদ্যাপতি নীলমাধবের সামনে উপস্থিত হলেন, তখন শবর বিদ্যাপতির চোখ খুলে দিলেন। বিদ্যাপতি নীলমাধবের অপূর্ব শ্রীবিগ্রহ দর্শন করে আনন্দে নৃত্য ও স্তব করতে লাগলেন।

এখানে স্পষ্টভাবেই বোঝা যাচ্ছে যে, শ্রীনীলমাধব হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং, তিনি শ্রীবিগ্রহরূপে প্রকাশিত হয়েছেন। ভগবানের বিগহরূপে অবতরণকে বলা হয় অর্চাবিগ্রহ। ভগবান তাঁর ভক্তদের প্রতি কৃপা করে শ্রীবিগ্রহরূপে প্রকাশিত হন। সর্বতোভাবে জড়কলুষ থেকে মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত যেহেতু ভগবানের দর্শন লাভ করা যায় না, তাই ভগবান তাঁর শ্রীবিগ্রহরূপে প্রকাশিত হন যাতে আমরা তাঁকে দর্শন করতে পারি এবং তাঁর পূজা করতে পারি। শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় বলেছেন—

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্ যাজী মাং নমস্কুরু ।

অর্থাৎ, সর্বক্ষণ আমার কথা চিন্তা কর, আমার ভক্ত হও, আমার পূজা কর এবং আমাকে নমস্কার কর। তাই ভক্তের পূজা এবং প্রণতি গ্রহণ করার জন্য ভগবান তাঁর অর্চাবিগ্রহরূপে প্রকাশিত হন। তিনি তাঁর ভক্তের কাছে নিজেকে সমর্পণ করেন, যাতে তাঁর প্রতি তাদের প্রীতি বর্ধিত হয় এবং তারা তাঁর সেবা করতে পারে। জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ জীবদের উদ্ধার করার জন্য এটি পরমেশ্বর ভগবানের একটি বিশেষ কৃপা। এইভাবে বিদ্যাপতি শ্রীনীলমাধবের করুণা ব্যক্তিগতভাবে উপলব্ধি করতে পারলেন।

শবর বিদ্যাপতিকে নীলমাধবের কাছে রেখে পূজার উপকরণ আহরণ করবার জন্য বেরিয়ে গেলেন। সেই সময় ব্রাহ্মণ দেখলেন যে একটি ঘুমন্ত কাক নিকটস্থ একটি কুণ্ডে পতিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রাণত্যাগ করল এবং চতুর্ভূজ মূর্তি ধারণ করে, অর্থাৎ সারূপ্য মুক্তি লাভ করে বৈকুণ্ঠে গমণ করল। তা দেখে বিদ্যাপতিও সেই বৃক্ষে আরোহন করে সেই কুণ্ডে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ বিসর্জন দিতে সঙ্কল্প করলেন। সেই সময় আকাশবাণী হল, "হে ব্রাহ্মণ, তুমি যে নীলমাধবের দর্শন পেয়েছ, তা সর্বপ্রথম ইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজকে জানাও।"

শবর বনফুল ও কন্দফুল সংগ্রহ করে নিয়ে এসে শ্রীনীলমাধবের পূজা করতে আরম্ভ করলেন। তখন নীলমাধব সেই শবরকে বললেন, "আমি এতদিন তোমার প্রদত্ত বনফুল গ্রহণ করেছি, এখন আমার ভক্ত শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজের প্রদত্ত রাজসেবা গ্রহণের অভিলাষ হয়েছে।"

শ্রীনীলমাধবের সেবা থেকে বঞ্চিত হবেন ভেবে শবর তাঁর জামাতা বিদ্যাপতিকে তাঁর গৃহে আবদ্ধ করে রাখলেন। তারপর তাঁর কন্যার বিনীত প্রার্থনায় তিনি সেই ব্রাহ্মণকে মুক্তি দিলেন। ব্রাহ্মণ তখন ইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজের কাছে উপস্থিত হয়ে শ্রীনীলমাধবকে আবিষ্কার করার কথা জানালেন। রাজা মহানন্দে বহু লোকজন নিয়ে শ্রীনীলমাধবকে আনবার জন্য অভিযান করলেন। বিদ্যাপতির নিক্ষিপ্ত সরিষা থেকে উৎপন্ন উদ্ভিদগুলি তাঁদের পথ প্রদর্শন করল, কিন্তু সেখানে গিয়ে মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন শ্রীনীলমাধবের বিগ্রহ না দেখতে পেয়ে তাঁর সৈন্য-সামন্ত নিয়ে শবর-পল্লী অবরোধ করলেন এবং বিশ্বাবসুকে বন্দী করলেন। তখন রাজার প্রতি আকাশবাণী হল, "বিশ্বাবসুকে ছেড়ে দাও। নীলাদ্রির উপর তুমি একটি মন্দির নির্মাণ কর, সেখানে দারুব্রহ্মরূপে তুমি আমার দর্শন পাবে। নীলমাধব মূর্তিতে তুমি দর্শন পাবে না।"

মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন মন্দির নির্মাণ করবার জন্য বাউলমালা নামক স্থান থেকে প্রস্তর আনবার ব্যবস্থা করে সেখান থেকে নীলকন্দর পর্যন্ত একটি পথ নির্মাণ করলেন। ঐ পথে প্রস্তর আনয়ন করে শঙ্খনাভি মণ্ডলে তিনি একটি মন্দির নির্মাণ করালেন এবং সেখানে রামকৃষ্ণপুর নামক একটি গ্রাম স্থাপন করালেন। সেই মন্দির মাটির নীচে ৬০ হাত ও মাটির উপর ১২০ হাত উঁচু করা হল। মন্দিরের উপর একটি কলস ও তার উপর একটি চক্র স্থাপিত হল এবং মন্দিরকে সুবর্ণমণ্ডিত করা হল। ইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজ শ্রীব্রহ্মাকে দিয়ে সেই মন্দির প্রতিষ্ঠা করাবার অভিলাষ করে ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হয়ে বহুকাল ধরে ব্রহ্মার অপেক্ষা করতে লাগলেন। এই সময়ের মধ্যে ইন্দ্রদ্যুম্নের নির্মিত মন্দির সমুদ্রের বালুকার দ্বারা আবৃত হয়ে গেল। ইতিমধ্যে সুরদেব এবং তারপর গালমাধব নামক কয়েকজন রাজা সেখানে রাজত্ব করলেন। গালমাধব বালির নীচ থেকে সেই মন্দিরটি উদ্ধার করলেন। এদিকে ইন্দ্রদ্যুম্ন ব্রহ্মার কাছ থেকে তাঁর রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করে সেই মন্দিরটি তাঁর নির্মিত বলে দাবী করায় গালমাধব তা মেনে নিতে অস্বীকার করলেন এবং সেই মন্দিরটি তিনি বানিয়েছেন বলে জানালেন। কিন্তু মন্দিরের নিকটবর্তী কল্পবটস্থিত ভূষণ্ডি কাক—যিনি যুগযুগান্তর ধরে শ্রীরামনাম কীর্তন করতে করতে সেখানে সমস্ত ব্যাপার দর্শন করছিলেন, তিনি জানালেন যে ওই মন্দিরটি ইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজ নির্মাণ করেছেন এবং তাঁর অনুপস্থিতিতে তা বালুকায় ঢাকা পড়ে গিয়েছিল, রাজা গালমাধব পরে তা উদ্ধার করেছেন। গালমাধব সত্যের অপলাপ করায় ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরের পশ্চিমে শ্রীমন্দিরের বর্হিদেশে ব্রহ্মার নির্দেশে অবস্থান করলেন। মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন ব্রহ্মাকে এই পরম মুক্তিদায়ক ক্ষেত্রে ভগবানের শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠা করবার জন্য প্রার্থনা জানালে ব্রহ্মা বললেন, "শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তির দ্বারা প্রকাশিত এই শ্রীক্ষেত্র ও স্বপ্রকাশ শ্রীভগবানকে প্রতিষ্ঠা করার ক্ষমতা আমার নেই। শ্রীজগন্নাথ ও তাঁর শ্রীধাম এই প্রপঞ্চে তাঁরই কৃপায় নিত্য বিরাজমান, তবে আমি এই মন্দিরের চূড়ায় একটি পতাকা বেঁধে দিচ্ছি। যারা দূর থেকে ওই পতাকা দর্শন করে দণ্ডবৎ প্রণাম করবে তারা অনায়াসে মুক্তিলাভ করবে।"

ইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজ নীলমাধবের দর্শন না পেয়ে অনশনব্রত অবলম্বনপূর্বক প্রাণত্যাগের সঙ্কল্প করে কুশশয্যায় শয়ন করলেন। তখন জগন্নাথদেব স্বপ্নে তাঁকে বললেন, "তুমি চিন্তা করো না, সমুদ্রের 'বাঙ্কিমুহান' নামক স্থানে দারুব্রহ্মরূপে ভাসতে ভাসতে আমি উপস্থিত হব।" রাজা সৈন্যসামন্তসহ

সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন এবং শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মাঙ্কিত শ্রীদারুব্রহ্ম দর্শন করলেন। রাজা বহু বলবান লোক, হাতি প্রভৃতি নিযুক্ত করেও সেই দারুব্রহ্মকে জল থেকে তুলতে পারলেন না। তখন শ্রীজগন্নাথদেব রাজাকে স্বপ্নে জানালেন, "আমার পূর্বসেবক বিশ্বাবসু, যে আমার শ্রীনীলমাধব স্বরূপের পূজা করত, তাকে এখানে আনো এবং একটি সুবর্ণ রথ দারুব্রহ্মের সম্মুখে স্থাপন কর।"

রাজা সেই স্বপ্নাদেশ অনুসারে কাজ করতে আরম্ভ করলেন। শবর বিশ্বাবসু এসে শ্রীদারুব্রহ্মের একদিক এবং ব্রাহ্মণ বিদ্যাপতি অপরদিক ধারণ করলেন। তখন চতুর্দিকে সকলে হরিনাম-সংকীর্তন করতে লাগলেন। রাজা শ্রীদারুব্রহ্মের শ্রীচরণ ধরে রথে আরোহণ করলে রাজা তাঁকে নির্দিষ্ট স্থানে নিয়ে এলেন। সেখানে শ্রীব্রহ্মা যজ্ঞ আরম্ভ করলেন, বিঘ্ন-বিনাশকারী শ্রীনৃসিংহদেব তখন যজ্ঞবেদিতে অবস্থান করেছিলেন। কথিত আছে যে যেখানে আজ মন্দির বর্তমান, সেইখানে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। মুক্তি-মণ্ডপের সংলগ্ন পশ্চিমদিকে যে নৃসিংহদেব বিরাজমান আছেন, তিনি সেই আদি 'নৃসিংহদেব'।

মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন সেই দারুব্রহ্মকে শ্রীমূর্তিরূপে প্রকট করবার জন্য বহু দক্ষ শিল্পীকে আহ্বান করলেন, কিন্তু তারা কেউই দারুব্রহ্ম স্পর্শই করতে পারল না, তাদের অস্ত্র-শস্ত্র সমস্তই খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে গেল। অবশেষে স্বয়ং ভগবান 'অনন্ত মহারাণা' নামে আত্মপরিচয় প্রদান করে একটি বৃদ্ধ শিল্পীর ছদ্মবেশে সেখানে এসে উপস্থিত হয়ে একুশ দিনের মধ্যে দাররুদ্ধ করে শ্রীবিগ্রহ প্রকটিত করবেন, এই প্রতিশ্রুতি দান করলেন। এদিকে যে সমস্ত কারিগর রাজার আহ্বানে সেখানে আগমণ করেছিল, সেই বৃদ্ধ সূত্রধরের উপদেশ অনুসারে রাজা তাদের দ্বারা তিনটি রথ প্রস্তুত করালেন। সেই বৃদ্ধ কারিগর দারুব্রহ্মকে শ্রীমন্দিরের ভিতরে নিয়ে গিয়ে দাররুদ্ধ করে একাকী অবস্থান করবেন এবং একুশ দিনের পূর্বে কিছুতেই রাজা দ্বার উন্মোচন করতে পারবেন না, এই প্রতিজ্ঞা করলেন। কিন্তু দু'সপ্তাহ অতিবাহিত হওয়ার পর কারিগরের অস্ত্র-শস্ত্রাদির কোন রকম শব্দ না পেয়ে রাজা অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়লেন। মন্ত্রীর নিষেধ সত্ত্বেও রাণীর পরামর্শ অনুসারে রাজা স্বহস্তে সেই মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত করলেন। সেখানে বৃদ্ধ কারিগরকে দেখতে পেলেন না, কেবল দেখলেন—দারুব্রহ্ম তিনটি শ্রীমূর্তিরূপে বিরাজ করছেন। তাঁদের সামনে গিয়ে তিনি দেখলেন শ্রীমূর্তির শ্রীহস্তের আঙ্গুলগুলি এবং শ্রীপাদপদ্ম প্রকাশিত হয়নি। বিচক্ষণ মন্ত্রী তাঁকে জানালেন, সেই বৃদ্ধ কারিগর আর কেউই নন,

তিনি স্বয়ং শ্রীজগন্নাথ। রাজা নিজের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে নির্দিষ্ট সময়ের এক সপ্তাহ পূর্বেই শ্রীমন্দিরের দ্বার উন্মোচন করায় শ্রীজগন্নাথ নিজেকে এইভাবে প্রকটিত করেছেন। রাজা তখন নিজেকে অত্যন্ত অপরাধী মনে করে প্রাণত্যাগ করবার সঙ্কল্প করে কুশশয্যায় শয়ন করলেন। অর্ধরাত্রে শ্রীজগন্নাথদেব রাজাকে স্বপ্নে দর্শন দান করে বললেন, "আমি এইরূপে 'শ্রীপুরুষোত্তম' নামে শ্রীনীলাচলে নিত্য অধিষ্ঠিত আছি। এই প্রপঞ্চে আমি আমার শ্রীধামের সঙ্গে চব্বিশটি অর্চাবতার রূপে অবতীর্ণ হই। আমি প্রাকৃত হস্ত-পদ রহিত হলেও অপ্রাকৃত হস্ত-পদাদির দ্বারা ভক্তের প্রদত্ত সেবোপকরণ গ্রহণ করি এবং সমস্ত জগতের মঙ্গলের জন্য বিচরণ করি—বেদের এই নিত্য প্রতিজ্ঞা রক্ষা করবার জন্য তুমি যে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছ, সে সম্বন্ধে একটি লীলামাধুরী প্রকট করবার জন্য আমি এই মূর্তিতে প্রকটিত হয়েছি। প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিবিলোচনেন—আমার মাধুর্য-রসলুব্ধ ভক্তরা আমাকে 'শ্রীশ্যামসুন্দর—মুরলীবদন' রূপে দর্শন করেন। আমার ঐশ্বর্যময়ী সেবায় যদি তোমার অভিলাষ হয় তা হলে তুমি স্বর্ণ বা রৌপ্যনির্মিত হস্ত-পদ আদির দ্বারা আমাকে কখনও কখনও ভূষিত করতে পার, কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও জেনে রেখো যে আমার শ্রীঅঙ্গ যাবতীয় ভূষণের ভূষণ স্বরূপ।"

রাজা স্বপ্নে শ্রীজগন্নাথদেবের এই বাণী শ্রবণ করে কৃতার্থ হলেন এবং প্রার্থনা জানালেন, "যে বৃদ্ধ কারিগর এই শ্রীমূর্তি প্রকট করেছেন তাঁর বংশধরেরা যেন যুগে যুগে জীবিত থেকে তিনটি রথ নির্মাণকার্যে ব্যাপৃত থাকেন।" শ্রীজগন্নাথদেব ঈষৎ হাস্য করে বললেন, "তাই হবে।" তারপর শ্রীজগন্নাথদেব রাজাকে আরও বললেন, "যে বিশ্বাবসু নীলমাধবরূপী আমার সেবা করতেন, তাঁর বংশধরেরা যুগে যুগে আমার 'দয়িতা'-সেবক নামে পরিচিত থেকে সেবা করবে। বিদ্যাপতির ব্রাহ্মণপত্নীর গর্ভজাত বংশধরেরা আমার অর্চক হবে, আর বিদ্যাপতির শবরীর গর্ভজাত সন্তানেরা আমার ভোগ রন্ধন করবে। তারা 'সুয়ার' (সুপকার) নামে খ্যাত হবে।"

মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন শ্রীজগন্নাথদেবকে বললেন, "আমাকে একটি বর দান করতে হবে। প্রতিদিন মাত্র এক প্রহর অর্থাৎ তিন ঘণ্টা আপনার শ্রীমন্দিরের দ্বার রুদ্ধ থাকবে, আর জগৎবাসী সকলের দর্শনের জন্য অবশিষ্ট সময় আপনার শ্রীমন্দিরের দ্বার মুক্ত থাকবে। সারাদিন আপনার ভোজন চলবে, আপনার হস্তপল্লব কখনও শুষ্ক হবে না।" শ্রীজগন্নাথদেব 'তথাস্তু' বলে সম্মত হলেন এবং বললেন, "এখন তোমার নিজের জন্য কিছু বর প্রার্থনা কর।" তখন

রাজা বললেন, "যাতে কোন মানুষ আপনার শ্রীমন্দিরকে নিজ সম্পত্তি বলে দাবী করতে না পারে, সেজন্য আমি নির্বংশ হতে চাই—আমাকে সেই বর দান করুন।" শ্রীজগন্নাথদেব 'তথাস্তু' বলে রাজাকে এই বরও প্রদান করলেন।

এইভাবে পরম করুণাময় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব, সুভদ্রাদেবী এবং বলদেব সমস্ত জীবের মঙ্গলের জন্য এই জড় জগতে আবির্ভূত হলেন। তাঁদের এই আবির্ভাবের ফলে জীবের কি কল্যাণ সাধিত হল? সেই কথা বৃহন্নারদীয় পুরাণে বর্ণনা করে বলা হয়েছে—

প্রতিমাং তত্রতাং দৃষ্টা স্বয়ং দেবেন নির্মিতম।
অনায়াসেন বৈজান্তি ভবনং মে তত নরাঃ ॥

অর্থাৎ, পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণ লক্ষ্মীদেবীকে বললেন, "পুরুষোত্তম-ক্ষেত্র নামক ধামে আমার স্বর্ণনির্মিত 'কেশব-বিগ্রহ' বিরাজমান। মানুষ যদি কেবল সেই শ্রীবিগ্রহ দর্শন করে, তাহলে তারা অনায়াসে আমার ধামে, আমার কাছে ফিরে আসতে পারে।"

এইভাবে শ্রীজগন্নাথদেব সমস্ত জগৎ উদ্ধার করবার জন্য আবির্ভূত হয়েছেন। বিশেষ করে তিনি যখন সকলের চোখের সামনে রথে চড়ে যান, তখন তাঁর সেই রথারূঢ় অবস্থা দর্শন করে জীব পুঞ্জীভূত পাপরাশি থেকে মুক্ত হতে পারে। তাই আমি রথযাত্রা মহোৎসবে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব, সুভদ্রাদেবী এবং বলদেবকে আমার দণ্ডবৎ প্রণতি জানাই এবং তাঁদের কাছে প্রার্থনা করি তাঁদের মহিমা বর্ণনা করতে আমার এই অক্ষমতাও তাঁরা যেন ক্ষমা করেন।

রথযাত্রা উৎসব—ভগবানের করুণার প্রকাশ

পরমেশ্বর ভগবান চান যে জড় জগতে মোহাচ্ছন্ন দুঃখ-দুর্দশাক্লিষ্ট জীব তার প্রকৃত আলয় চিন্ময় ভগবদ্ধাম, গোলোক বৃন্দাবনে ফিরে আসুক। জীবকে সেই সুযোগ প্রদান করবার জন্য ভগবান নানারকম আয়োজন করেছেন। যেমন সৃষ্টির শুরুতেই বেদ রূপে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। তারপরে

যুগে যুগে তিনি এসেছেন এই জগতে ধর্ম সংস্থাপন করার জন্য, সাধুদের পরিত্রাণ করার জন্য এবং দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ করার জন্য। আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর আগে তিনি স্বয়ং তাঁর স্বরূপে প্রকাশিত হয়েছেন। তিনি বৃন্দাবনে তাঁর নিত্যলীলা প্রকট করে জীবকে মাধুর্যরসের উৎকর্ষতা প্রদর্শন করেছেন। আজ থেকে পাঁচশত বছর আগে তিনি এই অঞ্চলে নবদ্বীপ মণ্ডলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে প্রকাশিত হয়ে জীবকে ভগবদ্‌ভক্তির পথ প্রদর্শন করে গেছেন। মনুষ্য জন্মের প্রকৃত উদ্দেশ্যের শিক্ষা দিয়ে গেছেন। তিনি এইভাবে আমাদের এই জড় জগতের দুঃখ-দুর্দশাময় পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার লাভের নানারকম আয়োজন করে গেছেন। যাতে আমরা তাঁর কাছে ফিরে যাই। আমাদের তাঁর কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি উদ্‌গ্রীব হয়ে রয়েছেন। তিনি সবরকম আয়োজন করে রেখেছেন।

কিন্তু তাঁর কাছে ফিরে যাওয়ার জন্য কেবল একটি প্রয়োজন আমাদের তরফ থেকে রয়েছে। সেটি হচ্ছে তাঁর কাছে ফিরে যাওয়ার বাসনা আমাদের করতে হবে। এই ব্যাপারে যে ক্ষুদ্র স্বাধীনতা ভগবান আমাদের দিয়েছেন—তাতে তিনি কখনও হস্তক্ষেপ করেন না।

ভগবান কেন জীবকে জোর করে তাঁর কাছে নিয়ে যান না? এই জড় জগতের দুঃখ-দুর্দশাময় পরিস্থিতি থেকে তিনি কেন আমাদের উদ্ধার করে তাঁর কাছে নিয়ে যাচ্ছেন না?

তার উত্তরেও, বলা হচ্ছে যে, ভগবানের সঙ্গে জীবের যে সম্পর্ক, সেটি প্রেমের সম্পর্ক, ভালোবাসার সম্পর্ক। জোর করে কাউকে ভালোবাসানো যায় না। ভালবাসাটা এমনই একটি বস্তু যেটি জোর করে কখনও করা যায় না। স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমাদেরকেই তাঁর প্রতি ঐকান্তিকতা অবলম্বন করে, আকৃষ্ট হয়ে, আমাদের হৃদয়ের যে প্রেম, সেটি তাঁকে অর্পণ করতে হবে। কেবল এইটুকুই ভগবান আমাদের কাছ থেকে চান। ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার একটি মাত্র শর্ত আমাদের জন্য রয়েছে। সেটি হচ্ছে আমাদের স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভগবানকে ভালোবাসতে হবে। এই ভালোবাসাটুকুই তাঁকে আমাদের প্রদান করতে হবে। আর বাকী সমস্ত আয়োজন তিনিই তখন করে দেবেন। ভগবান প্রতিটি জীবের হৃদয়ে বিরাজ করছেন। কেবল সেই মুহূর্তটির জন্য তিনি প্রতীক্ষা করে রয়েছেন, তিনি আমাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন, তিনি অপেক্ষা করে রয়েছেন, কখন আমরা ঐকান্তিকতার সঙ্গে তাঁর কাছে প্রার্থনা করব, হে ভগবান এবার তুমি আমাকে তোমায় ভালোবাসার সুযোগ দাও,

আমার ভালোবাসার প্রকাশ ঘটিয়ে তোমাকে সেবা করার সুযোগ দাও। এই জড়জগতের দুঃখদুর্দশাময় পরিস্থিতি থেকে আমাকে উদ্ধার করে চিদ্ জগতে তোমার নিত্যসেবায় আমাকে নিযুক্ত কর। কেবল এইটুকুই আমাদের করতে হবে। যদি তা করি, তাহলে আমাদের হৃদয়ে পরমাত্মারূপে বিরাজিত ভগবান তৎক্ষণাৎ আমাদের সেই প্রার্থনায় সাড়া দেবেন। আমাদের ভালোবাসা যখন তাঁর প্রতি অর্পিত হয় তখন তিনি সেই ভালোবাসাটি সহস্র গুণে, লক্ষ গুণে, কোটি গুণে বর্ধিত করে আমাদেরকে তাঁর ভালোবাসা অর্পণ করেন। এইভাবে জীবের সঙ্গে যে প্রেমের বা ভালোবাসার আদান প্রদান শুরু হয়, তাকেই বলা হয় ভক্তি।

ভগবদ্ভক্তির পথ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রদর্শন করে গেছেন। আমরা কিভাবে ভগবানের ভক্ত হতে পারি সেই শিক্ষা দেওয়ার জন্যই পরমেশ্বর ভগবান কৃষ্ণ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে এই বঙ্গভূমিতে, এই গৌড়মণ্ডলভূমিতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তিনি চব্বিশ বছর এইখানে লীলাবিলাস করার পর সন্ন্যাস লীলা অবলম্বন করে জগন্নাথপুরীতে যান। সেখানে তিনি শ্রীজগন্নাথের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় অবলম্বন করে, জগন্নাথকেই তাঁর জীবনের কেন্দ্রবিন্দু করে তিনি তাঁর বাকি চব্বিশ বছরের আঠারো বছর সেখানে কাটিয়েছিলেন। মাঝে ছয় বছর তিনি ভারতের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করেছিলেন। দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ করেন, তারপর বৃন্দাবনে যান, বৃন্দাবন থেকে আবার ফিরে এসে তিনি জগন্নাথপুরীতেই তাঁর অন্ত্য লীলা সমাপন করেন।

যেহেতু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবান কৃষ্ণ, তাই বোঝা যাচ্ছে যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভক্তভাব অবলম্বন করে অবতীর্ণ হয়ে, কিভাবে রথযাত্রা উৎসবটি পালন করতে হবে সেটি পুরীধামে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর রথযাত্রালীলার মধ্য দিয়ে আমাদের শিক্ষা প্রদান করেছেন। আর রথযাত্রার সেই ভাবটি হচ্ছে বৃন্দাবনের গোপীদের ভাব। তার কারণ, শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম ও সুভদ্রাদেবীকে রথে আরোহন করিয়ে প্রথম এই রথযাত্রার সূচনা করেছিলেন বৃন্দাবনের গোপীগণ। সেই কাহিনীটি হল—একবার শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম ও সুভদ্রাদেবী সূর্যগ্রহণ উপলক্ষ্যে কুরুক্ষেত্রে স্যমন্তপঞ্চকতীর্থে স্নান করতে যান। এখনও কুরুক্ষেত্রে সূর্যগ্রহণকালে স্নান করতে বহু পুণ্যার্থী গমন করেন। এই রীতিটি হাজার হাজার বছর ধরে চলে আসছে। সেই রীতি অনুসরণ করে আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর আগে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা থেকে গিয়েছিলেন কুরুক্ষেত্রে। সূর্যগ্রহণকালে বৃন্দাবন থেকে ব্রজবাসীরাও সেখানে গিয়েছিলেন। সূর্যগ্রহণের

স্নানের পর সকলে যে যাঁর নিজস্থানে ফিরে যাবার আয়োজন করছেন। তখন ব্রজবাসীরা সংবাদ পেলেন কৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে এসেছেন। শোনামাত্রই তাঁরা ছুটলেন কৃষ্ণকে দর্শন করার জন্য।

কংসকে বধ করবার জন্য কৃষ্ণ যখন বৃন্দাবন থেকে মথুরায় গিয়েছিলেন, তখন কৃষ্ণ মথুরা থেকে দ্বারকায় চলে যান। প্রায় একশ বছর ধরে ব্রজবাসীরা কৃষ্ণের দর্শন পাননি। যে ব্রজবাসীরা, যে ব্রজগোপিকারা এক নিমেষেরও অদর্শন সহ্য করতে পারতেন না, অর্থাৎ চোখের যখন পাতা পড়তো—সেই চোখের পলক পড়ার ক্ষণটি বা নিমেষ—সেই সময়টুকু তারা কৃষ্ণকে দেখতে না পারা সহ্য করতে পারতেন না। সেই জন্য তাঁরা আক্ষেপ করে বলেছিলেন, ব্রহ্মা যে কি সৃষ্টি করেছেন, চোখের পাতার পলক পড়ছে—এভাবে ব্রহ্মার সৃষ্টিকর্মে তাঁরা ভুল প্রদর্শন করেছিলেন। সেই ব্রজগোপিকারা একশো বছর শ্রীকৃষ্ণের বিরহে ব্যথিত ছিলেন।

এখন যখন শুনতে পেলেন কৃষ্ণ এসেছেন কুরুক্ষেত্রে—সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা ছুটলেন কৃষ্ণকে দর্শন করতে। কৃষ্ণ তখন রথে উঠে বসেছেন, তিনি কুরুক্ষেত্র থেকে তাঁর রাজধানী দ্বারকায় ফিরে যাবেন, সঙ্গে রয়েছেন শ্রীবলরাম ও সুভদ্রা। চারপাশে অনেক রাজপুরুষ, সৈনিক। কৃষ্ণের বেশও অন্যরকম। গোপবেশের পরিবর্তে রাজবেশ। হাতে বাঁশীর পরিবর্তে ধনুর্বাণ। কোমরে তলোয়ার, বর্ম, মাথায় মুকুট, পরণে রাজবেশ। কৃষ্ণকে এভাবে দর্শন করে গোপীদের মন ভরল না। বিশেষ করে রাধারাণী বললেন—এই কৃষ্ণ আমাদের সেই কৃষ্ণ নয়, যাঁকে আমরা চিনতাম, বৃন্দাবনের বনে বনে আমাদের সঙ্গে যে লীলাখেলা করত, সেই কৃষ্ণের মাথায় ময়ূরের পাখা, তাঁর পরণে পীতবসন, গলায় বনমালা, হাতে বাঁশি, আর এই কৃষ্ণের পরণে তো রাজবেশ।

রাধারাণীর সেই মনোভাব বুঝতে পেরে ব্রজবাসীরা কৃষ্ণের রথের দড়ি ধরে, কৃষ্ণের রথের ঘোড়াগুলি ধরে টানতে টানতে নিয়ে চললেন বৃন্দাবনের দিকে। সঙ্গে বলরাম—তিনিও ব্রজবাসীদের শৈশবের, কৈশোরের সাথী। তাঁকেও রথে চড়ালেন। সুভদ্রা বোন—তাঁকে তো ফেলে রাখা যায় না, তাঁকেও তাঁরা নিয়ে চললেন। এইটি হচ্ছে রথযাত্রার ইতিহাস। সেই সময় থেকে এই রথযাত্রার অনুষ্ঠান হয়ে আসছে। বিশেষ করে জগন্নাথ পুরীতে।

জগন্নাথ পুরীর এই রথযাত্রাটি হচ্ছে গোপীদের সেই কুরুক্ষেত্র রথযাত্রার দ্যোতক। রথের সময় জগন্নাথ বা কৃষ্ণকে নিয়ে যাওয়া হয় নীলাচল থেকে সুন্দরাচলে। অর্থাৎ গুণ্ডিচা মন্দিরে—সেটিই বৃন্দাবন, যেখানে কৃষ্ণ

ব্রজবাসীদের সঙ্গে আটদিন ছিলেন। এদিকে কৃষ্ণ দ্বারকায় ফিরে এলেন না দেখে দ্বারকাবাসীরা সকলে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হয়ে রয়েছেন—কেন কৃষ্ণ ফিরে এলেন না। খবর নিয়ে জানতে পারলেন যে, ব্রজবাসীরা কৃষ্ণকে চুরি করে নিয়ে চলে গেছে বৃন্দাবনে। কুরুক্ষেত্র থেকে কৃষ্ণকে তারা চুরি করে নিয়ে চলে গেছে। মহালক্ষ্মী রুক্মিনীদেবী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি তখন সৈন্য সামন্ত নিয়ে বৃন্দাবনকে অবরোধ করে ঘিরে রাখলেন। ব্রজবাসীদের গ্রেফতার করলেন। তাঁদের দণ্ড দেবেন। দণ্ড দেওয়ার সময় বিচার হচ্ছে। ব্রজবাসীদের পক্ষে ললিতাদেবী। দ্বারকাবাসীদের পক্ষে কথা বলছেন নারদমুনি। তাঁদের মধ্যে বাক্‌বিতণ্ডা হচ্ছে।

কথায় কথায় প্রশ্ন উঠল, কৃষ্ণ যদিও দ্বারকাতে থাকেন,—রুক্মিনীদেবীই প্রশ্নটি তুললেন—কিন্তু তাঁর মনটি যেন অন্য কোথাও থাকে। সবসময় দ্বারকাতে কৃষ্ণ অন্যমনস্ক। তাঁর শরীরটি রয়েছে দ্বারকায়, তাঁর মন রয়েছে অন্য কোথাও। রাত্রিবেলায় নিদ্রাকালে তিনি ব্রজবাসীদের, ব্রজগোপীদের, ব্রজের গাভীদের নাম ধরে ডাকেন। এভাবে রুক্মিনীদেবী বুঝতে পেরেছিলেন যে কি জাগ্রত অবস্থায় এবং কি নিদ্রিত অবস্থায় কৃষ্ণের মনটি পড়ে রয়েছে বৃন্দাবনে। প্রশ্নটি ছিল—দ্বারকায় বহু কিছু ঐশ্বর্য থাকা সত্ত্বেও কেন কৃষ্ণের মন সবসময় পড়ে রয়েছে বৃন্দাবনে?

তার উত্তরে ললিতাদেবী জানালেন—এই বৃন্দাবনের প্রতিটি গাছ কল্পবৃক্ষ, প্রতিটি গাভী হচ্ছে সুরভী, ভূমি হচ্ছে চিন্তামণি, অতএব এগুলির প্রভাবে এখানে সবকিছু ঐশ্বর্যই থাকতে পারে। যদি ব্রজবাসীরা চায় তা হলে তারা কল্পবৃক্ষের কাছে, সুরভী গাভীদের কাছে, চিন্তামণি ভূমির কাছে সবকিছু ঈপ্সিত বস্তু লাভ করতে পারেন। কিন্তু বৃন্দাবনে তারা ঐশ্বর্য চান না। বৃন্দাবনবাসীদের একমাত্র চাওয়া হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ। সর্বক্ষণই কৃষ্ণকেই চাইছেন। আর কোনও কিছু চান না। সেজন্য বৃন্দাবনে ঐশ্বর্য প্রকাশিত হয়নি, যদিও ঐশ্বর্যের পরাকাষ্ঠা হচ্ছে এই বৃন্দাবন।

অর্থাৎ বৃন্দাবনে ব্রজবাসীদের কৃষ্ণের প্রতি যে অনুরাগ, যে প্রীতি, যে ভক্তি, সেটিই হচ্ছে ভক্তির চরম পরিণতি। ভক্তির স্তরে স্তরে ক্রমোন্নতি—সেই ক্রমোন্নতির চরম স্তর হচ্ছে বৃন্দাবনের মধুর রসে পরকীয়াভাবে কৃষ্ণের প্রতি তাঁদের যে প্রেম, অন্তরের ভালোবাসা। সেজন্য বৃন্দাবনই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান। অর্থাৎ চিদ্‌জগতে বৈকুণ্ঠলোকের উর্ধ্বে হচ্ছে বৃন্দাবন। এই জড়জগৎ—ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মাণ্ডের বাইরে রয়েছে বিরজা নদী, বিরজার অপর পাড়ে রয়েছে

ব্রহ্মজ্যোতি, ব্রহ্মজ্যোতি ভেদ করে বৈকুণ্ঠলোক, বৈকুণ্ঠের উপরে অযোধ্যা, তার উপরে দ্বারকা, তার উপরে মথুরামণ্ডল। মথুরামণ্ডলের কেন্দ্রস্থল হচ্ছে বৃন্দাবন। আর সেই বৃন্দাবনে যাওয়ার জন্য দ্বারকাধীশ কৃষ্ণ পর্যন্ত আকুল হন। সেই ভাবটি রথযাত্রা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে।

বৈকুণ্ঠে ঐশ্বর্য রয়েছে। বৈকুণ্ঠে আছেন লক্ষ্মীদেবী। নারায়ণের বক্ষবিলাসিনী লক্ষ্মীদেবী সেখানে বিরাজ করছেন। তাই সেখানে সবরকম ঐশ্বর্য প্রকাশিত হয়েছে। সেই বৈকুণ্ঠের সর্বোচ্চ স্তর হচ্ছে দ্বারকা। সেখানে থাকেন মহালক্ষ্মী। বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মী, দ্বারকার রুক্মিনী হচ্ছেন মহালক্ষ্মী। সমস্ত লক্ষ্মীর উৎস রুক্মিনীদেবী।

এখানে আমরা দেখতে পাই সেই রুক্মিনী দেবী বৃন্দাবনের মাধুর্য, বৃন্দাবনের মহিমা অবলম্বন করে বৃন্দাবনের কাছে নতি স্বীকার করছেন। তিনি স্বীকার করছেন, বৃন্দাবন দ্বারকারও উর্ধ্বে। তাই কৃষ্ণকে অপহরণকারী ব্রজবাসীদের গ্রেফতার করতে এসে তিনি তাঁদের কাছে নতি স্বীকার করলেন।

তারপর রুক্মিনীদেবী বললেন, আমি তো শুনেছি রাসলীলার কথা, তাই রাসলীলা দর্শন করতে চাই। ব্রজগোপিকারা তখন কৃষ্ণকে নিয়ে রাসলীলা নৃত্য করলেন এই রথযাত্রার সময় নববৃন্দাবনে। কুরুক্ষেত্রের কাছেই একটি স্থানে যেখানে গোপেরা সূর্যগ্রহণ উপলক্ষে এসে অবস্থান করেছিলেন, তাকেই বলা হয় নব-বৃন্দাবন। সেখানেই কৃষ্ণ, বলরাম ও সুভদ্রাকে তাঁরা নিয়ে গিয়েছিলেন।

ব্রজবাসীরা যেহেতু তারা গোপালক, তাঁরা তাই বনের কাছেই ছিলেন। কৃষ্ণকে তাঁরা সেই বনেই নিয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে আটদিন কাটিয়ে ছিলেন। তারপর রাসনৃত্য দর্শন করে রুক্মিনীদেবী বলেছিলেন—আহা কি অপূর্ব এক সম্পদ আমি দর্শন করলাম। ব্রজগোপীরা উত্তর দিয়েছিলেন, বৃন্দাবনের যে রাসনৃত্য, তার কাছে এই রাসনৃত্য কিছুই নয়। এভাবে বৃন্দাবনের মহিমার উৎকর্ষ ক্রমশঃ প্রকাশিত হয়েছে। আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি, কৃষ্ণের সঙ্গে রয়েছেন বলরাম ও সুভদ্রা। কৃষ্ণের সঙ্গে লক্ষ্মীদেবী বা রুক্মিনীদেবী নেই। সুভদ্রা—যোগমায়া। এখানে বৃন্দাবন লীলা ব্যক্ত করতে ঐশ্বর্যের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীদেবী দূরে সরে গেছেন। এখানে যোগমায়ার প্রকাশ হয়েছে। যোগমায়ার প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের এই ব্রজলীলা প্রদর্শিত হচ্ছে।

অর্থাৎ এই রথযাত্রা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা ঐশ্বর্যপর ভগবদ্‌ভক্তিকে অতিক্রম করে মাধুর্যপর ভক্তিকে প্রদর্শনের সুযোগ লাভ করছি। আমাদের

কাছে এই রথযাত্রা অনুষ্ঠান এক বিশেষ বৈশিষ্ট্যসমন্বিত। সেজন্য শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করার জন্য যখন পাশ্চাত্য দেশে গিয়েছিলেন তখন তিনি সেখানে গিয়ে এই রথযাত্রার আয়োজন করেন। রথযাত্রা শুরু করেন। বহু মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন। প্রভুপাদ বহু মানুষকে কৃষ্ণভক্তে পরিণত করেছেন। সেইসঙ্গে এই রথযাত্রার অনুষ্ঠান করেছিলেন। প্রথমে সানফ্রান্সিসকো শহরে, তারপর আমেরিকার বিভিন্ন শহরে—নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন, ডালাস, শিকাগো ইত্যাদি। তারপর লণ্ডন। লণ্ডনের কেন্দ্রস্থলে প্রভুপাদ জগন্নাথের রথযাত্রা মহোৎসবের আয়োজন করেছিলেন। লণ্ডনের ট্রাফেলগার স্কোয়ারে প্রতি বছর মহাসমারোহে আজও রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রীল প্রভুপাদের সময়ে পৃথিবীর আট দশটি শহরে কেবল রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হত। এখন পৃথিবীর শত শত শহরে রথযাত্রা অনুষ্ঠান হচ্ছে। জগন্নাথের রথযাত্রা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করার মাধ্যমে আমাদের মানব জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য অবগত হতে পারি। শাস্ত্রে বলা হয়েছে রথারূঢ় পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করলে এই জড় জগতের জন্ম মৃত্যুর আবদ্ধতা থেকে তৎক্ষণাৎ মুক্তি লাভ করা যায়। তাই যথার্থভাবেই এই রথযাত্রার উৎসব জীবের প্রতি ভগবানের এক করুণার প্রকাশ।

বৈষ্ণব ধর্মের ঐতিহ্যের ইতিহাস
পর্ব–১
সৃষ্টির আদিতেই বৈষ্ণব ধর্ম

আমাদের আলোচনার শিরোনাম হল বৈষ্ণব ধর্মের ঐতিহ্যের ইতিহাস। অর্থাৎ বৈষ্ণব ধর্মের যে পরম্পরাগত ইতিহাস রয়েছে সেই পরম্পরা বা ঐতিহ্যটি কি সেটি আমরা জানার চেষ্টা করব।

সমস্ত ধর্ম আচরণের মধ্যে ভক্তিই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ। আবার ভক্তির মধ্যে শুদ্ধভক্তিই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ। শুদ্ধভক্তির মধ্যেও প্রেমভক্তি শ্রেষ্ঠ। ভক্তিপথে

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রদর্শিত যে প্রেমভক্তি সেটিই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ। মহাপ্রভু সেই প্রেমভক্তি দয়া করে আমাদের প্রদান করেছেন। ধর্মের পথে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সেই দানটি কেন সর্বশ্রেষ্ঠ সেটি আমাদের বিচার করতে হবে। এইজন্য শাস্ত্রে বলা হয়েছে—

চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥

এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সেই চমৎকার পন্থাটি বা শিক্ষাটি হচ্ছে—

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং।
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা॥
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্।
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরঃ ন পরঃ॥

(চৈতন্যমতমঞ্জুষা)

আরাধ্য ভগবান হচ্ছেন ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর ধাম হল বৃন্দাবন। ব্রজবধূ ব্রজগোপিকারা যে ভাবে শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করেছিলেন সেটিই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ। সমস্ত পুরুষার্থ বা সিদ্ধির চরম সিদ্ধি হচ্ছে কৃষ্ণপ্রেম। আর তার প্রমাণ হচ্ছে অমল পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত। এটিই হচ্ছে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মত। আমাদের সাদরে সেটিই গ্রহণ করা উচিত। আর কোনো কিছু গ্রহণ করার প্রয়োজন নেই। এই পথে এগোনোর সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় হল—

শুদ্ধভকত-চরণরেণু ভজন-অনুকূল।

(শরণাগতি, ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

ইতিহাস মানে হচ্ছে ধারাবাহিক বিবরণ। অর্থাৎ কালক্রমে যা ঘটেছে তার বিবরণ। ইতিহাস আর পুরাণের মধ্যে পার্থক্য কি? ইতিহাস ধারাবাহিকভাবে হয় বা ক্রমপর্যায়ে তার বিবরণ হয়। কিন্তু পুরাণ বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন জায়গার ঘটনা। যেমন সত্যযুগের কোনো ঘটনা, তার পরেই কলিযুগের কোনো ঘটনা হতে পারে। তবে সেই ঘটনাগুলি ভগবান এবং ভক্তের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত।

আমরা বৈষ্ণব ঐতিহ্যের ইতিহাস নিয়ে যখন আলোচনা করব তখন মনে রাখতে হবে যে ইতিহাস মানে ক্রমে ক্রমে বা কালক্রমে যা ঘটে তার বিবরণ। সেই অনুসারে আমরা যখন বিচার করতে যাই তখন দেখতে পাই যে সৃষ্টির শুরু থেকেই এই বৈষ্ণবধর্ম বিদ্যমান। এই জ্ঞানটি ভগবান কৃষ্ণ সৃষ্টির শুরুতেই প্রথমে ব্রহ্মাকে দান করলেন। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে,

সৃষ্টির শুরুতেই বৈষ্ণব ধর্মের সৃষ্টি হল। কৃষ্ণ প্রথমেই ব্রহ্মাকে যে তত্ত্বটি দান করলেন সেটা বৈষ্ণব তত্ত্ব। আর ব্রহ্মার মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছিল বলেই ব্রহ্মা হলেন আমাদের আদি গুরু। আরও গভীরে গেলে দেখা যায়, এই বৈষ্ণবধর্ম কেবল ব্রহ্মার মধ্য দিয়েই শুরু হয়নি। এই বৈষ্ণবধর্ম অনাদি। এই জগৎ সৃষ্টির আগেও এই ধর্ম বর্তমান ছিল। চিৎ-জগতে সকলেই বৈষ্ণব, তাহলে দেখতে পাই এই জগৎ সৃষ্টির পূর্বেও বৈষ্ণবধর্ম ছিল। এই জগৎ সৃষ্টি কিভাবে হল? ভগবান অর্থাৎ গর্ভোদকশায়ী শ্রীবিষ্ণুর নাভিপদ্ম থেকে একটা পদ্ম উদ্ভূত হয়, সেই পদ্মে রয়েছেন ব্রহ্মা এবং সেই ব্রহ্মা থেকেই এই জগতের সৃষ্টি হল।

এইভাবে প্রত্যেকটি ব্রহ্মাণ্ডে রয়েছেন এক একজন গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু এবং তাঁর নাভিপদ্ম থেকে এক-একজন করে ব্রহ্মার সৃষ্টি হয়েছে। আবার কারণসমুদ্রে শায়িত আছেন কারণোদকশায়ী বিষ্ণু বা মহাবিষ্ণু। তাঁর নিঃশ্বাসের ফলে যে বুদ্‌বুদের সৃষ্টি হচ্ছে, সেই এক একটি বুদ্‌বুদ্ হল এক-একটি ব্রহ্মাণ্ড এবং সেই প্রত্যেকটি ব্রহ্মাণ্ডে ভগবান প্রবেশ করে তাঁর স্বেদবারির দ্বারা নির্গত জলে ব্রহ্মাণ্ডের অর্ধেকটা পূর্ণ করে সেই জলের উপর তিনি শয়ন করলেন, তাই তাঁর নাম হল গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু।

গর্ভ-উদক, উদক মানে হল জল। সেই গর্ভ-উদকের জলে শয়ন করে আছেন বলেই তিনি গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু। সেই বিষ্ণুর নাভি থেকেই একটি পদ্ম উদ্ভূত হল। সেই পদ্মের কোরকে বসে আছেন ব্রহ্মা এবং সেই ব্রহ্মা থেকেই সমস্ত জগতে জীবের সৃষ্টি হল। এইভাবে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়েছে। ব্রহ্মা সবকিছুর সৃষ্টি কার্য সাধিত করেন এবং এই ব্রহ্মাকে সৃষ্টির আদিতে স্বয়ং ভগবান দিব্যজ্ঞান দান করেছিলেন।

তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎসূরয়ঃ। (ভাগবত ১/১)

এই দিব্যজ্ঞান হল বৈষ্ণব হওয়ার জ্ঞান। বৈষ্ণব শব্দের মূল হলেন বিষ্ণু। এই বিষ্ণুর যারা সেবক বা ভক্ত, তারাই হলেন বৈষ্ণব। অতএব সৃষ্টির আদিতেই বৈষ্ণব ধর্মের উদ্ভব হল। আর প্রথম বৈষ্ণব হলেন ব্রহ্মা, তাঁর থেকে প্রথমে প্রজাপতিদের এবং কুমারদের সৃষ্টি হল। তারপরে নারদমুনি, এই নারদমুনি হলেন শুদ্ধ বৈষ্ণব এবং সমস্ত জীবের গুরুদেব। জীবকে বিষ্ণুভক্তি দান করেন বলেই তিনি হচ্ছেন না-র-দ। এইভাবে নারদমুনির কৃপাতেই সমস্ত জীব বৈষ্ণব হওয়ার শিক্ষা লাভ করেছেন। আমরা তাই দেখতে পাই শ্রীমদ্ভাগবতে প্রায় সকলেই নারদমুনির সান্নিধ্যে এসেই বিষ্ণুভক্তি লাভ

করেছেন। যেমন প্রহ্লাদ মহারাজ, ধ্রুব মহারাজ, মৃগারি সবাই নারদমুনির কাছ থেকে বিষ্ণুভক্তি লাভ করেন। নারদমুনি যে বিষ্ণুভক্তি দান করেন, সেটি হচ্ছে শুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম। ভক্তি আবার অনেক রকমের হয়। সেগুলি সাধারণত তিনটি পর্যায়ে পড়ে—১) কর্মমিশ্রা ভক্তি ২) জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি এবং ৩) শুদ্ধভক্তি।

১) যতক্ষণ পর্যন্ত কর্মের প্রতি আসক্তি আছে ততক্ষণ পর্যন্ত হল কর্মমিশ্রা ভক্তি। এবং শুদ্ধভক্তির লক্ষণ হল—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ১/১/১১)

এই উত্তম ভক্তিটি হল অন্য অভিলাষ শূন্য। অন্য অভিলাষ মানে জড় জগৎকে ভোগ করার বাসনা এবং জড় জগৎকে ত্যাগ করার বাসনা। ভোগ এবং ত্যাগ এই দুইটি বাসনার থেকে মুক্ত হতে হবে। তবে যেখানে কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্য কিছু অভিলাষ আছে। যেমন কৃষ্ণের শরণাগত হয়ে কৃষ্ণের আনুগত্য মানা হল কিন্তু তবুও জড় সুখভোগের বা ইন্দ্রিয় তৃপ্তির বাসনা রয়েছে, তাহলে সেটি হল কর্মমিশ্রা ভক্তি। এই কর্মমিশ্রা ভক্তির স্তরে রয়েছেন স্বর্গের দেবতারা, আর কর্মী হল যারা ভগবানকে মানে না। তারা শুধু জড় জগৎকে ভোগ করতে চায়। তারা ভক্ত নয়, আর কর্মমিশ্রা ভক্ত হল—যারা ভগবানকে মানছে এবং জড় জগৎকে ভোগ করার বাসনাও রয়েছে। এই স্তরের ভক্তরা হল কনিষ্ঠ স্তরের ভক্ত। যেমন দেবতারা নারায়ণকে মানে কিন্তু আবার ভোগ করেও চলেছে। কিন্তু তবুও যখন অসুরদের দ্বারা দেবতারা বিপদে পড়ে তখন ভগবান তাদের রক্ষা করার জন্য আবির্ভূত হন। এমন কি ইন্দ্রের ছোট ভাই হিসেবেও ভগবান বামনদেবরূপে এসে তাদের রক্ষা করেছেন। কিন্তু তবুও তাদের ভোগবাসনা রয়ে গেছে। তারা স্বর্গসুখ ভোগ করতে চায়। তাই তারা ভক্ত হওয়া সত্ত্বেও শুদ্ধভক্ত নয়। তারা কর্মমিশ্রা ভক্ত আর যারা এই জড় জগতের ভোগবাসনা ত্যাগ করে মুক্ত হতে চায় তারা হচ্ছে জ্ঞানী। এবং যে সমস্ত ভক্তের এই মুক্ত হওয়ার বাসনা রয়েছে তারাও শুদ্ধভক্ত নয়। এদিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় অনেক বৈষ্ণবেরাও এই জ্ঞানমিশ্রা ভক্ত। যেমন মহাপ্রভু যখন উত্তরপ্রদেশে গিয়েছিলেন মধ্বাচার্যের যারা অনুগামী তত্ত্ববাদী তাদের সঙ্গে তাঁর যে আলোচনা হয়, তাতে তাদের বক্তব্য হল মুক্তিই হল ভক্তির একমাত্র লক্ষণ। এই মুক্তি মানে কৈবল্য বা সাযুজ্য মুক্তি নয়। তারা সামীপ্য, সারূপ্য, সালোক্য এবং সার্ষ্টি এই চার রকমের মুক্তি কামনা করে

বৈকুণ্ঠে ভগবানের কাছে ফিরে যেতে চায়। মহাপ্রভু সেই তত্ত্ববাদীদের যিনি আচার্য বা মহান্ত তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—শাস্ত্রে বলা হচ্ছে ভক্তকে মুক্তি দেওয়া হলেও সে মুক্তি চায় না। ভগবান কপিলদেব বলেছেন যে—

সালোক্যসার্ষ্টিসামীপ্যসারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥

(ভাগবত ৩/২৯/১৩)

অর্থাৎ তাদের মুক্তি দেওয়া হলেও তারা তা গ্রহণ করতে চায় না। তাহলে ভক্তকে ভগবানের সেবা ছাড়া যে কোন মুক্তি দিলেও সে যদি তা গ্রহণ না করে তাহলে সেই মুক্তি কেন আমাদের লক্ষ্য হবে?

মহাপ্রভু দ্বিতীয় শ্লোকে বলেন—

মুক্তি স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলি সেবতেঽস্মান্।
ধর্মার্থকামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ ॥

(শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত ১০৭ শ্লোক)

মুক্তিদেবী মুকুলতাঞ্জলি হয়ে ভক্তের কাছে প্রার্থনা করে তাকে যেন সেবা করার সুযোগ দান করা হয়।

তাহলে এখানে মুক্তিদেবী করোজোড়ে যদি ভক্তের কাছে প্রার্থনা করে যে আমাকে সেবা করার সুযোগ দান করুন, তাহলে ভক্ত হয়ে সেই মুক্তি কেন গ্রহণ করবেন? মহাপ্রভু তাদের বোঝালেন তোমরা ভক্তির মাধ্যমে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা করছো, এটা প্রকৃতপক্ষে ভক্তির লক্ষণ নয়। তাহলে ভক্তির উদ্দেশ্য কি? ভক্তির উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রেম।

ভগবানের প্রতি প্রেম অর্জন করাই হচ্ছে ভক্তির একমাত্র উদ্দেশ্য এবং সেই প্রেমভক্তি হচ্ছে শুদ্ধভক্তির চরম স্তর। তাহলে দেখা যাচ্ছে ভক্তি তিন রকমের। যথা কর্মমিশ্রা, জ্ঞানমিশ্রা ও শুদ্ধভক্তি এবং এই শুদ্ধভক্তির চরম স্তরই হল প্রেমভক্তি। এই প্রেমভক্তি দান করতেই মহাপ্রভু এসেছেন। প্রেমভক্তি লাভের উপায় হচ্ছে শুদ্ধ চিত্তে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ ও কীর্তন করা।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

এই শুদ্ধভক্তি অত্যন্ত অপূর্ব বস্তু এবং এই শুদ্ধভক্তি যে কোন ব্যক্তি লাভ করতে পারে।

যেই ভজে সেই বড় অভক্তহীন ছার।
কৃষ্ণভজনে নাহি জাতিকুলাদি বিচার ॥

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪/৬৭)

এখানে বলা হচ্ছে—যেই ভজে সেই বড়। এখানে কোন রকম উপাধির বিচার নেই।

সর্বোপাধিবিনির্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্মলম্।
হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে ॥

(নারদ পঞ্চরাত্র)

সেটি সমস্ত উপাধি-মুক্ত। মহাপ্রভু সেই সম্বন্ধে বলছেন যে—

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ ॥

(পদ্যাবলী ৭৪)

আমি ব্রাহ্মণ নই, ক্ষত্রিয় রাজা নই, বৈশ্য বা শূদ্র নই, ব্রহ্মচারী নই, গৃহস্থ নই, বাণপ্রস্থ নই, সন্ন্যাসীও নই। আমার একমাত্র পরিচয় হচ্ছে গোপীভর্তা যে কৃষ্ণ, সেই গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের দাসের অনুদাসের দাস। আর সেটিই হল বৈষ্ণবের প্রকৃত পরিচয়।

কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণ তত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয় ॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ৮/১২৮)

এই যে শুদ্ধ বৈষ্ণবের দৃষ্টান্তগুলি তার মধ্যে একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত নিয়ে এখন আলোচনা করা হবে।

বৃত্রাসুর আপাতদৃষ্টিতে একটা অসুর হলেও তিনি ছিলেন এক মহান বৈষ্ণব। তাহলে দেখা যাচ্ছে অসুরও বৈষ্ণব হতে পারে। অসুরও যদি বৈষ্ণব হয় তাহলে তিনি আমাদের প্রণম্য। বৃত্রাসুর পূর্বজন্মে ছিলেন চিত্রকেতু। চিত্রকেতু সারা পৃথিবীর রাজা। লক্ষ লক্ষ তাঁর মহিষী কিন্তু একটিও পুত্র নেই। ভাগ্যক্রমে বা দুর্ভাগ্যক্রমে তার প্রতিটি স্ত্রী ছিল বন্ধ্যা। পুত্রহীন হওয়ায় যেহেতু তার কোন উত্তরাধিকারী ছিল না, তাই চিত্রকেতু দুঃখে অত্যন্ত মুহ্যমান ছিলেন। এমতাবস্থায় একদিন অঙ্গিরা ঋষি এলেন এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'চিত্রকেতু মহারাজ, আপনি কেমন আছেন? মহারাজ বললেন—আমার সবকিছু থাকা সত্ত্বেও আমি পুত্রহীন। তাই আমার মনে কোন সুখ নেই। তখন অঙ্গিরা ঋষি বললেন—ঠিক আছে আমি একটি যজ্ঞ করব। সেই যজ্ঞের ফলে তুমি একটি পুত্র সন্তান লাভ করবে, কিন্তু সেই পুত্র তোমার সুখ

এবং দুঃখ দুইয়েরই কারণ হবে। তখন চিত্রকেতু ভাবলেন যে আমার যদি একটি পুত্র সন্তান হয় তবে অত্যন্ত সুখের কথা, তা নিয়ে একটু দুঃখ এলেও তখন মেনে নেওয়া যাবে। যথাসময়ে তার মহিষী কৃতদ্যুতির গর্ভে পুত্র সন্তান হল। তারফলে রাজা সর্বক্ষণ তার মহিষী কৃতদ্যুতি ও পুত্রকে নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন। এতে তাঁর অন্য মহিষীরা খুব ঈর্ষান্বিত হয়ে তারা সেই সন্তানকে বিষ প্রয়োগ করে মেরে ফেলে। রাজা অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে ক্রন্দন করতে থাকেন। তখন নারদ মুনি অঙ্গিরা ঋষির সঙ্গে ঘটনাক্রমে সেখানে উপস্থিত হন। তখন রাজা অত্যন্ত কাতরভাবে নারদ মুনির কাছে প্রার্থনা করেন যে এখন 'আমার এই পুত্রটিকে পুনর্জীবিত করুন।' নারদমুনি তখন রাজার অনুরোধে পুত্রটিকে পুনর্জীবিত করে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি কেন তোমার পিতা-মাতাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছ? তারা তোমার জন্য কত কষ্ট পাচ্ছে। তখন সেই পুত্রটি বলল—আমি বহুজন্ম এখানে এসেছি। কোন জন্মে মানুষ হয়েছি, কোন জন্মে পশু হয়েছি, কোন জন্মে পাখি হয়েছি। আপনি কোন্ জন্মের পিতা-মাতার কথা বলছেন? এইভাবে চিত্রকেতু তখন বুঝতে পারলেন যে, এই জীবন কত অনিত্য, এই দেহটি নশ্বর, এবং জীব সর্বক্ষণ একদেহ থেকে আরেক দেহে দেহান্তরিত হয়। এইভাবে চিত্রকেতুর প্রাথমিক জ্ঞান লাভ হল এবং তখন নারদমুনি চিত্রকেতুকে বিষ্ণুমন্ত্র দান করলেন। সেই মন্ত্র জপ করার ফলে চিত্রকেতু ভগবানের কৃপা লাভ করলেন। তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম শুদ্ধভক্ত নারদমুনির কৃপাতে চিত্রকেতু ভক্ত হলেন। এইভাবে ভক্তের কৃপাতেই ভক্তি লাভ করা যায়। তাই ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন—

শুদ্ধভকত চরণরেণু ভজন অনুকূল।

এইভাবে চিত্রকেতু কৃষ্ণনাম জপ করার ফলে ভক্ত হলেও তার কিছু জড়-জাগতিক কাম-বাসনা ছিল। ফলে তার এই মন্ত্রের প্রভাবে সাতদিনের মধ্যেই তিনি বিদ্যাধরদের রাজা হলেন। গন্ধর্ব-বিদ্যাধরেরা হলেন দেবতা, তারা উচ্চস্তরের জীব। তাদের রাজা হয়ে চিত্রকেতু তার মহিষীদের নিয়ে ব্রহ্মাণ্ডে ভ্রমণ করেছিলেন। একদিন দেখলেন, শিব পার্বতীকে কোলে করে বসে আছেন কৈলাসে এবং তাঁর চারপাশে সমস্ত মুনি ঋষিরা বসে আছেন, তা দেখে চিত্রকেতু খারাপ মন্তব্য করলেন যে, এ কি রকম আচরণ! মহাদেব এত মহান উন্নত স্তরের জীব, অথচ তিনি এই সাধু সমাবেশে তাঁর পত্নীকে কোলে নিয়ে বসে আছেন। এইভাবে শিবের সমালোচনা করার ফলেই পার্বতী চিত্রকেতুকে অভিশাপ দিলেন, তুমি অসুর যোনি প্রাপ্ত হবে।

এই সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে যে, চিত্রকেতু যদিও পার্বতীকে অভিশাপ দিতে পারতেন, অভিশাপের প্রতি অভিশাপ দিতে পারলেও চিত্রকেতু তা করেন নি। এইটি হল বৈষ্ণবের লক্ষণ। বৈষ্ণব সর্বদাই সবকিছুই ভগবানের কৃপারূপে গ্রহণ করে নেন। বৈষ্ণব কোন কিছুর প্রতিবাদ করেন না। চিত্রকেতুও প্রতিবাদ করলেন না। মাথা পেতে অভিশাপ অঙ্গীকার করে চিত্রকেতু সেখান থেকে চলে গেলেন। পরবর্তীকালে পার্বতীর অভিশাপের ফলে চিত্রকেতু বৃত্রাসুর রূপে জন্মগ্রহণ করলেন। তিনি এতই প্রভাবশালী বা বীর্যবান ছিলেন যে তিনি স্বর্গরাজ্যও অধিকার করে নিলেন। দেবতাদের পরাস্ত করে ত্রিভুবন জয় করলেন। দেবতারা পর্যন্ত তাঁর কাছে হেরে গেলেন। এমনই বৈষ্ণবের ক্ষমতা। বৈষ্ণবের শক্তি সমস্ত শক্তির চেয়ে শ্রেষ্ঠশক্তি। দেবতাদের রাজা ইন্দ্র পর্যন্ত পরাজিত হলেন এবং কিভাবে বৃত্রাসুরকে বধ করে পুনরায় ইন্দ্র তাঁর রাজ্য ফিরে পেতে পারেন সেই উপদেশ প্রাপ্ত হলেন। জানা গেল যে, দধিচি মুনির কাছ থেকে যদি তাঁর অস্থি পাওয়া যায় অর্থাৎ দধীচি মুনির দেহের হাড়গুলি দিয়ে যদি একটা বজ্র তৈরী করা যায়, তবে সেই বজ্র দিয়েই বৃত্রাসুরকে বধ করা যাবে। তখন দেবতাদের সঙ্গে ইন্দ্র গেলেন দধীচি মুনির কাছে। দধীচি মুনি সব কথা শুনে তাঁর দেহস্থ অস্থি দিয়ে বজ্র তৈরি করতে সম্মত হলেন। এখানে আমরা আরেকটি মহান দৃষ্টান্ত দেখতে পাচ্ছি, যাঁরা ভগবৎ ভক্ত, তাঁরাই এরকম ত্যাগ স্বীকার করতে পারেন। দধীচি বললেন—ঠিক আছে, এই দেহটি নশ্বর, আজকে না হোক কালকে, নয়তো একশত বৎসর পরে নষ্ট হবে। সুতরাং, দেহটি দিয়ে যদি কোনও ভাল কাজ হতে পারে তবে তাই হোক। এই বলে তিনি তাঁর দেহটি দান করলেন। তার অস্থি দিয়ে বজ্র তৈরি হল এবং তা দিয়ে ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে সংহার করলেন। আমরা দেখতে পাই বৃত্রাসুর যদিও জানতে পারলেন যে, তাঁর মৃত্যু অনিবার্য। কিন্তু তবুও তিনি একটুকুও ভয়ে ভীত হননি। অথচ কি সুন্দরভাবে ঐ সময় ভগবানের মহিমা কীর্তন করে যাচ্ছেন। তিনি বললেন, ভগবান যেটা করবেন সেটা হবেই। ভগবান যদি ইন্দ্রকে রাজা বানান এবং তার ফলে যদি আমার মৃত্যু হয় তা হোক, ভগবানের বিধান আমি মেনে নেবো, এবং ভগবানের চরণাশ্রয় করেই আমি সবসময় থাকবো। এইভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি ভগবানের যিনি ভক্ত তিনি যেকোন অবস্থাতেই থাকুক না কেন, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ। একজন অসুর পর্যন্তও ভগবানের শুদ্ধভক্ত হতে পারেন। এখানে আমরা দেখছি একদিকে বৃত্রাসুর অপরদিকে ইন্দ্র। এই দুইজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন বৃত্রাসুর।

ইন্দ্র তার নিজের সুখ ভোগের জন্য অন্যকে তার দেহটি পর্যন্ত ত্যাগ করতে বলছে। এটাই হল কর্মমিশ্রা ভক্তের দৃষ্টান্ত।

কামমিশ্রা ভক্তরা নিজেদের সুখভোগের জন্য সবকিছু করতে পারে। তাদের চিন্তাধারা হল, ঠিক আছে দধীচি মুনি দিয়ে দিক জীবনটা, কিন্তু আমি তো সুখভোগ করব। কিন্তু যে শুদ্ধভক্ত সে কোন কিছুর পরোয়া করে না। সেইটি হচ্ছে বৃত্রাসুরের মাহাত্ম্য। এমনি হচ্ছে শুদ্ধ ভক্তের প্রভাব এবং মহিমা। আমরা যে পথটি অবলম্বন করছি সেইটি হচ্ছে দৃষ্টান্ত।

ভক্ত সর্বদা গুরুত্ব দেন কৃষ্ণের ইচ্ছার উপর। তিনি যদি আমার দেহটা চান তবে আমি তা দিয়ে দেবো। শুদ্ধভক্ত সর্বদা সেটাকে ভগবানের কৃপা এবং আশীর্বাদ হিসেবে গ্রহণ করেন। বৃত্রাসুর অসুর হলেও দেহের প্রতি তার কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। তিনি ভাবলেন যদি আমি অসুর যোনিও লাভ করি তাতে তো ক্ষতি নেই, কিন্তু যেন কৃষ্ণকে কখনও না ভুলে যাই। এইটি হচ্ছে ভক্তের একমাত্র কামনা।

অসুর শব্দের দুইটি অর্থ, একটি হচ্ছে যারা ভগবৎ বিদ্বেষী। দ্বিতীয়টি হল দেবতাদের যারা বিরোধী। কিন্তু তিনি ভগবৎ বিদ্বেষী নাও হতে পারেন। সুরদের অর্থাৎ দেবতাদের বিরোধী বলেই তিনি অসুর।

জ্ঞানমিশ্রা ভক্তের অনেক দৃষ্টান্ত আছে। যেমন ভীষ্মদেব এবং কুমাররাও একটা স্তরে জ্ঞানমিশ্রা ভক্ত। জ্ঞানমিশ্রা ভক্তরা সবসময় যে জ্ঞানমিশ্রা ভক্ত তা নয়। একটা স্তরে তারা জ্ঞানমিশ্রাভক্ত। তার পরে তারা শুদ্ধভক্তের স্তরে আসতে পারে। যারা মুক্তি কামনা করে তারা জ্ঞানমিশ্রা ভক্ত। ভীষ্মদের জ্ঞান-মিশ্রা ভক্ত হওয়ার কারণ তিনি শাস্ত্রের নীতির উপর বেশি জোর দিয়েছেন। কৃষ্ণভক্তির কাছে তাদের ন্যায়নীতিটা বড় বলে প্রতিপন্ন হয়। এখানে ভীষ্মদেব পাণ্ডবদের পক্ষ অবলম্বন করছেন না কেন ? তার কারণ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম হচ্ছে যার অন্ন খাবে তার পক্ষ অবলম্বন করা। যেহেতু তিনি দুর্যোধনের অন্ন খেয়েছেন, তাই তিনি দুর্যোধনের পক্ষ অবলম্বন করছেন। কিন্তু অন্তিম সময়ে আবার শুদ্ধভক্তের পন্থা অবলম্বন করেছেন। তার দৃষ্টান্ত হল—ভীষ্মদেব যখন যুধিষ্ঠির মহারাজকে তাঁর শরশয্যা অবস্থায় উপদেশ দিচ্ছিলেন তখন দ্রৌপদী মুচকি হাসলেন। তার মুখের হাসি দেখে ভীষ্মদেব জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি হাসলে কেন ? তখন দ্রৌপদী বললেন, যে যখন কৌরবরা আমায় অপমানিত করেছিল, তখন আপনার এই উপদেশ ও তত্ত্বজ্ঞান কোথায় ছিল? তখন ভীষ্মদেব বললেন, সেই সময় যেহেতু আমি দুর্যোধনে অন্ন খেয়েছিলাম তাই

আমার চিন্তাধারা দূষিত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এই শরশয্যায় শয়নের ফলেই আমার শরীর থেকে সেই সমস্ত দূষিত রক্ত বের হয়ে গেছে। সেইজন্য এখন আমি সেই চেতনা থেকে মুক্ত হয়ে গেছি। অর্থাৎ ভীষ্মদেব আগে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তের স্তরে ছিলেন। পরে শুদ্ধভক্তের স্তরে উন্নীত হয়েছেন।

পর্ব–২
বৈদিক ধর্মের পুনর্জাগরণ

বৈষ্ণব শব্দটি আসছে বিষ্ণু থেকে। অর্থাৎ বিষ্ণুর যাঁরা ভক্ত বা সেবক তাঁকে বৈষ্ণব বলা হয়। বিষ্ণু হচ্ছেন ভগবান। আর বৈষ্ণব হলেন ভগবানের ভক্ত। অতএব বৈষ্ণব ভগবান থেকে আসছেন। প্রতিটি জীব হচ্ছেন বৈষ্ণব। ভগবদ্ধামে সকলেই বৈষ্ণব। জীব যখন জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয় তখনই জীব অবৈষ্ণবে পরিণত হয়। অর্থাৎ তার বৈষ্ণব সত্ত্বা হারিয়ে ফেলে। তাই সৃষ্টির আদিতেই ভগবান কিভাবে বৈষ্ণব হওয়া যায় সেই পরম শিক্ষা প্রদান করেন। এই শিক্ষা প্রথমে তিনি ব্রহ্মাকে প্রদান করেন এবং সেই জ্ঞানটি বেদরূপে প্রকাশিত হয়েছে। ভগবান সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মাকে প্রণব বা গায়ত্রীমন্ত্র দান করেন। সেই গায়ত্রীমন্ত্র জপ করার ফলে ব্রহ্মার হৃদয়ে দিব্যজ্ঞান প্রকাশিত হয়।

তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎসূরয়ঃ। (ভাগবত ১/১)

সেই জ্ঞানটি ব্রহ্মার মাধ্যমে প্রকাশ হল। তাই সেটি বেদ। যেহেতু গায়ত্রী থেকে বেদের উদ্ভব হয় তাই গায়ত্রীকে বেদমাতা বলা হয়। যেমন মাতার গর্ভে সন্তানের জন্ম হয়, তেমনি গায়ত্রীর মধ্য থেকে বেদের উদ্ভব হয়। বেদ থেকে একটি শাখার উদ্ভব হয়। বেদের আরও দুটি শাখা আছে। একটি শাখা এই জড় জগতে প্রসারিত হয়েছে। কিভাবে জড় জগৎটিকে ভোগ করা যায়। সেই শাখাটিকে বলা হয় কর্মকাণ্ড। যখন জড় জগতের প্রতি বীতশ্রদ্ধ বা বিতৃষ্ণ হয়ে জীব মুক্ত হতে চায় তখন বেদের যে দিকটি বা যে অংশটি সেই মুক্ত হওয়ার তত্ত্বটিকে প্রকাশ করছেন তাকে বলা হয় জ্ঞানকাণ্ড। অতএব কর্মকাণ্ড ও

জ্ঞানকাণ্ড দুটিই জড় জগৎ ভিত্তিক। অর্থাৎ একটি জড় জগৎ ভোগ ও অপরটি জড় জগৎ ত্যাগ। অতএব দুটিই জড় জগৎকে কেন্দ্র করে। তাই এই দুটিকেই জড় জগতের সঙ্গে জড়িত বলে বিচার করা হয়েছে। তাই জড় জগতের অতীত যে আর একটি শাখা প্রসারিত হয়েছে চিৎ জগতের প্রতি, সেই শাখার মাধ্যমে কেবল ভগবত-তত্ত্ব জ্ঞান লাভ হয়। সেই শাখাটিকে বলা হয় ভগবৎ-তত্ত্ব। অতএব বেদের আমরা দুইটি দিক পাচ্ছি। একটি কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের আর একটি ভগবদ্‌তত্ত্ব জ্ঞান বা ভগবদ্ভক্তির পন্থা। ভগবদ্ভক্তির পন্থাই হল বেদের প্রকৃত উদ্দেশ্য। অর্থাৎ বেদের উদ্দেশ্য হল ভগবানকে জানা।

বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্ বেদবিদেব চাহম্ ॥

(ভগবদ্‌গীতা ১৫/১৫)

সমস্ত বেদের মধ্যে একমাত্র জ্ঞাতব্য হচ্ছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। সেটিই বেদের প্রকৃত উদ্দেশ্য। এবং সেই শাখাটিতে ভগবদ্‌তত্ত্ব জ্ঞান এবং ভগবদ্ভক্তির পন্থা নিরূপিত হয়েছে। সেইটি হচ্ছে ভাগবত পরম্পরা ধারা। সেই ধারাটি ব্রহ্মা থেকে নারদ, নারদ থেকে বেদব্যাস, বেদব্যাস থেকে মধ্বাচার্য এইভাবে প্রসারিত হয়েছে। এইভাবে অনাদি কাল থেকে এই তত্ত্বজ্ঞান অর্থাৎ ভগবদ্‌তত্ত্ব জ্ঞান বা চিন্ময় জগতের কথা পরম্পরাক্রমে আমরা লাভ করতে পেরেছি। এই জড় জগতের ঊর্ধ্বে আর একটি জগৎ আছে। সেটি চিদ্ জগৎ। সেই জগৎটি আমাদের জড় ইন্দ্রিয়ের অতীত।

অপ্রাকৃত বস্তু নহে ইন্দ্রিয় গোচর ।

অপ্রাকৃত তত্ত্ব বা বস্তু আমাদের এই প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রহণীয় নয়। তা অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রাহ্য। অতএব সেই জিনিসটি আমরা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা দর্শন বা স্পর্শ করতে পারি না। যেমন ভারতবর্ষে বসে, আমেরিকা কি রকম দেশ তা জানতে পারবো না। কিন্তু যে আমেরিকায় গেছে সে যদি এসে আমেরিকার কথা বলে তাহলে জানা যাবে। যে আমেরিকা ঘুরে এসেছে সে যদি আমেরিকার সম্বন্ধে একটি বই লেখে তাহলে সেই বইটি পড়ে আমরা জানতে পারবো। ঠিক তেমনই ভগবদ্ধামের কথা বা চিৎ জগতের কথা আমরা জানতে পারি কেবল তাঁদেরই মাধ্যমে, অর্থাৎ যাঁরা চিৎ জগত দর্শন করেছেন এবং যারা চিৎ জগৎ দর্শন করে গ্রন্থাবলী রচনা করেছেন তার মধ্য দিয়ে। এখন এই চিৎ জগৎ সম্বন্ধে গ্রন্থাবলী হচ্ছে শাস্ত্র এবং সেই শাস্ত্র হচ্ছে বেদ। এখানে এই যে বৈদিক তত্ত্বজ্ঞান সেটি পরম্পরা ক্রমে অর্থাৎ গুরু থেকে শিষ্য

এবং সেই শিষ্য পরে গুরু হয়ে তার শিষ্যকে এই জ্ঞান দান করেছেন। এইভাবে একটা নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে পরম্পরা ধারায় এই জ্ঞান অনাদি কাল থেকে প্রবাহিত হয়ে আসছে এবং সেই জ্ঞানটির ধারক এবং বাহক ছিল ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়। সেই ভাবেই এই জ্ঞানটি প্রবাহিত হয়ে আসছিল। কিন্তু কলিযুগের আগমনের ফলে তা বিনষ্ট হয়ে যায়। কলিযুগ হল অধর্মের যুগ। ধর্ম শব্দটির অর্থ হচ্ছে ভগবানের দেওয়া আইন। ভগবান যে আইনটি দান করেছেন, সেই আইনটি মেনে চলাই হচ্ছে ধর্ম। যে মেনে চলবে তার কল্যাণ হবে। আমরা ভারতবর্ষে আছি। ভারতবর্ষের আইন যারা মেনে চলবে তারা সরকারের কাছ থেকে স্বীকৃতি পাবে। তারা সব রকমের সুযোগ-সুবিধা, সাহায্য এবং প্রতিরক্ষা পাবে। এবং যারা আইন ভঙ্গ করবে তাদের দণ্ডভোগ করতে হবে। ঠিক তেমনি এই জগৎটিও হচ্ছে ভগবানের রাজ্য। এই জগতের নিয়ম-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য ভগবান আইন দিয়ে গেছেন, আর সেই আইনগুলি মেনে চলাই হচ্ছে ধর্ম। "ধর্মন্তু সাক্ষাদ্ ভগবৎ প্রণীতম্।"

ধর্ম সাক্ষাৎ ভগবানের প্রণীত আইন এবং সেই আইন যদি আমরা মেনে চলি তাহলে জগতের শৃঙ্খলা বজায় থাকবে। আমরা যদি আইন ভঙ্গ করি তাহলে বিশৃঙ্খলা বা অশান্তির সৃষ্টি হবে। যারা ভগবানের আইন মেনে চলে তাদের বলা হয় ধার্মিক। আর যারা মেনে চলে না তাদের বলা হয় অধার্মিক। ধর্ম আবার চারটি পা বা স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে আছে। ধর্মের সেই পাগুলি হল—সত্য, শৌচ, তপঃ ও দয়া। সত্যযুগে ধর্মের চারটি পা অক্ষত ছিল। কিন্তু ত্রেতা যুগে একটি পা (তপঃ) ভেঙ্গে গেল। অর্থাৎ তপস্যা হারিয়ে ফেলল। দ্বাপর যুগে দয়া এবং কলিযুগে শৌচ হারিয়ে গেল। এখন এই কলিযুগ কেবলমাত্র একটি পা বা সত্যের উপর দাঁড়িয়ে আছে। যদি আমরা সত্যকেও ত্যাগ করি তাহলে ধর্ম সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যাবে। ধর্মের যখন একটি পা ভাঙ্গে তখন অধর্মের একটি পা গজায়। ধর্মের যখন দয়া পাটি ভেঙ্গে গেল তখন অধর্মের আমিষ আহার পা-টি গজালো। ত্রেতাযুগের শেষে দ্বাপর যুগে যখন তপঃ পা-টি ভেঙ্গে গেল তখন অধর্মের আসবপান বা নেশা নামক পাটি গজালো। তারপর কলিযুগের আগমনে যখন ধর্মের তৃতীয় পাটি (শৌচ) ভেঙ্গে গেল অর্থাৎ তখন অধর্মের অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ পাটি গজালো। এই কলিযুগে যখন ধর্মের চতুর্থ পাটি (সত্য) ভেঙ্গে যাচ্ছে তখন অধর্মের দ্যুতক্রীড়া পা'টি দেখা দিচ্ছে। এই কলিযুগটি হচ্ছে অধর্মের যুগ। এখন এই অধর্মের যুগে ধর্মকে নাশ করার জন্য সম্পূর্ণরূপে কলি বেদকে নষ্ট করার পরিকল্পনা করল। কারণ

বেদের উপর ভিত্তি করে ধর্ম রয়েছে। তাই কলি বেদের উপর নানা রকম অনাচারের প্রবেশ করাল বা সৃষ্টি করল। যেমন বেদের ধারক ছিল ব্রাহ্মণেরা। এখন কলিযুগকে আশ্রয় করে রাক্ষস-বৃত্তিসম্পন্ন কিছু জীবাত্মা বা মানুষরূপে ব্রাহ্মণ গৃহে জন্মগ্রহণ করল।

রাক্ষসাঃ কলিম্ আশ্রিত জায়ন্তে ব্রহ্মযোনিষু ॥

তার ফলে বৈদিক আচরণগুলো ভ্রষ্ট হতে শুরু করল। মানুষ বেদ বা বেদের প্রতি তাদের আস্থা হারিয়ে ফেলতে লাগল। এই বেদের অনাচারের ফলে, কলিযুগের প্রভাবে অসৎ আচরণ শুরু হল। যেমন কৌলিন্য প্রথা সৃষ্টি করল। কৌলিন্য প্রথা হল—কুলীন ব্রাহ্মণের মেয়েদের কুলীন ব্রাহ্মণের ছেলের সঙ্গে বিবাহ দিতে হবে। আর যদি তা না হয়, তা হলে সেই ব্রাহ্মণ তার কৌলিন্য হারিয়ে জাতিচ্যুত হবে। অর্থাৎ মেয়েকে যথাযথ ব্রাহ্মণের গৃহে বিবাহ না দিতে পারলে তারা জাতিচ্যুত হবে। দেখা গেল কুলীন ব্রাহ্মণের সংখ্যা কম আর মেয়েদের সংখ্যা বেশী। তাই এক ব্রাহ্মণ বহু মেয়েকে বিবাহ করতে লাগলো। তারা পঞ্চাশটি গ্রামে পঞ্চাশটি মেয়েকে বিয়ে করে শুধু ঘুরে ঘুরে বেড়াত। কখনও এই শ্বশুর বাড়ি আবার কখনও অন্য শ্বশুর বাড়ি। এইভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। শুধু তাই নয় এইসঙ্গে সতীদাহ প্রথা শুরু হল। সতীদাহ প্রথাটি বৈদিক আচরণ। বেদে তার নির্দেশ আছে। যেমন আমরা মহাভারতে দেখতে পাই কুন্তি এবং মাদ্রী পাণ্ডুর মৃত্যুর পরে দুজনেই সহমৃতা হতে চেয়েছিলেন। তখন তারা বিচার করে দেখল "দুজনেই যদি সহমৃত্যুবরণ করি তাহলে আমাদের এই পাঁচটি শিশু পুত্রকে দেখার জন্য কেউ থাকবে না। তাহলে আমাদের একজনকে বেঁচে থাকতে হবে।" এবং তাই নিয়ে তাদের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক শুরু হল। কুন্তী বলল—"যেহেতু আমি বড়, তাই আমি সহমৃতা হব।" আর মাদ্রী বলল—"তোমার তিনটি পুত্র তাই তোমাকে থাকতে হবে। যেহেতু আমার জন্য স্বামীর মৃত্যু হল তাই আমারই সহমৃতা হওয়া কর্তব্য।" এইভাবে তখন স্বেচ্ছায় তারা পতির সঙ্গে সহমৃতা হতেন। কিন্তু এই কলিযুগের প্রভাবে এটি প্রথাতে পরিণত হল। একে বলা হয় সতীদাহ প্রথা। অর্থাৎ পতির যদি মৃত্যু হয় তাহলে তার পত্নীকে জোর করে সেই পতির চিতার আগুনে ফেলে দেওয়া হতো। এইরকম সমস্ত নৃশংস আচরণ বেদের নামে হতে শুরু করল এবং বেদের নামে ব্রাহ্মণেরা অসংখ্য পশুবলি দিতে শুরু করল। এইভাবে বেদের নামে অধর্মের প্রসার এতো বাড়তে লাগল যে ভগবান তখন মানুষকে বেদ বিমুখ করতে এই সমস্ত অনাচার বন্ধ করার জন্য বুদ্ধদেব রূপে আবির্ভূত হলেন।

নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহ অশ্রুতিজাতং
সদয়-হৃদয় দর্শিত-পশুঘাতং ॥

ভগবানের সদয় হৃদয় এই জীবহত্যা দর্শন করে ব্যথিত হয়েছিলেন। যজ্ঞ বিধির নাম করে যে সমস্ত আচরণ হচ্ছিল সেইগুলিকে বন্ধ করার জন্য তিনি বুদ্ধদেব রূপে আবির্ভূত হয়ে ভারতবাসীদের বেদ-বিমুখ করলেন।

বেদ না মানিয়া বুদ্ধ হইল নাস্তিক।

বৌদ্ধরা যেহেতু বেদ মানেন না তাই তাঁরা প্রচ্ছন্ন নাস্তিক। সরাসরি ভাবে নাস্তিক নন তাঁরা। তাঁদের আচরণ দেখে মনে হয় যেন তাঁরা ভগবানকে মানেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁরা ভগবানকে মানছেন না। এটি প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতার একটি দিক। আর একটি দিক হল যে, যদিও তাঁরা নাস্তিক কিন্তু যেহেতু তাঁরা বুদ্ধদেবকে মানছেন এবং যেহেতু বুদ্ধদেব হচ্ছেন ভগবানের অবতার, তাই তাঁরা পরোক্ষভাবে আস্তিক। এইভাবে প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতাবাদ তিনি সৃষ্টি করলেন। এবং বুদ্ধদেবরূপে অবতীর্ণ হয়ে বৈদিক অনাচারগুলি সংশোধন করলেন। তখন বুদ্ধদেবের প্রভাবে প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষ বেদবিমুখ হয়ে পড়েছিল। আবার কালক্রমে আমরা দেখতে পাই যে ক্ষত্রিয়রা বৌদ্ধ হয়ে যায়। আর সেই সময় জৈনধর্ম রূপে আর একটি শাখা আস্তিকতার বাণী নিয়ে প্রকাশিত হয়। জৈন ধর্মের উদ্ভব হয়েছিল ঋষভদেবের থেকে। কিন্তু ঋষভদেব হলেন ভগবানের অবতার। তিনি ছিলেন পৃথিবীর রাজা এবং ভরত মহারাজ ও নবযোগেন্দ্রের পিতা। তিনি এক সময় তাঁর পুত্রদের উপর রাজ্যভার অর্পণ করে গৃহত্যাগী হন। তখন তিনি অবধূতের মতো সর্বত্র ভ্রমণ করতে থাকেন। কিন্তু ঋষভদেবের আচরণ সম্পূর্ণ উন্মাদের মতো ছিল। তা সত্ত্বেও সকলেই ঋষভদেবের অনুগমন করতে শুরু করে। তা দেখে কঙ্কা ও বেঙ্কা প্রদেশের রাজা অর্হত ভাবলেন, আমি এত বড় রাজা হওয়া সত্ত্বেও তো এত লোক আমার সঙ্গে ছোটে না, এত লোক তো আমাকে মানে না। তাই আমি যদি এই লোকটির মতো আচরণ করি তাহলে হয়তো লোকেরা আমাকে শ্রদ্ধা ও পূজা করবে। এই ভেবে রাজা অর্হত ঋষভদেবের অনুকরণ করতে শুরু করলেন। তার ফলে একটি সম্প্রদায় সৃষ্টি হয়। মহাবীর এসে সেই সম্প্রদায়টিকে গ্রহণ করেন। জৈনরা বলে যে জৈন ধর্মের প্রবর্তক হচ্ছেন ঋষভদেব আর দ্বিতীয় তীর্থঙ্কর হচ্ছেন অর্হত বা অহন্ত। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে আমরা দেখতে পাচ্ছি ঋষভদেবের অনুকরণকারী অর্হত বলে কঙ্কার এবং বেঙ্কার প্রদেশের এক রাজা। কিন্তু তাঁর ধর্মটিও অনেকটা বৌদ্ধ ধর্মের মতোই

অহিংস ধর্ম। বুদ্ধদেবের সমসাময়িক মহাবীরের দ্বারা জৈনধর্মেরও প্রসার শুরু হয়। এই সময় ক্ষত্রিয়দের সঙ্গে বৈশ্যদের একটা বিবাদ গড়ে ওঠে। তার ফলে বৈশ্যরা জৈন ধর্মের অনুসরণ করে। আর ক্ষত্রিয়রা বুদ্ধদেবের অনুসরণ করে। যার ফলে ক্ষত্রিয় সম্প্রদায় অহিংস হয়ে যায়। ক্ষত্রিয়রা যদি অহিংস হয় তাহলে সমাজকে রক্ষা করবে কারা? বিদেশীর আক্রমণ থেকে রাজ্যকে রক্ষা করবে কারা? এইভাবে ক্ষত্রিয় সমাজ বিধ্বস্ত হয়ে যাওয়ার ফলে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাবে ভারতবর্ষ অত্যন্ত ক্ষীণবীর্য হয়ে পড়ে। তাই আমরা দেখতে পাই যে ভারতবর্ষের ইতিহাসে অনাদিকাল থেকে কোন বিদেশী রাজা বা বিদেশী শত্রু ভারতবর্ষে প্রবেশ করতে পারেনি। তারা বহুবার ভারতবর্ষকে আক্রমণ করেছে। কিন্তু কেউ ভারতবর্ষে প্রবেশ করতে পারেনি। পক্ষান্তরে ভারতবর্ষের রাজারাই সারা পৃথিবীর উপরে আধিপত্য করে এসেছে। পরীক্ষিৎ মহারাজ পর্যন্ত ভারতবর্ষের রাজারাই সসাগরা পৃথিবীর রাজত্ব করে গেছেন। সসাগরা মানে সাগর সমন্বিত কেবল স্থলভাগই নয়, জল ভাগ সমন্বিত পৃথিবীর একছত্র রাজা ছিলেন। সেটি আমরা দেখতে পাই পরীক্ষিৎ মহারাজের রাজত্ব পর্যন্ত। আর পরীক্ষিৎ মহারাজের সময় থেকেই কলিযুগের সূচনা হয়। ক্রমে ক্রমে এইভাবে যখন ভারতের বর্ণাশ্রম ধর্ম বা বৈদিক ধর্মের অবক্ষয় হতে থাকে তখন ভারতবর্ষের রাজারা অত্যন্ত হীনবীর্য হয়ে পড়ার ফলে বিদেশীরা এসে ভারতে প্রবেশ করার সুযোগ পায়। ভারতের ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই যে, আজ থেকে প্রায় এক হাজার বৎসর আগেই বিদেশীরা ভারতে প্রবেশ করেছে। দশম শতাব্দীতে আফগানিস্তানের অধিবাসী পশ্তুভাষীদের দল, সাম্রাজ্যলোভী পাঠান সুলতান মামুদ সতেরবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছিল। কিন্তু প্রতিবারই পরাজিত হয়। পরবর্তীকালে পাঠান সুলতান মহম্মদ ঘোরি, গিয়াসুদ্দিন তুঘলক প্রমুখ বিদেশী আক্রমণকারীরা ভারতীয় রাজাদের পরাজিত করে ভারতবর্ষে প্রবেশ করে এবং রাজত্ব শুরু করে।

আমরা দেখেছি এইভাবে কালক্রমে ভারতবর্ষ বিদেশীদের হস্তগত হয়েছে। বৈদিক ধর্মের থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ার ফলেই বিদেশীরা ভারতকে পরাভূত করতে পেরেছিল। তাহলে দেখা যাচ্ছে আমাদের সংস্কৃতি যদি আমরা হারিয়ে ফেলি তার ফলে আমাদের নানারকম অসুবিধাই কেবল হচ্ছে না, আমাদের সর্বনাশও হচ্ছে। আর আমাদের এই সর্বনাশ থেকে উদ্ধারের একমাত্র উপায় হল আমাদের বৈদিক সংস্কৃতিকে পুনরায় অবলম্বন করা। বৈদিক সংস্কৃতি বলতে বোঝায়—বর্ণাশ্রম ধর্ম এবং তার চরম প্রকাশ বৈষ্ণব ধর্ম। বুদ্ধদেব

আসার পরেই যদিও সংস্কৃতির বিপর্যয় বা অবক্ষয় হয়েছে, তবুও একটা ভালো দিক আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, ক্রমে ক্রমে সেই যে নাস্তিকতাবাদ থেকে আবার পুনরায় বেদের সংস্থাপন হলো।

প্রথমে শঙ্করাচার্য এলেন। শঙ্করাচার্য এসে ভারতবর্ষ থেকে বৌদ্ধধর্ম উৎখাত করলেন। বুদ্ধদেবের সিদ্ধান্ত ছিল যে, ১০টি সৎ কর্ম করাই হচ্ছে ধর্ম, আর জীবনের চরম উদ্দেশ্য হচ্ছে নির্বাণ। নির্বাণ মানে শূন্যে লীন হয়ে যাওয়া। শঙ্করাচার্য এসে বললেন—দেখো তোমরা যে-নির্বাণের কথা বলছ সেটা তো বেদের কথা বা বেদের বাণী। আর বেদে নির্বাণের অর্থ শূন্যে বিলীন হয়ে যাওয়া বা ব্রহ্মে লীন হয়ে যাওয়া নয়। নির্বাণের অর্থ হল পূর্ণে লীন হয়ে যাওয়া। ব্রহ্ম কি তা তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন। যেহেতু বৌদ্ধরা নাস্তিক, তাই পূর্ণরূপে শঙ্করাচার্য বেদের তত্ত্বটি প্রদান করলেন না। যতটুকু তাদের পক্ষে গ্রহণীয় বা শিক্ষণীয় হয়, ঠিক ততটুকুই তাদের প্রদর্শন করলেন। তিনি বললেন যে, ব্রহ্ম হচ্ছে নিরাকার, নিঃশক্তিক ও নির্বিশেষ এবং সেই ব্রহ্মে লীন হয়ে যাওয়াই হচ্ছে জীবনের উদ্দেশ্য। তাঁর সিদ্ধান্তটি প্রতিষ্ঠা করার জন্য তিনি বললেন "ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা।" জগৎ মিথ্যাটি হল—যেমন রজ্জুতে কখনও সর্পভ্রম হয় বা মরিচিকায় জল ভ্রম হয়। ঠিক তেমনই এই জগৎটি ভ্রম। প্রকৃত পক্ষে কিন্তু এটি তা নয়। আমাদের এই জগৎটি বাস্তব বলে মনে হতে পারে। আসলে রজ্জুতে যেমন সর্প নেই, ঠিক তেমনই এই জগতে বাস্তব বস্তুটি নেই। এই সিদ্ধান্ত দিয়ে শঙ্করাচার্য বৌদ্ধদের নিরস্ত করেন। তিনি পুনরায় বেদ প্রতিষ্ঠা করলেন। তারপরে রামানুজাচার্য এসে শঙ্করাচার্যের এই যে মত, সেটিও তিনি খণ্ডন করলেন। তাঁর কয়েকটি দৃষ্টান্ত এই রকম যে, শঙ্করাচার্য বলেছেন "ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা।" যেমন রজ্জুতে কোন সর্প ভ্রম হয়, তেমনই এই জগৎটা ভ্রম। রামানুজাচার্য বললেন, ঠিক আছে রজ্জুতে সর্প নেই মানলাম কিন্তু কোথাও না কোথাও সর্প আছে বলে ভ্রম হচ্ছে। যদি সর্প না থাকতো তাহলে রজ্জুতে সর্প ভ্রমের কোন প্রশ্নই উঠত না। অতএব এই জগৎটি যাকে আমরা বাস্তব বলে মনে করছি সেটি বাস্তব নাও হতে পারে। কিন্তু বাস্তব জগৎটি কোথাও রয়েছে বলেই এই জগৎটিকে আমরা বাস্তব বলে মনে করছি। এইভাবে তিনি শঙ্করাচার্যের মত খণ্ডন করে প্রতিষ্ঠা করলেন এই জড় জগতের ঊর্ধ্বে আর একটি জগৎ রয়েছে। এই জগৎটি হচ্ছে সেই জগতের প্রতিবিম্ব। এই জগতে যা কিছু রয়েছে তা সব ঐ জগতেও রয়েছে এবং ঐ জগৎটি বাস্তব, এবং এই জগৎটি তার ছায়া। এবং ছায়ারূপে এই

জগৎটিও সত্য, মিথ্যা নয়। যেমন জলে গাছের ছায়া পড়ে তাহলে জলে যা কিছু দেখা যায়, গাছটিতে সেই সবকিছু রয়েছে বলেই দেখা যাচ্ছে। যদি গাছটিতে সবুজ পাতা আর লালফুল না থাকতো, হলুদ ফল না থাকতো তাহলে জলে লাল ফুল, হলুদ ফল দেখা যেতো না। সেই জন্য তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন—এই জগতের যে বৈচিত্র্য তা ঐ জগতেও রয়েছে। এইভাবে তিনি শঙ্করাচার্যের কেবলাদ্বৈতবাদের পরিবর্তে তিনি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠা করলেন। তারপর মধ্বাচার্য এসে আরও দৃঢ়ভাবে তার মধ্বগৌড়ীয় সম্প্রদায়ের মাধ্যমে এই জগতে বৈষ্ণব ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করলেন। শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদ এবং বৈষ্ণবদের দ্বৈতবাদ তার মধ্যে একটা সংঘর্ষ গড়ে উঠেছিল। অবশেষে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এসে তাঁর অচিন্ত্য ভেদাভেদতত্ত্বের মাধ্যমে শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদ এবং বৈষ্ণব আচার্যদের দ্বৈতবাদের সমন্বয় সাধন করলেন। তিনি বললেন যে গুণগতভাবে ব্রহ্ম জীব এবং প্রকৃতির মাঝে ঐক্য বা অভেদ রয়েছে, কিন্তু আয়তনগতভাবে তাদের মধ্যে পার্থক্য আছে। যেমন জীব এবং ঈশ্বর। গুণগতভাবে জীবও সচ্চিদানন্দময়, ভগবানও সচ্চিদানন্দময়। কিন্তু আয়তনগতভাবে জীব ক্ষুদ্র, ভগবান পূর্ণ। যেমন সমুদ্রের জল এবং একবিন্দু জল। কিন্তু কেউ যদি বলে যে একবিন্দু জলটাই সমুদ্র তাহলে সেটা ঠিক হবে না। ঠিক যেমন আগুনের স্ফুলিঙ্গও আলো এবং সূর্যের কিরণও আলো। কিন্তু আমরা কিরণ ও আগুনের কণাকে কি সূর্য বলি? গুণগতভাবে এক হলেও আয়তনগত ভাবে আলাদা। কিন্তু যে বিষয়টি নিয়ে আমরা আলোচনা করছি সেটি অচিন্ত্য; চিন্তার অতীত। অতএব অচিন্ত্য তত্ত্বটি বা বস্তুটি যদিও অচিন্ত্য, তবুও তার মধ্যে ভেদ এবং অভেদ দুটিই রয়েছে। একদিকে ভেদ রয়েছে আর এক দিকে অভেদ রয়েছে। এইভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্বের মাধ্যমে বেদের পূর্ণ তত্ত্বটি প্রতিষ্ঠিত করলেন।

পর্ব–৩

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের কারণ

কালের আবর্তন হয় চক্রাকারে। যেমন একটি সেকেণ্ডের পরে আর একটি সেকেণ্ড আসে, একটি মিনিটের পরে আর একটি মিনিট শুরু হয়। একটি দিনের পরে শুরু হয় আর একটি দিন। একটি সপ্তাহের পরে আবার শুরু হয় আর একটি সপ্তাহ। একটি মাসের পরে শুরু হয় অন্য একটি মাস এবং একটি বছরের পর শুরু হয় অন্য একটি বছর। এইভাবে আমরা দেখতে পাই কাল চক্রাকারে ভ্রমণ করে। কালের যে বৃহত্তর চক্র বা আবর্তন সেটি হচ্ছে যুগ। চারটি যুগ—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি। এই চারটি যুগ নিয়ে চতুর্যুগ এবং সেই চতুর্যুগের পরে আর একটি চতুর্যুগ। সত্যযুগের পরে আসে ত্রেতা, ত্রেতা যুগের পরে আসে দ্বাপর, দ্বাপরের পরে আসে কলি, কলির পরে আবার সত্যযুগ। এমনি করেই কালের আবর্তন হয় চক্রাকারে। এইভাবে একহাজার চতুর্যুগে ব্রহ্মার একদিন হয়। এবং সেই একদিনে প্রতিদিন একবার স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই ব্রহ্মাণ্ডে আসেন। কখনও আসেন অষ্টবিংশতি চতুর্যুগে। একহাজার চতুর্যুগের মধ্যে অষ্টবিংশতি চতুর্যুগের দ্বাপরে ভগবান স্বয়ং অবতীর্ণ হন। সেই স্বয়ং ভগবানের রূপটি দ্বিভুজ শ্যামসুন্দর মুরলীধর। এটি হচ্ছে ভগবানের স্বরূপ বা স্বয়ংরূপ। সেই স্বয়ংরূপ ভগবান থেকে প্রথম বিস্তার হয় বলরামের। বলরাম থেকে বিস্তার হয় দ্বারকার চর্তুব্যূহ। অর্থাৎ বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ। তারপর সেই সংকর্ষণ থেকে বৈকুণ্ঠের অসংখ্য নারায়ণের বিস্তার হয় বৈকুণ্ঠলোকে। আর তারপরে এই জগৎ সৃষ্টির জন্য সেই সংকর্ষণের অংশ মহাবিষ্ণু তিনি কারণোদকশায়ী। তিনি কারণসমুদ্রে শয়ন করেন এবং তাঁর নিঃশ্বাসের ফলে যে বুদবুদের সৃষ্টি হয়ে কারণসমুদ্রে উঠে সেই বুদবুদগুলি এক একটি ব্রহ্মাণ্ড। এইভাবে শাস্ত্রে চিৎ-জগৎ এবং জড় জগতের বর্ণনা রয়েছে। এই স্বয়ংরূপ ভগবান অর্থাৎ বৃন্দাবনের লীলাবিলাসকারী ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ, যিনি স্বয়ং ভগবান, তিনি এই জড় জগতে অর্থাৎ এই ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মার একদিনে একবার অবতীর্ণ হন। সৌভাগ্যক্রমে এইটি হচ্ছে অষ্টবিংশতি চতুর্যুগ। অর্থাৎ এই যুগে আজ থেকে ৫০০০ বছর আগে দ্বাপর যুগে স্বয়ং ভগবান লীলাবিলাস করে গেছেন। ভগবান তাঁর সেই বৃন্দাবন লীলাবিলাস করার পর পরবর্তী কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে আবির্ভূত

হন এই নবদ্বীপ ধামে। নবদ্বীপ হল নয়টি দ্বীপের সমন্বয়। নব মানে নয়, দ্বীপ হচ্ছে চতুর্দিকে জল বেষ্টিত ভূমি। মাঝখানে একটি দ্বীপ আর তার চারপাশে আটটি দ্বীপ একটি পদ্মফুলের মতো বিরাজ করছে। পদ্মফুলের মাঝখানে কোরক রয়েছে। কোরকের চারপাশে রয়েছে পাপড়ি। প্রথম পর্যায়ে আছে আটটি পাপড়ি। তারপর ১০০ পাপড়ি—এইভাবে বিন্যস্ত।

সহস্রপত্র কমলং গোকুলাখ্যং মহৎপদম্।
তৎকর্ণিকার তদ্ধাম তদনন্তাংশসম্ভবম্ ॥ ২ ॥
তৎকীঞ্জল্কং তদংশানাং তৎপত্রাণি শ্রিয়ামপি ॥ ৪ ॥

ব্রহ্মসংহিতায় এইভাবে গোলোকের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এই নবদ্বীপ হচ্ছে সেই গোলোক। গোলোকের দুটি প্রকোষ্ঠ, একটি বৃন্দাবন অপরটি নবদ্বীপ। বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণ তাদের মাধুর্য লীলাবিলাস করছেন এবং সেই রাধাকৃষ্ণই মিলিতভাবে নবদ্বীপে শ্রীগৌরসুন্দর রূপে ঔদার্য লীলাবিলাস করছেন। মধুর রসে ভগবান তাঁর ভক্তদের সঙ্গে যে প্রেম বিনিময় করছেন, সেইটি হচ্ছে মাধুর্য লীলা। অর্থাৎ মধুর রসে যে লীলা।

জয় জয়োজ্জ্বল রস সর্বরসসার।
পরকীয়া ভাবে যাহা ব্রজেতে প্রচার ॥

সমস্ত রসের (শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর) মধ্যে সর্বোত্তম এবং সবথেকে উজ্জ্বল রস হল মধুর রস। মধুর রসের চরম পরাকাষ্ঠা হচ্ছে পরকীয়া রস। এখনও বৃন্দাবনে ভগবান তাঁর সেই মধুরলীলা বিলাস করছেন। তিনি তাঁর ভক্তদের সঙ্গে কৃষ্ণপ্রেম আস্বাদন করছেন। আর নবদ্বীপে সেই কৃষ্ণচন্দ্রই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে ঔদার্যলীলা বিলাস করছেন। ঔদার্য মানে উদার। উদারভাবে তিনি ব্রহ্মারও দুর্লভ প্রেম বিতরণ করছেন। বিতরণটা ঔদার্যের লক্ষণ। অন্যকে দান করাটি ঔদার্যের লক্ষণ। উদার ব্যক্তি দান করেন। যে যত বেশি উদার তিনি ততো বেশি মূল্যবান সম্পদ দান করেন। এই জগতের মধ্যে সবচাইতে মূল্যবান সম্পদটি হল কৃষ্ণপ্রেম। সেই কৃষ্ণপ্রেম ব্রহ্মারও দুর্লভ। ব্রহ্মারও দুর্লভপ্রেম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু যেচে যেচে সকলকে দান করছেন।

ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম সবাকারে যাচে।

আর তাঁর সেই প্রেম বিতরণের সহায়ক হচ্ছেন নিত্যানন্দ প্রভু। নিত্যানন্দ প্রভুর সেই প্রেম বিতরণের লীলা বর্ণনা করে বলা হচ্ছে—

যথেষ্টং রে ভ্রাতঃ! কুরু হরিহরি-ধ্বানমনিশং।
ততো বঃ সংসারাম্বুধি-তরণ-দায়ো ময়ি লগেৎ ॥

হে ভাই সব! তোমরা মুখে শুধু হরিনাম কীর্তন কর। তাহলে এই সংসার-সমুদ্র থেকে তোমাদের উদ্ধারের দায়িত্বটি আমি গ্রহণ করব। তাহলে কত সহজে কত অনায়াসে আমরা এই সংসার-সমুদ্র পার হতে পারি। এই ভবসমুদ্র হচ্ছে দুরতিক্রম।

দৈবীহ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।

এই মায়া অতিক্রম করা অসম্ভব। কিন্তু নিত্যানন্দ প্রভু বলছেন তোমরা যদি হরিনাম কর তাহলে আমি এই সংসার-সমুদ্র পার করে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব-ভার গ্রহণ করবো।

অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়।
অভিমানশূন্য নিতাই নগরে বেড়ায় ॥
যারে দেখে তারে কহে দন্তে তৃণ ধরি।
আমারে কিনিয়া লহ ভজ গৌরহরি ॥
এত বলি নিত্যানন্দ ভূমে গড়ি যায়।
সোনার পর্বত যেন ধূলাতে লুটায় ॥

অত্যন্ত বিনীতভাবে তোমরা গৌরহরির ভজনা কর এবং সেই মূল্য দিয়ে আমাকে কিনে নাও। নিত্যানন্দ প্রভু বলছেন তাঁকে এই কৃষ্ণ-নামের মূল্য দিয়ে আমরা যেন কিনে নিতে পারি। এইভাবে তিনি কৃপা করছেন জীবদের। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এইভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রূপে আবির্ভাবের কারণ হল দুটি। একটি হচ্ছে আভ্যন্তরীণ আর একটি বাহ্যিক। বাহ্যিক কারণটি সম্পর্কে বলা হচ্ছে—

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ ॥

যে বস্তুটি দীর্ঘকাল অর্পণ করা হয়নি বা দেওয়া হয়নি, সেই বস্তুটি দান করার জন্য তিনি কৃপা করে এই কলিযুগে অবতীর্ণ হয়েছেন। অর্থাৎ কখনও অবতারে ভগবান এই বস্তুটি দেননি।

উন্নত উজ্জ্বল রসে তাঁর নিজের যে ভক্তি সেই ভক্তিসম্পদটি দান করার জন্য তিনি করুণা করে এই কলিযুগে অবতীর্ণ হয়েছেন। অর্থাৎ তিনি তাঁর নিজের উন্নত উজ্জ্বল রসের ভক্তি দান করার জন্য এবং মধুর রসের পরকীয়া ভাবে যে কৃষ্ণপ্রেম বা কৃষ্ণভক্তি সেটি দান করার জন্য তিনি অবতীর্ণ হয়েছেন।

...স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ ॥

ভগবান শ্রীহরি, যাঁর অঙ্গকান্তি বর্ষার জলভরা মেঘের মতো ঘনশ্যাম। কৃষ্ণ এসেছেন তাঁর সেই অঙ্গকান্তিটিকে আচ্ছাদন করে গৌরবর্ণ ধারণ করে, অর্থাৎ

সোনার মতো অঙ্গকান্তি অবলম্বন করে গৌরবর্ণ ধারণ করে তিনি এসেছেন। প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণের অঙ্গকান্তি বা গায়ের রং ঘনশ্যাম। যিনি তপ্তকাঞ্চনের মতো অঙ্গকান্তি ধারণ করে অবতীর্ণ হয়েছেন, সেই শচীনন্দন গৌরহরি সদা আমাদের হৃদয়কন্দরে প্রকাশিত হন। এইটি মহাপ্রভুর আবির্ভাবের বহিরঙ্গা বা বাহ্যিক কারণ। অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রেম দান করার জন্য তিনি এসেছেন।

আর আভ্যন্তরীণ কারণটি হল—

রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনীশক্তিরস্মা-
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্ ॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদিলীলা ১/৫)

শ্রীকৃষ্ণ শক্তিমান এবং শ্রীরাধা হচ্ছেন তার শক্তি। সেই হ্লাদিনী শক্তির মাধ্যমেই শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রেম আস্বাদন করেন। যদিও শক্তি এবং শক্তিমান এক তত্ত্ব, রাধা-কৃষ্ণ একই তত্ত্ব। কিন্তু তাঁরা ভিন্ন দেহে প্রকাশিত হয়েছেন। অর্থাৎ কৃষ্ণ এবং রাধারূপে ভিন্ন দেহে প্রকাশিত হয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন শক্তিমান এবং রাধারাণী হচ্ছেন হ্লাদিনী শক্তির, আনন্দদায়িনী শক্তির মূর্ত প্রকাশ। তাঁরা যদিও এক আত্মা, এক তত্ত্ব কিন্তু দেহে তাঁদের ভেদ রয়েছে। অর্থাৎ তাঁরা দুই দেহে প্রকাশিত হয়েছেন। কিন্তু এখন তাঁরা দুজনে একত্রীভূত হয়ে, এক হয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে প্রকটিত হয়েছেন। শ্রীমতী রাধারাণীর অন্তরের ভাবটি কৃষ্ণভক্তিতে পরিপূর্ণ। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সেই অন্তরের ভাবটি অর্থাৎ কৃষ্ণভক্তি নিয়ে, কৃষ্ণভক্তির ভাব অবলম্বন করে, শ্রীমতী রাধারাণীর দেহের অঙ্গকান্তি নিয়ে অবতীর্ণ হলেন।

কুঙ্কুমাক্ত-কাঞ্চনাব্জ-গর্বহারি-গৌরভা।
পীতনাঞ্চিতাব্জগন্ধ-কীর্তি-নিন্দি-সৌরভা ॥

তপ্তকাঞ্চনের সঙ্গে কুমকুমের লাল রঙ মিশ্রিত করলে যে রঙটি হবে সেটি রাধারাণীর গায়ের রঙ। অতএব কৃষ্ণ সেই রঙটি অবলম্বন করে এসেছেন। তাহলে রাধারাণীর ভাব আর রাধারাণীর অঙ্গকান্তি অবলম্বন করে শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু রূপে কলিযুগে অবতীর্ণ হয়েছেন। কেন তিনি এইভাবে এলেন? তার কারণটি হচ্ছে—কৃষ্ণ ভাবলেন—

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।

শ্রীরাধার প্রেমের মহিমা কি রকম? ঐ প্রেমের দ্বারা শ্রীরাধা আমার যে অদ্ভুত মাধুর্য আস্বাদন করেন, সেই মাধুর্যই বা কিরকম? এবং আমার মাধুর্য আস্বাদন করে শ্রীরাধা যে সুখ অনুভব করেন, সেই সুখই বা কিরকম—এই তিনটি বিষয় শ্রীকৃষ্ণের জানার লোভ হয়েছিল। এবং এইগুলি জানার জন্যই শ্রীকৃষ্ণকে রাধারাণীর ভাব অবলম্বন করে আসতে হয়েছিল।

সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা-
ত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ ॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদিলীলা ১/৬)

সমুদ্র মন্থনের ফলে ক্ষীরসমুদ্র থেকে যেমন চন্দ্রের উদয় হয়েছিল, ঠিক তেমনই শচীমাতার গর্ভরূপ-সিন্ধু মন্থনের ফলে চৈতন্যচন্দ্রের উদয় হয়েছেন রাধাপ্রেমের পূর্ণ মহিমা হৃদয়ঙ্গম করার জন্য। এটি আভ্যন্তরীণ কারণ। এবং বাহ্যিক কারণটি হল কৃষ্ণপ্রেম বিতরণ করার জন্য, যা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। চৈতন্য-চরিতামৃতে বলা হয়েছে—

চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার ॥

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দয়ার কথা, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর যে অপূর্ব তত্ত্ব, সেটি বিচার করে দেখো। বিচার করে দেখলে চিত্ত চমৎকৃত হবে। চৈতন্যমহাপ্রভুর শিক্ষার পাঁচটি বিষয় রয়েছে। তাঁর দর্শনকে বলা হয় অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্ব। বেদের যে নিগূঢ় তত্ত্বজ্ঞান সেটি তিনটি পর্যায়ে প্রকাশিত—১) সম্বন্ধ ২) অভিধেয় ৩) প্রয়োজন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই তিনটি তত্ত্বকে প্রকাশ করেছেন। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর যে দান তা অকল্পনীয়।

মহাপ্রভু নিজে কোন গ্রন্থ লেখেননি। তিনি কেবল শিক্ষাষ্টকের আটটি শ্লোক দিয়ে গেছেন। এই আটটি শ্লোকের মধ্যেই ভগবৎ-তত্ত্ববিজ্ঞান পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়েছে। এই আটটি শ্লোক কেউ যদি পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন তাহলে তিনি ভগবৎ-তত্ত্ব জ্ঞান লাভ করতে পারবেন। মহাপ্রভুর শিক্ষা হল—

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং।
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা ॥
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্।
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরঃ ন পরঃ ॥

আরাধ্য ভগবান হচ্ছেন ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ। নন্দ-যশোদার পুত্র শ্রীকৃষ্ণ। অর্থাৎ দেবকী নন্দন বাসুদেব কৃষ্ণ নন। স্বয়ংরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। অর্থাৎ ব্রজেন্দ্র নন্দন কৃষ্ণ। তাঁর ধাম হচ্ছে বৃন্দাবন। ব্রজ-গোপিকারা যে ভাবে কৃষ্ণকে ভালোবেসেছিলেন বা আরাধনা করেছিলেন, সেটিই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ আরাধনা। অমলপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে এর প্রমাণ। শাস্ত্র প্রমাণ ছাড়া আমরা কতকগুলো মনগড়া কথা বলতে পারি না। যদি বলা হয় তা সাধুসমাজ গ্রহণ করবে না। আমরা যখন অধ্যাত্মতত্ত্ব নিরূপণ করব তখন শাস্ত্রের প্রমাণ দিতে হবে। আঠারোটি পুরাণের মধ্যে এটি হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ পুরাণ। যার মধ্যে কোন মল নেই। অন্যান্য যে সতেরটি পুরাণ আছে, তাতে হয় সত্ত্বগুণের মল নতুবা রজগুণের মল নতুবা তমগুণের মল রয়েছে। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে সম্পূর্ণরূপে নির্মল।

কৃষ্ণপ্রেম হচ্ছে জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি। আমাদের জীবনের চরম লক্ষ্য হচ্ছে সেই কৃষ্ণপ্রেম। এইটি হচ্ছে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা। এটিকে আদরের সঙ্গে গ্রহণ করতে হবে, অন্য কিছু নয়। বৃন্দাবনের গোস্বামীরা, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুগামীরা ভুরি ভুরি গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং সেই গ্রন্থগুলি রচনার মাধ্যমে তাঁরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষার সর্বোত্তম বা সর্বশ্রেষ্ঠ তাৎপর্য কি তা নিরূপণ করে গেছেন।

নানাশাস্ত্র-বিচারণৈক-নিপুণৌ সদ্ধর্ম-সংস্থাপকৌ
লোকানাং হিতকারিণৌ ত্রিভুবনে মান্যৌ শরণ্যাকরৌ।
রাধাকৃষ্ণ-পদারবিন্দভজনানন্দেন মত্তালিকৌ
বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥

নানা শাস্ত্র বিচার করে গোস্বামীগণ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর যে মত সেটি প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। মহাপ্রভু নিজে কিছু লিখে যান নি। তিনি মুখে মুখে শিক্ষা দিয়েছেন। এবং তাঁর যে শিক্ষা সেটি হচ্ছে আধ্যাত্মিক জীবনের সারাতিসার। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষাটি যে প্রকৃত সনাতন ধর্ম সেটি ষড়গোস্বামীগণ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন জগতের মানুষদের হিতসাধনের জন্য। সেইজন্য তাঁরা ত্রিভুবনে বরণীয় এবং স্মরণীয়। ত্রিভুবন তাদের মান্য করেন এবং তাদের শরণাগত হন। আমি বার বার সেই শ্রীরূপ, সনাতন, রঘুনাথ ভট্ট, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ দাস ও শ্রীজীব গোস্বামিপাদগণের বন্দনা করি।

পর্ব-৪
রাগানুগা ভক্তি

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের দুটি কারণ রয়েছে—একটি বাহ্যিক কারণ এবং অপরটি আভ্যন্তরীণ কারণ। বাহ্যিক কারণটি হল কৃষ্ণপ্রেম বিতরণ করা এবং যুগধর্ম প্রবর্তন করা।

"যজ্ঞৈঃ সংকীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তিহি সুমেধসঃ",

আর আভ্যন্তরীণ কারণটি হচ্ছে শ্রীমতী রাধারাণীর অন্তরের ভাব নিয়ে তিনি রাধারাণীর প্রেম আস্বাদন করছেন বা প্রেমের মর্ম উপলব্ধি করছেন। মহাপ্রভু রূপে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের আর একটি কারণ—নিত্যানন্দ প্রভু নবদ্বীপ ধাম মাহাত্ম্যে শ্রীল জীব গোস্বামীকে নবদ্বীপ ধাম দর্শন করানোর পর উপদেশ প্রদান করেছেন। সেই উপদেশটির মর্মার্থ হচ্ছে এই যে, শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপরে তাঁর বৃন্দাবনলীলা প্রকাশ করার পর বিচার করলেন, এই যে ব্রজলীলা, যা হচ্ছে ভগবানের সমস্ত লীলার মধ্যে সর্বোত্তম এবং বৃন্দাবন, যে স্থান হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট। সেখানে প্রকাশিত লীলার বিশেষ বৈশিষ্ট্যটি হচ্ছে যে বৃন্দাবনে ভগবানের সঙ্গে ভক্তের যে সম্পর্ক সেটি তিনটি বিশেষ রসের উপরে লীলাটি প্রতিষ্ঠিত। সেই রসগুলি হচ্ছে সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। বৈকুণ্ঠে ভগবানের সঙ্গে ভক্তের সম্পর্ক হচ্ছে দাস্য রসের, বৈকুণ্ঠে সকলেই দাসভাবে ভগবানের সেবা করেন বা আরাধনা করেন। কিন্তু বৃন্দাবনে ভগবানের সঙ্গে ভক্তের যে সম্পর্ক সেটি সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। ভগবান বিচার করলেন যে সাধারণতঃ দাস্য বা বৈধী ভক্তিতে ভক্তরা ভগবানের সেবা করে এবং বৈধী ভক্তিতে যখন সিদ্ধিলাভ হয় তখন তারা বৈকুণ্ঠে উন্নীত হয়। কিন্তু বৈকুণ্ঠের উপরে যে বৃন্দাবন, তাহলে সেখানে তারা প্রবেশ করবে কি করে? তাই ভগবান ভক্তরূপে আবির্ভূত হলেন। সেই যে ভক্ত রূপে ভগবান, তাঁকে বৈধী ভক্তির মাধ্যমে আরাধনা করার ফলে বৃন্দাবনে প্রবেশ লাভ হয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রূপে ভগবান এলেন বৃন্দাবনের দ্বারটি সকলের জন্য খুলে দেওয়ার জন্য। ভগবান বৃন্দাবন লীলা প্রকাশ করার পর ভাবলেন যে, জীব সেই লীলায় প্রবেশ করবে কি করে? প্রবেশের সেই পথটি হল ভক্তরূপী ভগবানকে বৈধীভক্তির মাধ্যমে বা দাস্যভাবে, তাঁর সেবা করার মাধ্যমে বৃন্দাবনে সখ্য, বাৎসল্য অথবা মধুর রসে সেবার অধিকার লাভ।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রূপে ভগবানকে সেবা করার ফলে এই গতি কেন হচ্ছে, কিভাবে হচ্ছে? তার কারণ হল—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন রাধাকৃষ্ণের মিলিত তনু।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রাধাকৃষ্ণ নহে অন্য।"

দাস্য ভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে আরাধনা করার ফলে আমরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে রাধাকৃষ্ণ রূপে দর্শন করতে পারি। দাস্য রসে নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সেবা হচ্ছে কিন্তু সেই সেবার চরম পরিণতি হচ্ছে মাধুর্য রসে রাধাকৃষ্ণের সেবা লাভ। এইভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জীবদের কৃপা করেছেন।

বৃন্দাবনে ভগবানের এই যে সেবা তাকে বলা হয় রাগানুগা ভক্তি। ভক্তির দুইটি দিক রয়েছে, একটি হচ্ছে বৈধী ভক্তি এবং অন্যটি হচ্ছে রাগানুগা ভক্তি। বৈধী ভক্তি হচ্ছে শাস্ত্রের বিধিনিষেধ পালন করে ভগবানের সেবা করা আর রাগানুগা ভক্তি হচ্ছে—ভাবের আবেগের প্রভাবে ভগবানের প্রতি আমাদের যে অনুরাগ সেটিই হচ্ছে রাগানুগ। রাগ মানে হৃদয়ের রং, হৃদয়ের রং গুলি হল আমাদের ভাবের আবেগ। অনুরাগ মানে কোন কিছুর প্রতি আকর্ষণ। আর এই আকর্ষণটি হল শ্রীকৃষ্ণের প্রতি। অনুরাগ—রাগ মানে প্রেম, সেই প্রেমের অনুবর্তী যে ভক্তি সেইটি হচ্ছে রাগানুগ ভক্তি, অর্থাৎ রাগের অনুগ। রাগ ভক্তি অর্থাৎ হৃদয়ে স্বতঃস্ফূর্ত প্রেমের প্রভাবে যে ভক্তি সেটি ব্রজবাসীদের সম্পদ। বৃন্দাবনে সকলে কৃষ্ণের প্রতি এক নিবিড় প্রেম অনুভব করেন। কৃষ্ণ যে ভগবান তার জন্য তাঁরা কৃষ্ণকে ভালোবাসেন না। কৃষ্ণের প্রতি তাঁদের ভালোবাসাটি এই যে, তাঁরা কৃষ্ণকে না ভালোবেসে থাকতে পারেন না। তাঁদের মনোভাবটি হচ্ছে যে কৃষ্ণ যদি ভগবান হয়ে থাকেন তাতে কি আছে? কৃষ্ণ ভগবান বলে তাঁকে তাঁরা ভালোবাসেন এমন নয়, কৃষ্ণ যদি ভগবান নাও হতেন তাহলেও তাঁরা কৃষ্ণকে ভালো বাসতেন। এটিই হচ্ছে ব্রজবাসীদের মনোভাব। তার একটি দৃষ্টান্ত হল, রাসস্থলী থেকে শ্রীকৃষ্ণ যখন চলে গেলেন তখন ব্রজগোপীকারা বৃন্দাবনের বনে কৃষ্ণকে খুঁজছেন, আর কৃষ্ণ বনপথে এক জায়গায় তাঁর চতুর্ভুজ নারায়ণরূপ ধারণ করে দাঁড়িয়ে আছেন, ব্রজগোপীকারা দেখলেন যে নারায়ণ দাঁড়িয়ে আছেন, তখন তাঁরা নারায়ণকে প্রণাম নিবেদন করে প্রার্থনা করলেন যে তাঁরা যেন তাঁদের কৃষ্ণকে খুঁজে পান। ব্রজগোপীকারা জানতেন যে নারায়ণ হচ্ছেন ভগবান, কিন্তু নারায়ণের প্রতি তাঁরা আসক্ত ছিলেন না। তাঁরা কৃষ্ণের প্রতি আসক্ত ছিলেন, কিন্তু কৃষ্ণ যে ভগবান সেটা তাঁরা জানতেন না। তা তাঁরা ভুলে গেছেন। তাঁরা যখন নারায়ণকে দেখেন

তখন তাঁরা নারায়ণকে চান না, তাঁরা নারায়ণের আশীর্বাদ চান এই জন্য তাঁরা যেন কৃষ্ণকে খুঁজে পান। এই হচ্ছে বৈধী ভক্তি ও রাগানুগা ভক্তির পার্থক্য। যাঁরা বৈধী ভক্তির আরাধনা করছেন তাঁরা নারায়ণকে দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাবেন, তাঁরা মনে করবেন তাঁদের সারা জীবনের সাধনার চরম সিদ্ধিলাভ হল। কিন্তু ব্রজগোপীকারা নারায়ণকে দেখে প্রণাম জানিয়ে চলে গেছেন, সেটাই হচ্ছে ব্রজবাসীদের কৃষ্ণপ্রেমের মাহাত্ম্য। অন্য গোপীকারা যখন এলেন তখন স্বয়ং কৃষ্ণই নারায়ণ রূপ ধারণ করে রয়েছেন। কিন্তু যখন স্বয়ং রাধারাণী এলেন তখন কৃষ্ণ আর নিজের রূপ লুকিয়ে রাখতে পারলেন না, তখন চতুর্ভুজ নারায়ণ রূপ থেকে দ্বিভুজ কৃষ্ণরূপ ধারণ করলেন। রাধারাণীর প্রতি কৃষ্ণের প্রেম এত ঐকান্তিক যে কৃষ্ণ রাধারাণীর কাছে তাঁর স্বরূপ লুকাতে পারেন না।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর যে মহিমা সেটা এইভাবে আমরা উপলব্ধি করতে পারি। তাই বলা হয়েছে "ব্রহ্মারও দুর্লভ প্রেম সবাকারে যাচে।" ব্রহ্মাও বৈধী ভক্তি অনুশীলন করছেন—দাস্য ভক্তি, কিন্তু এই যে সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভক্তি সেই ভক্তিতে সাধারণত ব্রহ্মারও প্রবেশাধিকার নেই। কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলায় ব্রহ্মা হরিদাস ঠাকুর রূপে প্রবেশাধিকার পেলেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, মহাপ্রভুর লীলায় ব্রহ্মা এই ভক্তি পেয়েছেন, কিন্তু তার আগে ব্রহ্মা তা পান নি। কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা দর্শন করেছেন ব্রহ্মা, কিন্তু কৃষ্ণকে চিনতে পারেন নি আর তাই তিনি কৃষ্ণের গোবৎস ও গোপবালকদের হরণ করে শ্রীকৃষ্ণের চরণে অপরাধ করলেন। তারপর অপরাধ করার পরে তিনি অন্তরে ব্যথিত হচ্ছেন যে, 'হায় হায় আমি একি করলাম আমার প্রভুকে এইভাবে আমি পরীক্ষা করতে গেলাম।'

দেবাদিদেব মহাদেবও এই ভক্তিতে প্রবেশ করতে পারছেন না, বৃন্দাবনে প্রবেশ করতে পারছেন না, যখন প্রবেশ করছেন তখন ঠিক বৃন্দাবনে প্রবেশ হচ্ছে না, তিনি গোপেশ্বর মহাদেব রূপে রাসলীলার দ্বার আগলে আছেন। ঠিক রাসলীলাতে প্রবেশ করতে পারছেন না।

লক্ষ্মীদেবীও রাসলীলায় প্রবেশ করতে পারছেন না। যখন লক্ষ্মীদেবীও কৃষ্ণের বৃন্দাবনে রাসলীলা দর্শন করতে চাইলেন, তখন নারায়ণ লক্ষ্মীদেবীকে বললেন, "তুমি যদি বৃন্দাবনের রাসলীলায় প্রবেশ করতে চাও, তাহলে তোমাকে কোন ব্রজবাসী সখীর অনুগত হতে হবে।" তখন লক্ষ্মীদেবী বললেন, "আমি তোমার মহিষী, আমি তো কারও কাছে মাথা নিচু করতে পারব না, আমি কি করে কারও অনুগত হব, তাহলে তো তোমার মর্যাদা ক্ষুণ্ন হবে।"

তখন নারায়ণ বললেন, "তাহলে তোমারও বৃন্দাবনে প্রবেশ হবে না যদি তুমি সখির অনুগত না হতে পার।" তখন লক্ষ্মীদেবী মর্মাহত হয়ে কঠোর তপস্যা শুরু করলেন, কৃষ্ণ তখন লক্ষ্মীদেবীর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, "কেন তুমি এমন কঠোর তপস্যা করছ?" তখন লক্ষ্মীদেবী বললেন, "আমি তোমার রাসলীলা দর্শন করব," তখন কৃষ্ণ লক্ষ্মীদেবীকে শ্রীবৎস চিহ্নরূপে তাঁর বক্ষে ধারণ করলেন। এইভাবে লক্ষ্মীদেবী ব্রজলীলায় প্রবেশাধিকার পেলেন। তাহলে বোঝা যায় কত দুর্লভ সেই ব্রজের প্রেমভক্তি। আর সেই প্রেমভক্তি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এইভাবে বিতরণ করছেন। কেন না কৃষ্ণ যে বৃন্দাবনলীলা প্রকাশ করলেন তার উদ্দেশ্য হচ্ছে ভক্তেরা যাতে এই বৃন্দাবন লীলায় প্রবেশ করতে পারে। তাই সেই বৃন্দাবন লীলাতে জীবের প্রবেশাধিকার দেওয়ার জন্যই কৃষ্ণ রাধারাণীর ভাব ও অঙ্গকান্তি অবলম্বন করে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু রূপে আবির্ভূত হলেন।

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায়তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ ॥

আবার তারজন্য অত্যন্ত সাবধান বাণীও দেওয়া হয়েছে এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যদিও হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র বিতরণ করলেন সকলের কাছে, কিন্তু বৃন্দাবনের রাধাকৃষ্ণের যে নিগূঢ় লীলা সেগুলি তিনি সচরাচর প্রকাশ্যে কারও কাছে আলোচনা করেন নি, কেবল অন্তরঙ্গ ভক্তদের সঙ্গেই তিনি সেই রস আস্বাদন করেছেন। তা থেকে আমাদের বুঝতে হবে যে আমাদের কর্তব্য হচ্ছে সংকীর্তন যজ্ঞে কৃষ্ণের আরাধনা করে যাওয়া। সংকীর্তন মানে কৃষ্ণের মহিমা কীর্তন এবং কৃষ্ণভক্তির প্রচার, এটিই হচ্ছে আমাদের কর্তব্য আর সেটি করার ফলেই শ্রীকৃষ্ণ ও রাধারাণী আমাদের কৃপা করবেন এবং সেই কৃপার প্রভাবেই আমরা বৃন্দাবনে প্রবেশ করার সুযোগ লাভ করতে পারব। কিন্তু কেউ যদি সরাসরি বৃন্দাবনে প্রবেশ করতে চায় বা অপক্ক অবস্থায় যদি রাগানুগা ভক্তির অনুশীলন করে, তাহলে তার অধঃপতনের সম্ভাবনা থাকে। অর্থাৎ অপক্ক অবস্থায় যদি রাগানুগা ভক্তির অনুশীলন হয় তাহলে সেটা সহজিয়ায় পর্যবসিত হয়। সেই জন্য আমাদের পূর্বতন আচার্যেরা খুব সুন্দর একটা বাঁধন দিয়ে গেছেন। সেই প্রতিরক্ষার উপায়টি কি? চারটি নিয়ম পালন করা, ধর্মের যে চারটি পা সেগুলি সুদৃঢ়ভাবে গড়ে তোল। ধর্মের যদি চারটি পা সুদৃঢ় ভাবে গড়ে ওঠে তাহলে, আর কখনও অধর্ম বা পাপ প্রবেশ করতে পারবে না। তাই যাঁরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুগামী হবেন তাদের অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে এই

চারটি নিয়ম পালন করতেই হবে। অর্থাৎ আমিষ আহার, সব রকমের নেশা, অবৈধ যৌনসঙ্গ এবং দ্যূতক্রীড়া সম্পূর্ণরূপে বর্জন করতে হবে। যাঁরা এই চারটি নিয়ম পালন করে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করেন তাঁদের অন্তরে শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় এই ব্রজপ্রেম প্রকাশিত হয়। তাঁরাই রাগানুগ ভক্তি যথাযথ ভাবে গ্রহণ করতে সক্ষম হন। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল এই যে রাধাকৃষ্ণের নিগূঢ় লীলা জনসাধারণের কাছে গিয়ে প্রচার করার কোন প্রয়োজন নেই। যখন কৃষ্ণের কৃপালাভ হবে তখন অন্তরেই কৃষ্ণলীলার স্ফুরণ হবে। সেই জন্য আমাদের পূর্বতন আচার্যরা বারবার এই সাবধান বাণী দিয়ে গেছেন। প্রভুপাদ, শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বা শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরও কখনও রাধাকৃষ্ণের নিগূঢ়লীলা সম্বন্ধে আলোচনা করেননি। পক্ষান্তরে তাঁরা বলে গেছেন—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

এই হরিনাম কীর্তন কর, এই হরিনাম প্রচার কর, এই নামের প্রভাবেই সব কিছু লাভ হবে। অতএব এই পথে আমাদের খুব সাবধানতার সঙ্গে এগোতে হবে। যদি কেউ যারা রাধাকৃষ্ণের এই নিগূঢ় লীলা লোক সমক্ষে কীর্তন করে লোকেদের আকর্ষণ করার চেষ্টা করে বা লোক ঠকাবার চেষ্টা করে, তাতে জনসাধারণের সর্বনাশই হয়, মঙ্গল হয় না। রাধাকৃষ্ণের লীলা স্মরণের প্রভাবে ভক্তদের চিত্ত বৃন্দাবন মুখী হবে, কিন্তু বিষয়ীদের কাছে যদি রাধাকৃষ্ণের লীলা শোনান হয় তাহলে তারা নিজেরা কৃষ্ণ সেজে বাজারের আর পাঁচটি মেয়ে মানুষকে নিয়ে রাসলীলা করার কথা ভাববে। কৃষ্ণলীলার প্রভাবে আমাদের অধ্যাত্ম উন্নতি হবে, অবনতি হবে না। সেই সম্বন্ধে প্রভুপাদ বলেছেন, রাধাকৃষ্ণ লীলার এমনই মহিমা যে সেই লীলায় আমরা যদি যথাযথ ভাবে মনোনিবেশ করতে পারি তাহলে হৃদয়ের কাম ভাব সম্পূর্ণ রূপে দূর হয়ে যাবে, মহাপ্রভুর কৃপায় আমাদের হৃদয় নির্মল হবে, হৃদয় কলুষিত হবে না। এই লীলা এমনই মহিমান্বিত যে এই লীলা শ্রবণের ফলে আমাদের স্ত্রীসঙ্গের প্রতি আসক্তি বা হৃদয়ের কামভাব সম্পূর্ণরূপে দূর হয়ে যাবে। আর সেটিই হচ্ছে কৃষ্ণের এই বৃন্দাবন লীলার মাহাত্ম্য আর এই বৃন্দাবন লীলায় প্রবেশ করার উপায়টি হচ্ছে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুগত হওয়া।

গৌরপদারবিন্দে বিন্দেত
ভক্তি কৃতপুণ্যরাশি যথাতথা।

উৎসার্পিত হৃদি অকস্মাৎ
রাধাপদাম্ভোজে সুধাম্বোরাশি ॥

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে পুঞ্জীভূত পুণ্যের প্রভাবে যখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মের প্রতি আমাদের যথাযথ আসক্তি হবে। সেই আসক্তি অর্থাৎ মহাপ্রভুর প্রতি ভক্তি অনুসারে হৃদয়ে রাধারাণীর শ্রীপাদপদ্ম নিঃসৃত যে সুধারাশি বা অমৃতরাশি তা হঠাৎ নিঃসৃত হতে থাকবে। এখন রাধারাণীর শ্রীপাদপদ্ম নিঃসৃত অমৃতরাশিটি কি? ব্রজপ্রেম, অর্থাৎ আমাদের কর্তব্য হচ্ছে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মের প্রতি আসক্ত হওয়া এবং সেই অনুসারে রাধারাণীর কৃপায় আমাদের হৃদয়ে ব্রজপ্রেম রূপ সুধা অকস্মাৎ নিঃসৃত হবে এবং সেই সুধা-অমৃতের দ্বারা আমাদের হৃদয় প্লাবিত হবে। এইটিই হচ্ছে অনুসরণীয় পন্থা, এইটিই হচ্ছে বৃন্দাবনের মাধুর্য, বৃন্দাবনের মহিমা হৃদয়ঙ্গম করার এবং বৃন্দাবন লীলায় প্রবেশ করার উপায়। কৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলায় যদি কেউ প্রবেশ করতে চায় তাহলে তার কর্তব্য হল শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মের প্রতি আসক্ত হওয়া। তিনি মহাপ্রভু আর আমাদের কর্তব্য হল তাঁর নিত্য দাস হয়ে যাওয়া। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভক্তরূপে এসে আমাদের কৃষ্ণভক্তি শিক্ষা দিচ্ছেন।

তাই আমাদের করণীয় হল শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে আসক্ত হওয়া।

(যদি) গৌর না হইত, তবে কি হইত,
কেমনে ধরিতাম দে,
রাধার মহিমা, প্রেমরস সীমা,
জগতে জানাত কে?

মহাপ্রভুর এক অতি অন্তরঙ্গ পার্ষদ বাসুদেব ঘোষ এইভাবে মহাপ্রভুর মহিমা কীর্তন করেছেন।

পর্ব–৫
ভগবানের শ্রেষ্ঠ ভক্ত কে?

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু একটি বিশেষ সময়ে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তিনি যখন অবতরণ করেন, তখন প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষই মুসলমানদের অধীন ছিল। মুসলমানেরা ভারতবর্ষ দখল করে বৈদিক সনাতন ধর্মাবলম্বী, অর্থাৎ হিন্দুদের উপর ভীষণ অত্যাচার করেছিল। তাদের অত্যাচারে হিন্দুধর্ম বা হিন্দুরা অত্যন্ত বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। মুসলমানেরা জোর করে হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করছিল এবং নানাভাবে নির্যাতন করছিল। কারণ ওদের রাজত্ব। সুতরাং ওদেরই হাতে সমস্ত ক্ষমতা। তারা যা ইচ্ছে তাই করতে পারে।

সেই রকম একটা সময়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অবতরণ করেন। মহাপ্রভু যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন এই বঙ্গভূমি হুসেন শাহের অধীন। হুসের শাহ স্বাভাবিক ভাবে হিন্দুদের উপরে অত্যাচার করছিল। মহাপ্রভুর লীলায় আমরা দেখতে পাই কিভাবে চাঁদকাজি মহাপ্রভুর সংকীর্তন আন্দোলন বন্ধ করার চেষ্টা করেছিল। এইভাবে তখন চারদিকে নানা রকম বাধাবিঘ্ন চলছিল। এই বৈদিক সনাতন ধর্ম অনুশীলনকারীদের বিরুদ্ধে। তাহলে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, মহাপ্রভু কেন এই রকম পরিস্থিতিতে অবতীর্ণ হলেন? তার কারণটি হচ্ছে মহাপ্রভু এইভাবে অবতীর্ণ হয়ে শিক্ষা দিলেন যে আমাদের কৃষ্ণভক্তির প্রচারে আমরা যেন কোনো অবস্থাতেই ভীত বা বিচলিত না হই। একটা প্রচণ্ড বিরোধিতা সমন্বিত সময়ে মহাপ্রভু এসে কৃষ্ণভক্তি প্রচার করলেন। দ্বিতীয় কথা, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর প্রচার কার্য শুরু করেন তাঁর দীক্ষা গ্রহণের পর থেকেই। তিনি নিজেও কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত হয়ে গিয়েছিলেন। শ্রীল ঈশ্বরপুরী-পাদের কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণের পর তিনি শুদ্ধভক্তির সমস্ত লক্ষণগুলি প্রকাশ করতে থাকেন। তাঁর দিব্য উন্মাদনা দেখে লোকেরা মনে করেছিল যে নিমাই পণ্ডিত পাগল হয়ে গেছে। আসলে নিমাই পণ্ডিত কৃষ্ণপ্রেমে পাগল হয়েছিলেন। এর কিছুকাল পরে মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করে জগন্নাথ পুরীতে চলে যান। বঙ্গদেশের প্রচার কার্যটি তিনি নিত্যানন্দ প্রভুর ওপর অর্পণ করেন। রূপ গোস্বামী এবং সনাতন গোস্বামীকে তিনি উত্তর ভারতে পাঠান। বৃন্দাবনে লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার আর শাস্ত্র প্রণয়নের কার্যভার দান করেন। আর তিনি নিজে সারা ভারতবর্ষ ভ্রমণ করে লক্ষ লক্ষ মানুষকে কৃষ্ণপ্রেম দান করেছিলেন।

এইভাবে মহাপ্রভু তাঁর প্রচার কার্য শুরু করেন। মহাপ্রভুর বাণী প্রচারে বৃন্দাবনে যে যে গোস্বামীগণ গিয়েছিলেন তাঁদের দান অতুলনীয়। তারা নানা শাস্ত্রবিচার করে এক সৎ ধর্ম স্থাপন করেছিলেন।

অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে, অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তাঁরা এক সৎধর্ম সংস্থাপন করেছিলেন। সৎধর্ম মানে সনাতন ধর্ম বা আত্মার ধর্ম। দেহের ধর্ম নয়। সেই আত্মার ধর্মটি হচ্ছে কৃষ্ণপ্রেম। কৃষ্ণপ্রেম যে আত্মার ধর্ম সেটি গোস্বামীগণ নানা শাস্ত্র বিচার করে প্রতিষ্ঠা করেছেন। এইভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু গোস্বামীদের দ্বারা তাঁর সংকীর্তন যজ্ঞের শাস্ত্র ভিত্তিক ব্যাখ্যা প্রদান করেন। গোস্বামীদের মধ্যে প্রধান হচ্ছেন শ্রীল রূপ গোস্বামী ও শ্রীল সনাতন গোস্বামী। শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রচুর গ্রন্থাবলী রচনা করেছেন। সকল গোস্বামীরাই বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। শ্রীল রূপ গোস্বামীর রচিত প্রধান প্রধান গ্রন্থগুলি হচ্ছে—'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু', উজ্জ্বলনীলমণি', 'স্তবমালা', 'বিদগ্ধ মাধব', 'ললিত মাধব' ইত্যাদি। শ্রীল সনাতন গোস্বামীর প্রধান গ্রন্থগুলি হচ্ছে 'হরিভক্তিবিলাস', 'বৃহৎ ভাগবতামৃত' এবং তিনি ভাগবতের বহু টীকা, ইত্যাদি রচনা করেছেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামীর যে 'বৃহৎ ভাগবতামৃত' সেখানে তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের প্রকৃত তত্ত্ব বিশ্লেষণ করেছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে যে শিক্ষাটি দেওয়া হয়েছে—শ্রীমদ্ভাগবতের মূল যে বিষয়বস্তু সেই বিষয়বস্তুটি প্রতিষ্ঠিত করেছেন শ্রীল সনাতন গোস্বামী তাঁর "বৃহৎ ভাগবতামৃতে"র মাধ্যমে।

শ্রীল সনাতন গোস্বামীর 'বৃহৎ ভাগবতামৃতে' দুটো বিভাগ আছে—পূর্ব বিভাগ আর উত্তর বিভাগ। পূর্ব মানে প্রথম দিকের আর উত্তর মানে শেষের দিকের। পূর্ব বিভাগে শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রতিষ্ঠা করেছেন যে, শ্রেষ্ঠ ভক্ত কে? তিনি ভগবানের শ্রেষ্ঠ ভক্তকে খুঁজছেন। প্রয়াগে ঋষিদের সমাবেশ হয়েছে। সেখানে বিভিন্ন মুনি ঋষিরা পরস্পরের ভক্তির প্রশংসা করছেন। তখন নারদমুনি ভাবলেন যে তিনি খুঁজে দেখবেন প্রকৃত শ্রেষ্ঠ ভক্ত কে? নারদমুনি দেখলেন এক ধনাঢ্য ব্রাহ্মণ। তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে ভগবানের পূজা করছেন। তা দেখে নারদ মুনি ভাবলেন ইনিই হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ ভক্ত। তখন নারদ মুনি তার কাছে গিয়ে তার ভক্তির প্রশংসা করতে লাগলেন। বললেন, আপনি ভগবানের প্রকৃত কৃপাপাত্র। তখন সেই ব্রাহ্মণটি তার উত্তরে বললেন, না-না, আমি ভক্ত নই। আমি যেটা করছি সেটা আমার বৃত্তি। সেটা আমার কর্তব্য। আমি ব্রাহ্মণ, ভগবানের পূজা করাটাই আমার কর্তব্য। অতএব আমি তাই করছি। প্রকৃত ভক্ত হচ্ছেন দাক্ষিণাত্যের এক রাজা। তিনি ক্ষত্রিয় রাজা,

তার কতো দায়-দায়িত্ব রয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠা পরায়ণ ভগবানের ভক্ত। তিনি ভগবানকে কেন্দ্র করে তার সমস্ত কার্য সম্পাদন করেন। তা শুনে নারদমুনি সেই রাজার কাছে গেলেন। তিনি দেখলেন যে, সেই রাজা অত্যন্ত নিষ্ঠাপরায়ণ ভক্ত। অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে ভগবানকে আরাধনা করছেন এবং পূজা করছেন। ভগবানকে কেন্দ্র করেই তিনি তার রাজ্য শাসন করছেন। তখন নারদ মুনি তার ভক্তির প্রশংসা করতে লাগলেন। তখন সেই রাজা বললেন, আমি ভক্ত নই, প্রকৃত ভক্ত হচ্ছেন স্বর্গের দেবরাজ ইন্দ্র। তিনি ভগবানের এতো প্রিয় ভক্ত যে ভগবান তাঁর ছোট ভাই বামনদেবরূপে আবির্ভূত হয়েছেন এবং স্বহস্তে তাঁর নিবেদন গ্রহণ করছেন। তখন নারদমুনি ইন্দ্রের কাছে গিয়ে তাঁর প্রশংসা করতে লাগলেন। ইন্দ্র বললেন—না, আমি ভক্ত নই। আমি কতো অন্যায় করি, কতো ভুল করি। তার ফলে আমি ভগবানের বিরুদ্ধাচরণ করি—এই বলে ইন্দ্র আক্ষেপ করতে লাগলেন যে, আমি যদি ভগবানের ভক্ত হতাম তাহলে কি এই সমস্ত কার্যগুলো করতে পারতাম। ভগবানের কতো বিরুদ্ধাচরণ করেছি। সেইজন্য ভগবান আমার প্রতি অত্যন্ত রুষ্ট হয়েছেন। তাহলে আপনি কেন বলছেন যে আমি ভগবানের একমাত্র কৃপার পাত্র। প্রকৃত ভক্ত হচ্ছেন ব্রহ্মা। তিনি বিশ্লেষণ করতে লাগলেন, "কেন ব্রহ্মা হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ ভক্ত।" তখন নারদ মুনি ব্রহ্মার কাছে গিয়ে তার ভক্তির মহিমা কীর্তন করতে লাগলেন। তা শুনে ব্রহ্মা অত্যন্ত লজ্জিত এবং রুষ্ট হয়ে নারদমুনিকে তিরস্কার করে বললেন, আমি কতবার তোমাকে বলেছি। আমাকে শ্রেষ্ঠ ভক্ত বলে কখনও বলো না। আমি কতো ভুল করি। কত সময় ভগবানের কত অসুবিধার কারণ হয়েছি। অসুরদের বর দিয়েছি তার ফলে সেই অসুরেরা কত উৎপাত করেছে। ভগবানকে এসে তাদের সংহার করতে হয়েছে। সত্যিই যদি আমি ভক্ত হতাম, তাহলে আমি কি ভগবানের সঙ্গে এই রকম করতাম। এই বলে ব্রহ্মা তার ভক্তির অক্ষমতা প্রকাশ করলেন। ব্রহ্মা তখন বললেন, মহাদেব হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ ভক্ত। নারদ মুনি তখন মহাদেবের কাছে গিয়ে তাঁর গুণকীর্তন শুরু করলেন। তখন মহাদেব নারদমুনিকে বললেন—এইভাবে তিনি যেন লজ্জা না দেন। কেন না তিনি প্রকৃত ভক্ত নন। ভগবান কৃপা করে তার সমস্ত ভুল ত্রুটি ক্ষমা করে দেন। তিনি ভগবানের ভক্ত হওয়া তো দূরের কথা, নানাভাবে ভগবানের অসুবিধার সৃষ্টি করেন। এমনকি তিনি ভগবানের সঙ্গে যুদ্ধ পর্যন্ত করেছেন। তার পূজাতে বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন করে তিনি ভগবানের বিরুদ্ধে গেছেন। এইভাবে

মহাদেব আক্ষেপ করে বললেন প্রকৃত ভক্ত হচ্ছেন বৈকুণ্ঠবাসীগণ। তিনি বিশ্লেষণ করতে লাগলেন কেন বৈকুণ্ঠবাসীরা শ্রেষ্ঠ ভক্ত। তখন পার্বতীদেবী বললেন, না-না, বৈকুণ্ঠ ভক্তদের মধ্যে আবার শ্রেষ্ঠ হচ্ছেন লক্ষ্মীদেবী। নারদ মুনি তখন বৈকুণ্ঠে যাবার জন্য উদ্যত হলেন। মহাদেব তখন তাঁকে বললেন, বৈকুণ্ঠের ভক্তদের থেকেও শ্রেষ্ঠ ভক্ত হচ্ছেন প্রহ্লাদ মহারাজ এবং তিনি প্রহ্লাদ মহারাজের ভক্তির মহিমা কীর্তন করতে লাগলেন। তখন নারদ মুনি সুতল লোকে গিয়ে প্রহ্লাদ মহারাজের ভক্তির মহিমা কীর্তন করতে লাগলেন। তখন প্রহ্লাদ মহারাজ বললেন, আমার ভক্তি কোথায়? শৈশব অবস্থায় শিশুরা যে রকম কোনো কিছুর প্রতি আকৃষ্ট হয়, সেই রকমভাবে আমিও ভগবানের প্রতি একটু আকৃষ্ট হয়েছিলাম এবং সেটা প্রকাশ করেছিলাম। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমার ভক্তি নেই। কেন না আমি যদি ভক্ত হতাম তাহলে ভগবানের সেবা করতাম। কিন্তু আমি ভগবানের কোন সেবা করিনি। পক্ষান্তরে আমাকে শিশু দেখে ভগবান বার বার রক্ষা করেছিলেন। প্রকৃত ভক্ত হচ্ছেন হনুমান এবং হনুমান নিষ্ঠা সহকারে ভগবানের সেবা করেছিলেন। তখন নারদমুনি হনুমানের কাছে গিয়ে হনুমানের মহিমা কীর্তন করতে শুরু করলেন। তা শুনে হনুমান কাঁদতে লাগলেন। কাঁদতে কাঁদতে বললেন, এমনিতেই শ্রীরামচন্দ্রের বিরহে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছে, আর আপনি এসে এইভাবে কেন সেই বিরহের বেদনাটিকে আরও বেশি করে উত্তপ্ত করছেন। এই বলে হনুমান কাঁদতে লাগলেন। আমি যদি সত্যি ভগবানের কৃপাপাত্র হতাম তাহলে কেন ভগবান তাঁর সঙ্গ থেকে বঞ্চিত করলেন। আমি তাঁর বিরহে আকুল হয়ে রয়েছি। ভগবানের প্রকৃত কৃপাপাত্র হচ্ছেন পাণ্ডবেরা। ভগবান নানাভাবে তাদের রক্ষা করেছেন, সঙ্গদান করছেন। নারদ মুনি তা শুনে তখন হস্তিনাপুরে গেলেন। পাণ্ডবদের স্থানে সেখানে গিয়ে তিনি যখন পাণ্ডবদের গুণ মহিমা বর্ণনা করতে লাগলেন তখন পাণ্ডবেরা লজ্জিত হয়ে বললেন—না-না আমরা ভগবানের ভক্ত কোথায়? আমরা তো ভগবানকে নানা রকম অসুবিধায় ফেলেছি। আমাদের জন্য ভগবানকে কতো কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে। আমাদের তিনি বিপদ থেকে কতো ভাবে রক্ষা করেছেন। ভগবানের প্রকৃত আপনজন, প্রকৃত কৃপাপাত্র হচ্ছেন যাদবেরা। তারা ভগবানের এতো ঘনিষ্ঠ, ভগবানের এতো প্রিয় যে ভগবান তাদের নিজের আত্মীয় বলে মনে করেন। নারদমুনি তখন দ্বারকাতে গেলেন যাদবদের ভক্তি দর্শন করতে। তিনি সুধর্ম সভায় গিয়ে যাদবদের ভক্তিমহিমা বর্ণনা করতে লাগলেন। তখন তারা

বললেন—যে, শ্রেষ্ঠ ভক্ত হচ্ছেন উদ্ধব। তখন নারদমুনি উদ্ধবের দর্শনের জন্য কৃষ্ণের প্রাসাদের অন্তঃপুরে গিয়ে উদ্ধবের মহিমা কীর্তন করতে লাগলেন। তখন উদ্ধব বললেন, না-না, আমি ভক্ত কোথায়? অবশ্য একটা সময় আমি ভাবতাম যে আমিও ভগবানের মহান ভক্ত। কিন্তু কৃষ্ণ যখন আমাকে চিঠি দিয়ে গোপীদের কাছে বৃন্দাবনে পাঠিয়েছিলেন তখন আমি বুঝতে পেরেছি যে তারাই হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ ভক্ত। নারদ মুনি দেখলেন, কৃষ্ণ তখনও মাথা থেকে পা পর্যন্ত চাদর দিয়ে ঢেকে শুয়ে আছেন। রোহিণী মাতাসহ সমস্ত মহিষীরা এবং বলরাম সেখানে আছেন। তারা পরস্পরের মধ্যে বলাবলি করছেন যে, কৃষ্ণ রাত্রিতে ব্রজের স্বপ্ন দেখে হৃদয়ে এতো ব্যথিত হয়েছেন যে, বিছানা থেকে ওঠেন নি। তাই ব্রজবাসীদের বিরহে তিনি কাঁদছেন। তখন রোহিণীদেবী বললেন, ব্রজবাসীদের প্রতি যদি কৃষ্ণের এতোই বিরহ বা আকুলতা থাকে, তাহলে কৃষ্ণ বৃন্দাবনে যায় না কেন? আর ব্রজবাসীরাও তাঁর বিরহে ব্যথিত হয়ে আছে। তখন রুক্মিণীদেবী বললেন, কৃষ্ণ দিনের বেলায় সবসময় অন্যমনস্ক হয়ে থাকেন। মনে হয় যেন তাঁর দেহটি এখানে রয়েছে কিন্তু মনটি পড়ে আছে বৃন্দাবনে। রাত্রেও ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কৃষ্ণ ব্রজবাসীদের কথাই কেবল বলেন। অর্থাৎ দিনের বেলায় কৃষ্ণ অন্যমনস্ক থাকেন আর রাত্রে বৃন্দাবনের স্বপ্ন দেখেন এবং বৃন্দাবনে চলে যান। সেখানে কৃষ্ণ সখাদের সঙ্গ দেন। তাঁর গাভীদের নাম ধরে ডাকেন, মা-বাবাদের ডাকেন। বলরাম তখন বললেন, এটি কৃষ্ণের কপটতা। ব্রজবাসীদের কৃষ্ণ কেন এইভাবে ব্যথিত করে রেখেছেন? কেন তিনি সেখানে যাচ্ছেন না? তখন কৃষ্ণ কাঁদতে কাঁদতে বললেন, (বিছানা থেকে উঠে) আমি যদি পারতাম তাহলে এখুনি চলে যেতাম। কিন্তু আমি যেতে পারছি না। এই বলে তিনি বলরামের গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন। বলরাম এবং কৃষ্ণ মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। তাদের মূর্ছিত হতে দেখে সমস্ত অন্তঃপুরবাসীরা উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করতে শুরু করেন। ক্রন্দন শুনে উগ্রসেন প্রমুখেরা সুধর্ম সভা থেকে কি হয়েছে, কি হয়েছে বলে ছুটে এলেন। তখন ব্রহ্মা গরুড়কে ডেকে বললেন, তুমি কৃষ্ণ এবং বলরামকে পিঠে চড়িয়ে নব বৃন্দাবনে নিয়ে যাও। নব বৃন্দাবন সমুদ্রের মধ্যে একটা দ্বীপে অবস্থিত। বিশ্বকর্মা বৃন্দাবনের মতো একটা নববৃন্দাবন সৃষ্টি করেছেন। সেখানে সমস্ত ব্রজবাসীরা আছেন, সমস্ত গাভীরা আছে। ঠিক যেন সেই বৃন্দাবন। ব্রহ্মা তখন গরুড়কে বললেন, কৃষ্ণ-বলরামকে নব বৃন্দাবনে নিয়ে যেতে। তখন গরুড় কৃষ্ণ-বলরামকে তাঁর পিঠে তুলে নিয়ে নব বৃন্দাবনে

গেলেন। বলরামের মূর্চ্ছা ভঙ্গ হলে ব্রহ্মা বলরামকে বললেন, কৃষ্ণকে গোপবেশ পরিয়ে দিতে। বলরাম কৃষ্ণকে গোপবেশ পরিয়ে দিলেন। অর্থাৎ হাতে তাঁর মোহন বাঁশি, পরনে পীতাম্বর, মাথায় শিখিপুচ্ছ, গলায় মালা দ্বারা কৃষ্ণকে সাজিয়ে দিলেন। ঠিক গোপ বেশ। বলরাম তখন কৃষ্ণকে ডেকে তুললেন। কৃষ্ণ ঘুম থেকে উঠলেন। উঠে দেখলেন সূর্য তখন মধ্য গগনে। কৃষ্ণ বললেন, আমি কি এতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলাম? বলরামকে বললেন জানো দাদা, এক মজার স্বপ্ন দেখেছি। আমি স্বপ্ন দেখেছি যে আমি কোনো একটা জায়গায় গিয়ে রাজা হয়ে গেছি এবং সেখানে ১৬০০০ রাজকন্যার সঙ্গে আমার বিবাহ হয়েছে। বলরাম তখন কৃষ্ণকে বললেন, চলো অনেক দেরি হয়ে গেছে। সকলে তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। গোচারণে যেতে হবে। কৃষ্ণ তখন দেখলেন মা যশোদা সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন। মা যশোদা কৃষ্ণকে কিছু বলছেন না দেখে কৃষ্ণ বললেন, মা, তুমি কি আমার উপরে রাগ করেছো, এতো বেলায় উঠলাম বলে। এইভাবে কৃষ্ণ তাঁর সঙ্গে কথা বলছেন, বলরাম তাড়া দিচ্ছেন চলো। তখন কৃষ্ণ বলরামের সঙ্গে সঙ্গে ছুটতে লাগলেন। কিন্তু রাধারাণীকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে তাঁকে প্রাণেশ্বরী বলে সম্বর্ধনা এবং আলিঙ্গন করলেন। তা দেখে নারদ মুনি তখন বুঝতে পারলেন যে এই ব্রজবাসীরাই হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ ভক্ত এবং তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছেন রাধারাণী। এইভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা শ্রীল সনাতন গোস্বামী নিরূপণ করলেন। শ্রেষ্ঠ ভক্ত কে? শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন যে শ্রীমতী রাধারাণী হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ ভক্ত। কিন্তু কেন, কিভাবে, কোন্ যুক্তিতে, কোন্ প্রমাণে রাধারাণী শ্রেষ্ঠ ভক্ত, শ্রীল সনাতন গোস্বামী উপরোক্ত বর্ণনার মাধ্যমে সেগুলি প্রতিষ্ঠা করলেন।

পর্ব–৬
জগতে কৃষ্ণভক্তি প্রচার

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের ঐতিহ্য অনেকদিন ধরে চলে আসছে। ভগবান ব্রহ্মাকে প্রথম এই জ্ঞান দান করেছেন। এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ যিনি তিনি হচ্ছেন বৈষ্ণব, তিনি হচ্ছেন আমাদের গুরুদেব। তার থেকে আমাদের

সম্প্রদায়, ব্রহ্ম সম্প্রদায় শুরু হয়েছে। তারপর এইভাবে ব্রহ্মা থেকে মহান ভগবদ্ভক্ত নারদমুনি এসেছেন। এসেছেন ব্যাসদেব, যিনি সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রগুলি রচনা করেছেন। এইভাবে ক্রমান্বয়ে ব্যাসদেব থেকে মধ্বাচার্য এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এসেছেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু থেকে রূপ গোস্বামী, সনাতন গোস্বামী, রঘুনাথ দাস গোস্বামী এসেছেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যে অমূল্য সম্পদটি আমাদের দান করতে এসেছিলেন সেটি তিনি সারা ভারত জুড়ে প্রচার করেছেন। আজ থেকে ৫০০ বছর আগে এই পৃথিবীতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন ছিলেন, তখন সারা ভারতজুড়ে কৃষ্ণভক্তির প্রচার হয়েছে। তার মানে গোটা ভারতবর্ষ তখন কৃষ্ণনগর ছিল। কিন্তু কালক্রমে মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর ধীরে ধীরে মহাপ্রভু প্রবর্তিত পন্থাটি প্রায় হারিয়ে যায় বা লুপ্ত হয়ে যায় এবং সেই সঙ্গে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ধামও লুপ্ত বা লোকচক্ষুর অগোচর হয়ে গিয়েছিল। লোকেরা ভুলে গিয়েছিল লোকেদের চোখের থেকে আড়াল হয়ে গিয়েছিল। তখন মহাপ্রভুর নাম করে কতকগুলি সুবিধাবাদী স্বার্থান্বেষী মানুষ নিজেদের মনগড়া মত প্রচার করেছিল। তারা মহাপ্রভুর নাম করে যত সমস্ত কদর্য আচরণ করত। ফলে কোন সভ্য রুচিমার্জিত ব্যক্তি মহাপ্রভুর অনুগমন করত না। তারা মনে করত এই সমস্ত অবৈধ আচরণগুলি হচ্ছে মহাপ্রভুর প্রবর্তিত মত বা পথ। সেই সময় শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আবির্ভূত হন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এখানে এসে পুনরায় কৃষ্ণভক্তির প্রচার শুরু করেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর হলেন ভগবানের নিত্য পার্ষদ, কিন্তু লীলাচ্ছলে তিনি ভাব করেন যেন মহাপ্রভুকে জানেন না বা মহাপ্রভুর মত কি সেটা সম্বন্ধে অবগত নন। তারপর শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর যখন উড়িষ্যায় ছিলেন, তখন তিনি এক বৈষ্ণবের কাছ থেকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সম্পর্কে অবগত হন। আর এইভাবে তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রতি আকৃষ্ট হন। কিন্তু তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সম্বন্ধে কোন গ্রন্থ পাওয়া যেত না। অনেক খুঁজে খুঁজে অবশেষে তিনি একখণ্ড শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত প্রাপ্ত হন। সেই গ্রন্থটি পড়ে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এত মুগ্ধ হন যে, তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মতটি প্রচার করতে সর্বতোভাবে বদ্ধ পরিকর হন। তিনি স্বয়ং মহাপ্রভুর শিক্ষা ও মহাপ্রভু সম্বন্ধে লিখতে শুরু করেন এবং গ্রন্থাবলী ছাপাতে শুরু করেন। এইভাবে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর যে সংকীর্তন আন্দোলন এবং যে স্বধর্ম শিক্ষা সেটি পুনরায় স্থাপন করেন। কিন্তু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তখন ছিলেন একজন অত্যন্ত উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী, তাই ততটা সময় ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি প্রচুর

গ্রন্থাবলী লিখেছেন। তিনি প্রতিদিন ভগবানের নাম জপ কীর্তন করতেন। রাতের বেলা চার ঘণ্টার মতো ঘুমাতেন। এইভাবে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ভগবানের বাণী প্রচারে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন। প্রচার কার্যে তার অক্ষমতা অনুভব করে, তিনি জগন্নাথের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন তিনি যেন তাকে একজন উপযুক্ত সহায়ককারী পাঠান। তারই প্রার্থনা অনুসারে জগন্নাথদেবের কৃপায় শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তার পুত্ররূপে আবির্ভূত হন। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর কালক্রমে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ধারাটি সারা ভারতজুড়ে প্রচার করেন। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের পরে শ্রীল প্রভুপাদ, অর্থাৎ আমাদের পরম আরাধ্য গুরুদেব শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ এসে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত ঠাকুরের ইচ্ছা অনুসারে সারা পৃথিবী জুড়ে কৃষ্ণভক্তির প্রচার করেন। আজ থেকে ৫০০ বছর আগে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভবিষ্যৎ বাণী করেছেন যে পৃথিবীর প্রতিটি গ্রামে ও নগরে কৃষ্ণভক্তির প্রচার হবে। ৫০০ বছর আগে মানুষ ভাবতেই পারত না সারা পৃথিবী জুড়ে কৃষ্ণভক্তির প্রচার হবে।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন ভগবান। ভগবান যা বলেছেন তা সত্যি হবেই। তাঁর বাণী প্রচারের জন্যই তিনি শ্রীল প্রভুপাদকে পাঠিয়েছেন। প্রভুপাদ ৭০ বছর বয়সে প্রায় নিঃস্ব অবস্থায় আমেরিকায় গিয়েছিলেন। সেখানে প্রচুর খরচ, ওখানকার একদিনের যা খরচ, তা আমাদের এখানে ১ মাসের খরচের সমান। সেই রকম একটি পরিস্থিতিতে শ্রীল প্রভুপাদ সেখানে যান। তিনি কেবলমাত্র ১২ বছরের মধ্যে সারা পৃথিবী জুড়ে কৃষ্ণভক্তি প্রচার করেন। যা একটি অসম্ভব ব্যাপার। ভগবানের কৃপায় প্রভুপাদ এই অলৌকিক কার্যটি সম্পন্ন করলেন।

হরেকৃষ্ণ!

শ্রীমৎ সুভগ স্বামী মহারাজের প্রদত্ত প্রবচন

রামরাজত্ব

সকলেই কিংডম অফ্ গড বা রামরাজ্য কথার সঙ্গে পরিচিত। এই জগৎ এমন হয়ে উঠুক—অনেকেরই সেটা একান্ত ইচ্ছা। দুর্ভাগ্যবশত প্রায় খুব কম সংখ্যক লোকই কিন্তু ভগবৎ শরণাগত হয়। ক'জনই বা ভগবানের, রামের শরণাগত হয়? কিন্তু তারা রামরাজ্যে বসবাস করতে চায়। রামকে বাদ দিয়ে, ভগবানকে বাদ দিয়ে, রামরাজ্য কি করে সম্ভব? ভগবানের আদেশ, ভগবানের নির্দেশ যদি আমরা না মানি, তা হলে কি করে আমার দেশে রামরাজ্য হবে?

হ্যাঁ, ভগবৎ শরণাগত হলে, ভগবৎ আদেশ পালন করলে, সেটা সম্ভব। শাস্ত্রে উল্লেখ আছে, ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের রাজত্বের সময় প্রজারা সকলেই ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে তাদের পিতারূপে গ্রহণ করে তাঁর শরণাগত হয়ে, নিজ নিজ ধর্ম ও আশ্রম অনুযায়ী কর্তব্য কর্ম করে জীবন যাপন করত। তারা সকলে পরম সুখ ও শান্তিতে জীবন অতিবাহিত করত। পিতা যেমন সন্তানদের শাসন করেন, পালন করেন, শ্রীরামচন্দ্রও তাঁর প্রজাদের সেই রকমভাবেই শাসন করতেন, পালন করতেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লেখ করা হয়েছে রামরাজত্বের কথা। সেখানে শ্রীল ব্যাসদেব লিখেছেন—ত্রেতা যুগে শ্রীরামচন্দ্রের রাজত্বকালে প্রজারা সকলেই ছিল ধার্মিক, তারা সকলেই শান্তিপূর্ণ ও সুখী জীবন যাপন করত, কারণ শ্রীরামচন্দ্রের শাসনব্যবস্থা ছিল সর্বোত্তম। রামরাজত্বে সপ্তসমুদ্র ও সপ্তদ্বীপ সমন্বিত পৃথিবীর সকল দেশ, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত ও বন-জঙ্গলে সকল জীবকুলের জীবন ধারণের যাবতীয় প্রয়োজনীয় সমস্ত সামগ্রীই অপর্যাপ্তভাবে পাওয়া যেত, উৎপন্ন হত।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীল ব্যাসদেব তা এইভাবে ব্যক্ত করেছেন—

বনানি নদ্যো গিরয়ো বর্ষাণি দ্বীপসিন্ধবঃ।
সর্বে কামদুঘা আসন্ প্রজানাং ভরতর্ষভ ॥

(ভাগবত ৯/১০/৫২)

এমন কি জনগণ রোগ, শোক, দুঃখ-দুর্দশা, জরা-ব্যাধি থেকে মুক্ত ছিল, শুধু তাই নয়, যারা মরতে চাইত না, তারা মরত না। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী তাই মহারাজ পরীক্ষিৎকে বলেছেন—

নাধিব্যাধিজরাগ্লানিদুঃখশোকভয়ক্লমাঃ।
মৃত্যুশ্চানিচ্ছতাং নাসীদ্ রামে রাজন্যধোক্ষজে ॥

(ভাগবত ৯/১০/৫৩)

ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের রাজত্বকালে এতই ঐশ্বর্য ছিল যে রাজধানী অযোধ্যার পথে পথে হাতিদ্বারা সুগন্ধি জল সিঞ্চন করা হত। অযোধ্যা নগরীকে সুন্দরভাবে রক্ষণাবেক্ষণ স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্র দ্বারা হত। নগরবাসী প্রজারা তাই অযোধ্যা নগরীকে এইভাবে আড়ম্বরপূর্ণ রাখায় খুবই তুষ্ট হয়েছিল। প্রাসাদ, প্রাসাদগুলির দ্বার, গোপুর, সভাগৃহ, মন্দিরাদিতে সোনার কলস ও বিভিন্ন রকম পতাকা শোভা বর্ধন করত।

ভগবান শ্রীরামচন্দ্র যেখানেই পরিদর্শন করতে যেতেন পবিত্র কলাগাছ, ফুল, ফল, পতাকা দ্বারা তৈরি সুন্দর তোরণ করা হত তাঁকে স্বাগত জানানোর উদ্দেশ্যে। উপাসনার বিভিন্ন সামগ্রী নিয়ে প্রজারা শ্রীরামচন্দ্রকে সম্বর্ধনা জানাতে আসত। তারপর কাতরভাবে তাঁর কাছে শুভ আশীর্বাদ প্রার্থনা করত। তারা এইভাবে আবেদন করত, "হে ভগবান, বরাহ অবতারে আপনি সাগরগর্ভ থেকে পৃথিবীকে উদ্ধার করেছিলেন, এখন আপনি সেই জগৎকে প্রতিপালন করুন। আপনার কাছে আমাদের এই কাতর প্রার্থনা।"

ভগবদ্গীতায় ভগবান বলেছেন—

চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ।

(গীতা ৪/১৩)

অর্থাৎ, গুণ ও কর্ম অনুযায়ী মানব সমাজকে চার ভাগে ভাগ করা হয়, এরা হচ্ছেন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। সমাজে চারটি আশ্রম আছে—এগুলি হচ্ছে ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। একে বলা হয় বর্ণাশ্রম ধর্ম। বৈদিক শাস্ত্র অনুযায়ী সমাজ গঠন করা উচিত। আদর্শ শাসকের উচিত এই বর্ণাশ্রম ধর্ম চালু করা। এই ব্যবস্থা প্রচলনের উদ্দেশ্য হচ্ছে সকলকে ভগবৎ ভাবনাময় করে তোলা। শাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে—

বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্ বিষ্ণুরারাধ্যতে।

(বিষ্ণুপুরাণ ৩/৮/৮)

এইভাবে সকল নাগরিককে ভগবদ্ভক্তে পরিণত করা যায়।

আদর্শ পিতা যেমন স্নেহের সন্তানদের উপযুক্ত শিক্ষা দান করেন, ভগবান শ্রীরামচন্দ্রও ছিলেন আদর্শ পিতার মত। তিনি প্রজাদের উপযুক্ত শিক্ষা দিয়েছিলেন, নিজ নিজ গুণ ও কর্ম অনুযায়ী প্রজাদের স্বধর্ম অনুশীলনের শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল তাঁর রাজত্বকালে।

ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎপ্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে ॥

(গীতা ৩/২১)

অর্থাৎ, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির আচরণ থেকে জনগণের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। বৈদিক শাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে—'মহাজন যেন গতঃ স পন্থাঃ'। মহাজনদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা উচিত। শাস্ত্রের বাণী অনুযায়ী জীবন যাপন করে, তা উপলব্ধি করে, জনগণকে আদর্শ নাগরিক—ভগবদ্ভক্ত বা বৈষ্ণবে পরিণত করে, এক ভগবৎ ভাবনাময় সমাজ গড়ে তোলাই আদর্শ শাসকের কর্তব্য।

তাই সারা বিশ্বের নেতাদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য ভগবানের শুদ্ধভক্তরা তাদের গুণ ও কর্ম অনুযায়ী জীবন যাপন করে, দৈব বর্ণাশ্রম ধর্ম অনুযায়ী জীবন যাপন করে, ভগবদ্ভক্তি অনুশীলন করে, বিশ্বময় জনগণকে জীবন সার্থক ও পূর্ণ করবার পন্থা দেখিয়েছেন। 'কলের্দোষনিধে রাজন্'—শাস্ত্রের এই বাণী অনুযায়ী কলিযুগে দোষ-ত্রুটি অসংখ্য। পাপ জীবনের স্তম্ভ-স্বরূপ হচ্ছে—অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, আমিষাহার, আসব পান, দ্যূতক্রীড়া। আদর্শ শাসকের উচিত প্রজাদের এই সব পাপ-কর্ম থেকে মুক্ত করা, ভক্তরাজ পরীক্ষিৎ মহারাজের শাসন ব্যবস্থা থেকে আমরা এই শিক্ষা লাভ করতে পারি।

আজকাল পৃথিবীর সব দেশেই বিধানসভা, সংসদ আদি আছে। সদস্যরা দেশের আইন প্রণয়ন করছেন, কিন্তু তবু দেশে চোর আছে, তস্কর আছে, কালোবাজারী আছে, কিন্তু কেন? তার কারণ হচ্ছে শুধু আইন পাশ করে, জনগণকে সুনাগরিক করা যায় না, তাদের আইনের প্রতি শ্রদ্ধাবান করা যায় না। তা কখনও সম্ভব নয়। এ সব কাজ জোর জবরদস্তিতে হয় না, বলপ্রয়োগ করে হয় না। এর জন্য জনগণকে সুনাগরিক হওয়ার প্রশিক্ষণ দেওয়া প্রয়োজন। যেমন, আজকাল স্কুল, কলেজ রয়েছে—জনগণকে বিভিন্ন বৃত্তি শিক্ষা দেওয়ার জন্য, কারিগরি শিক্ষা দেওয়ার জন্য, প্রযুক্তিবিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার জন্য। কম বেশি বিশ্বের প্রায় সব দেশেই বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা দেওয়ার জন্য বিভিন্ন রকম শিক্ষায়তন ও বিভাগ রয়েছে।

শাস্ত্রে বলা হয়েছে—বর্ণাশ্রম গুণান্বিতঃ। জনগণকে সুনাগরিক করে তোলার জন্য রাজ্যের আইনকানুন মান্য করবার জন্য এক পরিবেশ গড়ে তোলা যায়। প্রাথমিক অবস্থা গড়ে তোলা যায় বিশেষ বিশেষ শিক্ষায়তনে জনগণকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র হওয়ার প্রশিক্ষণ দেওয়ার

মাধ্যমে—ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস হওয়ার প্রশিক্ষণ দেওয়ার মাধ্যমে।

পুরাকালে রাজাকে বলা হত নরদেবতা। তাঁকে ভগবানের প্রতিনিধি বলে মান্য করা হত। তিনি শাস্ত্রজ্ঞ, পণ্ডিত, ব্রাহ্মণদের পরামর্শে দেশ শাসন ও প্রজা পালন করতেন, সকলকে শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে আদর্শ দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য শ্রীরামচন্দ্র সেইভাবেই তাঁর রাজ্য শাসন করতেন। তিনি ছিলেন ভগবান, তবু মানব সমাজকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি নিজে শাস্ত্র-সম্মতভাবে আচরণ করে সকলকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। সেই কারণে রাজ্যের প্রধানকে কখনও কখনও রাজর্ষিও বলা হত। কারণ রাজা হলেও, তাঁদের চরিত্র, তাঁদের আচার-ব্যবহার ছিল ঋষির মত। তারা ছিলেন আদর্শ শাসক, তাদের সঙ্গে নাগরিক বা প্রজাদের সম্বন্ধ সহজবোধ্য ছিল, তাই রাজ্যে তেমন কোন চোর, দস্যু, তস্করের উপদ্রব বা উৎপীড়ন ছিল না। তাই রামরাজত্বে আদর্শ শাসন ব্যবস্থা ছিল, এবং প্রজারা সুখে ও শান্তিতে বাস করত। কিন্তু গণতন্ত্রের যুগে, কলিযুগে তা হচ্ছে না। কেন না এখন বর্ণাশ্রম শিক্ষা ব্যবস্থা নেই। দস্যু, তস্করের রাজত্ব চলছে। আজ সকলেই প্রতারকদের হাতে প্রতারিত হচ্ছে। শাসকবর্গ 'কর'-এর নামে জনগণের বহু কষ্টার্জিত ধন অপহরণ করছে। জনগণও নানা উপায়ে 'কর' ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করছে। ফলে আজ পৃথিবীর দেশে দেশে শাসন ব্যবস্থায় এক বিশৃঙ্খলা এসেছে,—এক বিপর্যয় এসে উপস্থিত হয়েছে।

এই বিপর্যয় থেকে উদ্ধারের পথ ভগবান বা তাঁর শুদ্ধ-ভক্তরাই দেখাতে পারেন। তাই তারা বিশ্বের সকল দেশ নেতা থেকে শুরু করে জনগণকে ভগবৎ ভাবনা অনুশীলনে, বিশেষভাবে বর্তমান যুগে কৃষ্ণভাবনা অনুশীলনে উদ্বুদ্ধ করবার চেষ্টা করেন। তাই নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য শ্রীশ্রীমৎ অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ বিশ্বময় কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচার করে গেলেন। ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষাদর্শে বর্তমান যুগের দেশনেতাদের উদ্বুদ্ধ হওয়া চাই, পাপময় জীবন ত্যাগ করে কৃষ্ণভাবনা অনুশীলন করা চাই। শাস্ত্র অনুযায়ী কলিযুগে সুখ ও শান্তির একমাত্র পথ সংকীর্তন যজ্ঞ। তাই মহামন্ত্র কীর্তন করা চাই—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

এইভাবে দেশে আদর্শ নেতাগণ, ভগবৎ ভাবনাময় নেতা হলে দেশবাসীও সুনাগরিক হবে, দেশে দেশে সুখ ও শান্তি বিরাজ করবে।

ভগবান শ্রীরামচন্দ্র ছিলেন আদর্শ শাসক। তিনি শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন কিভাবে দেশ শাসন করলে, প্রজাপালন করলে সারা বিশ্বে জনগণ সুখ ও শান্তিতে বসবাস করতে পারে এবং এই রকম ভগবৎ ভাবনাময় জীবনে জনগণের জীবন সার্থক হতে পারে। ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের লক্ষণ বর্ণনা করেছেন। ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের রাজত্বকালে আদর্শ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়াদি ছিল, তারা সেইভাবে আচরণ করত।

একজন আদর্শ গৃহস্থ শ্রীরামচন্দ্র আচার্যের উপদেশে প্রাতে যজ্ঞানুষ্ঠান লীলা করতেন। ব্যক্তিগত অলঙ্কার ও পোশাক ছাড়া ভগবান শ্রীরামচন্দ্র তাঁর সব কিছুই ব্রাহ্মণদের মধ্যে বিতরণ করে দিতেন। ব্রাহ্মণরা শ্রীরামচন্দ্রের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন, শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি ব্রাহ্মণদেরও গভীর প্রীতিভাব ছিল। তাই শ্রীরামচন্দ্রের প্রদত্ত সব দানই তারা প্রত্যর্পণ করতেন, প্রীতি-বিগলিত হৃদয়ে তারা বলতেন, "হে প্রভু, আপনি নিখিল ভুবনের ঈশ্বর, আমাদের জড় জাগতিক বিষয় সম্পদের কোন প্রয়োজন নেই। আপনি আমাদের হৃদয়ের অন্তঃস্থলে প্রবেশ করে, জ্ঞানালোকের মাধ্যমে যে তম-অন্ধকার দূর করেন, সেইটি আপনার সর্বশ্রেষ্ঠ দান।"

ভগবান শ্রীরামচন্দ্র অযোধ্যায় যখন রাজ্য শাসন লীলা করতেন, তখন অযোধ্যাবাসী প্রজারা শ্রীরামচন্দ্রকে সশ্রদ্ধ প্রণাম করে, তাঁর চরণকমল স্পর্শ করে, পিতার মত মহারাজকে দর্শন করে, কখন বা বন্ধুর মত তাঁর পাশে উপবেশন করে, কিংবা তার পুত সান্নিধ্য লাভ করে ধন্য হয়েছিল এবং তাঁর সেবা করে তাদের জীবন সফল ও সার্থক করে তুলেছিল।

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি—এই চার যুগের মধ্যে কলিযুগই সবচেয়ে দুঃখজনক, কিন্তু এই যুগে—

অস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ ॥

ভগবানের নাম (রাম, কৃষ্ণ আদি) কীর্তন করে কলির প্রভাব থেকে জনগণ মুক্ত হতে পারে, সকল কলুষতা থেকে মুক্ত হতে পারে। এই যুগে এইটি সুখ-শান্তিময় ভগবৎ ভাবনাপূর্ণ জীবন লাভের সুবর্ণ সুযোগ।

ভগবান শ্রীরামই আবার এই যুগে গৌরসুন্দর রূপে আবির্ভূত হয়েছেন। তিনি পতিতপাবন। কলিযুগে জনগণ সকলেই প্রায় পতিত। শ্রীগৌরসুন্দর আমাদের রামরাজ্য বা ভগবানের রাজ্যে বসবাসের পথ দেখিয়েছেন। ভগবানের নাম ও তিনি অভিন্ন, শ্রীগৌরসুন্দর আমাদের এই শিক্ষা দিয়েছেন।

তাই নিরপরাধে আমরা ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করতে পারি—সদাচার পালন করতে পারি—অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, আমিষাহার, আসব পান, জুয়াখেলাদি পরিত্যাগ করে। আর যদি নিয়ত আমরা শুধু ভগবৎ প্রসাদ গ্রহণ করি, রামরাজত্ব এই কলিযুগেই তখুনি শুরু হয়ে যাবে।

'কলিযুগে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার।' কলিযুগে এই দুঃসময়ে বিশ্বময় ভগবানের নাম কীর্তন—'হরি সংকীর্তন যজ্ঞ' হওয়া জরুরি ও একান্ত প্রয়োজন।

অসুর জীবন ও ভক্ত জীবন

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় অর্জুনকে বলেছেন—

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

"হে ভারত, যখনই ধর্মের অধঃপতন হয় এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন আমি নিজেকে প্রকাশ করে অবতীর্ণ হই। সাধুদের পরিত্রাণ করার জন্য এবং দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ করার জন্য এবং ধর্মসংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।"

ভগবান সত্যযুগে নৃসিংহদেব রূপে আবির্ভূত হয়ে দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুকে বধ করে ভক্তশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদ মহারাজকে রক্ষা করেছিলেন।

কঠোর তপশ্চর্যার দ্বারা হিরণ্যকশিপু ব্রহ্মাজীকে তুষ্ট করে এবং সুদুর্লভ হলেও তাঁর অভীষ্ট বর লাভ করে। ভগবান বিষ্ণুর প্রতি সে অত্যন্ত রুষ্ট হয়েছিল, কারণ তার ভাই হিরণ্যাক্ষ পৃথিবীকে হরণ করে সমুদ্রতলে নিয়ে যাওয়ায় ভগবান বিষ্ণু বরাহ অবতার রূপে পৃথিবীকে উদ্ধার ও হিরণ্যাক্ষকে বধ করেছিলেন। হিরণ্যকশিপু এত প্রবল পরাক্রমশালী হয়ে উঠেছিল যে, ব্রহ্মাজী, দেবাদিদেব শিব ও ভগবান বিষ্ণু ছাড়া ব্রহ্মাণ্ডের সকলকে তার শাসনাধীন করেছিল। দেবরাজ ইন্দ্রকে স্বর্গরাজ্য থেকে সে বিতাড়িত করেছিল। সকল

দেবতারা তাঁর সেবা করত, তবু সে সুখী ছিল না, ধন ঐশ্বর্য ও ক্ষমতার মদে সে প্রমত্ত হয়ে উঠেছিল। শাস্ত্রের বিধি লঙ্ঘন করে, যজ্ঞাদি বৈদিক ধর্মানুষ্ঠান—ব্রাহ্মণ, মুনি ঋষিদের সে করতে দিত না। দর্প ও অহংকারে সে স্ফীত হয়ে উঠেছিল।

যজ্ঞানুষ্ঠানের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবান বিষ্ণুকে তুষ্ট করা। ব্রহ্মার কাছে বর লাভ করে, অতুলনীয় ঐশ্বর্য লাভ করেও ভগবান বিষ্ণুর প্রতি সে বিদ্বেষ ভাবাপন্ন ছিল। স্বর্গরাজ্য দখল করে সে ত্রিলোকের ও অন্যান্য লোকের অধিবাসীদের শাসন করত। মনুষ্য, গন্ধর্ব, গরুড়, উরগ, সিদ্ধ, চারণ, বিদ্যাধর, যম, মনু, যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ, ভূত, প্রেত—সমস্ত লোক সে জয় করেছিল। ব্রহ্মাণ্ডে যেখানে যত জীব ছিল সেই লোকের শাসকদের পরাভূত করে, সকলের উপর সে কর্তৃত্ব করত ও সকলের ক্ষমতা সে অধিকার করে নিয়েছিল। এইভাবে স্বর্গের সিংহাসন অধিকার করে, সেখানে বিখ্যাত নন্দনকানন, বিশ্বকর্মা নির্মিত বিপুল ঐশ্বর্য ও আড়ম্বরে পরিপূর্ণ ইন্দ্রপুরী সবই সে উপভোগ করত।

বর্তমান যুগের বিজ্ঞানীরা বলতে পারে পৃথিবীতেই একমাত্র জীব আছে, ব্রহ্মাণ্ডের অন্য গ্রহে কোন জীব নেই। তারা চন্দ্রগ্রহে অভিযান সাফল্যের দাবি করে। তারা বলে, তারা সেখানে কোন জীবনের চিহ্ন দেখে নি। সেখানে বিশাল গহ্বর রয়েছে—ধূলি ও পাথরে পূর্ণ সেগুলি। কিন্তু ত্রিকালজ্ঞ ব্যাসদেবের বর্ণনায় আমরা জানতে পরি যে চন্দ্রগ্রহ সহ অসংখ্য গ্রহে ও নক্ষত্রে বিভিন্ন রকম জীব রয়েছে।

আমরা যে পৃথিবীতে আছি তার চেয়ে ঊর্ধ্বলোকবাসীরা হাজার হাজার গুণ উন্নত ও ঐশ্বর্যশালী। স্বর্গলোকের স্থপতি বিশ্বকর্মা ঊর্ধ্বলোকে অনেক অনেক আশ্চর্যজনক অট্টালিকা প্রসাদাদি নির্মাণ করেন। সেখানে দেবতাদের আমোদ-প্রমোদের জন্য নন্দনকাননাদি, সুন্দর সুন্দর উদ্যানাদি রয়েছে। বৈদিক সাহিত্যের মতো প্রামাণিক শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে ঊর্ধ্বলোক ও ঐ লোকের ঐশ্বর্যের বিবরণ পাওয়া যায়। বৈদিক সাহিত্যের প্রত্যক্ষ তথ্য নির্ভুল ও ত্রুটিহীন। ইন্দ্রের স্ফটিকময় প্রাসাদ বহুমূল্য মহামরকত, বৈদুর্য মণি, পদ্মরাগ মণি প্রভৃতি দ্বারা সুশোভিত ছিল।

পিতামহ ব্রহ্মা, দেবাদিদেব শিব ও ভগবান বিষ্ণু ছাড়া স্বর্গের সকল দেবতারা হিরণ্যকশিপুর সেবা করতে বাধ্য ছিলেন। কঠোর শাস্তির ভয়ে তারা হিরণ্যকশিপুর আদেশ অমান্য করতে সাহসী ছিল না। শ্রীমদ্ভাগবতে বেন

রাজের উল্লেখ আছে, এই বেনরাজ ছিল ভগবদ্বিদ্বেষী। সেও ব্রাহ্মণদের বৈদিক ক্রিয়াকর্ম, যজ্ঞানুষ্ঠানকে নিদারুণ ঘৃণা করত।

বৈষ্ণবাচার্য শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর হিরণ্যকশিপুকে শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লেখিত বেনরাজের সঙ্গে তুলনা করেছেন। বেনরাজ, ভৃগু প্রভৃতি মুনিকে ভয় করত কিন্তু হিরণ্যকশিপুর ভয়ে সকল দেবতা এত ভীত ছিল যে তারা দৈত্যরাজকে নতমস্তকে প্রণাম করত।

ভৃগুমুনির ক্রোধানলে হিরণ্যকশিপু যাতে ভস্মীভূত না হয়, তাই সে কঠোর তপশ্চর্যা ও কৃচ্ছ্রসাধন করে, ভৃগু প্রভৃতি মুনির শক্তিকে অতিক্রম করে এবং তাঁদের পর্যন্ত তার আজ্ঞাধীনে এনেছিল। পিতামহ ব্রহ্মা, দেবাদিদেব শিব ও ভগবান বিষ্ণুকে বাদ দিলে ত্রিজগতের সকলেই তার দ্বারা উৎপীড়িত ও লাঞ্ছিত হয়েছিল। দেবর্ষি নারদ মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে জানান যে দেবরাজ ইন্দ্রের সিংহাসনে উপবিষ্ট হিরণ্যকশিপু নিজ বলে বিশ্বের সকলের নিয়ন্তা হয়ে উঠেছিল। দুই গন্ধর্ব বিশ্ববসু, তম্বুরু, বিদ্যাধর, অপ্সরারা বার বার তার বন্দনা করত।

দেবর্ষি নারদ অবশ্য তার অধীন ছিলেন না। তবুও তার পরাক্রম এত ছিল, কখনও কখনও ভক্তশ্রেষ্ঠ দেবর্ষি নারদ আদি পর্যন্ত তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল।

হিরণ্যকশিপু তীব্র গন্ধময় মদ্য পান করে প্রায়ই প্রমত্ত থাকত, তাই তার চোখ ছিল তাম্রবর্ণ। পিতামহ ব্রহ্মা, দেবাদিদেব শিব ও ভগবান বিষ্ণু ছাড়া সকল দেবতারাই তাকে তুষ্ট করবার জন্য স্বয়ং নানা রকম উপহার নিয়ে আসত তার কাছে। কঠোরভাবে বর্ণাশ্রম ধর্ম পালনকারীর প্রচুর পরিমাণে যে যজ্ঞের উপকরণ, উপহার আদি নিয়ে আসত, তার কিছু মাত্র সে দেবতাদের দিত না, নিজের ভোগের জন্য সব কিছু গ্রহণ করত।

হিরণ্যকশিপুর ভয়ে সপ্তদ্বীপ সমন্বিত পৃথিবীতে কৃষিকার্য ছাড়াই প্রচুর খাদ্যশস্য উৎপন্ন হত, গাভীরা বৈকুণ্ঠের সুরভিদের মত প্রচুর দুগ্ধ দান করত, আকাশ পথও অপূর্ব সুন্দর রূপ ধারণ করত। আর ঊর্মিমালাময় সমুদ্র ও নদীগুলি হিরণ্যকশিপুর ভোগের জন্য বহুমূল্য নানা রত্ন উৎপন্ন করত।

শাস্ত্র অনুযায়ী প্রকৃতির তিনটি গুণ তিনজন বিভিন্ন দেবতার নির্দেশ অনুযায়ী সক্রিয় হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লেখ করা হয়েছে 'তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ঃ'—অর্থাৎ এই জড় জগৎ মৃত্তিকা, জল ও আগুনের মিশ্রণেই আকার লাভ করেছে। ইন্দ্রের নির্দেশে বারি বর্ষণ হয়, সেরকম অন্যান্য দেবতাদের

সাহায্য ছাড়াই তপশ্চর্যা ও কৃচ্ছ্রসাধনার দ্বারা প্রবল পরাক্রমশালী হিরণ্যকশিপুর নির্দেশেই এসব কার্য সম্পাদিত হত। যারা বিশ্বের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা লাভ করে, ইন্দ্রিয় তৃপ্তিকর সব কিছু উপভোগ করলেও, সে জীবনে সুখী হতে পারেনি, কারণ ইন্দ্রিয় সংযমের পরিবর্তে সে ছিল ইন্দ্রিয়ের দাস।

আদর্শ জীবন হচ্ছে ভক্তজীবন—ভগবৎ সেবাময় জীবন, অর্থাৎ যে জীবনে ভগবানের তৃপ্তির জন্য ইন্দ্রিয়গুলিকে ব্যবহার করা হয়, নিযুক্ত করা হয়।

'হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে'।

এখানে লক্ষ্যণীয় দৈত্যরাজের নাম ছিল হিরণ্যকশিপু অর্থাৎ স্বর্গ, ধন-সম্পদ ও স্ত্রীসঙ্গ ভোগই যার জীবনের অন্তিম লক্ষ্য। আসুরিক জীবনের অন্তিম লক্ষ্যই হচ্ছে চরম ইন্দ্রিয়তৃপ্তি। ভগবদ্বিদ্বেষী অসুর ইন্দ্রিয় সুখকর এক পরম আরামপ্রদ জীবন যাপনের ব্যবস্থা করে, কিন্তু তারা ইন্দ্রিয়ের দাস হওয়ায় পরিশেষে জীবনে সুখী হতে পারে না। এই সব অসুররা অর্থ ও স্ত্রীসঙ্গ ভোগের আয়োজনেই অনেক অগ্রসর হয়েছে। এইটিই হচ্ছে বর্তমান জগতের জনজীবন। হিরণ্যকশিপুর মত বর্তমান যুগের লোকেরাও কর্তৃত্ব ও ইন্দ্রিয়ভোগের চূড়ান্ত আয়োজন করেও কেউ কখন সুখী হতে পারবে না। তাই শ্রীল ব্যাসদেব শ্রীমদ্ভাগবতে লিখেছেন—

নূনং প্রমত্ত কুরুতে বিকর্ম
যঃ ইন্দ্রিয়প্রীতয়ে আপ্নোতি।

"ইন্দ্রিয়ভোগই যাদের জীবনের অন্তিম লক্ষ্য, তারা ইন্দ্রিয়তৃপ্তিতে প্রমত্ত হয়ে সব রকম শাস্ত্র বিরুদ্ধ কর্ম করে।" তাই তারা ভগবানকে জানতে পারে না। অর্থাৎ—

সকল যজ্ঞ তপস্যার আমি ভোক্তা হই।
সমস্ত লোকের স্বামী কেহ নহে সেই॥
সমস্ত জীবের বন্ধু আমি একমাত্র।
জগতের শান্তি হয় জানিলে সর্বত্র॥

শান্তিপূর্ণ সুখী জীবনের এইটি হচ্ছে পন্থা। এখানে তিনটি সত্য উল্লেখ করা হয়েছে। পরমেশ্বর ভগবান বিষ্ণু হচ্ছেন সব কিছুরই পরম ভোক্তা, নিখিল সৃষ্টির অন্তিম মালিক, এবং তিনিই জীবকুলের পরম কল্যাণকামী বন্ধু। এই সত্য উপলব্ধি হলে শান্তিলাভ হয়—জীবন সুখময় হয়।

এই দিব্য সুখলাভের উদ্দেশ্যে জীবাত্মা ব্রহ্মাণ্ডে বিভিন্ন যোনি ভ্রমণ করে চলেছে। ভগবানের সঙ্গে তার অন্তরঙ্গ 'সম্বন্ধ'-এর কথা ভুলে যাওয়ায় অনেক

অনেক জীবদেহে সে দুঃখ ভোগ করে চলে। জীবমাত্রই ভগবানের সঙ্গে বিশেষ সম্বন্ধ রয়েছে আর মনুষ্য জীবনে ভগবান বিষ্ণুর সঙ্গে নিত্য সম্বন্ধের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা যায়। আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ এই শিক্ষাই সারা বিশ্বের জনগণকে দিয়ে গিয়েছেন। ক্রমশ ক্রমশ আজকাল বিশ্বের মানব সমাজ জীবনের অন্তিম লক্ষ্যের প্রতি উদাসীন হয়ে পড়ছে; নিত্য আনন্দময় জীবন লাভে উদাসীন হয়ে পড়ছে। ভগবান শ্রীহরিকে তুষ্ট করাই যে জীবনের পরম সিদ্ধি, এই জ্ঞানের অভাবে ধীরে ধীরে মানুষ কুকুর, বেড়ালের মতো জীবন যাপন করতে চলেছে। এই আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন বিশ্বের জনগণের সেবা করতে চায়, তারা বিশ্বময় কৃষ্ণভক্তি প্রচার করতে চায়।

শাস্ত্রে বলা হয়েছে, 'মহাজন যেন গত স পন্থা'—অর্থাৎ স্বয়ম্ভু, শম্ভু, নারদ মুনি, কপিলদেব, জনক রাজ, যমরাজ, বলি মহারাজ, ভক্ত প্রহ্লাদ, কুমার, ভীষ্মদেব ও শুকদেব—এই মহাজনদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে বলা হয়েছে।

দেবর্ষি নারদ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের কাছে ভক্তশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদ মহারাজের অতুলনীয় চরিত্র ও গুণাবলী বর্ণনা করেছেন। প্রহ্লাদ মহারাজ অসুর পিতা হিরণ্যকশিপুর জঘন্য সকল অত্যাচার ও উৎপীড়ন সহ্য করেন। সব সময় ভগবানকে স্মরণ করেন, ভগবানও তাঁর প্রিয় ভক্তকে রক্ষা করেন।

হিরণ্যকশিপুকে বধ করে ভগবান নৃসিংহদেব প্রহ্লাদকে বর প্রার্থনা করতে বললেন। প্রহ্লাদ কিন্তু এই বর নেওয়াকে বণিকের মনোবৃত্তি বলে বিবেচনা করেছেন, এগুলি শুদ্ধ ভক্তির প্রতিবন্ধক। তিনি ভগবানের কাছে শুদ্ধ ভক্তি—ভগবৎ সেবা প্রার্থনা করলেন, আর কিছু চাইলেন না। এইটি হচ্ছে শুদ্ধ ভক্তের লক্ষণ।

ভক্তশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদ মহারাজ বলেছেন কৃষ্ণানুশীলন হচ্ছে—

শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥

অর্থাৎ, সর্বত্র—সকল স্থানে, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে বালক-বালিকা, যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা নির্বিশেষে হরিকথামৃত শ্রবণ শিক্ষণীয়। অর্থাৎ, প্রত্যেকের জীবনে কায়মনোবাক্যের দ্বারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ ভগবদ্গীতার বাণী প্রয়োগ করা উচিত। এইভাবে পশু জীবনে অধঃপতনের ভয় থাকবে না।

প্রহ্লাদ মহারাজ নবধা ভক্তির কথা বলেছেন পূর্বের শ্লোকে। ভগবান বিষ্ণুর দিব্য নাম, রূপ, গুণ, লীলাদি মহিমার শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, ভগবৎ পাদ সেবন, অর্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন—এই ন'টির যে কোন একটি বা একাধিক বা সব কটি পন্থায় কৃষ্ণানুশীলন করে যে কেউ ভগবানের ধামে যেতে পারে।

কলিযুগে কৃষ্ণানুশীলন খুবই সহজ। ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শাস্ত্রীয় এই শিক্ষা সকলকে গ্রহণ করতে বলেছেন—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

সকলের প্রয়োজন শুধু মহামন্ত্র কীর্তন করা—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

ঋষভদেব ও তাঁর শিক্ষা

মহারাজ নাভি ও তাঁর পত্নী মেরুদেবী অনেক যজ্ঞানুষ্ঠান সহ ভগবান বিষ্ণুর উপাসনা করেন, এবং বহুকাল তাঁরা কঠোর তপশ্চর্যা ও কৃচ্ছ্রসাধন করেন। ভগবান বিষ্ণু মহারাজ নাভির ভগবৎ ভজনে অতীব তুষ্ট হয় এবং তাঁদের অভিলাষ পূর্ণ করবার উদ্দেশ্যে তাঁদের পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

জন্ম হওয়া মাত্র ঋষভদেবের মধ্যে সকল ভগবৎ লক্ষণসমূহ প্রকাশিত হয়েছিল। যেমন তাঁর পদতলে ধ্বজ, কমল, বজ্রাদি চিহ্নসমূহ বিরাজমান ছিল। ভগবান ধন, বীর্য, যশ, শ্রী, বৈরাগ্য আদি ষড় ঐশ্বর্যে পূর্ণ। ঋষভদেব সকল ঐশ্বর্যে পূর্ণ হলেও, শাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি কিন্তু আদৌ বিষয় ভোগে আসক্ত ছিলেন না। তাঁর মন ও ইন্দ্রিয়সমূহ বশীভূত হওয়ায় তিনি সম্পূর্ণ শান্ত ছিলেন। তিনি সকলের প্রতি সমদর্শী ছিলেন। তিনি কখনও একজনকে অনুগ্রহ ও অপরকে উপেক্ষা বা অবহেলা করতেন না। তিনি সকলেরই প্রিয় ছিলেন। প্রায়ই আমাদের দেশে বহু ভুঁইফোড় অবতার দেখা যাচ্ছে, তাই বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রই শাস্ত্রীয় লক্ষণসমূহ বিচার করে একজনের ভগবত্তা বিষয়ে নিশ্চিত হবেন।

তাঁর প্রভাব দিন দিন বৃদ্ধি পেয়েছিল। তখন রাজ্যের প্রজা, ব্রাহ্মণ ও এমন কি দেবতারা পর্যন্ত তাঁকে শাসকরূপে লাভ করতে চেয়েছিল।

তাঁর দেহ জড় জাগতিক লোকের মতো ছিল না, সেটি ছিল বিশুদ্ধ সত্ত্বময় দেহ। তাছাড়া বল, শ্রী, তেজ, বীর্য, শৌর্য এবং যশস্বীসম্পন্ন হওয়ায় তিনি সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। অতুলনীয় বৈশিষ্ট তাঁর মধ্যে দেখা গিয়েছিল। সকল ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ লক্ষণসমূহ দেখে মহারাজ নাভি তাঁর নাম রেখেছিলেন ঋষভ।

পরমেশ্বর ভগবানকে পুত্ররূপে লাভ করে মহারাজ নাভি অতি যত্নে, পরম স্নেহে তাঁকে লালন-পালন করেছিলেন। তারপর এক সময় সংসার ত্যাগ করে ভগবৎ ভজনের উদ্দেশ্যে পত্নী সহ মহারাজ নাভী বদরিকাশ্রমে চলে গিয়েছিলেন এবং সমস্ত রাজ্যের শাসনভার অর্পণ করেছিলেন পুত্র ঋষভদেবকে।

'যস্য হি ইন্দ্র স্পর্ধমানো'—অর্থাৎ ঋষভদেবের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে দেবরাজ ইন্দ্র জগতে বারিপাত থেকে বিরত হলে, যোগেশ্বর ঋষভদেব ইন্দ্রের আচরণে মৃদু হেসেছিলেন (ভগবানৃষভদেবো যোগেশ্বরঃ প্রহস্যাত্মযোগমায়য়া এবং স্ববর্ষমজনাভং নামাভ্যবর্ষং)—এবং তারপর যোগমায়ার মাধ্যমে 'অজানত' নামে নিজ রাজ্যে প্রবল বৃষ্টিপাত ঘটিয়েছিলেন।

ভগবানকে শাস্ত্রে যজ্ঞ, যজ্ঞপতি বলেও অভিহিত করা হয়। তাছাড়া ভগবান হচ্ছেন সর্বশক্তিমান, তাঁর পক্ষে এই রকম কাজ অতীব তুচ্ছ। এই যুগে জনগণের অজ্ঞতা ও যজ্ঞের উপকরণের অভাবের জন্য জনসাধারণ যজ্ঞানুষ্ঠানে অবহেলা করবে, তার ফলে প্রায়ই খরা বা অনাবৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

যজ্ঞানুষ্ঠানেই ভগবান তুষ্ট হন, তাই কলিযুগে সুমেধাসম্পন্ন ব্যক্তিরা সংকীর্তন যজ্ঞ দ্বারা ভগবানকে তুষ্ট করেন বলে শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লেখ করা হয়েছে।

আর ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মহামন্ত্র কীর্তন দ্বারা জগতের অন্তিম কল্যাণের পথ দেখিয়েছেন—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

সাম্প্রতিককালে আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য শ্রীশ্রীমৎ অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ বিশ্বময় সকলকে মহামন্ত্র শিক্ষা দিয়েছেন।

ভগবান হচ্ছেন সর্বজ্ঞ, তবুও জগদ্বাসীকে শিক্ষা দেওয়ার জন্যে তিনি গুরুগৃহে শিক্ষা গ্রহণ করেন। প্রকৃত শিক্ষা গুরুকুলে লাভ হয়। সেটিই হচ্ছে বৈদিক পন্থা। স্বয়ং আচরণ করে অন্যকে শিক্ষা দেওয়া যায় বলে তিনি গুরুকুলে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। শিক্ষা শেষ করে তিনি গুরুবর্গকে দক্ষিণা দান করেন। তারপর গার্হস্থ্য জীবনে প্রবেশ করেন। দেবরাজ ইন্দ্রদত্ত জয়ন্তীকে তিনি পত্নীরূপে গ্রহণ করেন।

শ্রুতি ও স্মৃতি শাস্ত্র অনুযায়ী পত্নী সহ তিনি আদর্শ জীবন যাপন করেন। ঋষভদেব ও জয়ন্তীদেবী ভগবানের মতো গুণ-সম্পন্ন একশত পুত্র সন্তান লাভ করেন। তিনি আদর্শ গৃহস্থ জীবন যাপন করেছিলেন, এবং পুত্রদের শিক্ষা দিয়েছিলেন কিভাবে দিব্য জীবন যাপন করতে হয়।

ভগবানের অবতারের কার্যাবলী জড়-জাগতিক কর্ম নয়। ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলেছেন, 'পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্'— অর্থাৎ ভক্তদের উদ্ধার ও অসুরদের বিনাশ করতে ভগবান জগতে আবির্ভূত হন—এইটি হচ্ছে তাঁর অবতরণের উদ্দেশ্য। প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য হচ্ছে ভগবানের নির্দেশ, শাস্ত্র ও ভক্তদের শিক্ষা ও আদর্শ অনুসরণ করে দিব্য জীবন লাভ করা, কৃষ্ণভাবনাময় হওয়া এবং জীবন অবসানে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া।

ঋষভদেবের একশত পুত্র সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে লেখা আছে—

যেষাং খলু মহাযোগী ভরতো জ্যেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠ গুণ।
অসীদ্যেনেদং বর্ষং ভারতমিতি ব্যপদিশন্তি ॥

তাঁর পুত্রদের মধ্যে অগ্রজ ভরতই ছিল শ্রেষ্ঠ গুণসম্পন্ন, তাঁর উদ্দেশে সম্মান প্রদর্শনের জন্য এই পৃথিবীর নাম হয় ভারতবর্ষ। আধুনিক যুগে কেবল হিমালয় থেকে কুমারিকা অন্তরীপ পর্যন্ত ভূখণ্ডকে ভারতবর্ষ বলা হয়। এই ভূখণ্ডকে পুণ্যভূমিও বলা হয়। এই ভারতভূমিতে জন্ম-গ্রহণকারী অত্যন্ত ভাগ্যবান, কারণ এখানে সহজেই কৃষ্ণানুশীলন করে সহজেই ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন—

ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার ॥

(চৈঃ চঃ আদি ৯/৪১)

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের আচার্য ও প্রতিষ্ঠাতা ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দিব্য জীবনলীলা থেকে আমরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আদর্শ শিক্ষার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখতে পাই।

কুশাবর্ত, ইলাবর্ত, ব্রহ্মাবর্ত, মলয়, কেতু, ভদ্রসেন, ইন্দ্রস্পৃক, বিদর্ভ ও কীকট—এঁরা ছিলেন যথাক্রমে ভরতের অনুজ। তা ছাড়া কবি, হবি, অন্তরিক্ষ, প্রবুদ্ধ, দ্রুমিল, চমস, করভাজনাদি ন'জন ছিলেন ভাগবত ধর্ম প্রচারক মহাভাগবত। অবশিষ্ট পুত্রদের সম্বন্ধে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিৎকে বলেছেন,—'পিতৃরাদেশকরা মহাশালীনা, মহাশ্রোত্রিয়া, যজ্ঞশীলা কর্মবিশুদ্ধা ব্রাহ্মণা'—অর্থাৎ তাঁরা পিতার আজ্ঞাপালক, বিনীত, বেদজ্ঞ, যজ্ঞশীল ও বিশুদ্ধ কর্মরত ব্রাহ্মণ গুণসম্পন্ন ছিলেন।

মহারাজ হওয়ায় ঋষভদেব নিঃসন্দেহে ক্ষত্রিয় ছিলেন। এক শত পুত্রদের মধ্যে শাসন করত দশজন অর্থাৎ গুণ ও কর্ম অনুযায়ী তারা ছিল ক্ষত্রিয়। এখান থেকে জানা যায় গুণ ও কর্ম দ্বারাই একজনের বর্ণ নিরুপণ করা যায়—জন্ম দ্বারা নয়। ভগবানের সৃষ্টি এই বর্ণাশ্রম ধর্ম সম্বন্ধে ভগবান স্বয়ং ভগবদ্গীতায় বলেছেন—

চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ।

জন্ম অনুসারে ঋষভদেবের পুত্ররা ক্ষত্রিয় হলেও, কিন্তু গুণ ও কর্ম অনুযায়ী কেউ ক্ষত্রিয়, কেউ ব্রাহ্মণ, আবার কেউ কেউ তাদের চেয়ে অনেক উন্নত শ্রীমদ্ভাগবতের প্রচারক মহাভাগবত ছিলেন। জনগণকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য ঋষভদেব বহু অনুষ্ঠান করেছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি পুত্রদের প্রজাপালন শিক্ষাও দিয়েছিলেন।

পরমেশ্বর ভগবান হওয়ায় ঋষভদেব সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কেন না তিনি ছিলেন সৎ, চিৎ ও আনন্দঘন এবং জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধির উর্দ্ধে। তা ছাড়া তিনি সকলের প্রতি সমভাবাপন্ন ছিলেন। তিনি অন্যের দুঃখে দুঃখী এবং সকল জীবের কল্যাণকামী সুহৃৎ ছিলেন। সকলের পরম নিয়ামক, পূর্ণ ব্যক্তিত্ব হলেও একজন সাধারণ বদ্ধ জীবের ন্যায় আচরণ করতেন। তাই তিনি কঠোরভাবে বর্ণাশ্রম ধর্ম আচরণ ও পালন করতেন। কালক্রমে বর্ণাশ্রম ধর্ম অবহেলিত হলে নিজ ব্যক্তিত্ব ও আচরণ দ্বারা অজ্ঞ জনসাধারণকে বর্ণাশ্রমোচিত কর্তব্য শিক্ষা দিয়েছিলেন। এইভাবে তিনি গৃহস্থ জীবনে ধর্ম, অর্থ, যশ, পুত্র-কন্যা, জড়ভোগ, অনন্ত জীবন লাভে জনগণকে নিয়ন্ত্রিত করেছিলেন। উপদেশের মাধ্যমে তিনি তাদের শিক্ষা দিয়েছিলেন কিভাবে গৃহস্থ জীবনে বর্ণাশ্রম ধর্ম আচরণ করেও তারা জীবনে সফল হতে পারে, ভগবদ্গতি লাভ করতে পারে।

ভগবান ঋষভদেব বিশ্ব পরিভ্রমণকালে একসময় ব্রহ্মবর্তে উপস্থিত হন। সেখানে ব্রাহ্মণ রাজপুত্র ও প্রজাদের এক সমাবেশ হয়; সংযত, বিনয়সম্পন্ন ও

ভক্তিমান হলেও নিজ পুত্রদের তিনি শিক্ষা দিয়েছিলেন। ঋষভদেব বলেন, "হে পুত্রগণ, এই জগতে জীবকুলের মধ্যে মনুষ্য জীবন কুকুর ও বিষ্ঠাভোজী শূকরের সহজলভ্য ইন্দ্রিয় সুখভোগের উদ্দেশ্যে দিবারাত্র পরিশ্রম করবার জন্য নয়। মনুষ্য জীবন কৃচ্ছ্রসাধন ও তপশ্চর্যার জন্য—যার দ্বারা সত্ত্বা শুদ্ধ হয় ও অনন্ত চিন্ময় সুখ অনুভব করা যায়।"

"মহাত্মার সেবার মাধ্যমে ভববন্ধন মোচন হয়। ভগবৎ সত্তায় লীনে ইচ্ছুক বা ভগবৎ সঙ্গ লাভে অভিলাষী উভয়কেই মহাত্মার সেবা করা চাই। মহতের সেবাহীন স্ত্রীসঙ্গ ও স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গ অভিলাষীদের জন্য নরকের দ্বার উন্মুক্ত। মহাত্মারা সকলেই সুহৃৎ, প্রশান্ত, ক্রোধহীন, সাধু ও সর্বজীবে সমদৃষ্টিসম্পন্ন।"

"এই মহাত্মারা কৃষ্ণভাবনার পুনর্জাগরণ করে ভগবদ্ভক্তি বৃদ্ধিতে আগ্রহী—যাতে কৃষ্ণের সুখ হয় না, এমন কর্মে তারা নিযুক্ত হন না।"

"আহার, নিদ্রা, মৈথুন ও আত্মরক্ষাই যাদের জীবন, মহাত্মারা তাদের সঙ্গ করেন না। মহাত্মারা গৃহী হলেও তারা স্ত্রী-পুত্র-গৃহ ও অর্থ-সম্পদে আসক্ত নন। তবে নিজ নিজ কর্তব্য কর্মে তারা উদাসীন নয়। দেহ ও আত্ম রক্ষার্থে যতটুকু অর্থ একান্তই প্রয়োজন ততটুকু মাত্র তারা সংগ্রহ করেন।"

"ইন্দ্রিয়-তর্পণকেই যারা জীবনের চরম লক্ষ্য বিবেচনা করে, বিষয় ভোগে প্রমত্ত হয়ে তারা নানা রকম পাপকর্মে লিপ্ত হয়। তারা জানে না যে পূর্বের পাপ কর্মের ফলে তারা অনিত্য ক্লেশপ্রদ ভৌতিক দেহ লাভ করেছে। প্রকৃতপক্ষে জীবাত্মার জন্য জড় দেহ নয়, কিন্তু ইন্দ্রিয় ভোগের জন্য সে এই জড় দেহ প্রাপ্ত হয়। তাই যে ইন্দ্রিয়ভোগময় কর্মের ফলে বার বার বিভিন্ন জীবদেহ প্রাপ্তি হয়, বুদ্ধিমান ব্যক্তির সেই কর্মে রত হওয়া অনুচিত বলে আমি মনে করি।"

"এই জীবনে আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে উদাসীন ব্যক্তির জীবনে সকল প্রয়াসই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় এবং অজ্ঞতার ফলে জীবন দুঃখপূর্ণ হয়ে উঠে। পাপ বা পুণ্য কর্মের ফল রয়েছে। সাধারণত কাম্য কর্মে রত ব্যক্তির মন অশুদ্ধ, তার চেতনা অপবিত্র। কর্মফলে অভিলাষী ও আবিষ্ট হওয়ায় তাকে আবার ভৌতিক দেহ ধারণ করতে হবে।

"অজ্ঞানাচ্ছন্ন জীবন আত্মা ও পরমাত্মাকে উপলব্ধি করতে পারে না এবং তার মন সকাম কর্মের বশীভূত হয়। তাই ভগবান বাসুদেব, আমাতে প্রীতির উদয় না হলে, তার ভববন্ধন মোচন হয় না।"

"স্ত্রী-পুরুষের মিথুনীভাবই সংসার জীবনের মূল ভিত্তি। স্ত্রী-পুরুষের বন্ধনের ফলে দেহ, গেহ, সুত, ধন-সম্পদ আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। এইভাবে মোহাচ্ছন্ন হয়ে 'আমি আমার দুর্বুদ্ধির উদয় হয়।"

"কর্মবন্ধনের ফলস্বরূপ দৃঢ় হৃদয়গ্রন্থী যখন শিথিল হয়, তখন বিষয়ভোগী জীবের গৃহ, স্ত্রী, সুতের প্রতি আসক্তি ক্ষয় হয়। এইভাবে তার (আমি ও আমার) মোহ বিদূরিত হয়, এবং সে তখন মুক্ত হয়ে পরাভক্তিতে উন্মুখ হয়।"

"হে পুত্রগণ, একজন পরমহংসকে দীক্ষাগুরুরূপে বরণ করবে। এইভাবে তোমাদের শ্রদ্ধা ও প্রীতি পরমেশ্বর ভগবান আমাতে অর্পণ করবে। শীত-গ্রীষ্ম ঋতুর পরিবর্তনের মতো দ্বন্দ্বময় সুখ-দুঃখে সহনশীল হয়ে ইন্দ্রিয়-ভোগে বিতৃষ্ণা হবে, এমন কি উর্ধ্বলোকেও জীবকুলের দুর্দশাপূর্ণ অবস্থা উপলব্ধির চেষ্টা করবে। সত্যানুসন্ধান করা চাই। ভগবদ্ভক্তি লাভের জন্য সব রকমের কৃচ্ছ্রসাধন ও তপশ্চর্যা করা চাই। ইন্দ্রিয়-ভোগের প্রয়াস ত্যাগ করে ভগবদ্ভক্তি অনুশীলন কর। ভগবৎ কথালোচনা শ্রবণ কর, চিন্ময় ভূমিকায় সকলের প্রতি সমদৃষ্টিসম্পন্ন হও। বৈরীভাব ত্যাগ কর, শোক ক্রোধের বশীভূত হয়ো না। দেহ-গৃহে আত্মবুদ্ধি ত্যাগ করে শাস্ত্র অধ্যয়ন অনুশীলন কর। ইন্দ্রিয়, মন ও প্রাণবায়ুকে এই পন্থায় সম্পূর্ণভাবে সংযত করা চাই। বৈদিক শাস্ত্র বাক্যে পূর্ণ বিশ্বাস করে সর্বদা ব্রহ্মচর্য রক্ষা করতে হবে এবং পরমেশ্বর ভগবানকে মনে রাখতে হবে। এইভাবে ভক্তিযোগ অনুশীলন করে জড় অহংকারকে ত্যাগ করবে।

"যে ঐকান্তিকভাবেই ভগবদ্ধামে যেতে চায়, পরমেশ্বর ভগবানের কৃপা লাভকে তার জীবনের পরম লক্ষ্যরূপে বিবেচনা করা চাই। পিতা, গুরু বা রাজা—পুত্র, শিষ্য ও প্রজাদের আমার মতোই উপদেশ দিবেন। এইগুলি বুঝতে বা পালনে তারা কখনও কখনও অসমর্থ হলেও, তাদের উপদেশ দেওয়া উচিত, ক্রুদ্ধ হওয়া উচিত নয়। পাপ ও পুণ্য কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিদের সর্ব প্রকারে ভগবৎ ভজনে নিয়োগ করা উচিত। দিব্যজ্ঞানহীন অন্ধ নেতা তার অনুগামীদের সংসারকূপে পতন ঘটায়, কিন্তু পিতা, গুরু বা রাজা অনুগামীদের ভগবৎ সেবায় নিয়োগ করে।"

"আপাত দৃষ্টিতে জড় মানব দেহ হলেও আমার এই শরীর সৎ, চিৎ ও আনন্দময়—অপ্রাকৃত ও অবিচিন্ত্য। আমি জড় মায়ার প্রভাবে বিশেষ দেহ ধারণ করি না, পক্ষান্তরে আত্মমায়ায় স্বয়ং প্রকাশিত হই। আমার হৃদয়ও অপ্রাকৃত, আমি সর্বদাই আমার ভক্তদের কল্যাণ চিন্তা করি। তাই আমার হৃদয়ে শুধু ভক্তিই বিরাজমান দেখা যায়। অধর্ম, অভক্তি আমার হৃদয় থেকে বহু দূরে পরিত্যক্ত। এইগুলি আমার হৃদয়কে স্পর্শও করে না। এ সব দিব্য গুণাবলীর জন্য জনগণ আমাকে পরমেশ্বর (সর্বশ্রেষ্ঠ জীব) ঋষভদেব রূপে বন্দনা করে।"

"হে পুত্রগণ, তোমরা সকলেই আমার হৃদয় থেকে উৎপন্ন হয়েছ, তাই বিদ্বেষী ও বিষয়ীর মতো আচরণ করো না, তোমাদের অগ্রজ মহাভাগবত ভরতের সেবা করো, তা হলে আমার সেবা হবে ও তোমরা স্বতঃই প্রজা পালন করবে। জন্ম-মৃত্যুময় সংসার থেকে যিনি তার অধীনস্থ প্রিয়জনকে উদ্ধার করতে পারেন না তাঁর কখন গুরু, পিতা, পতি বা জননী হওয়া উচিত নয়।"

"সকল জীবসমূহের মধ্যে ব্রাহ্মণরাই শ্রেষ্ঠ, কিন্তু ব্রাহ্মণের চেয়েও বৈষ্ণবেরা শ্রেষ্ঠ। বৈষ্ণবের সেবা করা হলেই পরমেশ্বর ভগবানের সেবা হয়ে যায়।"

এইভাবে জীবকুলের পরম সুহৃৎ পরমেশ্বর ভগবান ঋষভদেব নিজ পুত্রদের উপদেশ দিয়েছিলেন।

ভগবৎ বিরহ ও কৃষ্ণস্মরণ

ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষানুযায়ী ভগবান কৃষ্ণ সর্বদাই বিরাজমান, ঠিক যেমন সূর্য সব সময়ই আকাশে বিরাজমান। কখন কখন তিনি আবির্ভূত হন, আবার কখন কখন অন্তর্হিত হন। আবির্ভাবে যেমন তাঁর সান্নিধ্য লাভ করা যায় তেমনি অন্তর্হিত হলেও শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণাদি ভগবৎ ভজনের মাধ্যমেও ভগবৎ সান্নিধ্য লাভ করে ভক্তরা পরমানন্দ অনুভব করেন। বিশেষত ভগবৎ বিরহে কৃষ্ণস্মরণ করে ভগবানের শ্রেষ্ঠ-ভক্তরা ভগবৎ-ভাবনায় তন্ময় হয়ে থাকতেন।

ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা হচ্ছে ভগবৎ বিরহে হরিভজন। এইভাবে ভগবৎ সান্নিধ্য আরো নিবিড়ভাবে লাভ হয়।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর এই জগৎ থেকে কৃষ্ণ তাঁর লীলা সংবরণ করলে কৃষ্ণ বিরহে শোকাকুল কৃষ্ণপার্ষদ উদ্ধব ভগবানের লীলাবিলাসসমূহ স্মরণ করে বিদুরের কাছে বর্ণনা করেছিলেন। ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ এই তথ্য খুব সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করে গিয়েছেন।

উদ্ধব ছিলেন নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণভক্ত। বাল্যকাল থেকেই তিনি কৃষ্ণমূর্তি নিয়ে খেলা করতেন। এইভাবে জন্ম থেকেই তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত কৃষ্ণভক্তি ছিল। সেই

কৃষ্ণমূর্তিকে পোশাক পরানো, ভোগ নিবেদন করা, তাঁর পূজা করা—সবই তিনি করতেন। এইটি হচ্ছে নিত্যমুক্ত ভক্তের লক্ষণ; এঁরা কখনও ভগবানকে ভুলতে পারেন না। এইভাবে শৈশবে উদ্ধব সব সময়ই কৃষ্ণমূর্তি সেবায় তন্ময় হয়ে থাকতেন। পাঁচ বছর বয়সে তাঁর মা তাঁকে প্রাতঃরাশের জন্য ডাকলেও কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত থাকায়, তিনি তা নিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। ভগবদ্গীতায় উল্লেখ করা হয়েছে, শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে "ভজনে উন্নত ব্যক্তি পরবর্তী জীবনে দিব্যজ্ঞান প্রাপ্ত পরিবারে জন্মগ্রহণের সুযোগ লাভ করে।"

এইভাবে উদ্ধব শৈশব থেকে অবিরামভাবে ভগবান কৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। শেষ বয়স পর্যন্ত তাঁর কৃষ্ণসেবা অব্যাহত ছিল। বিদুর উদ্ধবকে কৃষ্ণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে, উদ্ধবের তক্ষুণি ভগবান কৃষ্ণের সমস্ত কথা স্মরণ হতে লাগল। কৃষ্ণস্মরণ হতেই তিনি ভগবদ্ভাবে অভিভূত হয়ে পড়লেন, এক মুহূর্তের জন্য তিনি নির্বাক হয়ে পড়লেন। ভগবৎ ভক্তিতে আপ্লুত উদ্ধব কৃষ্ণচরণকমল স্মরণ করে আবিষ্ট হয়ে ভাবের গভীর থেকে আরো গভীরে নিমজ্জিত হলেন। তাঁর দেহ বিবর্ণ হয়ে পড়ল, তাঁর দুচোখ বেয়ে অবিরল ধারায় অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। বিদুর দেখলেন উদ্ধবের মধ্যে দিব্য ভগবৎ-প্রেমের সকল লক্ষণসমূহ। তখন উদ্ধব এই বাহ্য জগতের সব কথা ভুলে গিয়েছিলেন। তিনি অশ্রু মোচন করে বিদুরকে ভগবান কৃষ্ণের কথা বলতে লাগলেন। ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ মন্তব্য করেছেন যে, শুদ্ধ ভক্ত এই দেহে অবস্থান কালেও সর্বদাই ভগবদ্ধামে বিরাজমান।

উদ্ধব বললেন—'আমাদের কুশল সংবাদ কি আর বলব, মহাকাল সর্প আমাদের গৃহকে গ্রাস করেছে, কৃষ্ণসূর্য অস্তমিত হয়েছেন।' কৃষ্ণকে সূর্যের সঙ্গে তুলনা যথার্থ হয়েছে। কারণ কৃষ্ণের আবির্ভাব ও অন্তর্ধান সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তেরই মতো। ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু খুব সুন্দরভাবে এই বিষয়টি বিশ্লেষণ করেছেন। ভগবানের একটি লীলা এই ব্রহ্মাণ্ডে শেষ হলে, সেই লীলাটি অন্য ব্রহ্মাণ্ডে প্রকট হয়। সূর্য যেমন সব সময় আকাশে রয়েছে, কৃষ্ণলীলা ঠিক সেই রকম নিত্য। এই লীলা সব সময় অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে, এর কোন বিরতি নেই। শাস্ত্রে বর্ণিত ভগবানের বিভিন্ন লীলাগুলি সবই যথাসময়ে ঘটে। দিনে একবার সূর্যোদয়ের মতো ব্রহ্মার একদিনে কৃষ্ণলীলা এক একটি ব্রহ্মাণ্ডে অনুষ্ঠিত হয়।

বৈষ্ণবাচার্য শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতে, যাদবদের বিনাশের সংবাদ পেয়ে বিদুর গভীর শোকে অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। উদ্ধব বিদুরের শোকাকুল হওয়ার কারণ বুঝতে পেরেছিলেন, 'সূর্যাস্তের পর সর্বত্রই অন্ধকার নেমে আসে' এই বলে বিদূরের কাছে তিনি সহানুভূতি প্রকাশ করেছিলেন। কৃষ্ণ-সূর্যের অস্ত গমনে, সমগ্র বিশ্বসংসারে শোকের ছায়া নেমে এসেছিল, কারোর মনে সুখের লেশমাত্র ছিল না, বিদুরের মতোই উদ্ধব ও অন্যান্যরাও গভীর শোকে কাতর হয়ে পড়েছিলেন।

'বিশ্ববাসীর দুর্ভাগ্য, আরো দুর্ভাগ্য যাদবদের কেন না অপ্রাকৃত দিব্য গুণাবলী দর্শন করেও আদি পুরুষ পরমেশ্বর ভগবান বলে কৃষ্ণকে চিনতে পারলেন না।' উদ্ধব জানতেন যে, কৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। কিন্তু সুবর্ণ সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও তিনি ভগবানের সেবা করতে পারলেন না ভেবে বেদনা বোধ করছিলেন। আবির্ভাবের পর থেকে কৃষ্ণ তাঁর ভগবত্তা, তাঁর ষড়-ঐশ্বর্য—

ঐশ্বর্যস্য সমগ্রস্য বীর্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞান-বৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা ॥

(বিষ্ণুপুরাণ ৬/৫/৭৪)

অর্থাৎ, পূর্ণ ঐশ্বর্য, বল, যশ, সৌন্দর্য, জ্ঞান ও বৈরাগ্য প্রদর্শন করলেও তাঁকে শুধু একজন অসাধারণ ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব বলে মনে করেছিল অনেক মূর্খ। যারা মূর্খ তারা ভগবানকে চিনতেই পারল না, আর যারা কৃষ্ণেরই বংশের—অর্থাৎ, যাদবরা সর্বদা কৃষ্ণের ভগবৎ সান্নিধ্য লাভের সুযোগ পেয়েছেন, তাঁকে সকলের হৃদয়ে অবস্থিত পরমাত্মা বলে জানলেও তাঁকে আদি পুরুষ পরমেশ্বর ভগবান বলে চিনতে পারলেন না। এই কথা ভেবে উদ্ধব গভীর শোকে অত্যন্ত আকুল হয়ে বিলাপ করেছিলেন। সুগভীর ভগবদ্ভক্তিই এর কারণ। শুদ্ধ ভক্ত এইভাবে সব চেয়ে অভাগা বলে মনে করে নিজেকে।

যাদের শাস্ত্রীয় বিশ্বাস আছে তারা ভগবানকে যথাযথ স্বীকার করে, কৃষ্ণ যখন জগতে লীলা প্রকট করেছিলেন, তখন বিভিন্ন লোক তাঁকে বিভিন্নভাবে গ্রহণ করেছিল। বৈদিক শাস্ত্রে এবং সর্বশ্রেষ্ঠ আচার্যরা কিন্তু কৃষ্ণকে আদি পুরুষ পরমেশ্বর ভগবান বলে স্বীকার করেছেন। ভগবান কৃষ্ণ ছিলেন যদু বংশের কুলতিলক। যাদবদের পরম সৌভাগ্য যে তাঁরা ভগবানকে অন্তরঙ্গভাবে সেবা করতে পেরেছেন, তাঁর পুত সান্নিধ্য লাভের সুযোগ পেয়েছেন। আর যারা তাঁকে একজন সাধারণ মানব মনে করেছে তারা নিশ্চয় ভগবানের মায়া দ্বারা বিভ্রান্ত হয়েছে। যাদের ভগবানে বিশ্বাস নেই, ভগবদ্গীতায় বিশ্বাস নেই, যারা মনে করে দুর্যোধনাদি বধের জন্য ব্রহ্মশাপে যদুবংশ ধ্বংস হয়েছে—তারা হচ্ছে ভগবদ্বিদ্বেষী। তাদের বুদ্ধি নারকীয়, যারা ভক্ত—কৃষ্ণ ভজন করেন, তাঁরাই কিন্তু ভগবানকে যথাযথভাবে জানেন। তাঁরা জানেন ভগবান তাঁর কর্মফল দ্বারা প্রভাবিত হন না—ভগবদ্গীতায় ভগবান কৃষ্ণ স্বয়ং ঘোষণা করেছেন—

ন মাং কর্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্মভির্ন স বধ্যতে ॥

মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠানে নিম্ন, মধ্য ও উর্ধ্বলোক থেকে দেবতারা সমবেত হয়েছিল। কৃষ্ণের অনুপম দিব্যরূপ দর্শন করে সেটি সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার নিপুণ শিল্প কর্ম বলে তারা মনে করেছিল। জগতে সব চেয়ে সুন্দর কিছু থাকলে তাকে হয় নীলকমল বা তাকে আকাশের পূর্ণচন্দ্রের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। কিন্তু বিভিন্ন গ্রহ লোকের দেবতাদের মতে নীলকমল বা নির্মল আকাশের পূর্ণ চন্দ্রের সৌন্দর্য কৃষ্ণের রূপের তুলনায় অতীব তুচ্ছ। দেবতারা ভেবেছিল, লোকপিতা ব্রহ্মা যেমন তাদের সৃষ্টিকর্তা, সেই রকম তিনি কৃষ্ণেরও সৃষ্টিকর্তা। প্রকৃতপক্ষে তা সত্যি নয়, পক্ষান্তরে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করেন কৃষ্ণ। কৃষ্ণের দিব্য রূপের সৃষ্টি করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। ভগবদ্গীতায় কৃষ্ণ স্বয়ং বলেছেন, অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে—কৃষ্ণেই সকলের সৃষ্টিকর্তা। তিনি সব কিছুর মূল উৎস। তিনি সকল কারণের কারণ।

বৃন্দাবনে গোপালকৃষ্ণ শৈশব লীলাবিলাসের সময় কখনও কখনও শিশুর মতো রোদন করতেন, কখন বা হাসতেন, তখন তাঁকে এক সিংহশাবকের মতো মনে হত।

যোগী বা জ্ঞানীরা ভগবানের এ সব লীলা আস্বাদন করতে পারেন না। নন্দ, উপানন্দ, মা যশোদাদি পিতৃস্থানীয় মাতৃস্থানীয় ব্রজের গোপ-গোপীরাই শুধু কৃষ্ণের এই সব লীলা আস্বাদন করতেন। ভগবানের এই সব লীলা আস্বাদন করতে চাইলে নন্দ-যশোদাদি ব্রজবাসীর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে।

কৃষ্ণ ব্রজবাসী সকলের প্রাণপ্রিয় ছিল। এমন কি গরু-বাছুর—তারাও কৃষ্ণকে প্রাণাধিক ভালবাসতো। গরু চরাতে বনে গেলে কখন কখন অসুররা আক্রমণ করত। শিশু কৃষ্ণ তাদের দেখে যেন অবাক্ হয়ে যেতেন কিন্তু পরক্ষণেই সিংহশাবকের মতো সেই অসুরকে বধ করতেন। তাঁর সখা অন্যান্য

গোপবালকরা বিস্মিত হতেন, আর বাড়ি ফিরে গিয়ে বাবা-মা ও অন্যান্যদের কৃষ্ণের এই সব অদ্ভুত ও বিস্ময়কর কার্যাবলী বিশদভাবে বলতেন। সবাই কৃষ্ণের এই সব কাহিনী শুনে তাঁর অশেষ গুণগান করতেন, তাই কৃষ্ণ শুধু নন্দ-যশোদাকেই আনন্দ দান করতেন না, এইভাবে সমস্ত ব্রজবাসীকে কৃষ্ণ অফুরন্ত আনন্দ দান করতেন।

পাখিদের রব ও নানা বৃক্ষে সুশোভিত যমুনাতীর দিয়ে সর্বশক্তিমান ভগবান গোপালকৃষ্ণ গোধন ও গোপসখাদের নিয়ে গোষ্ঠে যেতেন। বৃন্দাবনের যমুনার তীর অপূর্ব সুন্দর। নানা ফুল-ফলে সেই যমুনার উপকূল পূর্ণ। আম, জাম, কাঁঠাল তালাদি নানা সুমিষ্ট ফল ও সুগন্ধি পুষ্পে সুশোভিত এই বৃন্দাবন। হংস, বক, ময়ূর-ময়ূরীর রবে সেই নদীতট, বৃক্ষসকল এবং বনভূমি নিনাদিত ছিল। সেই বৃন্দাবনের বৃক্ষ-পশু-পক্ষীরা সকলেই পুণ্যাত্মা। গোপালকৃষ্ণ ও গোপ-গোপী সকলকে আনন্দ দানের জন্যই এরা ব্রজে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ভগবান কৃষ্ণ ছিলেন আচ্ছাদিত অগ্নিশিখার মতো। একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ যেমন উপযুক্ত জ্বালানির সংস্পর্শে এক বিরাট অগ্নিকাণ্ড ঘটাতে পারে, সেই রকম ছোট্ট গোপাল কৃষ্ণ কখন নন্দালয়ে, কখন প্রিয় পার্ষদ গোপবালকদের সঙ্গে বৃন্দাবনে খেলাধূলার সময় পুতনা, অঘাসুর, বকাসুর, প্রলম্বাসুর ইত্যাদি অনেক ভয়ঙ্কর অসুর বধ করেছিলেন।

শ্রীপতি ভগবান সুন্দর সুন্দর বৃষদের গোচারণে নিয়ে যাবার সময় মধুর সুরে বংশীধ্বনি করে প্রিয় গোপসখাদের দিব্য আনন্দ দান করতেন। শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লেখ করা হয়েছে যে—

ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা
দাস্যং গতানাং পরদৈবতেন।
মায়াশ্রিতানাং নরদারকেণ
সাকং বিজহ্রুঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ॥

এই সব গোপবালকরা বহু বহু জীবনে পুঞ্জীভূত পুণ্যকর্মের ফলে আজ লীলা পুরুষোত্তম ভগবানের খেলার সাথী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছে। তারা সাধারণ বালক নয়। ভগবানের দিব্যলীলা বিলাসের সহচর হওয়া সাধারণ জীবের পক্ষে সম্ভব নয়। এই সব গোপবালকরা আগের জন্ম বহু বহু জীবন ধরে ছিলেন মহাঋষি, মহাযোগী। 'কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ' অর্থাৎ বহু বহু পুণ্যজীবনের ফলে আজ তারা ভগবানের দিব্যলীলাবিলাসে অংশগ্রহণে সুযোগ পেয়েছেন, তাঁর পুতসান্নিধ্য লাভের সুযোগ পেয়েছেন, ভগবান গোপালকৃষ্ণের খেলার

সাথী হয়েছেন। কৃষ্ণকে তাঁদের সব চেয়ে অন্তরঙ্গ ও প্রিয়তম সখারূপে তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পরিচয়, তাঁর ভগবত্তা নিয়ে গোপসখারা কখনো মাথা ঘামাত না। কখন ভোর হবে, কখন তাঁরা কৃষ্ণের সঙ্গে গরু চরাতে বনে যাবেন, সেখানে গিয়ে সারাদিন কৃষ্ণের সঙ্গে সকল গোপসখারা খেলাধূলায় কৃষ্ণের দিব্য সান্নিধ্যে অপ্রাকৃত আনন্দ লাভ করবে—এ সব কথা আগের রাতে চিন্তা করে গভীর আগ্রহে তারা সূর্যোদয়ের অপেক্ষা করত। তাঁরা গোপালকৃষ্ণকে এত ভালবাসতো।

নন্দ মহারাজের হাজার হাজার গোধন ছিল। তিনি ছিলেন কংসের রাজ্যের বৈশ্য ও ভূস্বামী। গোরক্ষা ও গোপালন বৈশ্যের কাজ। কৃষ্ণ তখন বালক। তাঁর বয়স তখন ছয় কি সাত বছর। তাই নন্দ মহারাজ অন্যান্য গোপবালকদের সঙ্গে কৃষ্ণকে তাঁর গোধন তত্ত্বাবধানের দায়িত্বভার দিয়েছিলেন, বিশেষত গরু চরাবার দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। গরু চরাতে গিয়ে অন্য সব গোপবালকদের সঙ্গে কৃষ্ণ বৈচিত্র্যময় অনেক লীলাবিলাস করেছিলেন। কৃষ্ণ যখন তাঁর প্রিয় বংশীধ্বনি করতেন, এই বংশীধ্বনি এতই মধুর যে তা শুনে মায়াবাদীদের অন্তিম লক্ষ্য ব্রহ্মানন্দের কথা গোপবালকদের কাছে অতি তুচ্ছ বলে মনে হত। কৃষ্ণের নানা রকমের বাঁশির কথা শ্রীল রূপ গোস্বামী তাঁর রচিত 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। লোকপিতা ব্রহ্মাজীও ভগবান কৃষ্ণের এই অপ্রাকৃত বংশীর উল্লেখ করেছেন এইভাবে—

বেণুং ক্বণন্তমরবিন্দদলায়তাক্ষং
বর্হাবতংসমসিতাম্বুদসুন্দরাঙ্গম্।
কন্দর্পকোটিকমনীয়বিশেষশোভং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

নারায়ণের চেয়ে ভগবান কৃষ্ণের যে ৪টি বেশি বৈশিষ্ট্য রয়েছে, তার একটি হচ্ছে এই বেণুমাধুর্য।

বৈদিক অর্থনীতি অনুসারে সমাজে মানুষের আর্থিক অবস্থা তার শস্যভাণ্ডার ও গোধনের পরিমাণের ওপর নির্ভর করত। নন্দ মহারাজের হলুদ, সবুজ, কালো রেখাযুক্ত নানা রঙের অনেক হাজার হাজার সুন্দর সুন্দর গাভী ও বলদ ছিল। এই সকল সুদেহী সবল আনন্দোৎফুল্ল গোধন বৃন্দাবনের পরিবেশকে প্রাণবন্ত করে তুলেছিল।

ভগবান কৃষ্ণের লীলাভূমি এই বৃন্দাবন আজও আছে। ভক্তকুল আজও ব্রজবিহার করেন। যাঁরা ভগবৎ-দর্শন করতে চান, যাঁরা ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে

চান তাঁরা শ্রেষ্ঠ ভগবদ্ভক্ত উদ্ধব, বিদুর আদির পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা অনুযায়ী ভগবান কৃষ্ণ যেমন সকলের উপাস্য, তাঁর ধাম বৃন্দাবনও তেমনি সকলের উপাস্য। কারণ ভগবান কৃষ্ণ ও তাঁর এই অপ্রাকৃত ধাম অভিন্ন। উদ্ধব ও বিদুর পাঁচ হাজার বছর আগে কৃষ্ণ সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। জড় চোখে ভগবানকে না দেখা গেলেও আজও হাজার হাজার ভগবৎ রসপিপাসু বৃন্দাবনে গিয়ে দিব্য আনন্দ আস্বাদন করেন।

বৈদিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী অর্থনৈতিক উন্নতি নির্ভর করে গোধন ও শস্যভাণ্ডারের প্রাচুর্যের উপর। এইভাবে প্রচুর খাদ্যশস্য ও পর্যাপ্ত গোধন দ্বারা মানব সমাজের খাদ্য সমস্যার সমাধান করা যায়। মানব সমাজের অর্থনৈতিক সমস্যাও এইভাবে গোধন ও শস্য—এই দুটির দ্বারা দূর করা যায়। এইভাবে আদি গুরু ভগবান কৃষ্ণ স্বয়ং আচরণ করে শিক্ষা দিয়েছেন যে কৃষি ও গোপালন বা গোরক্ষা হচ্ছে আদর্শ বৈশ্যের বৃত্তি। বৈদিক শাস্ত্রেও বৃষকে পিতার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে আর গাভীকে মাতা বলা হয়েছে। কারণ মানব সমাজে পিতার মতো বৃষ জমি চাষ করে খাদ্য উৎপাদন করে। মানব সমাজ যেমন মাতৃস্তন্যে লালিত হয়, তেমন গো-মাতাও আমাদের সব চেয়ে উপাদেয় দুগ্ধ দান করে ও পালন করে।

বর্তমান জগতে বিশাল বিশাল কসাইখানায় প্রতিদিন অসংখ্য গো-হত্যা করে মানব সমাজের জীবনী শক্তির অপরিসীম ক্ষয়সাধন চলছে। এই সমস্যার সমাধানে আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের আচার্য ও প্রতিষ্ঠাতা ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য শ্রীশ্রীমৎ অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ ও তাঁর সংঘের অনুগামীরা সাফল্যজনকভাবে বিশ্বময় সকলকে কৃষ্ণানুশীলনে উদ্বুদ্ধ করে চলেছেন। সকলকে আমিষ আহার, অবৈধ স্ত্রী সঙ্গ, আসব পান ও জুয়াখেলাদি পাপকর্ম ত্যাগ করে মহামন্ত্র—

হরে [illegible] হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

কীর্তন করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। নিষ্পাপ জীবন যাপন করে নিরপরাধে সকলে হরিনাম কীর্তন করলে কৃষ্ণভাবনাময় হওয়া যায়। এইভাবে শ্রবণ, কীর্তন, ভগবৎ-স্মরণাদি করে জীবকুল জীবনের অন্তিম লক্ষ্য ভগবদ্ধামে চলে যেতে পারে। এই কৃষ্ণভাবনা অনুশীলন করে এই জীবনেই অভয়, অশোক ও অমৃত আস্বাদন করতে পারে। শ্রেষ্ঠভক্ত, ভগবৎ পার্ষদ উদ্ধবের জীবন থেকে আমরা এই শিক্ষা লাভ করি।

শ্রীবামনদেবের আবির্ভাব

বলি মহারাজ স্বর্গ জয় করলে দেবতারা সেখান থেকে পলায়ন করে, পুত্রদের সুখের জন্য দেবমাতা অদিতি পয়োব্রত পালন করে ভগবান বিষ্ণুকে তুষ্ট করেন। অদিতির অভিলাষ পূর্ণ করবার উদ্দেশ্যে ভগবান শ্রীহরি তাঁর পুত্ররূপে জগতে আবির্ভূত হন। ভাগবত পুরাণে ভগবানের এই অবতারকে বামনদেব নামে উল্লেখ করা হয়েছে।

দেবতারা স্বর্গচ্যুত হলে তাদের মা অদিতি অত্যন্ত দুঃখিত হন। অদিতি তাঁর পতিকে পরমেশ্বর ভগবানকে তুষ্ট করবার পথের সন্ধান দিতে অনুরোধ করেন। পুত্রদের বিরহে কাতর অদিতিকে দেখে তার পতি কশ্যপ মুনি দেবতাদের কল্যাণের জন্য তাঁকে ব্রত সাধন করতে বলেন। বহুকাল ব্যাপী ধ্যান করবার পর এক দিন মহাঋষি কশ্যপ তাঁর আশ্রমে ফিরে আসেন। সেখানে তিনি সর্বত্রই বিপদের চিহ্ন দেখতে পান। আশ্রমের সকলকে বিষণ্ণ ও দুঃখিত দেখার কারণ সম্বন্ধে মহাঋষি কশ্যপ পত্নী অদিতিকে জিজ্ঞাসা করেন। তাঁর দুঃখের কারণ—দেবতাকুল স্বর্গচ্যুত, পুত্ররা কি উপায়ে তাদের নিজ নিজ পদ লাভ করতে পারে, তারা আবার স্বর্গে ফিরে আসতে পারে। এই বিষয়ে পতির কাছে অদিতি উপদেশ প্রার্থনা করলেন। অদিতির অনুরোধে তুষ্ট কশ্যপ মুনি প্রথমে তাঁকে আত্মোপলব্ধি তত্ত্ব উপদেশ দেন, অদিতি তাতে তুষ্ট হয়নি। তখন কশ্যপ মুনি অদিতিকে জনার্দন বাসুদেবের উপাসনা করতে উপদেশ দেন, তিনি তাঁকে প্রতিশ্রুতি দেন যে ভগবান বাসুদেবই তাঁর সকল ইচ্ছা পূর্ণ করতে পারেন। অদিতি এইবার খুশি হলেন, জনার্দন বাসুদেবের উপাসনা করতে স্বীকৃত হলেন। তখন বারো দিন ব্যাপী পয়োব্রত নামে এক ভগবৎ উপাসনার নির্দেশ দিলেন কশ্যপ মুনি অদিতিকে। এই ভগবৎ উপাসনা পন্থা লোকপিতা ব্রহ্মার কাছে কশ্যপ মুনি শিক্ষালাভ করেছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে অদিতির উদ্দেশ্যে কশ্যপ মুনির উপদেশ এইভাবে লেখা আছে—

উপতিষ্ঠস্ব পুরুষং ভগবন্তং জনার্দনম্।
সর্বভূতগুহাবাসং বাসুদেবং জগদ্গুরুম্ ॥

অর্থাৎ, "হে অদিতি! সকল প্রাণীর অন্তর্যামী, জনার্দন পরম পুরুষ ভগবানকে ভজনা কর। একমাত্র ভগবান বাসুদেবই সকলের অন্তিম কল্যাণকারী, কারণ তিনি হচ্ছেন জগৎ-গুরু।"

এখানে কশ্যপ মুনি তাঁর পত্নীকে বাসুদেব কৃষ্ণের শরণাগত হতে উপদেশ দিয়েছেন। ভগবানের শরণাগত হলে ভগবান কৃষ্ণ তাঁর ভক্তের সকল সমস্যার সমাধান করে দেন। তাই কশ্যপমুনি হচ্ছেন আদর্শ গুরুদেব। তিনি ভগবান কৃষ্ণ বা বাসুদেবের শরণাগত হতে উপদেশ দিয়েছেন, তাই তিনি হচ্ছেন সদ্‌গুরু। যিনি এইভাবে কশ্যপ মুনির মতো ভগবান কৃষ্ণে শরণাগতি শিক্ষা দেন, তিনিও গুরুর ভূমিকা গ্রহণ করেন।

বর্তমান জগতে অনেকেই নিজেকে জগৎ-গুরু বলে প্রচার করেন। কশ্যপ মুনি নিজেকে এইভাবে কখনও প্রচার করেননি। শ্রীমদ্ভাগবতে তিনি বাসুদেব কৃষ্ণকে জগৎ-গুরু বলে তাঁর মহিমা কীর্তন করেছেন। 'বাসুদেবং জগৎ গুরুম্।' তাই ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের মতে কশ্যপ মুনিই প্রকৃত জগৎ-গুরু। কিন্তু যারা নিজেদের জগৎ-গুরু বলে প্রচার করে, অথচ কৃষ্ণোপদেশ, 'ভগবদ্গীতা যথাযথ' প্রচার করে না, তারা জনগণকে শুধু প্রতারণা করে। যারা সদ্‌গুরুপরম্পরা অনুসরণ করে শুদ্ধ ভক্তি অনুশীলন করে, কৃষ্ণানুশীলন করে, কৃষ্ণোপদেশ যথাযথ প্রচার করে, তারাই সদ্‌গুরু হন। তারাই সমস্যা পীড়িত, বিভ্রান্ত ব্যক্তিকে ভগবান কৃষ্ণ বা বাসুদেবের চরণকমলে শরণাগত হতে উপদেশ দেন, তখন ভগবান শরণাগতকে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার বুদ্ধি দান করেন।

ভগবদ্গীতায় (৭/১৬) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জুন।
আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥

অর্থাৎ, "হে ভরতশ্রেষ্ঠ অর্জুন, আর্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু এবং জ্ঞানী এই চার প্রকার পুণ্যকর্মা ব্যক্তিগণ আমার ভজনা করেন। এখানে দেবমাতা অদিতি হচ্ছেন আর্ত, কেন না দেবতারা স্বর্গচ্যুত, তাই দেবমাতা অদিতি অতীব দুঃখকাতর, পতি কশ্যপ মুনির নির্দেশে তিনি ভগবান কৃষ্ণ বা বাসুদেবে শরণাগতি কামনা করছেন।

কশ্যপ মুনি তার পত্নী অদিতির সঙ্গে কথোপকথনে বুঝলেন যে অদিতির হৃদয়ে জড় বাসনা রয়েছে। কিন্তু নিষ্কপট ভক্ত শুধু কৃষ্ণের সেবাই চায়, তাই কৃষ্ণও তাকে শুদ্ধভক্তিই দান করেন। শুদ্ধভক্তের কোন জড় বাসনা নেই। তবে শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লেখ করা হয়েছে—

অকামঃ সর্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্ ॥

অর্থাৎ, "কেউ সব কিছুই কামনা করে, কেউ কিছুই কামনা করে না, কেউ বা ভগবানে লীন হতে চায়। তবে সবচেয়ে বুদ্ধিমান ভক্ত পরম পুরুষ ভগবানকে দিব্য ভগবদ্ভক্তির মাধ্যমে ভজনা করেন।" (ভাঃ ২/৩/১০)

এই জড় জগৎকে যে সব রকমভাবে ভোগ করতে চায় তাকে সর্বকাম বলা হয়। যার সব কামনা বাসনা পূর্ণ হয়ে গেছে, যে সম্পূর্ণভাবে জড় বাসনা শূন্য তাকে অকাম বলে। যে মোক্ষ কামনা করে যে পরম-ব্রহ্মে লীন হতে চায়, যে ভগবৎ সত্তায় বিলীন হতে চায়, সে শুদ্ধ নয়, সে পবিত্র নয়।

শুদ্ধভক্তের কোন জড় বাসনা নেই, কোন জড় জাগতিক বিষয়ের কামনা নেই। তাই তিনি পবিত্র, তিনি শুদ্ধ। তাই শুদ্ধভক্তির সংজ্ঞায় বলা হয়েছে—

সর্বোপাধি বিনির্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্মলম্।

কৃষ্ণানুশীলন এমনি চমৎকার যে অন্তিমে তা সকলেরই পরম কল্যাণ সাধন করে। তাই কর্মী-জ্ঞানী-যোগী সকলেরই কৃষ্ণানুশীলন করা উচিত। তাদের সকলেরই উচিত নিষ্পাপ জীবন যাপন করা ও নিরপরাধে মহামন্ত্র কীর্তন করা—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা আমরা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত থেকেও পাই। সেখানে বৈষ্ণবাচার্য শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলেছেন—

কৃষ্ণ কহে,—'আমা ভজে, মাগে বিষয়-সুখ।
অমৃত ছাড়ি' বিষ মাগে, এই বড় মূর্খ ॥
আমি—বিজ্ঞ, এই মূর্খে, 'বিষয়' কেনে দিব?
স্ব-চরণামৃত দিয়া 'বিষয়' ভুলাইব ॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ২২/৩৮-৩৯)

কেউ যদি শুদ্ধ ভক্ত হতে চায়, অথচ তার হৃদয়ে জড় বাসনাও পোষণ করে, তখন কৃষ্ণ তাকে বিশেষ কৃপা দান করেন এইভাবে,—তিনি সব কিছু জড় জাগতিক যা তার আছে সব কেড়ে নেন। তাকে নিঃস্ব করে দেন এবং অবশেষে ভগবান তাকে অনন্য শুদ্ধভক্তি দান করেন।

কশ্যপ মুনি অদিতিকে বলেন—'ফাল্গুন মাসের শুক্লপক্ষে দ্বাদশ দিন পয়োব্রত পালন করবে এবং অরবিন্দাক্ষ পরমেশ্বর ভগবানকে ভক্তিভরে ভজনা করবে।' এখানে কশ্যপ মুনি 'অর্চয়েৎ' শব্দ ব্যবহার করেছেন। ভক্তিভরে ভগবান বিষ্ণুর আরাধনার অর্থ হচ্ছে অর্চন মার্গ, তা শাস্ত্রে এইভাবে উল্লেখ করা হয়েছে—

শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্ ।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্ ॥

শ্রীশ্রীমৎ অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ এই তাৎপর্যে লিখেছেন—ভগবান বিষ্ণু বা কৃষ্ণের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করা চাই। শাস্ত্রানুযায়ী সুগন্ধি পুষ্পমালা ও সুন্দর পোষাক দ্বারা শৃঙ্গার করে ভক্তিসহকারে তাঁকে সব রকম ফুল, ফল, সাত্ত্বিক অন্নব্যঞ্জন নিবেদন করা চাই। ঘণ্টা, শঙ্খ, ধূপ, দীপ আদি দ্বারা আরতি করা চাই। এইভাবে ভগবান বিষ্ণু বা কৃষ্ণের উপাসনা করা উচিত। 'ভক্ত্যা' শব্দ ব্যবহার করেছেন কশ্যপ মুনি, অর্থাৎ শুদ্ধভক্তিযুক্ত হয়ে পয়োব্রত ও ভগবৎ অর্চন করা চাই। যিনি ভগবানকে জানতে চান তাকে শুদ্ধ ভক্ত হতে হবে। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় অর্জুনকে বলেছেন—

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।

দেবমাতা অদিতি তাঁর পতি কশ্যপ মুনির কাছে পয়োব্রতের উপদেশ পেয়ে কঠোরভাবে তা পালন করেছিলেন ও অনলস হয়ে সেই ব্রত অনুষ্ঠান করেছিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভাগবতে এর সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন যে, পারমার্থিক জীবনে উন্নতির জন্য সদ্গুরুর উপদেশ কঠোরভাবে পালন করা উচিত। দেবমাতা অদিতি তাই করেছিলেন। তিনি কঠোরভাবে তাঁর প্রতি ও গুরুর উপদেশ পালন করেছিলেন। বৈদিক নির্দেশেও তা প্রতিপন্ন হয়েছে, যেমন—

'যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।'

গুরুর কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস থাকা চাই। তিনি শিষ্যের পারমার্থিক জীবনের উন্নতিতে সাহায্য করেন। সদ্গুরুর উপদেশ অনাদর করা—উপেক্ষা করা মাত্র শিষ্যের প্রয়াস ব্যর্থ হবে—'যস্য অপ্রসাদান্ন গতিঃ কুতোহপি।' অদিতি কঠোরভাবে তার পতি ও গুরুদেবের উপদেশ পালন করেছিলেন। এইভাবে তার প্রয়াস সফল হয়েছিল।

অদিতি একাগ্র চিত্তে পরমপুরুষ পরমেশ্বর ভগবান বিষ্ণুর চিন্তা করে প্রবল পরাক্রান্ত দুর্দমনীয় মন ও ইন্দ্রিয়গুলিকে সম্পূর্ণ বশীভূত করে ভগবানের পাদপদ্ম-সেবায় নিয়োজিত করেছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ এ সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন যে—শুদ্ধভক্তি অনুশীলনকারীর মনকে এইভাবে শুধু ভগবান কৃষ্ণের চরণারবিন্দে নিবিষ্ট করতে হবে। এইভাবে দুর্জয় মন ও ইন্দ্রিয়গুলিকে দমন করে সম্পূর্ণভাবে কৃষ্ণানুশীলন করা যায়। অনন্য কৃষ্ণভক্তির দ্বারা এইভাবে ভক্তরা যা করে, তা অন্য যৌগিক পন্থায় প্রায় অসম্ভব। তাই মনকে জয়

করবার জন্য ভক্তিযোগই শ্রেষ্ঠ পন্থা। শাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে—স বৈ মনঃ কৃষ্ণ-পদারবিন্দয়োঃ।

পীতবসন, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ আদি পুরুষ ভগবান দেবমাতা অদিতির সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছিলেন। ভগবানকে দেখে দিব্য আনন্দে অভিভূত অদিতি প্রথমে উঠে দাঁড়ান। তারপর শ্রদ্ধাবনত হয়ে দণ্ডবৎ প্রণাম করেন। ভগবদ্ভক্তিতে আপ্লুত অদিতির বাক্ রুদ্ধ হল। তাঁর সমস্ত শরীর কম্পমান হল। ভগবানের বন্দনা করতে চাইলেও অদিতি সমর্থ হলেন না। আনন্দে তার বদন অশ্রু প্লাবিত হল। কিছুক্ষণ এইভাবে অতিবাহিত হল। ভগবানের দিব্যরূপ দর্শন করে অদিতি শান্ত হলেন, তখন অদিতি ভগবানের বন্দনা করলেন। সর্বান্তর্যামী পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি অতীব তুষ্ট হলেন, এবং ভগবানের অংশাবতারের মাধ্যমে তাঁর পুত্ররূপে আবির্ভূত হতে স্বীকার করলেন। ভগবান ইতিপূর্বেই কশ্যপ মুনির কৃচ্ছসাধনায় তুষ্ট হয়েছিলেন। এইভাবে ভগবান শ্রীহরি তাঁদের পুত্ররূপে দেবতাদের প্রতিপালনে স্বীকৃত হলেন।

ভগবানের নির্দেশে অদিতি ভক্তিভরে কশ্যপ মুনির সেবায় নিয়োজিত হলেন। ভগবানের জন্ম ও কর্ম সবই দিব্য। ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষীয় শুভ শ্রবণা নক্ষত্রযুক্ত দ্বাদশী তিথিতে অভিজিৎ মুহূর্তে ভগবান পীত বসনে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম ধারণ করে অদিতির গর্ভ থেকে শ্যামবর্ণ দেহে আবির্ভূত হলেন। সচ্চিদানন্দ দেহে আবির্ভূত ভগবানকে পুত্ররূপে দেখে অদিতি ও কশ্যপ মুনি আনন্দিত হলেন। তখন ভগবান বামন রূপ ধারণ করলেন। তখন উপস্থিত সকলেই আনন্দে ভগবানের স্তবস্তুতি করতে লাগলেন।

শ্রীরামচন্দ্রের লঙ্কাবিজয়

শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধে শ্রীল ব্যাসদেব ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের আবির্ভাবের বর্ণনা করেছেন।

ভগবান শ্রীরামচন্দ্র রঘুবংশে আবির্ভূত হয়েছিলেন। শ্রীল ব্যাসদেব শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধের দশম অধ্যায়ে রাবণ বধ ও লঙ্কা বিজয় করে শ্রীরামচন্দ্রের অযোধ্যায় ফিরে আসার কাহিনীর বিবরণ দিয়েছেন।

ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের দিব্য-লীলা সমূহ তত্ত্বদর্শী মহামুনি বাল্মীকি তাঁর রচিত রামায়ণ-এ লিপিবদ্ধ করেছেন। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী সংক্ষেপে মহারাজ পরীক্ষিতের কাছে তা বর্ণনা করেছেন।

সূর্যবংশে মহারাজ রঘু জন্মগ্রহণ করেন। রঘুর পুত্রের নাম ছিল অজ, অজর পুত্রের নাম ছিল দশরথ।

পরমেশ্বর ভগবান মহারাজ দশরথের পুত্ররূপে জগতে আবির্ভূত হন ও বহু দিব্য-লীলাবিলাস করেন। দেবকূলের প্রার্থনায় তুষ্ট হয়ে পরম-ব্রহ্ম পরম সত্য পরমেশ্বর ভগবান তাঁর অংশ ও অংশকলাসহ শ্রীরাম, লক্ষ্ণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন নামে মহারাজ দশরথের পুত্ররূপে জগতে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

ভগবানের অংশ ও অংশের অংশ বা কলারূপে তাঁর অনন্ত রূপ আছে। শ্রীব্রহ্মসংহিতায় এই কথা উল্লেখ করা হয়েছে—অদ্বৈতমচ্যুতমনাদিমনন্তরূপম্। শ্রীরাম, লক্ষ্ণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন—এঁরা সকলেই বিষ্ণুতত্ত্ব, এঁরা সকলেই ভগবানের সৃষ্টির যে-কোন জায়গায় বিরাজ করতে পারেন। এগুলি ভগবানের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বরূপে নিত্য বিরাজমান। এঁরা সর্বশক্তিমান। দশাবতার স্তোত্রে বৈষ্ণব কবি শ্রীল জয়দেব গোস্বামী ভগবানের বন্দনা করে লিখেছেন—

বিতরসি দিক্ষুরণে দিক্‌পতিকমনীয়ং।
কেশব ধৃত-রামশরীর জয় জগদীশ হরে ॥

হে কেশব! আপনি রাম আকৃতি পরিগ্রহ করে, রাবণের দশমুণ্ড ছেদন করে রমণীয় বলিস্বরূপ দিক্‌পতিগণকে উপহার দিয়েছিলেন। হে জগদীশ! হে হরে। রামশরীরধারী আপনার জয় হোক!

পত্নী কৈকেয়ীর কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ পিতা মহারাজ দশরথের আদেশ পালনের উদ্দেশ্যে একজন মুক্তাত্মার মতো ভগবান শ্রীরামচন্দ্র সীতাদেবীকে নিয়ে রাজ্য, ঐশ্বর্য, প্রিয়জন, সুহৃৎ, প্রাসাদাদি সব কিছুই পরিত্যাগ করে বনে গমন করেছিলেন।

মহারাজ দশরথের কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রা নামে তিন পত্নী ছিল। মহারাজ দশরথ একসময় রাণী কৈকেয়ীর সেবায় অতীব তুষ্ট হয়ে তাকে বর প্রার্থনা করতে বলেন। রাণী কৈকেয়ী অন্য সময়ে এই বর প্রার্থনা করবেন বলে জানান। পরে শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্য অভিষেকের সময় উপস্থিত হলে, কৈকেয়ী মহারাজ দশরথের কাছে এই দাবী করেন যে তাঁর পুত্র ভরতকে রাজসিংহাসন দিতে হবে ও শ্রীরামকে বনে পাঠাতে হবে। দশরথ মর্মাহত ও শোকাকুল হলেন। পত্নীর নির্দেশে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ দশরথ স্নেহের পুত্র শ্রীরামকে বনে গমন

করতে বললেন। একান্ত অনুগত শ্রীরাম নিঃসঙ্কোচে তৎক্ষণাৎ পিতার আদেশ পালন করে সমস্ত জড়-জাগতিক আকর্ষণে নিস্পৃহ মুক্তাত্মার মতো রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করে বনে গমন করেন।

কঠোর জীবন যাপন কালে বনে ভ্রমণরত শ্রীরামচন্দ্র অপরাজেয় ধনুর্বানসহ রাবণের কামাতুরা ভগ্নী শূর্পনখার নাসিকা ও কর্ণ ছেদন করেছিলেন, এবং খর, ত্রিশির, দূষনাদি চৌদ্দ হাজার রাক্ষসদেরও শ্রীরাম বধ করেছিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধের দশম অধ্যায়ের দশম শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে—

সীতাকথাশ্রবণদীপিতহৃচ্ছয়েন

অর্থাৎ, পরমা সুন্দরী সীতাদেবীর কথা শুনে রাবণের চিত্ত কামানলে প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠেছিল। সে এক হীন উপায়ে সীতাদেবীকে অপহরণ করেছিল। সীতা হরণের সময় আকাশ-পথে জটায়ু সীতাদেবীকে দেখতে পায় ও রাক্ষসাধম রাবণকে বাধা দেয়। প্রবল পরাক্রমশালী রাবণের সঙ্গে সংগ্রামে জটায়ু পক্ষহীন ও ধরাশায়ী হয়। সীতার খোঁজে শ্রীরামচন্দ্র বনের মধ্যে মৃতপ্রায় জটায়ুর কাছে রাবণের সীতাহরণের সংবাদ পান।

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ এই সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে, নীতিশাস্ত্র অনুযায়ী পথে 'নারীং বিবর্জিতা'—অর্থাৎ দূর দেশে যাত্রার সময় নারীকে সঙ্গে আনা উচিত নয়। পূর্বে যানবাহন ছাড়া জনগণ দূরদেশে যাত্রা করত, তবু যতদূর সম্ভব গৃহত্যাগের সময় পত্নীকে সঙ্গে নেওয়া উচিত নয়, বিশেষত পিতার আদেশে নির্বাসিত শ্রীরামচন্দ্রের মতো অবস্থায়।

ভগবান শ্রীরাম জড়-জগতের অতীত; তাই শাস্ত্রে আছে 'নারায়ণঃ পরোঽব্যক্তৎ।' শ্রীরামচন্দ্রের এই অবস্থা সম্পূর্ণ চিন্ময়। এখানে আমাদের শিক্ষণীয় হচ্ছে যে, জড় জগতের নারীর প্রতি আসক্তি সর্বদাই সমস্যা ও বিপদ ডেকে আনে।

ভগবান শ্রীরামচন্দ্র হচ্ছেন জড়-জগতের স্রষ্টা; তাই তিনি কখনও জড়-মায়ার অধীন নন। বৈষ্ণবাচার্যের মতে শ্রীরামচন্দ্রের এই সীতাবিরহ হচ্ছে ভগবানের হ্লাদিনী শক্তির অন্তর্গত বিপ্রলম্ভ-ভাব। ভগবান ব্যক্তিত্বহীন নন্, তিনি নিঃশক্তিকও নন্। পক্ষান্তরে তিনি এক সবিশেষ তত্ত্ব। তিনি সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ।

প্রকৃতপক্ষে রাবণ সীতাদেবীর অপছায়া মায়া সীতাকে হরণ করেছিল। অগ্নি পরীক্ষার সময় মায়াসীতা ভস্মীভূত হয়েছিল, চিন্ময় সীতাদেবী অগ্নি থেকে

প্রকাশিত হয়েছিলেন। তাই রাবণের পক্ষে প্রকৃত সীতাকে হরণ তো দূরের কথা, স্পর্শ করা পর্যন্ত সম্ভব হয়নি।

লোকপিতা ব্রহ্মা ও দেবাদিদেব শিবের উপাস্য শ্রীরামচন্দ্র নরলীলার ন্যায় শাস্ত্রীয় বিধি অনুযায়ী পুত্রের মতো রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত জটায়ুর দাহকার্য সমাপন করে, প্রিয়তমা সীতাদেবীকে উদ্ধারের উদ্দেশ্যে বানরদের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করেন। জটায়ুর দাহকার্য করবার পর তিনি কবন্ধ নামে অসুরকে বধ করেন।

মূর্তিমান সমুদ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্যে, সমুদ্রতীরে উপস্থিত হয়ে শ্রীরামচন্দ্র তিনদিন ধরে উপবাস করেছিলেন। মূর্তিমান সমুদ্রের অনুপস্থিতির ফলে শ্রীরাম কটাক্ষপাত দ্বারা যে দিব্য ক্রোধ লীলা প্রদর্শন করেন, তার ভয়ে নক্র-মকর আদি জলজন্তুরা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে। ভীত মূর্তিমান সমুদ্র অর্ঘ্যাদি পূজোপহার মস্তকে ধারণ করে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের পাদপদ্মে আগমন করে বলেন—"হে ভগবান, আমরা জড়-বুদ্ধি সম্পন্ন, তাই আপনাকে বুঝতে পারি-নি, কিন্তু এখন বুঝেছি যে আপনি হচ্ছেন আদি পুরুষ। ত্রিজগতের অধীশ্বর। দেবতারা সত্ত্বগুণাধীন প্রজাপতিরা রজোগুণাধীন, ভূতপতিরা তমোগুণাধীন, কিন্তু আপনি সকল গুণের অধীশ্বর।"

এখানে যে 'জড়ধিয়ো' বা জড়বুদ্ধির কথা উল্লেখ করা হয়েছে সে সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদ মন্তব্য করেছেন যে—"এটি হচ্ছে পাশবিক বুদ্ধি; এই রকম বুদ্ধি দিয়ে পরমেশ্বর ভগবানকে জানা যায় না—ভগবৎ উপলব্ধি হয় না।" যেমন প্রহার ছাড়া পশু মনিবের উদ্দেশ্য বুঝতে পারে না, সেই রকম জড়বুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষ পরমেশ্বর ভগবানকে জানতে পারে না। তবে গুণময়ী প্রকৃতির কঠোর শাসনে মানুষ ভগবানকে বুঝতে শুরু করে। এই প্রসঙ্গে এক হিন্দিভাষী কবির বাণী বিশেষ উল্লেখযোগ্য—

দুঃখসে সব হরি ভজে সুখসে ভজে কৈ।
সুখসে আগর হরি ভজে দুঃখ কাহাঁসে হ্যায়॥

অর্থাৎ, দুঃখের সময় মানুষ হরিভজন করতে মন্দিরে যায়, কিন্তু আর্থিক স্বচ্ছলতার সময় মানুষ ভগবান শ্রীহরিকে ভুলে যায়। এ জন্য ভগবান শ্রীহরির গুণময়ী প্রকৃতির দ্বারা মানব-সমাজ দণ্ডনীয় কেন না মানব-সমাজকে দণ্ড না দিলে, জড় বুদ্ধি বশত মানবজাতি পরম নিয়ন্তা ভগবানকে ভুলে যায়।

মূর্তিমান সমুদ্র আরও বলল, হে ভগবান, আপনি স্বেচ্ছায় এই স্থানের জল ব্যবহার করুন। আপনি সমুদ্র অতিক্রম করে ত্রিলোকে ক্লেশদায়ক রাবণের

রাজ্যে প্রবেশ করুন। পুত্র হলেও বিশ্রবা মুনির মূত্রের মতো রাবণকে বধ করে পত্নী সীতাদেবীকে পুনরুদ্ধার করুন। হে বীরশ্রেষ্ঠ, এই সমুদ্র লঙ্কাযাত্রায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করলেও, আপনার দিব্য যশোরাশি বিস্তারের উদ্দেশ্যে এই সাগরের উপর সেতু তৈরি করুন। বীর রাজন্যবর্গ ভবিষ্যতে আপনার এই অসাধারণ ও অত্যাশ্চর্য লীলাবিলাস দর্শন করে আপনার গুণকীর্তন করবে।

বানর সেনাপতির করস্পর্শে প্রকম্পিত বৃক্ষরাশিপূর্ণ পর্বতশৃঙ্গ সমুদ্রজলে নিক্ষেপ করে সেতুবন্ধন করে শ্রীরাম লঙ্কায় প্রবেশ করেন, হনুমান পূর্বে যে লঙ্কাপুরীকে অগ্নি দগ্ধ করেছিল, রাবণের ভ্রাতা বিভীষণের পরামর্শে সুগ্রীব, নীল ও হনুমানাদি বানর সেনাপ্রধান সহ শ্রীরাম সেই লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করেন।

এখানে রাবণকে বিশ্রবা মুনির মূত্রের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, কথায় বলে পুত্র ও মূত্রের উৎস এক—তা হচ্ছে জননেন্দ্রিয়। কিন্তু পুত্র কৃষ্ণভক্ত হলে সে বংশের গৌরব বৃদ্ধি করে, আর অযোগ্য হলে সে মূত্রের মতো হেয়। এই রকম হেয় রাবণকে শ্রীরাম বধ করুন, এইটি মূর্তিমান সমুদ্রের ইচ্ছা।

ভগবদ্গীতায় (৪/৯) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন॥

ভগবানের এই উক্তি থেকে প্রতিপন্ন হয়, ভগবানের কার্যাবলী সবই অসাধারণ, দিব্য ও অদ্ভুত। ভগবান হচ্ছেন সর্বশক্তিমান, এই জন্য শাস্ত্রে এই সব কার্যাবলী উল্লেখ করা হয়েছে।

আজকাল প্রায়ই একটু যাদু, ভোজবাজী বা ম্যাজিক দেখিয়ে মূর্খ জনসাধারণের কাছে যে সব ভগবান নির্বাচন করা হচ্ছে, তারা যে প্রকৃতপক্ষে ভগবান নয়—আসলে মেকি, কৃত্রিম তা ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের সেতুবন্ধনলীলার অসাধারণ কার্যদ্বারা আমাদের শিক্ষা দান করে গেছেন। যে কোন কাজ অসম্ভব হলেও ভগবানের পক্ষে সবই সম্ভব কারণ তিনি সর্বশক্তিমান। ব্রহ্মসংহিতায় উল্লেখ করা হয়েছে—

যস্যাজ্ঞয়া ভ্রমতি সংভৃতকালচক্রো

ভগবানের ইচ্ছায় বিশাল সূর্য মহাকাশে ভ্রমণ করে চলেছে; এই রকম তুচ্ছ ভারহীন তুলাখণ্ডের মতো অসংখ্য গ্রহ, নক্ষত্র আকাশে ভগবদিচ্ছায় ভাসমান হতে পারলে, সমুদ্রে বানর সেনাদের নিক্ষিপ্ত বৃক্ষ লতাপূর্ণ বিরাট বিরাট পর্বতশৃঙ্গ ভগবদিচ্ছায় ভাসমান হবে না কেন?

লঙ্কায় প্রবেশ করে সুগ্রীব, নীল, হনুমান আদির নেতৃত্বে বানরসেনারা ক্রীড়াস্থল, ধান্যাগার, কোষ, গৃহদ্বার, পুরদ্বার, সভাগৃহ, প্রাসাদের অগ্রভাগ,

কপোতকক্ষ অধিকার করে নেয়। লঙ্কাপুরীর জনপথের সংযোগস্থল, বেদি, প্রাসাদের উপর পতাকা, স্বর্ণকলস আদি ধ্বংস করা হলে, সমগ্র লঙ্কাপুরীকে হস্তীকুলদ্বারা বিধ্বস্ত এক নদীর মতো দেখাচ্ছিল। এই সব দেখে রাক্ষসরাজ রাবণ নিকুম্ভ, কুম্ভ, ধুম্রাক্ষ, দুর্ম্মুখ, সুরান্তক, নরান্তক আদি রাক্ষস ও পুত্র ইন্দ্রজিৎ এবং পরে প্রহস্ত, অতিকায়, বিকম্পন ও অবশেষে কুম্ভকর্ণকে ডেকে শত্রুদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য উত্তেজিত করেন।

লক্ষ্মণ, সুগ্রীব, গন্ধমাদ, নীল, অঙ্গদ, জাম্ববান, ও পানসাদি সহ রামচন্দ্রের অসি, শূল, ধনুক, প্রাস, ঋষ্টি, শক্তিশর, খড়্গ ইত্যাদি ভীষণ অস্ত্রে সজ্জিত রাক্ষস সেনাদের আক্রমণ করেছিলেন।

অঙ্গদাদি বানর সেনাপ্রধানরা হস্তী, পদাতিক, রথ ও অশ্ব—চার রকম রাবণ সৈন্যদের সম্মুখীন হয়ে বিশাল বৃক্ষ, পর্বতশৃঙ্গ, গদা ও শর নিক্ষেপ করেছিল। এইভাবে সীতাদেবীর ক্রোধে হৃতমঙ্গল রাবণের সেনাকুল ধ্বংস হয়েছিল। নিজ সেনানী ধ্বংস হতে দেখে ক্রোধানলে প্রজ্জ্বলিত রাক্ষসরাজ রাবণ পুষ্পক বিমানে আরোহণ করে শ্রীরামচন্দ্রের দিকে ধাবিত হয় এবং তাঁকে তীক্ষ্ণ শরদ্বারা আঘাত করে।

এই সম্পর্কে শ্রীল প্রভুপাদ মন্তব্য করেছেন যে, রাবণের সৈন্যরা আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত; আর শ্রীরামের সৈন্যরা ছিল বানর, তাদের উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্র ছিল না। শুধু শ্রীরাম ও লক্ষ্মণেরই ধনুর্বাণ ছিল। বানর সেনারা শুধু পাথর, বৃক্ষ ও পর্বত-শৃঙ্গ অস্ত্ররূপে ব্যবহার করেছিল, মা সীতাদেবীর অভিশাপের ফলেই রাক্ষসরা সহজেই বানরসেনা দ্বারা ধ্বংস হয়। বল বা শক্তি দু'রকম—দৈব ও পুরুষাকার। দৈব বল জড়-জাগতিক বুদ্ধি বল অপেক্ষা শ্রেয়। এমন কি আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত না হলেও, ভগবৎ কৃপার উপর নির্ভর করে শত্রুর সঙ্গে সংগ্রাম করতে হবে, সমস্ত শক্তি দিয়ে শত্রুর সঙ্গে লড়াই করতে হবে, কিন্তু সাফল্যের জন্য ভগবান শ্রীহরির উপর নির্ভর করতে হবে। ভগবান এই শিক্ষাই দিয়েছেন ভগবদ্গীতায়—'মাম্ অনুস্মর যুদ্ধ চ'—ভক্তশ্রেষ্ঠ অর্জুন এই উপদেশ পালন করে যুদ্ধে জয় লাভ করেছিলেন।

তারপর শ্রীরামচন্দ্র রাবণকে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করে বললেন, তুই হীনচেতা রাক্ষস পুরীষ, কুকুরের মতো আমার অনুপস্থিতিতে আমার পত্নী সীতাকে অপহরণ করেছিস্, তুই নির্লজ্জ, জঘন্য পাপী, তাই যমরাজ যেমন পাপীকে দণ্ডদান করে, আজ অলঙ্ঘ্য বীর্য আমিও তোকে সমুচিত দণ্ড দিব। এইভাবে তীব্র ভাষায় ভর্ৎসনা করে শ্রীরামচন্দ্র রাবণকে লক্ষ্য করে যে বাণ

নিক্ষেপ করলেন, তা বজ্রের মতো রাবণের হৃদয় বিদীর্ণ করল। দশানন রাবণ বিমান থেকে ভূপতিত হল। অনুগামী রাক্ষস ও রাবণের পত্নী মন্দোদরীসহ সকল পতিহীনা রাক্ষসীরা লঙ্কাপুরী থেকে বের হয়ে নিজ নিজ পতির মৃতদেহের কাছে গিয়ে করুণ সুরে ক্রন্দন করতে লাগল। তখন রামভক্ত বিভীষণ কোশলরাজ শ্রীরামচন্দ্রের অনুমতি নিয়ে শাস্ত্রসম্মতভাবে পিতৃমেধ বিধান অনুযায়ী ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া অনুষ্ঠান করেন। তারপর বিভীষণকে এককল্পকাল লঙ্কার শাসনভার দান করে শ্রীরামচন্দ্র সীতাদেবীকে অশোকবন থেকে উদ্ধার করেন এবং বনবাসকালের অবসান হলে হনুমান, সুগ্রীব ও ভ্রাতা লক্ষ্মণসহ পত্নী সীতাদেবীকে সঙ্গে নিয়ে বিমানে অযোধ্যায় ফিরে যান। রাজধানী অযোধ্যায় পৌঁছলে, রাজপথে রাজকীয় লোকপালরা সুগন্ধি পুষ্প বর্ষণ দ্বারা শ্রীরামচন্দ্রকে স্বাগত জানান, আর ব্রহ্মাদি শ্রেষ্ঠদেবতারা বিজয়োল্লাসে শ্রীরামচরিত কীর্তন করেন।

গোবর্ধন পূজা

শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের চতুর্বিংশ অধ্যায়ে শ্রীল ব্যাসদেব গোবর্ধন পূজার বর্ণনা করেছেন। ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ এই কাহিনী সংক্ষেপে লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। পূর্বের বৈষ্ণবাচার্যরা এর তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে গেছেন, তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণীয়।

ভগবান কৃষ্ণ হচ্ছেন সর্বজ্ঞ। তিনি দেখলেন ব্রজের গোপরা জলদাতা স্বর্গরাজ ইন্দ্রকে তুষ্ট করবার জন্য যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণদের মতো এক যজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করছে। তবু শিষ্টাচার রক্ষা করবার জন্য কৃষ্ণ পিতা মহারাজ নন্দাদি বয়োজ্যেষ্ঠদের কাছে বিনম্র ও শ্রদ্ধা সহকারে এই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে চললেন। কৃষ্ণ নন্দ মহারাজকে জিজ্ঞাসা করলেন, "পিতঃ, এক বিরাট যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য এই ব্যবস্থাটি কি? এই যজ্ঞানুষ্ঠানের ফল কি? কার জন্য এই যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা হচ্ছে? কিভাবে এই অনুষ্ঠানটি হবে? এই যজ্ঞানুষ্ঠানের উদ্দেশ্যই বা কি? এই যজ্ঞ অনুষ্ঠানের পন্থাটি কি? আমি এই সব বিষয়ে জানতে খুবই আগ্রহী, আমাকে আপনি এই সব জানান।

নন্দ মহারাজ ভাবলেন পুত্র কৃষ্ণ হচ্ছে এক সামান্য বালক; যজ্ঞ অনুষ্ঠানের জটিল বিষয় সে বুঝতে পারবে না। এই কথা ভেবে তিনি চুপ করে রইলেন। কৃষ্ণ কিন্তু নন্দ মহারাজকে বলতে লাগলেন সাধু ও উদার-হৃদয় ব্যক্তিদের কাছে গোপনীয় বলে কিছু নেই। তারা কাউকেই শত্রু বা বন্ধু বিবেচনা করেন না। কেন না তারা সকলের কাছে আন্তরিকভাবে মনোভাব প্রকাশ করেন। যারা তত উদার-হৃদয় নন শত্রুভাবাপন্নদের কাছে তারা গোপনীয়তা রক্ষা করতে পারেন, কিন্তু একই পরিবারের লোকজনের কাছে, বন্ধুদের কাছে, কিছুই গোপন করবার দরকার নেই। আমার কাছেও নয়।

সকলেই সকাম কর্মী। কেউ কেউ এই সব কর্ম ও কর্মফল সম্বন্ধে সচেতন; আবার কেউ কেউ এই সব কর্মের ফল ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে না জেনেই কর্ম অনুষ্ঠান করে বলে তারা সম্পূর্ণ ফল পায় না। কিন্তু যারা পূর্ণ জ্ঞানে কার্য করে তারা পূর্ণ ফল প্রাপ্ত হয়। তাই আমাকে বলুন এই যজ্ঞানুষ্ঠান কি শাস্ত্রসম্মত? না, এইটি শুধু প্রচলিত যজ্ঞ অনুষ্ঠান? এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যই বা কি?

তখন নন্দ মহারাজ তাঁর স্নেহের পুত্র কৃষ্ণকে সবকিছু বিশ্লেষণ করে বলতে লাগলেন—এই যজ্ঞানুষ্ঠান প্রায় একটি প্রচলিত রীতি বা প্রথামাত্র। জল আমাদের একান্ত প্রয়োজন। দেবরাজ ইন্দ্রের কৃপাতেই বৃষ্টি হয়। আমরা এইভাবে প্রয়োজনীয় জল পাই। জলদানকারী মেঘগুলি ইন্দ্রেরই প্রতিনিধি। তাঁর প্রতি অবশ্য আমাদের এই কৃতজ্ঞতা জানানো চাই। কেন না ইন্দ্রই আমাদের জল দান করে। আমাদের কৃষিকর্মে যথেষ্ট রবিশস্য উৎপাদনের জন্য কৃপা করে দেবরাজ ইন্দ্র যথেষ্ট বৃষ্টিপাতের ব্যবস্থা করেছেন। তাই আমরা তাঁকে তুষ্ট করবার প্রচেষ্টা করছি। জল একান্ত প্রয়োজন। জল ছাড়া আমরা কৃষিকার্য করতে পারি না, বা শস্য উৎপাদন করতে পারি না। খরা হলে আমাদের জীবনযাপন দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। ধর্মীয় অনুষ্ঠান, অর্থনৈতিক উন্নতি, অবশেষে মুক্তির জন্য এই জল বা বৃষ্টিপাতের একান্ত প্রয়োজন রয়েছে। তাই প্রচলিত প্রথা বা অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করা আমাদের পক্ষে উচিত নয়। কাম, লোভ বা ভয়ের বশবর্তী হয়ে এই প্রচলিত অনুষ্ঠান ত্যাগ করা অশোভন।

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত অনুযায়ী লিখেছেন—কৃষ্ণানুশীলনে নিযুক্ত থাকলেই কারুর কাছে কোন ঋণ থাকে না। একজন কৃষ্ণভক্তের এই সম্বন্ধে সুদৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে। কৃষ্ণের প্রতি ভক্তি রক্ষায় তিনি সব রকম দেবপূজা ও সকল বৈদিক ক্রিয়াকর্ম ইতিমধ্যেই সম্পন্ন করেছেন বলে বুঝতে হবে। কেন না শুদ্ধভক্তের বেদ নির্দিষ্ট কোন ক্রিয়াকর্ম করবার দরকার নেই।

কোন দেবোপাসনার প্রয়োজন নেই। বৈদিক শাস্ত্র অনুযায়ী কৃষ্ণসেবায় পূর্ণভাবে নিযুক্ত ব্যক্তি ইতিপূর্বেই সকল বৈদিক ক্রিয়াকর্ম অনুষ্ঠান শেষ করেছেন, তা না হলে ভগবান কৃষ্ণে তার শুদ্ধভক্তি উদয় হত না।

কখন কখন জড়া-প্রকৃতির প্রভাবে দেবতারা গর্বে স্ফীত হয়ে উঠে, পরম নিয়ন্তা ভগবানকে ভুলে যায় আর নিজেদেরই সর্বেসর্বা বলে মনে করে। যদিও দেবরাজ ইন্দ্র ছিল ভক্ত, তবু তাঁর গর্ব চূর্ণ করে তাঁকে শিক্ষা দেওয়ার কথা ভগবান কৃষ্ণ চিন্তা করেছিলেন। তাই ব্রজবাসীদের আয়োজিত ইন্দ্রযজ্ঞ অনুষ্ঠানে তিনি বাধা দেন। এই যজ্ঞ করতে কৃষ্ণ তাঁদের নিষেধ করেন। কৃষ্ণ ব্রজবাসীদের এর কারণও বিশ্লেষণ করে বলেন। ভগবদ্গীতায় ভগবান কৃষ্ণ বলছেন, জড়-জাগতিক উন্নতির জন্য দেবোপাসনার ফল অনিত্য আর অল্পবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিরাই দেবোপাসনায় আগ্রহ প্রকাশ করে। ভগবান কৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় স্বয়ং স্পষ্টভাবেই বিশ্লেষণ করে বলেছেন এই সব কথা, এবং তা সপ্তম অধ্যায়ের ২০ থেকে ২৩ শ্লোকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ 'গীতার গানে' তা এইভাবে প্রকাশ করেছেন—

> যে পর্যন্ত কামনার দ্বারা থাকে বশীভূত।
> প্রপত্তি আমাতে তদা নহে ত' সম্ভূত ॥
> সেই কাম দ্বারা তারা হৃতজ্ঞান হয়।
> আমাকে ছাড়িয়া অন্য দেবতা পূজয় ॥
> আমি অন্তর্যামী তার থাকিয়া অন্তরে।
> সেই সেই দেবপূজা করাই সত্বরে ॥
> সেই সেই শ্রদ্ধা দিই করিয়া অচল।
> অতএব অন্য দেব করয়ে পূজন ॥
> সে তখন শ্রদ্ধাযুক্ত দেব আরাধন।
> করিয়া সে ফল পায় আমার কারণ ॥
> কিন্তু সেই সেই ফল অনিত্য সকল।
> স্বল্প মেধা চাহে তাই সাধন বিফল ॥
> তারা দেবলোকে যায় অনিত্য সে ধাম।
> মোর ভক্ত মোর ধামে নিত্য পূর্ণকাম ॥

কৃষ্ণ এমনভাবে তাঁর পিতা নন্দ মহারাজের সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন যেন তিনি 'কর্ম মীমাংসাবাদ'-এর সমর্থক। এই দর্শন অনুযায়ী সকলেরই নিজ নিজ

কর্তব্য-কর্ম করা উচিত। উত্তম কর্মের ফলও উত্তম হয়। ভগবান বলে যদি কিছু থাকে, তবুও তাঁকে উপাসনা করার কোন প্রয়োজন নেই। কেন না যার যেমন কর্ম তার তেমন ফল দিতে তিনি বাধ্য। কৃষ্ণ নন্দ মহারাজকে এইভাবে ব্যাখ্যা করলেন—'কৃষিকার্যে সাফল্যজনক উৎপাদনের জন্য কোন দেবপূজার প্রয়োজন নেই। নিজ নিজ কর্ম অনুযায়ী জীবকুল ভবিষ্যৎ জীবনে সুখ-দুঃখ লাভ করে। ইন্দ্র মানবকুলের ভাগ্য নিয়ন্তা নয়, তাঁর পূজা মানুষ করবে কেন?

নন্দ মহারাজাদির অভিমত হচ্ছে অধিকারী-দেবতাদের তুষ্ট না করে শুধু জড়-জাগতিক প্রচেষ্টায় কোন ভাল ফল পাওয়া যায় না। তাই কৃষিকর্মে ভাল ফল লাভের উদ্দেশ্যে দেবরাজ ইন্দ্রকে অবশ্য তুষ্ট করা চাই বলে নন্দ মহারাজ যুক্তি দেখালেন। কেন না প্রয়োজনীয় রবিশস্য উৎপাদনের জন্য যথেষ্ট জলের প্রয়োজন। আর দেবরাজ ইন্দ্রই জলদান করেন। তখন কৃষ্ণ তাঁর পিতাকে ব্যাখ্যা করে বললেন যে, দেবতারা শুধু জীবকুলের নির্দিষ্ট কর্তব্য-কর্মের ফলই প্রদান করতে পারেন। আর যারা নির্দিষ্ট কর্তব্য-কর্ম করে না, দেবতারা তাদের উত্তম ফল দিতে পারে না।

কৃষ্ণ পিতা নন্দ মহারাজকে আরো বোঝালেন যে, প্রত্যেক জীবকেই তার কর্মফল পেতে হবে। তাই ইন্দ্র-যজ্ঞের কোন প্রয়োজন নেই। লক্ষ্যণীয় এই যে প্রত্যেক মানুষই নিজ নিজ প্রবণতা অনুযায়ী কর্মে নিযুক্ত থাকে। দেবতা বা মানুষ যেই হোক নিজ নিজ স্বভাব মতো যথাক্রমে ফলও লাভ করে। বিভিন্ন কর্মের ফলেই উন্নত বা নিকৃষ্ট দেহধারী জীব পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা, বন্ধুত্ব স্থাপন করে। নিজ স্বভাব অনুযায়ী কর্তব্য-কর্ম সম্পাদনে সকলেরই সতর্ক হওয়া উচিত, আর বিভিন্ন দেবোপাসনায় মনোনিবেশ করা উচিত নয়। কর্তব্য-কর্ম যথাযথভাবে সম্পাদনেই দেবকুল তুষ্ট হয়, তাই বিভিন্ন দেবোপাসনার কোন প্রয়োজন নেই। প্রকৃতপক্ষে নিজ নিজ কর্তব্য-কর্ম যথাযথভাবে সম্পাদন না করে কেউ সুখী হতে পারে না। তাই যে তার স্বধর্ম পালন করে না, তাকে অসতীর সঙ্গে তুলনা করা হয়। এইভাবে ব্রাহ্মণের ধর্ম হচ্ছে বেদাধ্যয়ন, ক্ষত্রিয়ের ধর্ম হচ্ছে প্রজাদের রক্ষা করা, বৈশ্যের ধর্ম হচ্ছে কৃষি, ব্যবসা ও গোরক্ষা, আর শূদ্রের ধর্ম হচ্ছে অন্যান্য উচ্চবর্ণের সেবা করা। 'আমরা বৈশ্য, শাস্ত্র নির্দিষ্ট আমাদের কর্তব্য হচ্ছে কৃষিকর্ম, কৃষি-জাত পণ্যের বাণিজ্য, গোরক্ষা বা অর্থ গচ্ছিত রাখা বা তা ব্যবসায় খাটানো।'

কৃষ্ণ নন্দ মহারাজকে আরও বলেন যে, 'ত্রিগুণময়ী জড়া-প্রকৃতির এভাবে এই চরাচর সৃষ্টি চলছে। সত্ত্ব, রজ ও তম—এই তিনটি গুণের দ্বারাই সৃষ্টি,

স্থিতি ও ধ্বংস হচ্ছে। রজোগুণ প্রভাবিত কার্যে মেঘ সৃষ্টি হয়। তাই রজোগুণই হচ্ছে বৃষ্টির কারণ। আর বৃষ্টি হওয়ার দরুণই কৃষিকার্যে সাফল্য যার ফল জীবকুল লাভ করে। এই কাজে তাই ইন্দ্রের কি সম্বন্ধ রয়েছে? আপনি যদি তাকে সন্তুষ্ট না করেন, সে কি করতে পারে? তার কাছ থেকে আমরা কোন বিশেষ উপকারই লাভ করি না। যেখানে জলের কোন প্রয়োজন নেই এমন কি ইন্দ্র সেখানেও জল দান করে। ইন্দ্রপূজার ওপর এগুলি নির্ভর করে না। শহর, গ্রাম বা দূরদেশে যাওয়ার কোন দরকার নেই, শহরে প্রাসাদোপম অট্টালিকা থাকে, কিন্তু আমরা বৃন্দাবনে বসবাস করেই খুশি। গোবর্ধন পাহাড় আর বৃন্দারণ্য, এদের সঙ্গেই আমাদের বিশেষ সম্বন্ধ, আর কিছুই নয়। তাই স্থানীয় ব্রাহ্মণ ও গোবর্ধন পাহাড়কে যা তুষ্ট করবে তেমন এক যজ্ঞানুষ্ঠান করুন,—এটাই আপনার কাছে আমার একান্ত অনুরোধ, আর ইন্দ্রের বিষয়ে আমাদের কিছু ভাববার দরকার নেই।

কৃষ্ণের সব কথা শুনে নন্দ মহারাজ স্থানীয় গোবর্ধন পাহাড়ের উদ্দেশ্যে আলাদাভাবে একটি যজ্ঞানুষ্ঠানের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন আর তখনকর জন্য ইন্দ্রযজ্ঞ করবার কথা বললেন।

কৃষ্ণ কিন্তু আবার বলে চললেন—সময় অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে। স্থানীয় ব্রাহ্মণ ও গোবর্ধন পাহাড়ের উদ্দেশ্যে যজ্ঞানুষ্ঠানে অনেক সময় লাগবে, বরং ইন্দ্রের পূজার জন্য যে আয়োজন করা হয়েছে, যে-সব উপকরণ সংগ্রহ করা হয়েছে এক্ষুণি সেইগুলি স্থানীয় ব্রাহ্মণ ও গোবর্ধন পাহাড়ের তুষ্টির জন্য ব্যবহার করা হোক্।

শেষ পর্যন্ত নন্দ মহারাজ কৃষ্ণের প্রস্তাবেই সম্মত হলেন। তখন কৃষ্ণের নির্দেশ অনুযায়ী স্থানীয় ব্রাহ্মণ ও গোবর্ধন পাহাড়ের পূজার ব্যবস্থা করলেন। ঘি ও রবিশস্য দ্বারা নানা রকম উত্তম খাদ্য তৈরি করা হল। অন্ন, ডাল, হালুয়া, পকোড়া, পুরি, পায়েস, সন্দেশ, রসগোল্লা, লাড্ডু, দুধাদি দিয়ে তৈরি করা হল বিবিধ নৈবেদ্য।

যারা যজ্ঞানুষ্ঠান কার্যে পারদর্শী বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণে দক্ষ, সেই ব্রাহ্মণদের কৃষ্ণ আমন্ত্রণ জানাতে নির্দেশ দিলেন। কৃষ্ণ তাদের আরও বললেন—'ব্রাহ্মণদের সব রকম রবিশস্য দান কর, গাভীদের যথাযথভাবে বেশভূষা ও অলঙ্কারে সজ্জিত কর, তাদের উত্তম খাদ্য দান কর। তারপর সেই ব্রাহ্মণদের অর্থ দান কর। কুকুরাদি নিচ পশুদের, অস্পৃশ্য ও চণ্ডালদের প্রচুর প্রসাদ ভোজন করাও। গাভীদের ঘাস খাওয়ানোর পরেই গোবর্ধন পূজা শুরু করা যেতে পারে। এই যজ্ঞ অনুষ্ঠানে আমি অতীব তুষ্ট হব'।

ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন যে কৃষ্ণ যেমন আমাদের উপাস্য, সেই রকম কৃষ্ণের লীলাবিলাসভূমি শ্রীধাম বৃন্দাবন ও গিরি-গোবর্ধনও তেমনি আমাদের উপাস্য। গোবর্ধন পূজা তাঁর পূজা থেকে অভিন্ন বলে কৃষ্ণ দৃঢ়ভাবে অভিমত প্রকাশ করেছেন। সেই সময় থেকে আজ পর্যন্ত এই গোবর্ধন পূজা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। একে অন্নকূটও বলা হয়। ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের নির্দেশে বিশ্বের সর্বত্র আজ আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত মন্দির-আশ্রমাদিতে এই গোবর্ধন পূজা অনুষ্ঠান ও মহোৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

ব্রজবাসীরা আজও কৃষ্ণের নির্দেশ মতো রঙিন বেশে সজ্জিত হয়ে গোবর্ধন পূজা করে চলেছে।

গোপীরা সুন্দর বেশভূষায় সজ্জিত হয়ে গরুর গাড়ি চড়ে কৃষ্ণলীলা কীর্তন করেছিল আর গাভীদের সম্মুখে রেখে গোপবালকরা গোবর্ধন পরিক্রমা করেছিল। ব্রাহ্মণরা গোপ-গোপীদের আশীর্বাদ করেছিল। কৃষ্ণ এক বিরাট দিব্যরূপ ধারণ করে গোবর্ধনকে নিবেদিত আহার্য সকল ভোজন করেছিলেন।

মহাপ্রভুর সন্ন্যাসলীলা

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় (৪/৮) জড়-জগতে তাঁর অবতরণের উদ্দেশ্য প্রকাশ করে বলেছেন—

পরিত্রাণায় সাধূণাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

অর্থাৎ, ভগবান জগৎ উদ্ধারের জন্য অবতরণ করেন; কিন্তু ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দর্শন করে, উদ্ধার লাভ করবার পরিবর্তে একসময় নবদ্বীপবাসী অনেকেই তাঁর চরণে অপরাধ করতে শুরু করে। এই প্রসঙ্গে শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর 'শ্রীচৈতন্য-ভাগবত'-এর মধ্য খণ্ডের ষড় বিংশ অধ্যায়ে লিখেছেন—

একদিন গোপী-ভাব জগতে-ঈশ্বর।
'বৃন্দাবন', 'গোপী গোপী' বলে নিরন্তর ॥

কোন যোগে তহিঁ এক পড়ুয়া আইল।
ভাব-মর্ম না জানিয়া সে উত্তর দিল ॥
"গোপী গোপী' কেন বল নিমাঞি পণ্ডিত।
'গোপী গোপী' ছাড়ি' 'কৃষ্ণ' বলহ ত্বরিত ॥
কি পুণ্য জন্মিবে, 'গোপী গোপী' নাম লৈলে।
'কৃষ্ণনাম' লইলে সে পুণ্য, বেদে বলে ॥"

সেই পড়ুয়াটির কৃষ্ণভক্তি সম্বন্ধে তেমন তত্ত্বজ্ঞান ছিল না। আশ্রয় বিগ্রহের শরণাগতি ছাড়া ভগবানের চরণকমল লাভ হয় না। গোপীরা হচ্ছেন কৃষ্ণের আশ্রয় বিগ্রহ; কৃষ্ণ হচ্ছেন বিষয় বিগ্রহ। ভক্তিতত্ত্ব বিচারে আশ্রয় বিগ্রহের আনুগত্যে সেবা করলে, তবেই বিষয় বিগ্রহ কৃষ্ণের কৃপা লাভ হয়। পড়ুয়ার এই জ্ঞান ছিল না।

মহাপ্রভু লাঠি হাতে নিয়ে ঐ পড়ুয়াটিকে তাড়া করেন। ভয়ে পড়ুয়াটি পালিয়ে যায়; আর মহাপ্রভুর অনুগামীরা তাঁকে এই তাড়না থেকে নিবৃত্ত করেন।

জড়-বুদ্ধিসম্পন্ন জনগণ ভগবান ও তাঁর দিব্য লীলা বিলাস বুঝতে পারে না। ভগবান হচ্ছেন অধোক্ষজ তত্ত্ব; অক্ষজ বিচারে তাঁকে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। পড়ুয়ারা ভগবানকে এইভাবে বিচার করে তাঁর চরণে অপরাধ করে ফেলে।

তখন সেই পড়ুয়া অন্যান্যদের সঙ্গে গিয়ে এ সম্বন্ধে আলোচনা করে, 'নিমাই হচ্ছে জগন্নাথ মিশ্রের ছেলে; আমাদেরই সহপাঠী। সে হচ্ছে ব্রাহ্মণ; আমরাও ব্রাহ্মণ সন্তান। তাই আমরা তার এই দুর্ব্যবহার সহ্য করব না।'

ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কিন্তু তাদের মনোভাব সবই জানতে পারলেন; কারণ তিনি সকলের হৃদয়ে অবস্থান করেন।

একদিন মহাপ্রভু হেঁয়ালিচ্ছলে পার্ষদদের কাছে সন্ন্যাস গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। সেখানে নিত্যানন্দ প্রভুই শুধু মহাপ্রভুর হেঁয়ালি বুঝতে পারলেন। অন্যান্য পার্ষদরা তা বুঝতে পারলেন না।

মহাপ্রভু গৃহত্যাগ করবেন। সন্ন্যাস গ্রহণ করলে, মস্তক মুণ্ডন করলে তাঁর সুন্দর কেশ আর পার্ষদরা দর্শন করতে পারবেন না,—এইভাবে চিন্তা করে নিত্যানন্দ প্রভু বিষণ্ণ হলেন। তা ছাড়া মহাপ্রভু একাকী নিত্যানন্দের সঙ্গে এই সম্বন্ধে আলোচনাও করেন। তারপর মুকুন্দের গৃহে গিয়ে তাঁর কাছেও সন্ন্যাস গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। এইসব বিবরণ শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর তাঁর লেখা 'শ্রীচৈতন্য-ভাগবত'-এ বিস্তারিতভাবে লিখে গিয়েছেন—

ক্ষণেকে ঠাকুর নিত্যানন্দ-হস্ত ধরি' ।
নিভৃতে বসিলা গিয়া গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥
প্রভু বলে,—"শুন নিত্যানন্দ মহাশয় ।
তোমারে কহিয়ে নিজ হৃদয় নিশ্চয় ॥
ভাল সে আইলাঙ আমি জগত তারিতে ।
তাড়ন নহিল, আমি আইলুঁ সংহারিতে ॥
আমা দেখি কোথা পাইবেক বন্ধনাশ ।
এক গুণ বন্ধ ছিল–হৈল কোটি-পাশ ॥
আমারে মারিতে যবে করিলেক মনে ।
তখনই পড়ি' গেল অশেষ-বন্ধনে ॥
ভাল লোক তাড়িতে করিলুঁ অবতার ।
আপনে করিলু সব জীবের সংহার ॥
দেখ কালি শিখা-সূত্র সব মুড়াইয়া ।
ভিক্ষা করি' বেড়াইমু সন্ন্যাস করিয়া ॥
তবে মোরে দেখি' সেই ধরিবে চরণ ।
এই মতে উদ্ধারিব সকল ভুবন ॥

আজ থেকে ৫০০ বছর আগে কলির প্রভাব তেমন ছিল না। তখন সাধারণ লোক সন্ন্যাসীকে তাড়না করত না। বৈদিক ধর্ম অনুযায়ী মানব সমাজে তিনটি আশ্রম—ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। সব বস্তুর সেবা গ্রহণ প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করে, ভগবানের সেবায় উন্মুখ হলেই ভক্তিমার্গে সন্ন্যাসী হয়।

মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভুকে বুঝিয়ে বললেন যে, নবদ্বীপের জনগণের নিত্য কল্যাণের জন্য তিনি হরিনাম সংকীর্তন শুরু করবেন। শুদ্ধভক্তি সম্বন্ধে তাদের কোন জ্ঞান ছিল না। তারা মহাপ্রভুকে ভুল বুঝল আর তাঁর চরণে অপরাধ করে বসল। তখন তাদের জড়-জগতের বন্ধন আরও দৃঢ় হল। ভগবদ্ভক্তের সেবা বুদ্ধির অভাব ও ভগবদ্-বিদ্বেষ—এইগুলিই তাদের আত্মবিনাশের কারণ। এইভাবে নবদ্বীপের জনগণের দুর্গতি হয়েছিল।

শচীনন্দন মুকুন্দের গৃহে উপস্থিত হলে মুকুন্দ খুব আনন্দ প্রকাশ করল। তিনি মুকুন্দকে কৃষ্ণ-কীর্তন করতে বললেন। মুকুন্দের কীর্তনে আনন্দে বিহ্বল মহাপ্রভু তাঁকে আরও কীর্তন করতে উৎসাহ দিলেন। তারপর হঠাৎ 'ভাব' সম্বরণ করে, তিনি মুকুন্দের কাছে সন্ন্যাস গ্রহণের কথা জানালেন। শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের মধ্য খণ্ডে লিখেছেন—

প্রভু বলে—"মুকুন্দ, শুনহ কিছু কথা ।
বাহির হইব আমি, না রহিব হেথা ॥
গারিহস্ত আমি ছাড়িবাঙ সুনিশ্চিত ।
শিখা-সূত্র ছাড়িয়া চলিব যে-তে ভিত ॥"

(চৈঃ ভাঃ মধ্য ২৬/১৬১-১৬২)

মুকুন্দের কাছ থেকে শচীনন্দন গদাধরের কাছে গেলেন। সেখানেও গদাধরের কাছে তাঁর সন্ন্যাস গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। গদাধরের তখনকার মনোভাব বৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্য-ভাগবত-এ এইভাবে বর্ণনা করেছেন,—

অন্তরে দুঃখিত হই' বলে গদাধর ।
"যতেক অদ্ভুত প্রভু, তোমার উত্তর ॥
বিনা-সূত্র ঘুচাইলেই সে কৃষ্ণ পাই ।
গৃহস্থ তোমার মতে বৈষ্ণব কি নাই?
মাথা মুড়াইলে প্রভু, কিবা কর্ম হয় ।
তোমার সে মত, এ বেদের মত নয় ॥
অনাথিনী, মায়েরে বা কেমত ছাড়িবে ।
প্রথমেই জননী-বধের ভাগী হবে ॥
তুমি গেলে সর্বথা জীবন নাহি তান ।
সবে অবশিষ্ট আছে তুমি তাঁর প্রাণ ॥
ঘরেতে থাকিলে কি ঈশ্বরের প্রীত নয় ।
গৃহস্থ সে সবার প্রীতের স্থলী হয় ॥
তথাপিও মাথা মুণ্ডাইলে স্বাস্থ্য পাও ।
যে তোমার ইচ্ছা তাই করি' চলি' যাও ॥"

মর্মাহত গদাধর অভিমান করে মহাপ্রভুকে এইভাবে উত্তর দিয়েছিলেন। তারপর একের পর এক অন্যান্য ভক্তদের কাছে শচীনন্দন সন্ন্যাস গ্রহণের কথা বললে ভক্তরা সকলেই ক্রন্দন করতে থাকেন।

প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য কৃষ্ণানুশীলন করা। যে আশ্রমেই তিনি থাকুন না কেন, সদা সর্বদা কৃষ্ণানুশীলনই সকলের কৃত্য।

'সংসার কৃষ্ণানুশীলনের প্রতিকূল, তাই সংসার ত্যাগ করা চাই',—এই শিক্ষা দেওয়াই ছিল শচীনন্দনের উদ্দেশ্য। এ জন্য তিনি সহপাঠীদের সঙ্গ ত্যাগ করলেন। তা ছাড়া, আরও একটি তার উদ্দেশ্য ছিল। প্রাকৃত সহজিয়ায়

আজ সারা ভারত ছেয়ে গেছে। এরা অবৈধ গৃহস্থ জীবন যাপন করে চলেছে। এর থেকে জনগণকে মুক্ত করবার ইচ্ছা ছিল শচীনন্দনের।

শচীনন্দন সকলকে ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করে চলে যাবেন। তাই তাঁর বিচ্ছেদের কথা ভেবে ভক্তরা সকলেই ক্রন্দন করতে থাকেন। তাঁরা আহার্য পানীয় সবই ত্যাগ করে। তাঁদের দুঃখ মহাপ্রভু সহ্য করতে পারেননি। তাই শচীনন্দন তাঁর প্রিয়জনদের প্রবোধ দান করেন। শচীনন্দন ভক্তদের ভালবাসেন। তাই সস্নেহে তাদের বললেন যে, তাঁরা সবাই তাঁর নিত্যপরিকর। তাঁরা না থাকলে তাঁর কোন লীলাবিলাসই হয় না। প্রভুর লীলায় অংশগ্রহণের জন্য তারা জন্মে জন্মে অবতরণ করেন। শচীনন্দনের কাছে এই সব সান্ত্বনার কথা শুনে, তাঁর প্রেমালিঙ্গন লাভ করে, অবশেষে তাঁরা স্থির হন।

মাতাকে দুঃখে অত্যন্ত কাতর দেখে শচীনন্দন মাথা নিচু করে রইলেন; কোন কথাই বললেন না। এ দিকে শচীমা নিমাই-এর সন্ন্যাস নেওয়ার ইচ্ছা শুনে অবিরাম ক্রন্দন করতে থাকেন। কখনও মূর্ছিত হয়ে ভূমিতে পড়েন; কখনও তাঁকে দেখে নিষ্প্রাণ মনে হয়। তখন তাঁর অবস্থা বর্ণনা করা যায় না। শোকে মুহ্যমান হয়ে তিনি তাঁর স্নেহের পুত্রকে উদ্দেশ্য করে বলতে লাগলেন, যদিও তাঁর বাক্‌রোধ হচ্ছিল। তিনি বলেছিলেন—

না যাইহ না যাইহ বাপ, মায়েরে ছাড়িয়া।
পাপ জীউ আছে তোর শ্রীমুখ চাহিয়া ॥
কমল-নয়ন তোর শ্রীচন্দ্র-বদন।
অধর সুরঙ্গ, কুন্দ-মুকুতা-দশন ॥
অমিয়া বরিখে যেন সুন্দর বচন।
না দেখি বাঁচিব কি সে গজেন্দ্র-গমন ॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ২৭/২২-২৪)

শচীমাতা নিমাইকে এই বলে বোঝাতে চেষ্টা করলেন,—'তুমি সকলকে ধর্মোপদেশ দাও। নিজের মা'কে ত্যাগ করে, গৃহ ত্যাগ করলে, কিভাবে জগতে ধর্ম-শিক্ষা দিবে? নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, শ্রীবাস আদিকে নিয়ে গৃহে থেকেই সানন্দে সঙ্কীর্তন করতে পার।'

মহাপ্রভু তখন শচীমাকে অনেক প্রবোধ দিলেন এবং নিজের স্বরূপ প্রকাশ করলেন। জন্মে জন্মে মাতারূপে শচীমার সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ ও লীলাবিলাস কাহিনী প্রকাশ করলেন। এক জন্মে তাঁর নাম ছিল পৃশ্নি; তখনও তিনি ছিলেন

তাঁর মা। তাঁর বামন অবতারে, তাঁর মাতৃরূপে তাঁর নাম ছিল তখন অদিতি। তা ছাড়া কৌশল্যা ও শ্রীরামচন্দ্র, এবং দেবকী ও কৃষ্ণরূপেও তাঁরা দুজন জগতে লীলা করেছিলেন। এইভাবে মহাপ্রভু শচীমাকে বুঝালেন যে, দুঃখ করবার কিছুই নেই। জন্মে জন্মে তাঁদের মাতা-পুত্রের সম্বন্ধ চলে আসছে। তাদের মধ্যে কোন বিচ্ছেদই নেই। তখন শচীমার মন কিছুটা স্থির হল।

সন্ন্যাস গ্রহণের আগের দিন নিত্যানন্দ প্রভুকে নির্জনে ডেকে মহাপ্রভু বললেন, আমার সন্ন্যাস গ্রহণের কথা কেবল পাঁচজনকে বলবেন। কাটোয়া গ্রামে ইন্দ্রাণী নামে এক জায়গায় আমি নিশ্চয় আগামীকাল সন্ন্যাস গ্রহণ করতে কেশব ভারতীর কাছে যাব। এই সংবাদটি শুধু আমার মা, গদাধর, ব্রহ্মানন্দ, শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য আর মুকুন্দ—এদের জানাবেন। তা ছাড়া অন্য কেউই এই কথা জানতে পারল না।

সেদিন মহাপ্রভু সকল বৈষ্ণবদের নিয়ে সংকীর্তনানন্দে কাটালেন। সর্বাঙ্গে মালা সুগন্ধি চন্দনে সজ্জিত কমললোচন শচীনন্দন সকল অনুচরদের নিয়ে বসলেন। বিদায়ের আগে সকলকে শচীনন্দন আকর্ষণ করে নিয়ে এলেন। সকলেই এসে শচীনন্দনকে প্রণাম করতে লাগলেন। নিজের গলার মালা তিনি একে একে সকলকে পরিয়ে দিতে লাগলেন। তাঁদের তিনি কৃষ্ণ-কীর্তন করতে উপদেশ দিলেন।

তিনি তখন বললেন,—

"বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, গাও কৃষ্ণ-নাম।
কৃষ্ণ বিনু কেহ কিছু না ভাবিহ আন ॥
যদি আমা' প্রতি স্নেহ থাকে সবাকার।
তবে কৃষ্ণ-ব্যতিরিক্ত না গাইবে আর ॥
কি শয়নে, কি ভোজনে, কি জাগরণে।
অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ, বলহ বদনে ॥"

(চৈঃ ভাঃ মধ্য ২৮/২৬-২৮)

এইভাবে শচীনন্দন সকলকে শুভদৃষ্টি দান করলেন। ফুল চন্দনে তাঁর যে শোভা হয়েছিল তার কাছে চন্দ্রের শোভা তুচ্ছ। তখন সকলেই উচ্চস্বরে 'হরি-ধ্বনি' করছিল।

শ্রীধর মহাপ্রভুর জন্য একটি লাউ নিয়ে এসেছিলেন। অন্য একজন লোক দুধ নিয়ে এসেছিলেন। ভক্তবৎসল গৌরহরি ভক্ত দত্ত লাউ সহ দুধ দিয়ে শচীমাকে রান্না করতে বললেন। নিমাই-এর কথা শুনে শচীমা খুশি হলেন।

সকলকে বিদায় দিয়ে শচীনন্দন ভোজন করলেন। তিনি শয়ন করলে, গদাধর ও হরিদাস মহাপ্রভুর গৃহের অতি নিকটেই শয়ন করলেন। রাত্রি আর চার দণ্ড আছে তখন মহাপ্রভু শয্যা ত্যাগ করলেন। নিমাই গৃহত্যাগ করবে বুঝতে পেরে শচীমা দরজায় বসে রইলেন। শচীমার হাত ধরে, মহাপ্রভু তাঁর কাছে বসে, অনেক প্রবোধ দিলেন, তিনি তখন বললেন,—

"বিস্তর করিলা তুমি আমার পালন।
পড়িলাম, শুনিলাম তোমার কারণ॥
আপনার তিলার্ধেকো না লৈলা সুখ।
আজন্ম আমার তুমি বাড়াইলা ভোগ॥
দণ্ডে দণ্ডে যত স্নেহ করিলা আমারে।
আমি কোটি-কল্পেও নারিব শোধিবারে॥

তিনি আরও বললেন—

শুনমাতা, ঈশ্বরের অধীন সংসার।
স্বতন্ত্র হইতে শক্তি নাহিক কাহার॥
সংযোগ বিয়োগ যত করে সেই নাথ।
তান ইচ্ছা বুঝিবারে শক্তি আছে কাত॥

তারপর বুকে হাত রেখে মহাপ্রভু প্রতিশ্রুতি দিলেন যে তাঁর সমস্ত ভার তিনি গ্রহণ করবেন। শচীমার পদধূলি শিরে নিয়ে, তাঁকে প্রদক্ষিণ করে মহাপ্রভু গৃহত্যাগ করলেন। জড় প্রায়, নির্বাক ও শোকাকুল অবস্থায় শচীমা বাড়ির বাহির দরজায় বসে রইলেন।

মহাপ্রভু কাটোয়ায় কেশব ভারতীর কাছে গিয়ে তাঁর স্তুতি করলেন এবং তাঁকে কৃপা প্রদর্শন করতে অনুরোধ করলেন। মুকুন্দ ও অন্যান্যদের কীর্তনে মহাপ্রভু নৃত্য করতে লাগলেন। বহু লোক সেখানে আসতে লাগল। ক্ষৌরকার শচীনন্দনের কেশ মুণ্ডন করতে গিয়ে ক্রন্দন করতে লাগলেন। অলক্ষ্যে দেবতারাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁরাও শোকাকুল হলেন।

সন্ন্যাসীর বস্ত্র পরিধান করলে, মহাপ্রভুকে অপূর্ব সুন্দর দেখাচ্ছিল। সকলের গুরু গৌরহরি এক ছলনা করে সন্ন্যাস মন্ত্রটি কেশব ভারতীকে বলে জিজ্ঞাসা করলেন সেটি সন্ন্যাস মন্ত্র কি না।

শুদ্ধা সরস্বতীর প্রেরণায় শচীনন্দনের সন্ন্যাস নাম হল 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' কেন না কৃষ্ণকীর্তনের মাধ্যমে তিনি জগতে চেতনার উন্মেষ ঘটান। মহাপ্রভুর সন্ন্যাস নাম শুনে চতুর্দিক থেকে বৈষ্ণবগণ সকলে আনন্দে উচ্চস্বরে হরি-ধ্বনি করে উঠলেন।

এই কাহিনী বর্ণনা করে শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর লিখেছেন যে, মহাপ্রভুর সন্ন্যাসলীলা যিনি শ্রদ্ধা ভরে শ্রবণ করবেন, তিনি অচিরেই কৃষ্ণপ্রেম-রূপ ধন লাভ করবেন।

দুর্গাদেবীকে তুষ্ট করবার পন্থা

আমরা সকলেই 'দুর্গা' দেবীর সঙ্গে পরিচিত; এই 'দুর্গা'দেবীকে ভগবান নারায়ণের শক্তি বলে বৈদিক শাস্ত্রের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে; চণ্ডী, দেবী ভাগবতাদিতে 'বিষ্ণুশক্তি' 'নারায়ণী' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

সৃষ্টির প্রথম জীব ব্রহ্মার কথায় ভগবান অনন্ত শক্তিময়; তবে জড়া বা অপরা প্রকৃতি ও পরা প্রকৃতি রূপে তা বিদ্যমান। মূলতঃ দুটি শক্তি; এই জড়া প্রকৃতি হচ্ছে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড। ঠিক যেন এক থলি 'সরিষা'র মত। এক একটি ব্রহ্মাণ্ডকে এক একটি সরিষার দানার সঙ্গে তুলনা করা যায়।

বৈদিক শাস্ত্রের বিবেচনায় এক একটি ব্রহ্মাণ্ডে আবার চৌদ্দটি ভুবন রয়েছে—ভূলোক, ভুবলোক, স্বলোক, মহলোক, জনলোক, তপলোক, সত্যলোক বা ব্রহ্মলোক—এগুলি উপরদিকে রয়েছে; আর নীচের দিকে রয়েছে—অতল, বিতল, সুতল, মহাতল, তলাতল, রসাতল, পাতাল বা নিম্নলোক। এইভাবে চৌদ্দ ভুবনাময় এই জগৎকে দেবীধাম বলে; দুর্গাদেবী হচ্ছেন, এই দেবীধামের 'অধিষ্ঠাত্রী'—যিনি দশভুজা, সিংহবাহিণী ও পাপদমনী। তিনি মহিষাসুরকে বধ করেছেন। তার এক পাশে জড় ঐশ্বর্য রূপ লক্ষ্মী ও অন্যদিকে জড়বিদ্যারূপ সরস্বতী বিরাজ করছেন। তার একদিকে শোভারূপ কার্তিক, অন্যদিকে সিদ্ধিরূপ গণেশ রয়েছেন। পাপ দমনের উদ্দেশ্যে বেদে উল্লেখিত নানা রকম ধর্মরূপ কুড়ি প্রকার দিব্য অস্ত্রে তিনি সুসজ্জিতা।

সৃষ্টির প্রথম জীব ব্রহ্মা ভগবান শ্রীহরির ভজনায় সিদ্ধি লাভ করে অর্থাৎ ভগবদ্ দর্শন লাভ করবার পর তিনি যখন শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা গান করেন, তাকে 'ব্রহ্মসংহিতা' বলে; যাই হোক, ব্রহ্মসংহিতায় উল্লেখ করা হয়েছে—

সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়সাধনশক্তিরেকা
ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্তি দুর্গা।
ইচ্ছানুরূপমপি যস্য চ চেষ্টতে সা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

অর্থাৎ, স্বরূপ শক্তি বা চিৎ শক্তির ছায়া স্বরূপা প্রাপঞ্চিক জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় সাধিনী মায়াশক্তিই ভুবন পূজিতা 'দুর্গা'; তিনি যাঁর ইচ্ছানুরূপ চেষ্টা করেন, সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

চিজ্জগতে যে দুর্গাদেবী আছেন—তিনি চিন্ময়ী কৃষ্ণদাসী। সেই দুর্গাদেবীর ছায়ারূপিনী হচ্ছেন এই জড় জগতে পূজিতা দুর্গাদেবী। পরমেশ্বর ভগবান আদি-পুরুষ গোবিন্দের ইচ্ছানুযায়ী দুর্গাদেবী ও শম্ভু একসঙ্গে কাজ করেন।

এই শম্ভু ও কৃষ্ণ অভেদ হলেও তাদের মধ্যে পার্থক্য আছে; তা হচ্ছে শম্ভুর ঈশ্বরতা আদিপুরুষ গোবিন্দের ঈশ্বরতার অধীন। একটি উদাহরণের সাহায্যে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা তা বিশ্লেষণ করেছেন, তিনি বলেছেন কৃষ্ণকে যদি দুধের সঙ্গে তুলনা করা হয়, তবে শম্ভুকে দধির সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। এই শম্ভু হচ্ছেন পরম বৈষ্ণব; তাই শাস্ত্রে বলা হয়েছে

"বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভু।"

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন—

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ ॥

অর্থাৎ, এই জগতে দু'রকম জীব রয়েছে, এক হচ্ছে দৈব গুণসম্পন্ন, আর একধরনের জীব হচ্ছে আসুরিক সম্পন্ন। এদের মধ্যে যারা শ্রীভগবানের আনুগত্য স্বীকার করে না, তাদের বলা হয় অসুর; তারা সবসময় নিজেই ভোক্তা ও কর্তা হতে চায়, ভগবানের কর্তৃত্ব তারা স্বীকার করে না। অথচ সকল শাস্ত্রগ্রন্থাদি থেকে আমরা জানি ভগবানই প্রধান কর্তা ও সমস্ত কিছুর ভোক্তা। ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন ঃ

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্।
সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি ॥

—রাজা যেমন তার রাজ্যে এক কারাগার তৈরি করেন; যারা রাজার নির্দেশ অমান্য করে তার কর্তৃত্ব স্বীকার করে না; তাদের স্থান হয় কারাগারে; ঠিক সেই রকম যারা ভগবানের নির্দেশ মানে না, যারা শাস্ত্র মানে না, তাদের কারাগাররূপ এই জড় জগতে আসতে হয়। কারাগারে দুঃখ-দুর্দশা রূপ শাস্তি ভোগ করতে হয়, তাই ভগবান এই জগৎকে ভগবদ্গীতায় বলেছেন—

'দুঃখালয়ম্'। এই জগতে দুঃখ-দুর্দশা সকলকেই ভোগ করতে হবে। কেউ তা এড়াতে পারবে না। তাই শ্রীল সনাতন গোস্বামী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে জীবের আদর্শ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলেন—

'কে আমি, কেনে মোরে জারে তাপত্রয়?"

(চৈঃ চঃ মধ্য ২/১০২)

অর্থাৎ, আমার স্বরূপ কি? কেন এই ভব সংসারে আমাদের 'তাপত্রয়' অর্থাৎ তিন রকম দুঃখ তাপ ভোগ করতে হচ্ছে? এই তিন রকম দুঃখ কি কি? শাস্ত্রে তাও উল্লেখ করা হয়েছে; এগুলো হচ্ছে আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক। সর্বোচ্চ লোক থেকে সর্বনিম্ন লোক পর্যন্ত এই জড় জগতে জন্ম-মৃত্যুময় দুঃখ-দুর্দশায় পরিপূর্ণ। এমনকি সমগ্র জীবকুলের মধ্যে এই জড় জগতের ব্রহ্মাও জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধি থেকে মুক্ত নয়। এই বিষয়ে ভগবান কৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় একটি শ্লোকে (৮/১৬) সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন—

"আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোঽর্জুনঃ।"

কিন্তু যারা কৃষ্ণানুশীলন করে কৃষ্ণকে লাভ করে তারা কৃষ্ণের ধামে যায়, সেখানে জীবন নিত্য জ্ঞান ও আনন্দে পূর্ণ। শুদ্ধ কৃষ্ণভক্ত সদ্‌গুরুর আনুগত্যে, নিরপরাধে, নিষ্কপটে ও সম্বন্ধ জ্ঞানের সঙ্গে মহামন্ত্র সর্বদা কীর্তন করা উচিত।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

—শুদ্ধ কৃষ্ণভক্ত সঙ্গে হরিনাম কীর্তনই এ যুগের ধর্ম।

ভগবান কৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় অর্জুনকে বলেছেন—'জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ'। অর্থাৎ, এই জড় জগতে জন্ম হলে জীবের মৃত্যু নিশ্চিত। আবার মৃত্যুর পর আবার জন্ম অনিবার্য। তার মধ্যে সমগ্র জীবকুলকে রোগ, শোক, জরা, ব্যাধি ভোগ করতে হয়। এগুলো থেকে কোন জীবেরই রেহাই নেই। তবে যারা ভগবান কৃষ্ণের চরণে প্রপত্তি করেন কৃষ্ণের শরণাপন্ন হন, তারা এই সব দুঃখতাপ থেকে মুক্তি লাভ করেন; যারা শুদ্ধ কৃষ্ণানুশীলনে দিনের ২৪ ঘণ্টায় এইভাবে নিমগ্ন তারা জীবনমুক্ত পুরুষ।

যারা ভগবান কৃষ্ণের আনুগত্য স্বীকার করে না, যারা অসুর তাদের এই কারাগার রূপ 'দুর্গ' থেকে জন্ম মৃত্যুময় আবর্ত থেকে বের হওয়া অতীব কঠিন। এই কারাগারের, এই জড় জগতের অধিষ্ঠাত্রী দুর্গাদেবী তাই এইসব কৃষ্ণদ্বেষী অসুরদেরকে ত্রিশূল দ্বারা আঘাত করেন অর্থাৎ তারা ত্রিতাপ জ্বালা ভোগ করে—মানসিক, দৈব ও অন্য জীব থেকে দুঃখ ভোগ করে; যেমন

একান্ত প্রিয়জনের বিয়োগ জনিত দুঃখ, বজ্রপাত, ভূমিকম্প, প্লাবন, মড়কাদির ফলে, দুঃখতাপ, সর্পাঘাত বা অন্য জীব থেকে প্রাপ্ত জ্বালাযন্ত্রণা তাদের ভোগ করতে হয়।

ভগবান হচ্ছেন 'স্বরাট'; কৃষ্ণ সম্পূর্ণ স্বাধীন; জীব ভগবানের অংশ হওয়ায় তারও স্বতন্ত্রতা রয়েছে; ভগবান হচ্ছেন বিভু, কিন্তু জীব হচ্ছেন অণু তবে স্বতন্ত্রতা সামান্য মাত্র; জীব যখন তার স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার করে, তখন সে কৃষ্ণোন্মুখ হয়; আর যখন সে স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করে, তখন সে কৃষ্ণবর্হির্মুখ হয়।

এই জড় জগতে জীবমাত্রই কৃষ্ণবহির্মুখ হয়ে ভোগ বাঞ্ছা করে; তারা দুর্গাদেবীর পূজা করে; তারা দেবীর কাছে 'ধনং দেহি, রূপং দেহি, যশো দেহি' ইত্যাদি প্রার্থনা করে; এইভাবে জীবকুল জড়জগতে নিক্ষিপ্ত হয়, তখন দুর্গাদেবী যে বর দেন, যেগুলি কিন্তু তার কপট কৃপা।

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥"

অর্থাৎ, ভগবানের দিব্য দুরতিক্রম্য মায়াকে তার শরণাগতর জন্যই অতিক্রম করতে পারে। "আর অন্য কেউ তা পারে না। কলিযুগে হরিনাম ছাড়া এই মায়াকে অতিক্রম করবার আর কোন উপায় নেই। তাই শাস্ত্রে বলা হয়েছে—কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ; আবার বলা হয়েছে—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

—এই শিক্ষাই কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জগৎকে দিয়েছেন। কলিযুগে অন্য কোন পন্থা কার্যকর নয়, কেবল শ্রীহরি নামের শ্রবণ কীর্তন স্মরণেই সর্বসিদ্ধি লাভ হয়। এই হল সর্ব-শাস্ত্রের মত।

অনেক সৌভাগ্যের ফলে শুদ্ধ কৃষ্ণ ভক্ত সঙ্গের ফলে জীবের কৃষ্ণবহির্মুখ ভাব দূর হয়; কৃষ্ণভক্তের সান্নিধ্যে জীব তখন ভগবানের শরণাগত হয়। দুর্গাদেবী তখন তুষ্ট হন।

ভগবানকে দর্শন করার যোগ্যতা

দক্ষযজ্ঞে ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব দেবতাগণ সকলে হোমাগ্নিতে আহুতি প্রদান করে ভক্তিভরে বৈদিক মন্ত্রাদি উচ্চারণের ফলে ভগবান শ্রীবিষ্ণু পরম সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর বিশেষ অষ্টভুজ আদি শ্রীনারায়ণ রূপ নিয়ে সেখানে প্রকট হয়েছিলেন।

ভগবান সেখানে আবির্ভূত হওয়া মাত্রই সমস্ত দিক আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল এবং তার ফলে সেখানে উপস্থিত ব্রহ্মা এবং অন্যান্য সকলেরই জ্যোতি খর্ব হয়েছিল। ভগবান বিষ্ণুকে সমাগত দেখে ব্রহ্মা, শিব এবং সেখানে উপস্থিত সমস্ত দেবতাগণ সকলে তাঁদের সশ্রদ্ধ দণ্ডবৎ প্রণতি নিবেদন করেছিলেন।

শ্রীনারায়ণের দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটায় সকলের প্রভাব ম্লান হয়ে গিয়েছিল এবং সকলেই স্তম্ভিত হয়ে নীরব হয়ে গিয়েছিলেন। সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধায় ভয়ভীত হয়ে, উপস্থিত সকলেই কৃতাঞ্জলিপুটে অবনত মস্তকে অধোক্ষজ পরমেশ্বর ভগবানের স্তব করতে উদ্যত হয়েছিলেন।

শ্রীবিষ্ণুর আদি অষ্টভুজ শ্রীনারায়ণ রূপের সামনে প্রথমে ব্রহ্মা তাঁর স্তুতি নিবেদন করেন। পরে একে একে ঋত্বিকেরা শিব, ভৃগু, ইন্দ্র, ঋত্বিক-পত্নীরা, ঋষিরা, সিদ্ধগণ, দক্ষপত্নী প্রমুখ তাঁদের প্রার্থনা নিবেদন করবার পরে ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন গ্রহলোকের পালকেরাও ভগবানের স্তুতিবন্দনা করেছিলেন। লোকপালেরা বলেছিলেন, হে ভগবান! আমরা কেবল আমাদের প্রত্যক্ষ অনুভূতিকেই বিশ্বাস করি, কিন্তু এই পরিস্থিতিতে আমরা জানি না যে, আমরা জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আপনাকে দর্শন করেছি কি না। আমাদের জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা কেবল এই দৃশ্য জগৎই দর্শন করতে পারি। কিন্তু আপনি পঞ্চভূতের অতীত। আপনি ষষ্ঠ তত্ত্ব। তাই আপনাকে আমরা জড় জগতের সৃষ্টিরূপে দর্শন করছি।

শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ এই বন্দনা-স্তুতির তাৎপর্য ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে 'শ্রীমদ্ভাগবত' গ্রন্থে (স্কন্ধ ৪) লিখেছেন, বিভিন্ন গ্রহলোকের পালকেরা অবশ্যই জড়জাগতিক ঐশ্বর্য-সমন্বিত এবং অত্যন্ত দাম্ভিক। এই প্রকার ব্যক্তিরা ভগবানের চিন্ময় শাশ্বত রূপ উপলব্ধি করতে অক্ষম। ব্রহ্মসংহিতায় বলা হয়েছে যে, যাঁদের চক্ষু ভগবৎ-প্রেমরূপ অঞ্জনের দ্বারা রঞ্জিত হয়েছে, তাঁরাই কেবল তাঁদের কার্যকলাপের প্রতি পদক্ষেপে পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করতে

পারেন। কুন্তীদেবীও তাঁর প্রার্থনায় (শ্রীমদ্ভাগবত, ১/৮/২৬) উল্লেখ করেছেন যে, ভগবান হচ্ছেন 'অকিঞ্চন-গোচরম্', অর্থাৎ যাঁরা ধনমদে মত্ত নন, তাঁরাই ভগবানকে দর্শন করতে পারেন। আর যারা মোহাচ্ছন্ন, তারা পরম তত্ত্বের কথা চিন্তা পর্যন্ত করতে পারে না।

ভগবানকে দর্শন অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের উপলব্ধি হয় প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন, তত্ত্বজ্ঞান উপলব্ধির পরোক্ষ অভিজ্ঞতার পন্থাও অবশ্য আছে—যেমন, আপনারা আমার কাছে বসে ভাগবত প্রবচন শুনছেন। তবে যত্নবান হতে হবে, যেন এই শ্রবণের মধ্যে কলুষতা না থাকে। মহামুনি ব্যাসদেব যেভাবে ভাগবতে তাঁর ভাগবত-উপলব্ধি পরিবেশন করেছেন, তার মধ্যে তাঁর নিষ্কলুষ উপলব্ধি বিধৃত হয়ে রয়েছে। সুতরাং মহামুনি ব্যাসদেবকৃত শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ-শ্রবণ করলে সেই নিষ্কলুষ অভিজ্ঞতার আস্বাদন পেতে পারি।

যে কোনও গূঢ় তত্ত্বের যথার্থ উপলব্ধি করতে হলে দেহ এবং মনের সংযম একান্ত প্রয়োজন। আমরা জানি, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে যখন অর্জুনকে গূঢ় তত্ত্ব প্রদান করেছিলেন, অর্জুনের মতো অসাধারণ ব্যক্তিসম্পন্ন মানুষও তা উপলব্ধি করতে যথেষ্ট সময় নিয়েছিলেন। তাঁরও মানসিক প্রস্তুতির প্রয়োজন হয়েছিল।

এর কারণ এই যে, মন বড়ই চঞ্চল—যেন বানরের মতো অস্থিরভাবে কোনও এক বিষয়ে স্থির হয়ে থাকতে পারে না। সেই চঞ্চল মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। তা ছাড়া জিহ্বা, উদর ইত্যাদি অঙ্গের বেগও নিয়ন্ত্রণ করা চাই।

তবে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের মাধ্যমে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র নিষ্ঠাভরে জপ করলে এবং চারটি বিধিবদ্ধ জীবনধারা মেনে চললে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং ইন্দ্রিয়াদি সংযত রাখা যায়। ঐ সমস্ত জড় ইন্দ্রিয়াদির সংযমের মাধ্যমে চিন্ময় ইন্দ্রিয় ক্ষমতা ক্রমশ বিকশিত হতে থাকে এবং ভক্তিমার্গের চরম লক্ষ্যই হল তাই। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়াদি যেমন চিন্ময়, তেমনি চিন্ময় গুণসম্পন্ন ইন্দ্রিয়াদির মাধ্যমেই তাঁর স্বরূপ যথাযথভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব হয়। মহাবিষ্ণুর নাভিপদ্ম থেকে যখন ব্রহ্মার আবির্ভাব হয়েছিল তখন ব্রহ্মা তাঁর নিজের উৎপত্তির উৎস সন্ধানের কৌতূহলে ভগবানের নাভিপদ্মের পদ্মনাল বেয়ে নিচে নেমে গিয়েও কোনও হদিশ পাননি—এমনই দুর্জ্ঞেয় ভগবানের স্বরূপ, এমনই রহস্যময় তাঁর সৃষ্টিতত্ত্ব।

পঞ্চতত্ত্বের দ্বারা জড় জগতের সমস্ত সৃষ্টি গড়ে উঠলেও জানতে হবে যে, সব কিছুর পিছনে এক অতীন্দ্রিয় চিন্ময় সত্তার সক্রিয়তা থাকে বলেই সেগুলিকে রহস্যময় মনে হয়। একমাত্র কৃষ্ণভাবনাময় ভক্তগণ তাঁদের শুদ্ধ ভক্তির মাধ্যমেই সেই চিন্ময় রূপ উপলব্ধি করতে পারেন। কারণ ভগবদ্ভক্তির অনুশীলনের সাহায্যেই জড় ভাবনায় কলুষিত জীব চিন্ময় স্তরের উপলব্ধি লাভ করতে পারে।

এই জন্যই 'অকিঞ্চন-গোচর' কথাটি এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। ভক্তিভাবাপন্ন ভক্ত যখন দীনহীন, নিরহঙ্কারী এবং নির্মৎসরভাবে আচরণ করতে শেখেন, তখনই তাঁর গোচরীভূত হতে থাকে সমস্ত কিছু যা অজ্ঞেয়, দুর্বোধ্য, অপ্রত্যক্ষ এবং অনির্বচনীয়। ভক্তের আত্মসমর্পিত চিত্ত অনায়াসে পরমেশ্বর ভগবানের অচিন্ত্য সত্তার উপলব্ধির পথে অগ্রসর হতে পারে এবং বাস্তবিকই তাঁর অন্তরে ভগবানের চিন্ময় রূপ দর্শন করা সম্ভব হয়। তাই ভগবৎ সেবোন্মুখ ভক্তই পরমেশ্বর ভগবানের রূপ দর্শন করতে পারেন। ভক্ত তাঁর প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত নয়নেই ভগবানের রূপ দেখতে পান, অন্য কেউ তা পায় না।

সেই জন্যই ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন গ্রহলোকের লোকপালেরা ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করেও শুধুমাত্র তাঁদের শ্রেষ্ঠত্বের অহঙ্কারে ভগবানের রূপ চাক্ষুষ অবলোকন করেও তা বিশ্বাস করতে পারেননি।

এর দ্বারা বোঝা যায়, বাস্তবিকই জড়জাগতিক জীবমাত্রেরই ইন্দ্রিয়গুলির অনুভূতি অত্যন্ত সীমিত, আর সেই জন্যই তা দিয়ে বিশাল রহস্যমণ্ডিত কোনও পারমার্থিক সত্তার উপলব্ধি করা দুঃসাধ্য। তাই লোকপালেরা তাঁদের চোখের সামনে আবির্ভূত শ্রীবিষ্ণুর মহাপ্রভাময় শ্রীনারায়ণরূপ দর্শন করেও নিজেদের উপলব্ধিকেই স্বীকার করতে দ্বিধা বোধ করছিলেন। বাস্তবিকই, জড় ইন্দ্রিয়াদির ক্ষমতা এমনই সীমিত যে, তার সাহায্যে দুর্জ্ঞেয় কোনও বস্তুর দর্শন লাভের সৌভাগ্য হলেও তা অবিশ্বাস্য বলেই মনে হতে পারে।

ভক্ত যখন ভগবৎ-প্রেমের যোগ্যতা অর্জন করে, তখন সেই অবিশ্বাস্য দর্শন-ক্ষমতা জাগরিত হয়, একথা বদ্ধ জীবেরা তথা নাস্তিকেরা হয়ত বিশ্বাস করবেন না। কিন্তু এখানে ভাগবতের দক্ষযজ্ঞ কাহিনীতে লোকপালকদের সামনে শ্রীনারায়ণের চাক্ষুষ আবির্ভাব সত্ত্বেও তাঁদের অবিশ্বাস, দ্বিধা, বিস্ময় ইত্যাদি মিশ্রিত অনুভূতির অভিপ্রকাশ থেকে সেই অনুভূতির বাস্তবতা কিছুটা উপলব্ধি হতে পারে।

ঝারিখণ্ডের পথে মহাপ্রভুর দিব্যলীলা

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাঁর "শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত" গ্রন্থে মধ্যলীলার সপ্তদশ পরিচ্ছেদে ঝারিখণ্ডের বনপথে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভ্রমণ লীলাবিলাসের বর্ণনা করেছেন।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁর 'অমৃতপ্রবাহ' ভাষ্যে সপ্তদশ পরিচ্ছেদে কথাসারে বলেছেন, "সেই বছর জগন্নাথ পুরীতে রথযাত্রা দর্শন করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বৃন্দাবন যেতে মনস্থ করলেন। শ্রীরামানন্দ রায় ও শ্রীস্বরূপ দামোদর, বলদেব ভট্টাচার্য ও তাঁর সঙ্গী এক ব্রাহ্মণ তাঁর সঙ্গে দিলেন। পরের দিন রাত্রি প্রভাত হবার পূর্বেই মহাপ্রভু কটক অভিমুখে যাত্রা করে কটক দক্ষিণে রেখে নির্জন বনপথে চললেন এবং বনপথে বাঘ, হাতি, প্রভৃতি জন্তুকে প্রেমে কৃষ্ণনাম গান করালেন। পথ চলতে চলতে যেখানেই গ্রাম পেতেন, সেখানে ভিক্ষা করে অন্ন ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করে সেবাদি সম্পন্ন করতেন। গ্রাম না থাকলে সঞ্চিত চাল পাক হত এবং বন্য শাকাদি সংগৃহীত হত। বলভদ্র ভট্টাচার্যের সুব্যবহারে মহাপ্রভু অত্যন্ত প্রীত হন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বৃন্দাবন যাওয়ার পথে বাঘ, হাতি, হরিণ ও পাখিদের যেভাবে কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত করে নৃত্য করিয়েছিলেন, সে সম্বন্ধে প্রথমেই নিম্নোক্ত শ্লোকটি শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী, উল্লেখ করেছেন—

গচ্ছন্ বৃন্দাবনং গৌরো ব্যাঘ্রেভৈনখগান্ বনে।
প্রেমোন্মত্তান্ সহোন্নৃত্যান্ বিদধে কৃষ্ণজল্পিনঃ ॥

জনগণ, সাধারণ মানুষকে কৃষ্ণশিক্ষা দেবার জন্যই মহাপ্রভু বৃন্দাবনে যাচ্ছিলেন। ভৌম বৃন্দাবনের অপ্রাকৃতত্ত্ব সম্বন্ধে নাস্তিক তুল্য জনগণের বিশ্বাস নেই। প্রকৃতপক্ষে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত মাত্রই বৃন্দাবনবাসী। গদাধর প্রভু একবার মহাপ্রভুকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, 'তুমি যেখানেই থাক, সেই স্থানটি বৃন্দাবন, যেখানে গঙ্গা, যমুনাদি সবতীর্থস্থানগুলি উপস্থিত।

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে ঝারিখণ্ডের বনের পথে মহাপ্রভুর গমনের বিবরণ দেওয়া আছে, এইভাবে—

'নির্জন-বনে চলে প্রভু কৃষ্ণনাম লৈঞা।
হস্তীব্যাঘ্র পথ ছাড়ে প্রভুরে দেখিয়া ॥
পালে-পালে ব্যাঘ্র, হস্তী, গণ্ডার, শূকরগণ।
তার মধ্যে আবেশে প্রভু করিলা গমন ॥'

এইসব দেখে বলভদ্র ভট্টাচার্যের মহাভয় হল; কিন্তু মহাপ্রভুর প্রভাবে এই সব হিংস্র জানোয়ার সব একপাশে সরে গেল। একদিন পথের পাশে এক বাঘ শুয়েছিল, ভগবৎ-প্রেমে আবিষ্ট মহাপ্রভুর পা-টি তার গায়ে লাগে; কিন্তু তার ফলে কি হল তা চৈতন্যচরিতকার বলছেন—

প্রভু কহে—কহ 'কৃষ্ণ', ব্যাঘ্র উঠিল।
'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' কহি ব্যাঘ্র নাচিতে লাগিল ॥

তারপর মহাপ্রভু একদিন যখন নদীতে স্নান করছিলেন, সেই সময় সেখানে একদল মত্ত হাতি আসে জলপান করতে। মহাপ্রভু জল ছুঁড়ে মারলেন হাতিগুলিকে; মহাপ্রভু হাতিদের কৃষ্ণনাম করতে বললেন। যাদের গায়ে মহাপ্রভুর ছেটানো জল লেগেছিল, তৎক্ষণাৎ সেই হাতিগুলি প্রেমাবেশে নৃত্য ও গান করতে লাগল। কোন হাতি ভূমিতে গড়াগড়ি খেতে লাগল, কোন হাতি বা পরমানন্দে চিৎকার করতে শুরু করল। এই দেখে বলভদ্র ভট্টাচার্য চমৎকৃত হলেন।

তারপর পথে যেতে যেতে মহাপ্রভু উচ্চস্বরে হরিনাম সংকীর্তন করতে লাগলেন; আর মহাপ্রভুর মধুর কণ্ঠস্বরে হরিণ-হরিণীরা আকৃষ্ট হয়ে মহাপ্রভুর কাছে ছুটে এল। এই সময়ে পাঁচ-সাতটি বাঘ বন থেকে এসে হরিণীদের সঙ্গে একত্রে মহাপ্রভুকে অনুসরণ করে চলতে লাগল। এই সব দেখে মহাপ্রভুর বৃন্দাবনের কথা স্মরণ হল। তিনি শ্রীমদ্ভাগবত থেকে এই প্রসঙ্গে যে শ্লোক উচ্চারণ করেছিলেন তা হল কৃষ্ণসঙ্গের জন্য আকুল ব্রজগোপীদেরই গান; শরৎকালে শ্রীকৃষ্ণ বনভ্রমণ করতে করতে মুরলী বাদন করতেন তখন কৃষ্ণসঙ্গ কামনায় ব্রজগোপিকারা এই গান গাইত। এই মূঢ় হরিণীরা ধন্য; কারণ তারা বিচিত্র বেশধারী নন্দনন্দনকে পেয়ে ও তাঁর বংশীধ্বনি শুনে কৃষ্ণসারদের প্রণয়দৃষ্টির মাধ্যমে পূজা করেছিল।

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে পরবর্তী ঘটনা এইভাবে বর্ণনা করা হয়েছে—

"কৃষ্ণ, 'কৃষ্ণ' কহ করি প্রভু যবে বলিল।
'কৃষ্ণ' কহি ব্যাঘ্র-মৃগ নাচিতে লাগিল ॥
নাচে কুন্দে ব্যাঘ্রগণ-মৃগীগণ সঙ্গে।
ব্যাঘ্র-মৃগ অন্যোন্যে করে আলিঙ্গন।
মুখে মুখ দিয়া করে অন্যোন্যে চুম্বন ॥

পশুকুলের এই সব মজার ব্যাপার দেখে মহাপ্রভু হাসতে হাসতে তাদের আগে চলে গেলেন। ময়ূরেরাও 'কৃষ্ণ', 'কৃষ্ণ' বলে উন্মত্তের মতো নাচতে নাচতে মহাপ্রভুর সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে চলল।

এরপর মহাপ্রভু উচ্চস্বরে 'হরিবোল', 'হরিবোল' বলতে থাকলে, সেই 'হরিবোল' ধ্বনি শুনে কাছাকাছি বৃক্ষলতারাও প্রফুল্লিত হয়ে উঠেছিল। এই প্রসঙ্গে হরিদাস ঠাকুরের মন্তব্য স্মরণীয়। তিনি ছিলেন নামাচার্য। তিনি বলেছিলেন উচ্চৈস্বরে মহামন্ত্র—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

কীর্তনের ফলে মনুষ্যেতর জীব—বৃক্ষ-লতা, কীট-পতঙ্গ সকলেই উদ্ধার লাভ করবে। তাই উচ্চৈস্বরে মহামন্ত্র কীর্তনীয়, তা হলে সকলেরই মঙ্গল হবে।

পথে মহাপ্রভুর মুখারবিন্দের কৃষ্ণনাম শুনে কিভাবে স্থাবর-জঙ্গম ভগবদ্ভক্তি লাভ করেছিল, তার সুন্দর বর্ণনা করেছেন চৈতন্যচরিতকার—

ঝারিখণ্ডে স্থাবর-জঙ্গম আছে যত।
কৃষ্ণনাম দিয়া কৈল প্রেমেতে উন্মত্ত ॥
যেই গ্রাম দিয়ে যান, যাহাঁ করেন স্থিতি।
সে-সব গ্রামের লোকের হয় 'প্রেমভক্তি' ॥
কেহ যদি তাঁর মুখে শুনে কৃষ্ণনাম।
তাঁর মুখে আন শুনে, তাঁর মুখে আন ॥
সবে 'কৃষ্ণ' 'হরি' বলি নাচে, কান্দে, হাসে।
পরম্পরায় 'বৈষ্ণব' হইল সর্বদেশে ॥

শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত জড় অভিলাষশূন্য হয়ে নিরপরাধে কৃষ্ণনাম করেন; তা শুনে অন্যে বৈষ্ণব হন; তাঁর মুখে কৃষ্ণ নাম শুনে আবার অন্য একজন বৈষ্ণব হন। এইভাবে বহু লোক বৈষ্ণব হন। বস্তুত এখানে 'কৃষ্ণ' নামের অপ্রাকৃত শক্তির বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সম্পূর্ণ বহির্মুখ ব্যক্তিদের তিনি এই পথে উদ্ধার করলেন।

ঝারিখণ্ডের জনগণ সুসভ্য ছিল না, তাদের প্রায় অসভ্য বলা চলে; তাদেরও মহাবদান্যবতার পরমেশ্বর ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু 'কৃষ্ণ' নাম দিয়ে উদ্ধার করলেন। এখানে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী আফ্রিকার নিগ্রোদের মতো শূদ্রাধম ভীলদের কথা বলেছেন।

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে (মধ্যলীলা ১৭/৫) উল্লেখ আছে—

নাম-প্রেম দিয়া কৈল সবারে নিস্তার।
চৈতন্যের গূঢ়লীলা বুঝিতে শক্তি কার ॥

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য অষ্টোত্তরশত শ্রীশ্রীমৎ অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ স্বয়ং আফ্রিকায় গিয়ে অসভ্য লোকেদের বৈষ্ণবে পরিণত করেও সদৈন্যে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর গুণ কীর্তন করে এই শ্লোকের তাৎপর্যে লিখেছেন—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর করুণার প্রমাণস্বরূপ আমরা দেখতে পাই যে, আফ্রিকার মানুষরা কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করে অন্যান্য বৈষ্ণবদের মতো কীর্তন করছেন, নৃত্য করছেন এবং কৃষ্ণপ্রসাদ গ্রহণ করছেন। আর তা সম্ভব হয়েছে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শক্তির প্রভাবে। সারা পৃথিবীময় তাঁর শক্তি কিভাবে ক্রিয়া করছে তা কে বুঝতে পারে?

আজ সারা বিশ্বের জনগণ 'হরেকৃষ্ণ' মহামন্ত্র শ্রবণ ও কীর্তন করছেন। এইভাবে জনগণ কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণবে পরিণত হচ্ছেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এখনও সকলের কাছে প্রকট নন, কিন্তু আজ সকলেই—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ।
শ্রীঅদ্বৈতগদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ ॥

কীর্তন করে মহাপ্রভুর সঙ্গ লাভ করতে পারেন। আবার কেউ কেউ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থ শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তের পরম্পরা ধারা থেকে যদি শ্রবণ করেন তাহলে তিনিও একদিন শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তে পরিণত হবেন।

প্রতিদিন নির্ঝরের উষ্ণ জলে মহাপ্রভু তিনবার স্নান করতেন আর সন্ধ্যার সময় কাঠ জ্বালিয়ে আগুন পোহাতেন। বলভট্ট দাস পরমানন্দে মহাপ্রভুর সেবা করতেন; মহাপ্রভু তাঁর সেবায় তুষ্ট হয়েছিলেন; এ সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে সুন্দর বর্ণনা আছে—

ভট্টাচার্য পাক করে বন্য ব্যঞ্জন।
বন্য ব্যঞ্জনে প্রভুর আনন্দিত মন ॥

বলভদ্রের সেবায় মহাপ্রভু যে তাকে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিলেন তা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে এভাবে উল্লেখ আছে—

ভট্টাচার্যে আলিঙ্গিয়া তাঁহারে কহিল।
'তোমার প্রসাদে এত সুখ পাইল' ॥

তখন বলভদ্র পরম দৈন্যোক্তি করে মহাপ্রভুর বন্দনা করেছিলেন এইভাবে—

তুমি 'কৃষ্ণ' তুমি 'দয়াময়'।
অধম জীব মুঞি, মোরে হইলা সদয় ॥

মুঞি ছার, মোরে তুমি সঙ্গে লঞা আইলা ।
কৃপা করি মোর হাতে 'প্রভু' ভিক্ষা কৈলা ॥
অধম-কাকেরে কৈলা গরুড় সমান ।
'স্বতন্ত্র ঈশ্বর' তুমি—স্বয়ং ভগবান ॥

এইভাবে বৃন্দাবন পথে যেতে যেতে পাহাড় দেখলে মহাপ্রভু সেটিকে 'গোবর্ধন' বলে মনে করতেন, আবার কোন নদী দেখলে সেটি 'কালিন্দী' বলে তাঁর ভ্রম হত ।

মহাপ্রভু কখনো কখনো কোন গ্রামে উপস্থিত হলে, স্থানীয় ব্রাহ্মণরা তাঁকে নিমন্ত্রণ করতেন । আবার কেউ বলভদ্রের কাছে অন্ন নিয়ে আসতেন । অন্যরা দুধ, ঘি ও মিছরি নিয়ে আসতেন । গ্রামে ব্রাহ্মণ না থাকলে, অব্রাহ্মণ পরিবারের ভক্ত এসে বলভদ্রের কাছে নিমন্ত্রণ করে যেতেন । এ বিষয়ে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ বলেছেন—ভগবদ্ভক্ত অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন না । কিন্তু শূদ্র কুলোদ্ভূত ব্যক্তি বৈষ্ণব হলে, তার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন । মহাপ্রভু শূদ্র মহাজনের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলেন, এ থেকে জানা যাচ্ছে যে, বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তির ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্তি হয় ।

ভগবান হলেও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এখানে মহাভাগবতের লীলাবিলাস করেছিলেন । মহাভাগবতের দৃষ্টিভঙ্গী এইভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবদ্গীতায় (৫/১৮) প্রকাশ করেছেন—

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি ।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥

তত্ত্ববিদ মহাভাগবত ব্রাহ্মণ, গাভী, কুকুর ও চণ্ডালের প্রতি সমদৃষ্টিসম্পন্ন হন অর্থাৎ মহাভাগবতের লক্ষণ হচ্ছে তিনি শত্রু-মিত্রে ভেদ দেখেন না । তিনি চিৎতত্ত্ব অনুভূতির উন্নত শিখরে অবস্থিত হওয়ায় বাঘ, হাতি, ও পণ্ডিতের মধ্যে কোন ভেদ দেখেন না; তিনি সর্বক্ষণ ভগবদ্ সেবায় নিযুক্ত, ঈর্ষাদ্বেষশূন্য ও নির্ভীক ।

মহাপ্রভুকে আমরা অনুকরণ করতে পারি না । তাঁর নির্দেশ পালনই আমাদের কর্তব্য । তিনি কৃষ্ণ অন্বেষণ করতে গিয়ে ভগবদ্ প্রেমে গভীরভাবে আবিষ্ট হয়ে পড়েছিলেন । তখন ঝারিখণ্ডের বন তাঁর কাছে বৃন্দাবন বলে মনে হয়েছিল । মহাভাগবতের হৃদয় সমস্ত জড় কলুষতামুক্ত হওয়ায় তিনি বনের হিংস্র জানোয়ারদের কাছেও প্রিয় হয়ে ওঠেন । ঐ স্তরে অবস্থিত ভক্ত হিংস্র পশুদেরও বন্ধুর মতো ব্যবহার করেন ।

ভগবান বলেছেন, 'তিনি সকলের অন্তর্যামী এবং সকল জীবকে তিনি নির্দেশ দেন, পরিচালনা করেন । এইভাবে তিনি তাঁর উন্নত ভক্তকে উৎপীড়ন না করতে বন্য পশুদেরকেও নির্দেশ দেন ।

শুদ্ধভক্তের দৃষ্টিতে নবদ্বীপ দর্শনের যোগ্যতা

প্রতি বছর গৌর-পূর্ণিমায় বৈষ্ণবরা নবদ্বীপ ধাম পরিক্রমা করেন । সবচেয়ে উদারভাবে ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সকল জীবকে ভগবৎ-প্রেম লাভের পথ দেখিয়েছেন । শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গান গেয়েছেন—

গৌর আমার যে সব স্থানে
করল ভ্রমণ রঙ্গে ।
সে সব স্থান হেরিব আমি
প্রণয়ী ভকত সঙ্গে ॥

প্রকৃত ভগবদনুশীলনকারী হচ্ছেন অকিঞ্চন, ভগবান ছাড়া তাঁর কেউ নেই, ভগবানই তাঁর একমাত্র সম্পদ । তিনি ভগবানের দিব্য নাম, রূপ, গুণ, লীলা, পরিকর আদি চিন্তা করেন । তাঁর জীবন ভগবৎ-সেবায় উৎসর্গীকৃত, তিনি সব সময় ভগবদ্ভক্ত সঙ্গ করেন । তিনি ভগবৎ-কথা আলোচনা করেন ভগবদ্ভক্তদের সঙ্গে, এইভাবে তাঁরা চিন্ময় আনন্দ লাভ করেন । ভগবান জগতে অবতরণ করে যে সব স্থানে সপার্ষদ লীলা বিলাস করেছিলেন, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আমাদের সেই সব স্থান স্বজাতীয় স্নিগ্ধ ভক্ত সঙ্গে দর্শন করতে অনুপ্রাণিত করেছেন ।

ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলাবিলাস ভূমি এই নবদ্বীপ ধাম, শুদ্ধ ভক্তদের সঙ্গে এই ধাম পরিক্রমা করা ভগবৎ-প্রেম প্রার্থী মাত্রই অবশ্য কর্তব্য । নিগম শাস্ত্রে নবদ্বীপকে ব্রহ্মপুর বলে বর্ণনা করা হয়েছে, পুরাণে শ্বেতদ্বীপ বলা হয়েছে, রসিক পণ্ডিতরা এই চিদানন্দময় নবদ্বীপকে ব্রজধাম থেকে অভিন্ন বলে বর্ণনা করেছেন । কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী

প্রভুপাদ তাঁর প্রণীত শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের ভাষ্যে এক জায়গায় লিখেছেন, বহু ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে এই ব্রহ্মাণ্ড শ্রেষ্ঠ, এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে পৃথিবী শ্রেষ্ঠ, এই পৃথিবীর মধ্যে পুণ্য ভারত ভূমি শ্রেষ্ঠ, ভারত ভূমিতে বহু তীর্থ স্থান আছে। বৈদিক শাস্ত্রে মোক্ষদা সপ্ত পুরীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে: অযোধ্যা, মথুরা, মায়া, কাশী, কাঞ্চী, অবন্তী, দ্বারকা—সব তীর্থই এই নবদ্বীপে অবস্থান করছে। কিন্তু তাদের মধ্যে এই গৌরমণ্ডল তথা নবদ্বীপ-ধাম শ্রেষ্ঠ কেননা এখানে ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আর্বিভূত হয়েছেন এবং ব্রহ্মারও দুর্লভ ভগবৎ-প্রেম সকলকে দান করেছেন।

নবদ্বীপের ন'টি দ্বীপের মধ্যস্থলে অন্তর্দ্বীপ বিরাজমান আটটি দ্বীপ যেন পদ্মের আটটি পাপঁড়ির মত। অন্ত, সীমন্ত, গোদ্রুম, মধ্য, কোল, ঋতু, জহ্নু, মোদদ্রুম ও রুদ্র—এই ন'টি, নবধা ভক্তির পীঠস্থান। এই নবধা ভক্তি হচ্ছে—শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, অর্চন, বন্দন, পাদসেবন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন। আর এদের মধ্য অন্তর্দ্বীপ আত্মনিবেদনক্ষেত্র, সীমন্ত দ্বীপ শ্রবণক্ষেত্র, গোদ্রুম দ্বীপ কীর্তনক্ষেত্র, মধ্যদ্বীপ স্মরণক্ষেত্র, কোলদ্বীপ পাদসেবনক্ষেত্র, ঋতু, জহ্নু, মোদদ্রুম ও রুদ্র যথাক্রমে অর্চন, বন্দন, দাস্য ও সখ্য ভক্ত্যঙ্গ পীঠ। এইসব স্থান পরম পবিত্র, অন্তরঙ্গ পার্ষদদের নিয়ে ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এখানে লীলা বিলাস করেছেন, তাই এই স্থানের মহিমা যথাযথ ভাবে বর্ণনা করা প্রায় কারো পক্ষে সম্ভব নয়।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর 'নবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গ'-এ লিখেছেন—

সর্বধাম শিরোমণি সন্ধিনী-বিলাস।
ষোল ক্রোশ নবদ্বীপ চিদানন্দ বাস॥
সর্বতীর্থ-দেব-ঋষি-শ্রুতির বিশ্রাম।
স্ফুরুক্ নয়নে মম নবদ্বীপ ধাম॥

নবদ্বীপ ধামে সকল তীর্থ রয়েছে; কলিযুগের এই সর্বশ্রেষ্ঠ ভগবদ্ধাম শুদ্ধ ভগবদ্ভজনকারীর কাছে প্রকাশিত হয়। সাধারণ লোকের কাছে এই স্থান জড় জগতের একটি অংশ বলে মনে হতে পারে কিন্তু শুদ্ধ ভক্ত এই ষোলক্রোশ নবদ্বীপধামকে চিদানন্দময় অনুভব করেন।

আজ থেকে প্রায় ৫০০ বছর আগে শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুকে এই নবদ্বীপধাম দর্শন করান ও তাঁর মাহাত্ম্য ব্যাখ্যা করেন।

পরবর্তীকালে বিশেষভাবে গৌড়ীয় গগণের পরমহংস-কূলচূড়ামণি, ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর শিষ্যবর্গ

সহ এই নবদ্বীপ ধাম পরিক্রমা করেন ও নবদ্বীপ ধাম মাহাত্ম্য বিশ্লেষণ করে গৌরভক্তদের অসীম আনন্দ দান করতেন। আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের পক্ষ থেকে বিশেষভাবে কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের স্নেহধন্য শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামীর পরিচালনায় অনেক বছর থেকেই সারা বিশ্বের শত শত ভগবদ্ভক্তরা এই ধাম পরিক্রমা করছেন ও গৌরলীলামৃত আস্বাদন করছেন।

যোগ্যতা অর্জন করলেই, এই চিন্ময় ধাম জীবকুলের হৃদয়ে স্ফুরিত হয়। কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তের কৃপা ও সাধুসঙ্গের দ্বারা শ্রদ্ধা লাভ হলে জড় মায়ার জাল মুক্ত হয়ে জীব যখন তার জড় ইন্দ্রিয়ের দর্শনে যে স্থান চিন্ময় তা বুঝতে পারতো না, তখন সেই স্থানই জড়াতীত, অপ্রাকৃত বলে উপলব্ধি করে। তখন কৃষ্ণ ও শুদ্ধ ভক্তের কৃপায় জীব ভগবদ্ধামে শোভা দর্শন করতে পারে।

প্রকৃতপক্ষে ভগবানের ধামকে জড়া-প্রকৃতি স্পর্শ করতে পারে না। যারা বিষয়ী তারা ভগবানের চিন্ময় ধামকে দর্শন করতে সমর্থ হয় না, আমিষ আহারে আসক্ত, স্ত্রীসঙ্গ লোলুপ, মাদক দ্রব্য সেবনকারী ও জুয়াদি খেলায় আসক্ত ব্যক্তিদের জানা উচিত যে তাদের কাছে অপ্রাকৃত ধাম প্রকাশিত হয় না। জড় জগতের টাকা-পয়সা দিয়ে যানবাহনে করে ভগবদ্ধামে যাওয়া যায় না, যারা 'রথ দেখা ও কলা বেচা'র নীতি গ্রহণ করে এই রকম বিষয় ভোগপর মনোভাব নিয়ে ভগবানের ধামে যারা যান, তারা ঠিক ধামে তো যান না পক্ষান্তরে নরকে যাবার পথ প্রশস্ত করেন—ধামে গিয়ে ঐসব ভোগ করে নিরয়গমনের পথযাত্রী হন।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এই সম্বন্ধে লিখেছেন—

বহির্মুখ-জন মায়ামুগ্ধ আঁখিদ্বয়ে।
কভু নাহি দেখে সেই উপবন-চয়ে॥

তিনি ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা করেছেন, তিনি যেন শ্রীমায়াপুরের দক্ষিণে জাহ্নবী ও সরস্বতীর সঙ্গম স্থলের 'ঈশোদ্যান' নামক উপবনে শ্রীগৌরাঙ্গের ভজন করতে পারেন। মহাপ্রভু তাঁর ভক্তদের নিয়ে মধ্যাহ্নে এখানে লীলাবিলাস করতেন, এখানে যে সকল বৃক্ষ, লতা রয়েছে, তা এক নিবিড় বন সৃষ্টি করেছে, এখানে সরোবর ও মন্দির শোভা অপূর্ব। নানা রকম পাখিরা এখানে এসে গৌরাঙ্গ গুণ-কীর্তন করে।

কি রকম মনোভাব নিয়ে ধাম দর্শনে যাওয়া উচিত তা আজ থেকে ৫০০০ হাজার বছর আগে শুদ্ধ কৃষ্ণভক্ত অক্রুর বৃন্দাবন গমন লীলা থেকে আমরা

জানতে পারি। কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামীর মতে কৃষ্ণভক্ত অক্রূরের এই বৃন্দাবন লীলা যেমন শিক্ষাপ্রদ তেমনি এই পন্থা আমাদের অনুসরণীয়ও। যিনি ধাম দর্শন করতে চান, যিনি গৌরাঙ্গ দর্শনে ইচ্ছুক, তাকে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে, সব সময় ভগবানের অপ্রাকৃত লীলাবিলাস স্মরণ করতে হবে। শাস্ত্রে আছে—সর্বোপাধি বিনির্মুক্তং—অর্থাৎ জড় জগতের যত কিছু মানমর্যাদাপূর্ণ পরিচয় রয়েছে, সে সব মিথ্যা অহংকার সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করা উচিত, নিজেকে 'তৃণাদপি সুনীচেন' মনোভাব গ্রহণ করতে হবে, কেননা ভগবান বিশেষভাবে মহাপ্রভু দীনহীন, পতিতকে সহজেই কৃপা করেন, পাণ্ডিত্য, কৌলিন্য ও ধনদৌলতের সংস্পর্শের মানুষ মত্ত ও অভিমানী হয়ে পড়ে, তার ফলে ভগবান, ভগবানের ধাম, তাঁর রূপ, গুণ, লীলা ও এইসব দিব্য, অপ্রাকৃত তত্ত্বের মাহাত্ম্য তার কাছে প্রকাশিত হয় না।

ভগবান ও ভগবানের ধাম, তাঁর রূপ, গুণ, লীলা পরিকর আদি এক জাতীয় তত্ত্ব। ভগবান ও তাঁর ধামের রজ, নদী, পশু, পাখী, বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, তৃণ—সবই এক জাতীয় তত্ত্ব। শ্রীল প্রভুপাদকে তাঁর এক শিষ্য এক প্রশ্ন করেছিল—ধামের রজ বা দিব্য ধূলিকণা সম্বন্ধে—ধামের ধূলিকণা, এরাও কি এক একজন স্বতন্ত্র চেতন সত্ত্বা? শ্রীল প্রভুপাদ উত্তরে বলেছিলেন—ইচ্ছা করলে বৃন্দাবনের একটি ধূলিকণা কৃপা পরবশ হয়ে জীবের ইচ্ছা পূর্ণ করতে পারে। বৃন্দাবনে ষড় গোস্বামীরা যখন ভজন করতেন তখন এক এক রাত এক এক বৃক্ষের নিচে তাঁরা বাস করতেন। ধামের বৃক্ষ জীবের ইচ্ছা পূর্ণ করে—তারা কল্পবৃক্ষ—গোস্বামীরা ভজন প্রভাবে অনুভব করতেন।

গৌরপার্ষদ ও বৈষ্ণব জগতে সকলের পরম প্রিয় নরোত্তম দাস ঠাকুর আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন কিভাবে আমরা মনকে শুদ্ধ করে, পবিত্র করে, পরম পবিত্র ভগবানের ধামকে দর্শন করতে পারব। গৌর ও গৌর-পার্ষদ বিরহে তিনি যে মনোভাব প্রকাশ করেছিলেন, তা অমৃতোপম দিব্য গীতিমালা রূপে ভক্তরা সাদরে গ্রহণ করেন, আস্বাদন করেন ও দান করেন—

'বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন।
কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন॥'

জড় জাগতিক রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ ও স্পর্শ সুখ—এইগুলি হচ্ছে বিষয় ইন্দ্রিয় ভোগ্য দ্রব্য, এসব ভোগ বাসনা মনে মনে পোষণ করাও ত্যাগ করতে হবে, কিন্তু এক মুহূর্তের জন্য আমরা মনকে নিষ্ক্রিয় রাখতে পারি না, মন অত্যন্ত চঞ্চল। আমরা যেন শুদ্ধচিত্তে কৃষ্ণের প্রিয় ধামের সেবা করতে পারি।

তারপর 'সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ'—অর্থাৎ, কৃষ্ণসেবান্মুখ হলে, তখন তিনি তুষ্ট হয়ে আমাদের নিকট আত্মপ্রকাশ করবেন। যেমন চোখ থাকলেই সব সময় সবকিছু দেখা যায় না, অন্ধকারে আমরা চোখ দিয়ে কিছু দেখতে পারি না, সেই রকম বিষয়ভোগে অন্ধ আমরা ভগবদ্ধামের মাহাত্ম্য অনুভব করতে পারি না; কিন্তু ভগবানের চিন্ময় ধাম দেখা যায়—তাঁর সেবা,—প্রীতি-ভাবময়ী সেবার আলোকে। ঠিক যেমন সূর্য যখন উদিত হবে—সূর্যের আলোকেই সূর্যকে দেখা যায়, ভগবানও তেমন আমাদের সেবায় খুশি হয়ে দর্শন দান করেন। সেই ভাগ্যবান, সেই দেখতে পারে—ভগবান অনিত্য, তাঁর ধামে অপ্রাকৃত লীলাবিলাস করে চলেছেন। তাই শ্রেষ্ঠ গৌরভক্তরা গান করেছেন—

অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গৌররায়।
কোন কোন ভাগ্যবান দেখিবারে পায়॥

বৃন্দাবন দর্শন আর গৌরধাম দর্শনের বিষয়ে কিছু জানা দরকার। বৃন্দাবনে অপরাধের অনেক ফল ভোগ করতে হয়, কিন্তু গৌর অনেক উদার, গৌর ধামে অপরাধের তত গুরুত্ব নেই। সব অবতারের শিরোমণি হচ্ছেন গৌর ও নিতাই, তাই বৈষ্ণব আচার্যরা প্রথমে গৌর নিতাই এর ভজনা করতে বলেছেন। জড় ভোগ বাসনা ত্যাগ করে গৌর ভজনে সম্পূর্ণ নিমগ্ন হয়ে সব সময় গৌরকীর্তনে আমাদের নিমগ্ন হতে হবে। গৌরভক্ত সঙ্গে গৌরভজন শুধু চিন্ময় আনন্দই লাভ হয়, আমরা শ্রেষ্ঠ গৌরভক্তদের কাছে উপদেশ পাই—

নাচ গাও ভক্ত সঙ্গে কর সংকীর্তন।
বড়ই মধুর মহাপ্রভুর বচন॥

এই কলিযুগে মানুষ মাত্রই ভগবদ্ভজনে বিশেষ আগ্রহী নয়, প্রত্যেকের নিজ নিজ মতবাদ রয়েছে, এই মতবাদ নিয়ে তারা সর্বদাই কলহ পরায়ণ, তাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন নয়, তারা সব সময় নানা দৈব-দুর্বিপাকে বিপন্ন। কিন্তু নিতাই ও চৈতন্যর কৃপা ভিক্ষা করলে আমরা সহজেই কলির প্রভাব মুক্ত হতে পারি, দুরতিক্রম্য সংসার বন্ধন থেকে উদ্ধার লাভ করতে পারি—তাদের ভজনা করে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুনিত্যানন্দ।
শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ॥

এই পঞ্চতত্ত্ব-মহামন্ত্র কীর্তন করে, তারপর আমরা হরিনাম মহামন্ত্র কীর্তন করতে পারি—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

এই মহামন্ত্র কীর্তন করে, হরি ভজনের পথে অপরাধ রয়েছে অনেক, সে সব অপরাধ সকলের পক্ষে অচিরেই ত্যাগ করে শুদ্ধ হরিভজন করা কঠিন। কিন্তু নিতাই-চৈতন্য পরম দয়ালু। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন মহাবদান্য, অপরাধী, পতিত, পাপী সকলকে কৃপা করেন, উদ্ধার করেন, আবার গৌর নিতাই-এর চেয়ে তাঁদের ভক্ত আরো কৃপাময়। তাই শুদ্ধ গৌরভক্তের আনুগত্যে আমাদের ভগবদ্ভজন করা উচিত। তখন আমরা ভগবদ্ধাম দর্শন করবার যোগ্যতা অর্জন করব।

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তারকেশ্বর-এ একরাত্রে স্বপ্নে ভগবানের আদেশ পান,—বৃন্দাবনে যাওয়ার দরকার নেই, নদীয়ার নবদ্বীপে তাঁর আবির্ভাব ও লীলার স্থান পুনরুদ্ধার ও তার মাহাত্ম্য প্রচারের মাধ্যমে ভগবৎ সেবা করবার ভগবৎ আদেশ তিনি পান। তাঁর এই গৌর সেবা অতুলনীয়, তিনি যে ভগবদ্ভক্তির মন্দাকিনী ধারা প্রবাহিত করেন, তা ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদ ষড় গোস্বামীদের ভগবৎ-সেবার পর্যায়ভুক্ত বলা চলে। তার এই প্রদর্শিত পথ ও উপদেশ ভগবদনুশীলনকারীর কাছে অমূল্যসম্পদ। ভগবৎ অনুশীলনকারীর মাত্রই তা অনুসরণীয়।

শ্রীমায়াপুরে গৌরপূর্ণিমা মহোৎসব

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীশ্রীমৎ অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী শ্রীল প্রভুপাদ অনেক আশা করে ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পূত আবির্ভাবস্থল শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীমায়াপুর চন্দ্রোদয় মন্দির স্থাপন করেছিলেন। তাঁর আশা ছিল সারা বিশ্বের সকল দেশ থেকে ভক্তরা এখানে এসে মিলিত হবে, তারা ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গের জয়গান করবে। তাই মঙ্গল, শুভ এবং পবিত্র সময় ভগবানকে আরাধনা করবার ব্রহ্মমুহূর্তে শঙ্খ ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে শত শত ভক্তরা মায়াপুর চন্দ্রোদয় মন্দিরে সমবেত হয়েছে। শ্রীবিগ্রহ—শ্রীশ্রীরাধামাধব দর্শন লাভ করে সকল দেশের ভক্তরা মধুর সুরে নৃত্য-গীতে ভরে তুলছিল মন্দিরকে। মহাপ্রভুর জয়গান করে তারা গাইছিল—

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥

আবার কখনও বা তারা গাইছিল—

জয় শচীনন্দন গৌরহরি।
গৌর হরি জয় গৌর হরি ॥

কেউ কেউ গাইছিল—

নিতাই গৌরাঙ্গ, নিতাই গৌরাঙ্গ। যারা গান গাইছিল তারা এসেছিল পৃথিবীর দূর দূরান্ত থেকে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে, বিভিন্ন ধর্মে বিশ্বাসী সকলেই আজ এখানে শ্রীগৌরসুন্দরের নাম ধর্মের জয় গান করছেন—শুদ্ধভক্ত শ্রীল প্রভুপাদের আহ্বানে। এই কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শুদ্ধভক্ত শ্রীল প্রভুপাদ এমন একটি গৃহ তৈরি করেছেন যেখানে বিশ্বের সকল জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলে সুখ-শান্তিতে বসবাস করতে পারে। এখানে রাশিয়ান, আমেরিকান, ভারতীয়, পাকিস্থানী, আরব, ইস্রায়িলী, দক্ষিণ কোরিয়া-উত্তর কোরিয়ানদের মধ্যে কোন বিবাদ নেই, 'কীর্তনীয় সদাহরি'—ভগবান 'শ্রীহরি' আমাদের সকল অশুভ হরণ করেন। যা কিছু শুভ তাতে আমাদের জীবন ভরে তোলেন। শ্রীগৌরসুন্দর আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন—ভগবান ও তাঁর নাম অভিন্ন। পৃথিবীর সকল শাস্ত্রে তাঁর অসংখ্য উল্লেখ আছে। সরলচিত্তে সম্বন্ধ জ্ঞানে ও নিরপরাধে সেই নাম কীর্তন করে সকলেই ভগবৎ-সান্নিধ্য লাভ করতে পারে। এটিই হচ্ছে ভগবৎ-দর্শনের পন্থা। এই পন্থা—শ্রীগৌরসুন্দরের দান, এর আগে কেউ এই শিক্ষা দেয়নি—মহাপ্রভুর এই দান তুলনাহীন। তাই শ্রীল রূপ গোস্বামী মহাপ্রভুকে 'নমো মহাবদান্যায়'—বলে তাঁকে প্রণাম জানিয়েছেন। ভগবান আর কখন এত উদারভাবে প্রদর্শন করেননি। সব ধর্মেই বলা হয়েছে—ভগবান সর্বত্রই রয়েছেন—তিনি সর্বত্রই বিরাজমান—তিনি সর্বব্যাপী। তাই বৈদিক শাস্ত্রে তাঁকে বিষ্ণু বলা হয়। সত্যযুগে তাঁকে লাভ করবার পথ সম্বন্ধে শাস্ত্রে বলা হয়েছে 'কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণু'—অর্থাৎ সত্যযুগে হাজার হাজার বছর ধ্যান করবার পর তাঁকে লাভ করা যেত, আর এই কলিযুগের মানুষ সকলেই প্রায় শূদ্র, তারা ভগবদ্বিমুখ, দ্বন্দ্ব কলহে পূর্ণ এই যুগ। এই কলিযুগের ত্রুটি অনেক, তাই শাস্ত্রে বলছে 'কলের্দোষনিধে' অর্থাৎ কলিযুগের দোষ-ত্রুটির পরিমাণকে সমুদ্রের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এত দোষ-ত্রুটি কলিযুগে রয়েছে। তাহলে কি ভগবানকে লাভ করবার কোন উপায় নেই? কোন আশা নেই?—আছে, তারপরে লেখা 'অস্তি' অর্থাৎ আছে। 'এক

মহান্ গুণঃ'—অর্থাৎ কলিযুগের একটি মহান গুণ, সেটি কি? 'কীর্তনাদেব কৃষ্ণস্য'—অর্থাৎ কৃষ্ণ-কীর্তন, কৃষ্ণ কখনও একা নয়, কৃষ্ণ যেখানে সেখানে তাঁর পার্ষদরাও আছেন, অর্থাৎ কৃষ্ণ ও তাঁর প্রিয় সবকিছুর কীর্তন করা চাই, তাহলে কি হবে? কৃষ্ণ-কীর্তন করবার ফল কি? 'মুক্তসঙ্গ পরং ব্রজেৎ', আমরা সংসার মুক্ত হব, আমাদের মায়ার বন্ধন ছুটে যাবে, তখন আমরা ভগবানের নাম কীর্তন ও শ্রবণাদিতে উন্মুখ হব।

ভগবান পরম করুণাময়, তিনি মহাবদান্য শ্রীগৌরসুন্দর রূপে কলিযুগে অবতরণ করেছেন, এইসব পতিত জীবদের উদ্ধারের জন্য। বৈষ্ণব ঠাকুর গান গেয়েছেন—'পতিত-পাবন হেতু তব অবতার' আগে যারা ছিল বেদ-বিরোধী সেই সব খস, আভির, যবন, পুলিন্দ পুক্কশ আদি সবাই এখন হরিকীর্তনে মেতেছে। শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন—জগতের সকল ধর্ম এক হয়ে মহাপ্রভু প্রদর্শিত একটি মাত্র এই 'হরিনাম কীর্তন' ধর্ম জগতে বিরাজ করবে, তা আজ বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে।

ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামীর অক্লান্ত প্রচেষ্টায়, তিনি প্রকৃতপক্ষে সারা বিশ্বকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে মিলিত করেছেন। তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন যথার্থ রাষ্ট্রসংঘ। তবে জড় জগতের রাষ্ট্রসংঘের চেয়ে অনন্ত গুণে শ্রেষ্ঠ এই রাষ্ট্রসংঘ কেননা এটি দিব্য ভাবময়, তিনি জগৎবাসীকে শিক্ষা দিয়েছেন—কৃষ্ণ সকল জীবের পিতা, সকলের নিত্য কালের একমাত্র প্রভু, জীব মাত্রই তাঁর নিত্য দাস। তাঁর সেবা করাই সকলের একমাত্র ধর্ম, কৃষ্ণ সকল আনন্দের উৎস—তিনি চিন্ময় আনন্দের মূর্তবিগ্রহ—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

তার আগে—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ।
শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ ॥

এই কীর্তনের দ্বারা মহাপ্রভুর কৃপা লাভ করে হরিনাম মহামন্ত্র কীর্তন করা তাদের পক্ষে সহজ হচ্ছে, আর শ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় তারা আমিষাহার, অবৈধ সঙ্গ, আসবপান ও জুয়াদি খেলা ত্যাগ করে আজ তারা সদাচারী হয়েছে।

ইটালী, জার্মানী, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, পোলাণ্ড, রাশিয়া, উত্তর আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড, নরওয়ে, সুইডেন, ফিনল্যাণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া, জাপান, মালয়েশিয়া,

চীন, দক্ষিণ আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিল, পেরু, আর কত দেশ থেকে এসেছে গৌর-ভক্তরা। এরা কি করে নিজেদের দেশের আচার ব্যবহার জীবনযাত্রা ছেড়ে দিয়ে এই মহাপ্রভুর প্রদর্শিত পন্থা কৃষ্ণভাবনাময় জীবন গ্রহণ করল? অনেকে এদের দেখে এই সব কথা ভাবে। মেয়েরা কিভাবে বাংলার মেয়েদের মত শাড়ি, শাখা, সিঁদুর ও তার উপর তিলক-মালা নিয়ে সব সময় সুন্দর ভাবে 'হরিনাম' করছে, ছেলেরাও ধুতি-কোর্তা, গৈরিক বেশবাস ও তিলক-মালা সহ সরল জীবন খুব সহজেই গ্রহণ করেছে, সঙ্গে সঙ্গে সব রকম ভারতীয় খাবারেও অভ্যস্ত হল কি করে—হাজার হাজার ভিন্ন দেশের লোক, কেননা পূর্ব জন্মে কেউ কেউ ভগবানের সেবা করেছে বা ভক্তের সেবা করেছে, বা ভক্তি উন্মুখী কোন সেবা হয়তো করেছিল, তাই পতিতপাবন মহাবদান্য মহাপ্রভু তাদের আবার ভগবৎ-সেবা কৃষ্ণভক্তি অনুশীলনের সুযোগ দিয়েছেন।

তারা জগতের বিভিন্ন দেশে জন্মগ্রহণ করে শ্রীগৌরাঙ্গের শুদ্ধ ভক্তের নেতৃত্বে শ্রীল প্রভুপাদের পরিচালনায় আবার ভগবৎ-সেবা করতে এসেছে মহাপ্রভুর আবির্ভাব স্থান শ্রীধাম মায়াপুরে, এই সব বিদেশীরা যারা মহাপ্রভুর শরণাগত হয়েছে, আজ তারা কৃষ্ণসেবার দিব্য আনন্দ অনুভব করছে, তাই আজ রাশিয়ার মত সাম্যবাদীদের দেশেও অন্ততঃ একশটি কৃষ্ণভাবনামৃত কেন্দ্র হয়েছে, সেখানে শহরে শহরে, রাস্তায় রাস্তায় ভক্তরা কৃষ্ণনামে মুখরিত করছে, জনসাধারণের কাছে কৃষ্ণপ্রসাদ বিতরণ করছে, হাজার হাজার লোক শ্রীল প্রভুপাদের লেখা ভগবদ্গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা—এইসব বই শুধু সাগ্রহেই যে তারা গ্রহণ করছে তা নয়, শ্রীল প্রভুপাদের লেখা এইসব কৃষ্ণভাবনাময় গ্রন্থের অবিশ্বাস্য রকম চাহিদা, আর তা দিন দিন বাড়ছে সেখানে ও অন্যান্য পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোতে।

কট্টর ইসলামপন্থী নেতার দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ অধ্যাপক ও তার পত্নী ও তাদের এক বন্ধু মহাপ্রভু প্রদর্শিত পথে হরিনাম প্রচার করছেন। শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থগুলি ঐ দেশের ভাষায় অনুবাদ করে, তারাও তাদের ঘোর বিরোধী ইস্রায়িলী ভক্তদের সঙ্গে একসঙ্গে কৃষ্ণপ্রসাদ পেল, এবং এক সঙ্গে নবদ্বীপ ধাম পরিক্রমা করল এবং একসঙ্গে 'হরিনাম সংকীর্তন' করল। এইটি হচ্ছে দিব্য জাতিসংঘ। শ্রীল প্রভুপাদের পন্থা—কৃষ্ণপ্রসাদ গ্রহণ কর ও হরিনাম কীর্তন কর—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

তাহলে ধীরে ধীরে সকলে কৃষ্ণানুশীলন করতে শুরু করবে, শ্রীল প্রভুপাদ এইভাবে সারা বিশ্বকে মহাপ্রভুর প্রদর্শিত কৃষ্ণভক্তির পথে এনেছেন। ভগবদ্গীতায় এই সব কথা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে শিক্ষা দিয়েছিলেন আজ থেকে ৫০০০ বছর আগে। 'যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্বকিল্বিষৈঃ'—কৃষ্ণপ্রসাদ সেবার ফল বহু বহু জন্মের সব পাপের ফল থেকে অচিরেই একজন মুক্ত হয়, পরম পবিত্র কৃষ্ণপ্রসাদ গ্রহণ করবার ফলে তাদের দেহও পবিত্র হচ্ছে, কৃষ্ণ-কীর্তন করে তাদের মন কৃষ্ণভাবনাময় হচ্ছে, তারা চৈতন্যচন্দ্রের দয়া অনুভব করছে, তাই তারা সকলে আনন্দে মহাপ্রভুর জয়গান করছে। বিগত পাপময় জীবন ত্যাগ করছে, তারা আজ এক নতুন জীবন,—এক দিব্য জীবন লাভ করছে, তাই মহাজন বৈষ্ণবাচার্য গান গেয়েছেন—

চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে, চিত্তে পাবে চমৎকার ॥

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভু ও হরিদাস ঠাকুরকে এইভাবে হরিনাম প্রচার করবার পদ্ধতি বলেছিলেন—

শোন শোন নিত্যানন্দ শোন হরিদাস।
সর্বত্র আমার আজ্ঞা করহ প্রকাশ ॥
প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ কর কৃষ্ণ-শিক্ষা ॥

ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপা লাভ করতে হলে, তাঁর আনুগত্য স্বীকার করা একান্ত কর্তব্য, তাঁর উপদেশ মতো তাঁর অভিন্ন প্রকাশ শ্রীনিত্যানন্দের আনুগত্য অর্থাৎ বর্তমানে তাঁর প্রতিনিধি সদ্গুরুর আনুগত্যে রূপানুগ ধারায় কৃষ্ণানুশীলন করা উচিত। ষড় গোস্বামীরা সেই শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছিলেন—

যারে দেখ, তারে কহ 'কৃষ্ণ'-উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ ॥

তাই আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের ভক্তরা নিজেরা কৃষ্ণপ্রাপ্তির জন্যই শুধু কৃষ্ণ অনুশীলন করেন না, পক্ষান্তরে অন্য সকলে যেন কৃষ্ণোন্মুখ হয়,—অন্যেরা যাতে কৃষ্ণানুশীলন পথে অগ্রসর হয় তারজন্যও সম্মিলিতভাবে চেষ্টা করে। এইটি আরও উদার মনোবৃত্তির পরিচায়ক। যখন কোন বাড়িতে আগুন লাগে, তখন প্রতিবেশী তার ভাষা বুঝতে না পারলেও, নানা উপায়ে ঐ অবস্থার কথা তাদের বোঝান যেতে পারে, সেটি জরুরী অবস্থা। সেই রকম

এই জগতে এখন কৃষ্ণভাবনা প্রচারের জরুরী প্রয়োজন, এই বিশ্বের জীবকে মায়ার তমোন্ধকার থেকে উদ্ধারের জন্য কৃষ্ণভক্তি প্রচার একান্তই প্রয়োজন।

বৈষ্ণবকুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীমৎ ভক্তিসিদ্ধান্ত ঠাকুর বলতেন—'প্রাণ আছে যার, সেহেতু প্রচার,' অর্থাৎ কৃষ্ণভক্তিতে বিশ্বাস থাকলেই হবে না, সেবা করা, প্রচার করা চাই—এর জন্য প্রয়োজন প্রাণ প্রাচুর্য, চাই অদম্য উৎসাহ, এই কৃষ্ণভাবনার অমৃত আস্বাদন করে আজ বিশ্বের দিকে দিকে জনমানস জড় জাগতিক আনন্দ উপভোগ ছেড়ে দিয়েছে, কোথায় কৃষ্ণ ভক্তির দিব্য আনন্দ? কোথায় জড় আনন্দ? তা শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীল ব্যাসদেব লিখেছেন—

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রয়োজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানং চ যদহৈতুকম্ ॥

অর্থাৎ, যেই ভগবান সর্বত্র বাস করেন, তাঁর প্রতি অহৈতুকী ভক্তি করলে অচিরেই জ্ঞান ও বৈরাগ্যের উদয় হয়, এইসব সারা বিশ্বের কৃষ্ণানুশীলনকারী ভক্তদেরও তাই হয়েছে, শ্রীল প্রভুপাদের নির্দেশ মতো তারা কৃষ্ণকথা শ্রবণ, কৃষ্ণকীর্তন, কৃষ্ণস্মরণাদি নবধা ভক্তি অনুশীলন করায়, কৃষ্ণ যে তাদের প্রভু, তারা কৃষ্ণের নিত্য দাস, এই উপলব্ধি হয়েছে। জড় জাগতিক বিষয় ভোগে তাদের বৈরাগ্য এসেছে—কেউ আর আজ চা, কফি, সিগারেট বা মদ্যাদি পানীয় বা আজে-বাজে চলচ্চিত্র, নাটক, নাচ-গান অমেধ্য আহারে ইচ্ছা প্রকাশ করে না।

ভগবানকে বা ভগবৎ-সেবা ভাল লাগলে, অন্য সব কিছুতে বিরক্তি আসে। ভগবানকে অথবা তাঁর সেবায় আনন্দ পেলে, মনে হয় এরচেয়ে বড় প্রাপ্তি আর কিছুই নেই, তখন চরম বিপদেও কৃষ্ণানুশীলনকারীরা বিচলিত হন না। এইভাবে হরিনাম শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণাদি নবধা ভক্তির মাধ্যমে ভগবদ্ সান্নিধ্যে যে আনন্দ তা চিন্ময়, তা অপ্রাকৃত হওয়ায় এই আনন্দ অসীম—তাই এইটি যথার্থ আনন্দ। এরা নিজ নিজ দেশে প্রচুর বিলাসবহুল জীবন যাপন করলেও কৃষ্ণসেবার অপ্রাকৃত লাভ করে, কৃষ্ণভাবনার অমৃত আস্বাদন করে, পূর্বের জীবনধারাকে তুচ্ছ জ্ঞানে ত্যাগ করেছেন। কেননা ভগবৎ-সেবার মাধ্যমে দিব্য আনন্দময়ের সান্নিধ্য তারা পেয়েছেন।

শ্রীধাম মায়াপুর থেকে মহাপ্রভু একদিন যে ভগবৎ-প্রেমের বন্যার সূচনা করেছিলেন, তা আজ সারা বিশ্বকে প্লাবিত করছে, মায়াপুরে গৌরপূর্ণিমা মহোৎসবে যোগদান করে এই কথাই মনে পড়ে বার বার। মনে পড়ে শুদ্ধ গৌরভক্ত সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভবিষ্যদ্বাণী—নবদ্বীপ তথা

মায়াপুরে এসে বিভিন্ন দেশের গৌরভক্তরা ভারতের গৌরভক্তদের সঙ্গে প্রেমালিঙ্গন করবে, 'জয় শচীনন্দন, জয় শচীনন্দন' বলে শ্রীধাম মায়াপুরের আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তুলবে। এইভাবে শ্রীধাম মায়াপুর আজ সারা বিশ্বের সকল জাতি ও ধর্মের মিলনের ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। আজ গৌর-নিত্যানন্দের দয়া উপলব্ধি করে গাইতে ইচ্ছা করে ঠাকুর লোচন দাসের গান—

পরম করুণ, পঁহু দুইজন,
নিতাই গৌরচন্দ্র।
সব অবতার, সার-শিরোমণি,
কেবল আনন্দ-কন্দ ॥

আর বাঞ্ছাকল্পতরু কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ ও বৈষ্ণবকুলচূড়ামণি শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত ঠাকুরের চরণারবিন্দ স্মরণ করে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি—গৌরনাম, গৌর রূপ, গৌর গুণ, গৌরলীলা, গৌর-নিতাই ধামের মহিমায় ও কীর্তনে সারা জগৎ প্লাবিত হোক্।

শ্রীল প্রভুপাদের দৃষ্টিতে বৈদিক শিক্ষা-ব্যবস্থা

সংস্কৃত ভাষায় 'বিদ্' ধাতু আছে, যার অর্থ হচ্ছে জানা। আর যেখান থেকে সব কিছু সম্বন্ধে জানা যায়, তাকে বলা হয়ে 'বেদ'।

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে মধ্যলীলায় রামানন্দ রায় ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মধ্যে কথোপকথনে আমরা জানতে পরি—

প্রভু কহে,—"কোন বিদ্যা বিদ্যা-মধ্যে সার?"
রায় কহে,—"কৃষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর ॥"

তাই বৈদিক সাহিত্যে আমরা বিভিন্ন মহাজনের জীবনে এই বিদ্যা অনুশীলন করতে দেখি। যেমন প্রহ্লাদ মহারাজ ও ঋষভদেব, তাঁরা এসম্বন্ধে অনেক উপদেশ দিয়েছেন। ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রূপ ও সনাতন গোস্বামীদেরও এ সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়েছিলেন।

নিজেকে জানাটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় বিদ্যা। তাই ভগবান ভগবদ্গীতায় তা বিশ্লেষণ করেছেন। এই আত্ম-বিদ্যা অত্যন্ত গোপনীয়, সবচেয়ে পবিত্র। এই বিদ্যালাভে আত্মানুভূতি হয় সোজাসুজি। এই বিদ্যা লাভ করলে তার সব মোহ দূর হয়, তার ভব-বন্ধন মোচন হয়, তাকে আর জন্মগ্রহণ করতে হয় না—আর মাতৃগর্ভে প্রবেশ করতে হয় না।

বৈদিক শাস্ত্র থেকে জানা যায় ৮৪ লক্ষ রকম জীব রয়েছে। তার মধ্যে ৪ লক্ষ রকম মানুষ, ৩০ লক্ষ রকম পশু, ২০ লক্ষ রকম বৃক্ষ ও পাহাড়-পর্বত, ১০ লক্ষ রকম পাখি, ১১ লক্ষ রকম কৃমি জাতীয় জীব ও ৯ লক্ষ জলজ জীব। এরা সকলেই আহার-নিদ্রা-মৈথুন ও আত্মরক্ষা করেই প্রধানতঃ জীবন অতিবাহিত করে। এদের মধ্যে মানুষ শ্রেষ্ঠ। মানুষের বিবেক আছে, তার বুদ্ধি উন্নত এবং সে চিন্তা করতে পারে। সেইজন্য শাস্ত্রে বলছে 'জীবস্য তত্ত্বজিজ্ঞাসা'। জীব বিশেষতঃ মানুষ মাত্রই এই আত্ম-জিজ্ঞাসা—আমি কে? এই প্রশ্নের উদয় হওয়া কর্তব্য। যার মনে এই রকম প্রশ্ন জাগে না শাস্ত্র অনুসারে তাদের 'মানুষ' বলে গণ্য করা হয় না।

আজকাল জগতে যে শিক্ষা দেওয়া হয় তা দেহকেন্দ্রিক। সকলেই নিজ নিজ দেহটিকে স্বরূপ বলে মনে করছে, অথচ সবচেয়ে সেরা প্রামাণিক সূত্র ভগবদ্গীতা থেকে আমরা জানতে পারি, স্বরূপতঃ আমরা এই দেহ নই। আমরা এক চেতন সত্তা। আমরা নিত্য, আমরা অবিনাশী, আমরা ব্রহ্ম। তাহলে তথাকথিত যে শিক্ষা আমরা পাচ্ছি এগুলো হচ্ছে জড় বিদ্যা। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের জড় ইন্দ্রিয়কে তৃপ্ত করা। এই বিদ্যা শিক্ষা করে বড় জোর একজন মূর্খ হতে পারে। কারণ এই দেহের ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে এই বিদ্যার ফলও বিনাশ হবে। আর যতক্ষণ না আমরা 'আত্মতত্ত্ব' সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করছি ততক্ষণ আমাদের সব শিক্ষাই ব্যর্থ হবে।

আজকালকার শিক্ষা ব্যবস্থায় দেখা যায় যে, যে যত উচ্চতর শিক্ষা লাভ করে সে যেন ততই এই আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করে। অথচ চেতনা আসছে কোথা থেকে?—তার সদুত্তর আজ পর্যন্ত এদের কেউ দিতে সক্ষম হয় নি। বৈদিক শাস্ত্র থেকে জানা যায় যে এই চেতনা 'আত্মা' থেকে আসছে। চেতনার দ্বারা আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। যেমন সূর্যের আলোর উৎস হচ্ছে সূর্য, ঠিক সেই রকম চেতনের উৎস হচ্ছে আত্মা।

শ্রীল এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে কসাইখানার সঙ্গে তুলনা করেছেন। কেননা শিক্ষার্থীরা সেখানে গিয়ে নিজের

নিত্য পরিচয়, এবং তার স্বরূপ সম্বন্ধে কিছুই জ্ঞানলাভ করছে না। তাদের সুদুর্লভ মানব জীবনকে সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট করছে তারা এইভাবে। তাই এই সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে (৫/৫/৫) বলা হয়েছে—

পরাভবস্তাবদবোধজাতো
যাবন্ন জিজ্ঞাসত আত্মতত্ত্বম্।

মহাজনদের পথই অনুসরণীয়। প্রহ্লাদ মহারাজ বলেছেন—

মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা
মিথোঽভিপদ্যেত গৃহব্রতানাম্।
অদান্তগোভির্বিশতাং তমিস্রং
পুনঃ পুনশ্চর্বিতচর্বণানাম্॥

অর্থাৎ, বহির্রথমানী, দুরাশয়, গৃহব্রত, অন্ধের দ্বারা নীয়মান অন্ধ-প্রায় ঐ সকল ব্যক্তি বিষ্ণুই যে জীবের একমাত্র স্বার্থগতি তা জানে না। বৈদিক সভ্যতা অনুযায়ী প্রত্যেক বালক ৫ বছর বয়সে গুরুগৃহে শিক্ষা করতে যায়। সেখানে সে গুরুর কাছে ব্রহ্মচর্য জীবন যাপন করে। দুর্ভাগ্যবশত আজকাল আর সেই শিক্ষা ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। ভারতবর্ষে কিছু কিছু জায়গায় এই গুরুকুল শিক্ষা ব্যবস্থা আছে। কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ বর্তমান যুগে শিক্ষা ব্যবস্থার কুফল লক্ষ্য করে, জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধিমুক্ত দিব্য-জীবন লাভের লক্ষ্যে পৌছাবার জন্য যুগোপযোগী গুরুকুল শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলন করেছেন। তাই বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ এই গুরুকুল প্রতিষ্ঠা করেছে। ভগবান কৃষ্ণের ভক্ত হলে, জন্ম-মৃত্যুকে জয় করা যায়। তাই শ্রীল প্রভুপাদ গুরুকুলের সকলকে কৃষ্ণভক্ত করতে চেয়েছিলেন। সংক্ষেপে বলা যায় গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের নিচের কৃষ্ণের উপদেশ মত ছাত্রদের জীবন গড়ে তুলতে হবে—

'মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু'—

অর্থাৎ, সবসময় কৃষ্ণকে মনে রাখতে হবে, কৃষ্ণভক্ত হতে হবে, কৃষ্ণ-পূজা করতে হবে ও কৃষ্ণকে প্রণাম করতে হবে। গুরুর কাছে খুব সহজ সরল ভগবদ্ ভাবনাময় জীবন যাপন শিক্ষণীয়।

ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

'বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্য'

অর্থাৎ, সকল বেদ পাঠের লক্ষ্য হচ্ছে ভগবান কৃষ্ণকে জানা, কৃষ্ণোপলব্ধি করা। আর কৃষ্ণকে তত্ত্বত জানলেই কৃষ্ণ যেমন ঠিক তেমনটি উপলব্ধি হবে। তখন তার আর এই জড় জগতে জন্মগ্রহণ করতে হবে না। কৃষ্ণের জন্ম, কৃষ্ণের কর্ম, কৃষ্ণের আবির্ভাব ও কৃষ্ণের লীলা বিলাসগুলি হচ্ছে দিব্য। সেগুলি হচ্ছে অপ্রাকৃত। এই জীবন অবসান হলে, যে কৃষ্ণকে এইভাবে উপলব্ধি করেছে তাকে আর এই জড় জগতে ফিরে আসতে হবে না। তাহলে তার কি হবে?—সে ভগবান কৃষ্ণের কাছে চলে যাবে—সে সেখানে কৃষ্ণের সঙ্গে নিত্য, চিন্ময়, আনন্দঘন জীবন যাপন করবে আর কখনই দুঃখ-দুর্দশা-পূর্ণ এই জগতে আসতে হবে না।

ভগবান কৃষ্ণ ও বলরাম পর্যন্ত গুরুকুল শিক্ষাগ্রহণ করেছিলেন। ভগবান হচ্ছেন পূর্ণতত্ত্ব। তাঁর বিদ্যা-শিক্ষার কোন প্রয়োজন নেই। তবু সকলকে শিক্ষা দেবার জন্য, আদর্শ দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য তিনি সন্দিপনী মুনির আশ্রমে বাল্যকালে শিক্ষাগ্রহণ লীলাবিলাস করেছিলেন। এইসব ঘটনা আজ থেকে ৫০০০ বছর আগে হয়েছিল। নিজে আচরণ না করলে, অন্যকে শিক্ষা অর্থাৎ ফলপ্রসূ শিক্ষা দেওয়া যায় না—তাই আজ থেকে ৫০০ বছর পূর্বে ভগবান, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে শ্রীধাম নবদ্বীপে অবতরণ করে সেই শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি বললেন—"আপনি আচরি ধর্ম শিখাইনু সবারে।"

শ্রীল প্রভুপাদ আমেরিকার একটি বিশ্ব বিখ্যাত প্রযুক্তিবিদ্যার শিক্ষায়তন মাসাচুসেট ইনস্টিটিউট্ অফ্ টেকনোলজিতে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। সেখানে ছাত্র শিক্ষাবিদ্, প্রযুক্তিবিদ্‌দের সভায় তিনি বৈদিক শিক্ষা, এই আত্মতত্ত্ব বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন। তিনি তাদের প্রশ্ন করেছিলেন—এত বিভাগ রয়েছে, অথচ কোথাও আত্মতত্ত্ব শিক্ষা দেওয়ার কোন বিভাগ নেই কেন?

বাস্তবিক কোথাও এই রাজবিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা নেই। আজকাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে বাণিজ্য, বিজ্ঞান, কলা, রাজনীতি, সমাজনীতি, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, গণিত, জ্যোতির্বিদা, যন্ত্রবিজ্ঞান আদি সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হয়। এই সবই জড়বিদ্যা। চেতন সত্তা, আত্মা সম্বন্ধে তারা কিছুই শিক্ষা লাভ করে না অথচ বিশ্বময় কত বিদ্যালয়, শিক্ষায়তন, বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। এইসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বহু বিভাগ রয়েছে। অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি যেমন বিশাল তেমনি সেখানে অনেক বহু বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। কিন্তু কোথাও এই 'আত্মতত্ত্ব' শিক্ষা দেওয়া হয় না। এইটি মানব সমাজের পক্ষে অতীব দুর্ভাগ্যের বিষয়।

এই শিক্ষা দেওয়ার জন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও তাঁর নিত্য পার্ষদ রূপ-সনাতন গোস্বামী লীলাবিলাস করে গেছেন আজ থেকে পাঁচশ বছর আগে। অথচ জড় জাগতিক বিচারে শ্রীল রূপ গোস্বামী ও শ্রীল সনাতন

গোস্বামী—দুজনেই ছিলেন বিরাট পণ্ডিত ও উচ্চশিক্ষিত। তারা মহাপ্রভুর কাছে আত্ম-তত্ত্ব সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করেছিলেন। মহাপ্রভুর শরণাগত হয়ে অতীব দৈন্য সহকারে মহাপ্রভুর কাছে এইসব প্রশ্ন করেছিলেন। চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই মনে প্রশ্ন জাগে আমি কে? এই পরিদৃশ্যমান জগতের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি? পরম নিয়ন্তা কে? তার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি? আমার জীবনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য বা অর্থ কি?

এই বিষয়ে জ্ঞান লাভ করাই হচ্ছে প্রকৃত শিক্ষা। আজকাল বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত যে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে, তা লাভ করে একজন শূদ্র হচ্ছে, চাকরি খুঁজছে—আসলে তা শূদ্রের কাজ। প্রকৃত উচ্চশিক্ষা হচ্ছে বৈদিক জ্ঞান লাভ করা। ব্রাহ্মণ হলে একজন ঐ শিক্ষা লাভ করতে পারে। সারা বিশ্বে এই শূদ্র ভাবাপন্ন ব্যক্তি তৈরি করার শিক্ষা দেওয়ার ফলে জগতে আজ এত অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হচ্ছে। ছাত্ররা আজ উচ্ছৃঙ্খল, তাদের জীবন উদ্দেশ্যহীন ও নৈরাশ্যময়। তাই শ্রীল প্রভুপাদ যখন আমেরিকায় যান এবং ঐ দেশীয় যুবক-যুবতীদের কৃষ্ণানুশীলনে উদ্বুদ্ধ করেন, সাংবাদিকরা তখন তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন—"এইসব যুবক যুবতীদের ভবিষ্যতে আপনি কি গড়ে তুলবেন?" শ্রীল প্রভুপাদ বলেছিলেন, "আমি এদের ব্রাহ্মণ করে তুলবো, আর ভগবানকে জানতে হলে, শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তের শরণাপন্ন হওয়া চাই। কৃষ্ণতত্ত্ববিদের শরণাগত হওয়া চাই। বিনয় নম্রভাবে তাঁর কাছে গিয়ে, তাঁর শরণাপন্ন হয়ে তাঁর আনুগত্যে শিক্ষাপ্রাপ্ত হলে, দাস সুলভ দৈন্যভাবে তাঁর সেবা করলে, কৃপাসিন্ধু বৈষ্ণব তখন তুষ্ট হন। তাকে সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের 'সার' বুঝিয়ে দেন। শ্রদ্ধাভরে, দৃঢ় বিশ্বাসে তাঁর মুখনিঃসৃত বাণী সর্বদা শ্রবণ করলে, তা কায়-মন-বাক্যে পালন করলে তাঁর কৃপায় ভগবানের কৃপা লাভ হয়। ভগবান শ্রীহরি তুষ্ট হলে সর্বসিদ্ধি লাভ হয়। শাস্ত্রে আছে 'সংসিদ্ধি হরিতোষণম্।' তাই গুরুকুলের ছাত্র শম, দম, তপ, শৌচ, ক্ষান্তি, আর্জব, জ্ঞান, বিজ্ঞান, আস্তিক্য আদি ব্রাহ্মণের গুণাবলী অর্জন করে গুরুসেবা করে। সে শৈশব থেকে গুরুকুলে শিক্ষা লাভ করে। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে আমরা কৃষ্ণ ও সুদামা কথোপকথন থেকে জানতে পারি—ভগবান কৃষ্ণ সকলের হৃদয়ে অবস্থান করে, সবকিছু লক্ষ্য করেন। যে সর্বান্তঃকরণে গুরুদেবকে তুষ্ট করবার প্রয়াস করে, ভগবান কৃষ্ণ তাঁর প্রতি সবচেয়ে তুষ্ট হন। গুরুর আশ্রমে বসবাস করে গুরুদেবের সেবায় সর্বস্ব নিবেদন করতে হবে। গুরুকুলে অবস্থানের সময় এমন কি ভগবান কৃষ্ণ পর্যন্ত অনেক কষ্ট স্বীকার করেছিলেন।

সাধারণত সূর্যোদয়ের প্রায় দেড় ঘণ্টা আগে শয্যা ত্যাগ, স্নান, পরিচ্ছন্ন বেশে ভগবদ্বিগ্রহের সামনে এসে প্রতিদিন গুরুবন্দনা করা প্রতি গুরুকুল ছাত্রের কর্তব্য। সকলের উচিত মহামন্ত্র—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

জপ করা। প্রতিদিন গুরুদেবের মুখনিঃসৃত শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ শ্রবণ করা প্রত্যেক ছাত্রদের কর্তব্য। শাস্ত্রে এইসব কথার উল্লেখ আছে, তাই সেখানে বলা হয়েছে—'ব্রহ্মচারী গুরুকুলে বসনদন্ত গুরোহিতম্।' ভগবদবতার ঋষভদেব তাঁর পুত্রদের শিক্ষাদানের সময় বলেছিলেন—

'তপো দিব্যম্ পুত্রকা যেন সত্ত্বম্'

অর্থাৎ, শুদ্ধ ও পবিত্র হওয়ার জন্য জীবনে, অন্ততঃ ছাত্র জীবনে তপশ্চর্যা করা চাই। যেমন কলিযুগে মহাপ্রভু খুব সহজ করে দিয়েছেন—কঠোর তপশ্চর্যা যা বৈদিক সভ্যতায় দেখতে পাওয়া যায়, ঐ রকম নয়। তবে ব্রহ্মমুহূর্তে শয্যাত্যাগ ও স্নান করা এইগুলি এইযুগে তপশ্চর্যা। বৈদিক শিক্ষার উদ্দেশ্য আদর্শ চরিত্র গঠন করা। প্রত্যেক নারীকে মাতৃজ্ঞান করা। বড় বড় পণ্ডিত হওয়া এই শিক্ষার লক্ষ্য নয়। প্রহ্লাদ মহারাজ বলেছেন—

কৌমার আচরেৎপ্রাজ্ঞো ধর্মান্ ভাগবতানিহ।
দুর্লভং মানুষং জন্ম তদপ্যধ্রুবমর্থদম্ ॥

এই মানব জীবন ক্ষণস্থায়ী, অনিশ্চিত অথচ সুদুর্লভ। তাই শৈশব থেকেই এমন শিক্ষা লাভ করা কর্তব্য যার দ্বারা জীবনের মূল সমস্যা জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধিকে জয় করা যায়। এটিই বৈদিক শিক্ষার লক্ষ্য। গুরুকুল শিক্ষা ব্যবস্থায় এমন শিক্ষা দেওয়া হয়, যাতে ছাত্র ভগবদ্ভাবনাময় হয়ে উঠে ও দেহের অবসানে বৈকুণ্ঠে নিত্যানন্দময় অনন্ত জীবন লাভ করে।

গুরুকুলে ব্রহ্মচারী গুরুর সম্পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করে শিক্ষা লাভ করে, তাহলে ছাত্রজীবন সফল হবে। যিনি বৈষ্ণব, কৃষ্ণের শরণাগত—কায়, মন ও বাক্য দ্বারা তিনি গুরু। ছাত্ররা তাঁর কাছে সদাচার শিক্ষা করে। এই গুরুকুলে ছাত্রদের এমনভাবে গড়ে তোলা হবে যাতে ভবিষ্যতে তারা শুদ্ধ বৈষ্ণব হয় ও সর্বত্র কৃষ্ণকথা প্রচার করতে পারে।

মহাপ্রভুর শিক্ষা—'বৈরাগ্য বিদ্যা নিজ ভক্তিযোগম্' এই শিক্ষা ব্যবস্থায় জড় জগৎ সম্বন্ধে বৈরাগ্যের উদয় হয় ও সঙ্গে সঙ্গে ভগবানে আসক্তি জন্মায়। সাধারণত জড় জগতে সকলেই কর্মী। তাদের সকলেরই লক্ষ্য অর্থনৈতিক

উন্নতি। কেন? ভোগসুখের জন্য। এইভাবে তারা ক্ষণস্থায়ী দেহ, গেহ, দারা-সুত ধন-সম্পদে আসক্ত হয়ে পড়ে। তার ফলে জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধিময় এই জড় জগতে আবার তাদের আসতে হবে। কিন্তু বৈদিক শিক্ষার ভিত্তি হল ভগবানে আসক্তি, ভগবানকে ভালবাসা, আত্মার সম্বন্ধে জীবের সঙ্গে আত্মীয়তা, এবং সকলকে ভালবাসতে শেখা। তখন 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' ভগবৎ-কেন্দ্রিক, কৃষ্ণ-কেন্দ্রিক জীবন হওয়ায় সকলকেই কৃষ্ণের সন্তান—এই দৃষ্টিতে দর্শন করায়, সারা জগৎকে কৃষ্ণের সংসার রূপে দেখা যায়। তখন এক বৈকুণ্ঠময়—অভয়, অশোক ও আনন্দের পরিবেশ সৃষ্টি করা যায় এই দুঃখ-দুর্দশাপূর্ণ জগতে। এইটিই হল বৈদিক শিক্ষার ফল।

শ্রীনিত্যানন্দের অহৈতুকী কৃপা

আজ থেকে মোটামুটি ৫০০ বছর আগের কথা। তখন হুগলী জেলায় হিরণ্য দাস ও গোবর্ধন দাস নামে মহা ধনবান দুই জমিদার ছিল। তাদের মাসিক আয় ছিল ২০ লক্ষ মুদ্রা। ছোট্ট ভাই গোবর্ধন দাসের একমাত্র ছেলে ছিলেন রঘুনাথ দাস। শান্তিপুরে রঘুনাথ দাস মহাপ্রভুর চরণ দর্শনের সুযোগ লাভ করেছিলেন। মহাপ্রভুর মথুরা থেকে আসার খবর পেয়ে, তাঁর চরণ দর্শন করতে চেষ্টা করেছিলেন রঘুনাথ।

বার বার রঘুনাথ মহাপ্রভুকে দর্শন করতে যান, তার স্নেহান্ধ বাবা মা তাকে প্রতিবার বাধা দেয়। গোবর্ধন দাস পুত্র সম্বন্ধে তার স্ত্রীকে বলেছিল—

"ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য, স্ত্রী অপ্সরা-সম।
এ সব বান্ধিতে নারিলেক যাঁর মন ॥
দড়ির বন্ধনে তাঁকে রাখিবা কেমতে?
চৈতন্যচন্দ্রের কৃপা হঞাছে ইঁহারে।
চৈতন্যচন্দ্রের 'বাতুল' কে রাখিতে পারে?"

(চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ৬/৩৯-৪১)

তার পর বহু সেবক নিয়ে নিত্যানন্দ প্রভু পানিহাটিতে এলে, রঘুনাথ তাঁর চরণ দর্শনের ইচ্ছায় সেখানে যান। সূর্যের মত তেজস্বী নিত্যানন্দ প্রভু সেখানে

গঙ্গার তীরে এক বৃক্ষের মূলে বসেছিলেন। অনেক অনুগামী তাঁর চারধারে বসেছিলেন। তেজঃপূর্ণ সপার্ষদ নিত্যানন্দ প্রভুকে দেখে রঘুনাথ বিস্মিত ও অভিভূত হলেন ও দূর থেকে ভক্তিভরে তাঁকে দণ্ডবৎ প্রণাম করলেন। পরম দয়ালু ও কৌতুকপ্রিয় নিত্যানন্দ প্রভু কৃপা করে রঘুনাথ দাসকে বললেন—

"নিকটে না আইস, চোরা, ভাগ' দূরে দূরে।
আজি লাগ্ পাঞাছি, দণ্ডিমু তোমারে ॥
দধি, চিড়া ভক্ষণ করাহ মোর গণে।"

(চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ৬/৫০-৫১)

এই কথা শুনে রঘুনাথ দাস খুব আনন্দিত হলেন এবং চিড়া, দধি, দুগ্ধ, সন্দেশ, চিনি, কলা দূর দূর গ্রাম থেকে আনালেন। দু'শ গোল মাটির পাত্র, বড় বড় মাটির ৫/৭ টি পাত্র অন্য গ্রাম থেকে লোকেরা নিয়ে এলেন। মহোৎসব-এর নাম শুনে সজ্জন-ব্রাহ্মণরা সেখানে আসতে শুরু করলেন।

নিত্যানন্দ প্রভুর প্রধান পার্ষদ তাঁর চারিদিকে বৃত্তাকারে বসেছিলেন। এদিকে সেখানে রাঘব পণ্ডিত গিয়ে উপস্থিত হলেন, এবং মহোৎসব করতে দেখে তিনি বিস্মিত হয়ে হাসতে হাসতে নিত্যানন্দ প্রভুকে বললেন—

"তোমা লাগি' ভোগ লাগাইল।
তুমি ইঁহা উৎসব কর, ঘরে প্রসাদ রহিল ॥"

রাঘব পণ্ডিত তাঁর সঙ্গে আনা প্রসাদ প্রথমে নিত্যানন্দ প্রভুকে দিলেন, তারপর তাঁর পার্ষদ ও ভক্তদের মধ্যে তা বিতরণ করে দিলেন। সেখানে রামদাস, সুন্দরানন্দ, দাস গদাধর, মুরারি, কমলাকর, সদাশিব, পুরন্দর, ধনঞ্জয়, জগদীশ, পরমেশ্বর দাস, মহেশ পণ্ডিত, গৌরীদাস, উদ্ধারণ দত্ত ও হোড়কৃষ্ণ দাস ছিলেন।

কোন কোন মাটির পাত্রে গরম দুধে চিড়া ভেজান হল; আবার কোন কোন পাত্রে দই, চিনি, কলা ও চিড়ে মেশান হল। কোন কোন পাত্রে চাঁপা কলা, চিনি, ঘি, কর্পূর ও ঘন দুধ চিড়ে মেশান হল। এক ব্রাহ্মণ এইগুলি থেকে সাতটি পাত্র নিত্যানন্দ প্রভুকে নিবেদন করলেন।

যে সব ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, পুরোহিতরা বিভিন্ন গ্রাম থেকে এসেছিলেন, নিত্যানন্দ প্রভু সসম্মানে তাদের উচ্চ আসনে বসতে দিলেন, এবং দুধ-চিড়ে ও দই-চিড়ে মেশান ২টি করে পাত্র সকলকে দেওয়া হল। যাদের সেখানে বসার জায়গা হল না, তাদের মধ্যে কেউ কেউ গঙ্গার তীরে, কেউ উপরে, কেউ নিচে, এমন কি কেউ কেউ জলে দাঁড়িয়ে পাত্রে চিড়ে ভেজাল। বিশ জন লোক

এদেরকে দুটি পাত্রে চিড়ে, দুধ, দই বিতরণ করছিলেন। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে এই মহোৎসব এইভাবে বর্ণনা করেছেন—

ধুতি পরি' প্রভু যদি পিণ্ডাতে বসিলা।
সাতকুণ্ডী বিপ্র তাঁর আগেতে ধরিলা ॥
চবুতরা উপরে যত প্রভুর নিজগণে।
বড় বড় লোক বসিলা মণ্ডলী-রচনে ॥
উদ্ধারণ দত্ত আদি যত নিজগণ।
উপরে বসিলা সব, কে করে গণন?
আর যত লোক সব চৌতরা-তলানে।
মণ্ডলী-বন্ধে বসিলা, তার না হয় গণনে ॥
একেক জনারে দুই দুই হোল্না দিল।
দধি-চিড়া দুগ্ধ-চিড়া দুইতে ভিজাইল ॥

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ঃ ৬/৫৯, ৬০, ৬৩, ৬৬, ৬৭)

তিনি আরও বর্ণনা করেছেন এইভাবে—

কোন কোন বিপ্র উপরে স্থান না পাঞা।
দুই হোল্ নায় চিড়া ভিজায় গঙ্গাতীরে গিয়া ॥
তীরে স্থান না পাঞা আর কত জন।
জলে নামি দধি-চিড়া করয়ে ভক্ষণ ॥

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৬/৬৮-৬৯)

নিত্যানন্দ প্রভু রাঘব পণ্ডিতকে দু'পাত্র চিড়ে-দুধ ও চিড়ে-দধি দিতে নির্দেশ দিলেন। রাঘবকে তাঁর ঘরে রাত্রে আহার করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন। তারপর তিনি তাঁকে জানালেন যে, প্রকৃতপক্ষে তিনি হচ্ছেন জাতিতে গোপ আর তারপর অনুগামীরাও সকলেই গোপ, তাঁদের নিয়ে একসঙ্গে নদীতীরে এইভাবে ভোজনে তিনি খুবই আনন্দ পান।

সকলকে মিশান চিড়ে বিতরণ করা হলে, নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে ধ্যান করলেন, এদিকে নিত্যানন্দের আহ্বানে মহাপ্রভু সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। তখন তাঁরা দুজন সকলের চিড়ের পাত্র দেখতে লাগলেন। কৌতুক-প্রিয় নিত্যানন্দ প্রভু প্রত্যেক পাত্র থেকে এক এক মুঠো মেশান চিড়ে তুলে নিয়ে মহাপ্রভুর মুখে পুরে দেন। আর মহাপ্রভুও তখন হাসতে হাসতে এক এক মুঠো মেশান চিড়ে পাত্রগুলি থেকে নিত্যানন্দের মুখে পুরে দেন।

এইভাবে শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীনিত্যানন্দের রঙ্গ-পরিহাস-লীলা হচ্ছিল সেখানে। উপস্থিত যারা সেখানে ছিলেন, একমাত্র ভাগ্যবানরাই মহাপ্রভুকে দেখতে পাচ্ছিলেন। অন্যান্য কেউ এসব জানতেও পাচ্ছিল না, বুঝতেও পাচ্ছিল না—কি হচ্ছে সেখানে।

তারপর গরম দুধে ভেজান চার পাত্র চিড়ে সামনে রেখে, মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভু আহারে বসলেন। মহাপ্রভুর সঙ্গে একত্রে আহার করে নিত্যানন্দ প্রভু অনেক ভাবাবেশ প্রকাশ করলেন।

তারপর 'হরি ধ্বনি' করে সকলকে চিড়া-দধি, চিড়া-দই আদি আহার করতে নিত্যানন্দ প্রভুর নির্দেশ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে এইভাবে লেখা আছে—

আজ্ঞা দিলা, 'হরি বলি' করহ ভোজন'।
'হরি' 'হরি'—ধ্বনি উঠি' ভরিল ভুবন ॥
'হরি' 'হরি' বলি বৈষ্ণব করয়ে ভোজন।
পুলিন-ভোজন সবার হইল স্মরণ ॥

(চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ৬/৮৬-৮৭)

রঘুনাথ দাসের পরম সৌভাগ্য—অশেষ করুণাময় ও উদার শ্রীনিত্যানন্দ ও চৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর এই প্রীতিময় সেবা গ্রহণ করলেন।

এই মহোৎসবের কথা শুনে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরের দোকানদাররা তাদের দোকানের দই, চিড়ে, সন্দেশ, কলা এনে সেখানে বিক্রী করতে লাগল। অন্যান্য বহু লোকও সেখানে এলো এই মহোৎসব দেখতে। রঘুনাথ সব খাদ্যদ্রব্য কিনে নিয়ে তাদের ও উপস্থিত অন্যান্য সকলকে দই-চিড়ে-কলাদি বিতরণ করে খাওয়ালেন। চারটি পাত্রের ভুক্তাবশেষ নিত্যানন্দ প্রভু রঘুনাথকে দিলেন; একজন ব্রাহ্মণ এসে নিত্যানন্দ প্রভুকে নিবেদিত অবশিষ্ট তিনটি পাত্রের চিড়ে-দই সকল ভক্তদের মধ্যে বিতরণ করলেন। আর রঘুনাথ দাস মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দের ভুক্তাবশেষ নিজ জনদের নিয়ে সানন্দে আহার করলেন।

এই মহোৎসবে লক্ষণীয় এই যে রঘুনাথ দাস নিত্যানন্দ প্রভুকে প্রণাম করছেন জানান হল, নিত্যানন্দ প্রভু রঘুনাথ দাসকে বলেন—

'চোরা দিলি দরশন'—কেননা রঘুনাথ দাস হচ্ছেন ভগবানের প্রতি অতি অন্তরঙ্গ নিজজন—তা অন্যেরা জানত না, নিত্যানন্দ প্রভু তা আভাষে প্রকাশ করলেন। রঘুনাথের পিতা ছিলেন ধনবান, বিষয়-ভোগী। এই লীলাবিলাসের মাধ্যমে নিত্যানন্দ প্রভু শুদ্ধভক্তদের সেবা দ্বারা ধনীর বিত্তশাঠ্যরূপ অনর্থ নাশ

ও নিত্য মঙ্গলের শিক্ষাদান করলেন। এইভাবে রঘুনাথ দাস নিত্যানন্দ প্রভুর অহৈতুকী কৃপা লাভ করলেন। পরদিন রঘুনাথ কাতরভাবে ও সদৈন্য আবেদন করলে, নিত্যানন্দ প্রভু সপার্ষদ রঘুনাথকে চৈতন্যচরণ লাভের আশীর্বাদ করলেন।

ভগবৎ-দর্শন ও তার ফল

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্তনাৎ ॥

(ভাঃ ১২/৩/৫২)

ভগবৎ-আরাধনার পন্থা সম্বন্ধে বিভিন্ন যুগে বৈদিক শাস্ত্রে এভাবে উল্লেখ করা আছে। অর্থাৎ কৃতে বা সত্য যুগে ধ্যানের মাধ্যমে মানুষ ভগবদুপলব্ধি করত। ত্রেতা যুগে 'যজতঃ'' অর্থাৎ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে মানুষ ভগবানের দর্শন লাভ করত। দ্বাপর যুগে 'পরিচর্যায়াম্' অর্থাৎ মন্দিরাদিতে ভগবৎ-আরাধনা দ্বারা তাঁকে লাভ করত আর কলিযুগে ভগবানের দিব্যনাম 'হরিকীর্তনের' মাধ্যমে ভগবৎ-উপলব্ধি করা হয়।

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি—এইভাবে চারটি যুগ সাধারণত আসে। সত্য যুগে মানব সমাজে সত্য, দয়া, তপস্যা, শুচিতা এসব গুণাবলী ছিল। সকলেই ভগবৎ-ভাবনাময় ছিল, সেহেতু তারা পুণ্যবান ছিল, তাই তারা দীর্ঘ জীবন যাপন করত। সাধারণত মানুষের জীবনকাল ১০০ হাজার বছর ছিল। তারপর ত্রেতা যুগে মানুষের এসব গুণাবলী একটু হ্রাস পায়, তারা তখন ১০ হাজার বছর বাঁচত। মানুষ তখন ছিল অনেক দীর্ঘকায়। যেহেতু যজ্ঞ করবার প্রয়োজনীয় উপকরণ—প্রচুর শস্য, ঘি আদি সকলের পক্ষে সংগ্রহ করা সম্ভব নয়, তাই রাজা, মহারাজারাই এসব যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে পারতেন। তারপর ত্রেতাযুগে মানুষ মন্দির আদিতে ভগবানের আরাধনা করত। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অবনতি হচ্ছে। তাদের গুণাবলী হ্রাস পেয়ে চলেছে। মানুষের আয়ুষ্কাল এখন বড় জোর ১০০ বছর কিন্তু কলিযুগে মানুষের অনেক অনেক অবনতি হয়েছে। তারা ভগবান সম্বন্ধে তেমন আগ্রহী নয়, এই

সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীল ব্যাসদেব লিখেছেন—'মন্দাঃ সুমন্দমতয়ো মন্দভাগ্যা হ্যুপদ্রুতঃ'। তাছাড়া এই কলিযুগের মানুষের মধ্যে সত্য, দয়া, তপস্যা ও শুচিতা আদিগুণাবলীর মধ্যে মাত্র সামান্য 'সততা' আছে, অন্যগুলি নেই বললেই চলে এই যুগে। তাই মানুষ আজ অনেক খর্বাকায় হয়ে গেছে। সাধারণত মানুষের উচ্চতা বেশি হলে ৭ ফুট, তার জীবনকাল ১০০ বছর মাত্র। মানুষ পতিত হওয়ায় ভগবানকে লাভ করবার সবচেয়ে সহজ পন্থা 'হরিকীর্তন' শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

স্থান, কাল ও পাত্র অনুযায়ী পৃথিবীতে বিভিন্ন শাস্ত্র দেখা যায়। তবে বৈদিক শাস্ত্র এ সব সকল শাস্ত্রগুলির মধ্যে সবচেয়ে পুরানো ও বিশাল। তাই বৈদিক শাস্ত্রে পৃথিবীর অন্যান্য শাস্ত্রের আলোচিত সকল বিষয়ই রয়েছে। ভগবানের লীলা বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী অনুযায়ী অনেক দিব্য নাম রয়েছে। এসব প্রতিটি নামই চিন্ময় ও অর্থপূর্ণ। ভগবানের এই নাম ও ভগবান অভিন্ন। শাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে—

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্য-রসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ ॥

ভগবানের নাম কীর্তনকারীর সকল মনোবাসনা পূর্ণ করে। নামে চৈতন্য স্বরূপ, সকল আনন্দের মূর্তবিগ্রহ। নাম পূর্ণতত্ত্ব, পূর্ণ পবিত্র ও নিত্যমুক্ত আর ভগবান ও তাঁর নামের মধ্যে কোন ভেদ নেই। ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শিক্ষা দিয়েছিলেন—"নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্বশক্তি"। ভগবানের অনেক অনেক নাম আছে, এসব নাম কীর্তন করে সকলেই যে কোন অবস্থায় ভগবানের পূত সঙ্গ লাভ করতে পারে। এভাবে কৃষ্ণানুশীলন করে ভগবৎ সান্নিধ্যের ফলে মানুষ জড়াতীত নির্গুণ অবস্থা প্রাপ্ত হতে পারে। তখন জীব দেহাত্মা-বুদ্ধির স্তর, মনোধর্মী জ্ঞানীর জল্পনা-কল্পনার স্তর অতিক্রম করতে পারে। এরপর মনের চেয়ে শ্রেয় বুদ্ধি—সেই বুদ্ধি দিয়ে বিচার করবার স্তর,—তাও সে অতিক্রম করে, এভাবে শুধু ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করে বা মহামন্ত্র—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

কীর্তন করে জীব ব্রহ্মভূত স্তরে উন্নীত হয়। কিন্তু এই স্তর লাভের লক্ষণ কি? আমরা কিভাবে বুঝব একজন এই দিব্য স্তর লাভ করেছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং এই লক্ষণ ভগবদ্গীতায় বর্ণনা করেছেন এভাবে—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥

অর্থাৎ, যিনি 'ব্রহ্মভূত' হয়েছেন, তার প্রথম লক্ষণ হচ্ছে, তিনি সব সময় আনন্দময়, আর কি লক্ষণ? না, কিছু হারিয়ে গেলে তিনি শোকাকুল হন না; অভাবগ্রস্থ লোকের মত অনুযোগ করেন না যে আমার এটা চাই, আমার ঐটা চাই—না এ সব তিনি করেন না। তিনি শুধু কৃষ্ণানুশীলন করেন; তিনি নিষ্কাম; তিনি শান্ত। কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত। কিন্তু যে প্রকৃতিকে ভোগ করতে চায় সে কর্মী, যে মুক্তি চায় সে জ্ঞানী, যে যোগ ঐশ্বর্য চায় সে যোগী—এদের সকলের মন অশান্ত। কৃষ্ণানুশীলনই কৃষ্ণসেবা, কৃষ্ণসেবাই কৃষ্ণভক্তি। কৃষ্ণ চিন্ময় আনন্দের ঘনীভূত মূর্তি, তাই কৃষ্ণানুশীলন করে জীব সেই চিন্ময় আনন্দ রস আস্বাদন করে। তার ফলে জীবের জড়াশক্তি, জড় জগতের প্রতি তার আকর্ষণ শিথিল হয়ে পড়ে। তাই বৈদিক শাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে—'ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র... ।' জীব এভাবে জড়-বন্ধন মুক্ত হয়।

বৈদিক শাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে—'মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেন ব্যাবস্থিতিঃ।' জীবের স্বরূপ হচ্ছে যে সে ভগবানের, সে কৃষ্ণের নিত্যদাস, তাই ভগবানের সেবায়, কৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত হওয়া মাত্রই সে মুক্ত। যে কৃষ্ণসেবা করে, যে ভগবৎ-সেবা করে, সে-ই এই সত্য অনুভব করতে পারে, যে অমৃতপান করে সে-ই অমৃতের স্বরূপ বুঝতে পারে। এই আনন্দ জড় জাগতিক আনন্দের মতো নয়—কখন আনন্দ, কখন নিরানন্দ—দুঃখ। না, ঐ রকম নয়—এই আনন্দ বৈচিত্রপূর্ণ, এই আনন্দ নিত্য নব-নবায়মান। 'আনন্দাম্বুধিবর্ধনম্'—অর্থাৎ এই আনন্দ সব সময়ই বেড়ে চলে, এই আনন্দের কোন হেয়তা নেই।

বহু বহু জন্মের পর বহু ভাগ্যের ফলে মনুষ্য জীবন লাভ হয়। বিষ্ণু পুরাণে উল্লেখ করা হয়েছে—'জলজা নব লক্ষাণি স্থাবরা লক্ষবিংশতি ক্রিময়ো রুদ্রসংখ্যকাঃ পক্ষিণাং দশলক্ষকম্। ত্রিংশলক্ষাণি পশবঃ চতুর্লক্ষাণি মানুষাঃ।'

অর্থাৎ, জলজীব আছে ৯ লক্ষ রকম, ২০ লক্ষ রকম বৃক্ষলতা, ১১ লক্ষ রকম ক্রিমি জাতীয় জীব, ১০ লক্ষ রকম পাখি, ৩০ লক্ষ রকম পশু এবং ৪ লক্ষ রকম মানুষ আছে। মোট ৮৪ লক্ষ রকম প্রজাতি আছে—অর্থাৎ ৮৪ লক্ষ রকম জীবদেহ আছে। ৪ লক্ষ রকম মানব দেহ মানে?—তার মানে হচ্ছে—সভ্য মানুষ, অর্ধসভ্য মানুষ, অসভ্য মানুষ, আবার সত্ত্বগুণ সম্পন্ন

মানুষ, রজোগুণ সম্পন্ন মানুষ, তমোগুণ সম্পন্ন মানুষ। আবার এই সব গুণের মিশ্রণে বিভিন্ন প্রকৃতির মানব রয়েছে।

এভাবে জীব ৮৪ লক্ষ যোনি ভ্রমণ করে বিভিন্ন জীব দেহ লাভ করছে, জন্ম লাভ করছে। তারপর একদিন তার মৃত্যু বা দেহাবসান হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় বলেছেন—'জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুঃ,' আবার 'ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ', মৃত্যু হলেই আবার অন্য এক জীব দেহ গ্রহণ করতে হবে। পরিদৃশ্যমান জগতে আমরা এ সব বৈচিত্রময় জীবদেহ দেখছি, এর কারণ কি?—বৈদিক শাস্ত্রে এই বিষয়ে ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে—'কর্মণা দৈবনেত্রেণ' অর্থাৎ, প্রত্যেকের কর্ম উপরওয়ালারা দেখছেন। যে যেমন কর্ম করছে, প্রকৃতি তাকে তার কর্ম অনুযায়ী উপযুক্ত জীব দেহ দান করছে। কেউ যদি খুব মাংস আহারে আসক্ত হয়, তাহলে তাকে মাংস আহারের উপযুক্ত দেহ দেওয়া হয়। তাহলে পরবর্তী জীবনে সে হয়ত মাংশাসী কোন পশুদেহ লাভ করতে পারে। একবার মনুষ্যেতর জীবদেহ লাভ করলে তার চেয়ে দুর্ভাগ্যের আর কিছু নেই, কেননা মনুষ্য জন্ম অতি দুর্লভ। আবার এই জীবনের স্থায়িত্ব কালও অনিশ্চিত। ভক্তশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদ মহারাজ বলেছেন—'দুর্লভং মানুষং জন্ম তদপ্যধ্রুবমর্থদম্।' অর্থাৎ, এই দুর্লভ মানব জীবন পরমার্থ লাভের জন্য। ভগবানকে লাভ করবার জন্য শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীল ব্যাসদেব লিখেছেন—

নিবৃত্ততর্ষৈরুপগীয়মানাদ্
ভবৌষধাচ্ছ্রোত্রমনোহভিরামাৎ।
ক উত্তমশ্লোকগুণানুবাদাৎ
পুমান্ বিরজ্যেত বিনা পশুঘ্নাৎ ॥

(ভাঃ ১০/১/৪)

এখানে এই 'পশুঘ্নাৎ' কথাটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ—যে আত্মহনন বা যে অন্য জীবের হত্যার কারণ হয়।

জীবাত্মা মাটি, জল, আগুন, বায়ু, আকাশ আদি পঞ্চ ভৌতিক স্থূল দেহ আর মন, বুদ্ধি, অহংকারাত্মক সূক্ষ্ম দেহে আবদ্ধ হয়ে আছে। তার চিন্ময় স্বরূপ, আত্মাকে উদ্ধারের কোন প্রয়াস করছে না। কৃষ্ণানুশীলন করে এই মনুষ্য জন্মেই আত্মার স্বরূপকে জানা যায়। ভগবৎ-অনুশীলন করে জানা যায় আমরা ভগবানের নিত্য দাস। ভগবান কৃষ্ণ সকলের নিত্য কালের প্রভু। তাঁর নিত্য সেবা করাই সকল জীবের একমাত্র ধর্ম। তা হয়—কৃষ্ণকথা শ্রবণ, কৃষ্ণ-কীর্তন, কৃষ্ণ-স্মরণ, কৃষ্ণ-বন্দন, কৃষ্ণার্চন, ভগবৎ-পাদসেবন, ভগবৎ-

দাস্য, ভগবৎ-সখ্য ও ভগবানে আত্মনিবেদনের মাধ্যমে। এইগুলিকে ভক্তশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদ মহারাজ ভগবৎ-গতি লাভের পন্থা বলে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি হচ্ছেন একজন মহাজন। এরকম বারজন মহাজনই ভক্তি লাভের জন্য কৃষ্ণানুশীলনের উপদেশ দিয়েছেন; তাঁরা হচ্ছেন—

স্বয়ম্ভুর্নারদঃ শম্ভুঃ কুমারঃ কপিলো মনুঃ।
প্রহ্লাদো জনকো ভীষ্মো বলির্বৈয়াসকির্বয়ম্ ॥

(ভা ঃ ৬/৩/২০)

নবধা ভক্তি অনুশীলন করে যে কেউ কৃষ্ণভক্তি লাভ করতে পারেন, এই ন'টির মধ্যে এমন কি শুধু একটি পন্থা দ্বারাও কৃষ্ণপ্রাপ্তি সম্ভব। যেমন মহারাজ পরীক্ষিৎ শুধু ভগবানের কথা শ্রবণ করেই তাঁকে লাভ করেছিলেন। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী কৃষ্ণ-কীর্তন করেই ভগবানকে লাভ করেছিলেন। আর প্রহ্লাদ মহারাজ স্মরণ করেই ভগবানকে লাভ করেছিলেন। অক্রূর, পৃথু মহারাজ, লক্ষ্মীদেবী, হনুমান, অর্জুন ও বলি মহারাজ যথাক্রমে বন্দনা, অর্চনা, পাদসেবন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন করে ভগবৎ-গতি লাভ করেছিলেন।

তবে এই নবধা ভক্তির মধ্যে প্রথম ও প্রধান হচ্ছে শ্রবণ ও কীর্তন। কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ বলেছেন, সদ্‌গুরুর কাছে শ্রদ্ধায় 'হরিকথা' শ্রবণ করলে, হরিকীর্তনের যোগ্যতা অর্জন করা যায়। এভাবে যিনি হরিকীর্তন করেন, তারই স্বতঃস্ফূর্ত হরিস্মরণ হয়। দেহাবসানের সময় এভাবে হরিস্মরণ হলে, নিঃসন্দেহে আমরা শ্রীহরিকে প্রাপ্ত হব। আর যে এই দুর্লভ মনুষ্য জন্ম পরমার্থ লাভে অবহেলা করল সে 'আত্মহনন'ই করল। আর যারা জিহ্বার লালসা তৃপ্তির জন্য কসাইখানা খোলে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে এই কাজের সঙ্গে জড়িত—যেমন আমিষাহারী, তারাও 'পশুঘ্ন', তারা পরমার্থ লাভ করতে পারে না। তাহলে কারা ভগবানের চরণে আশ্রয় গ্রহণ করে? স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় এভাবে তা ব্যাখ্যা করেছেন—

চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জুন।
আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥

যারা বিপন্ন তারা আর্ত, উদাহরণস্বরূপ চতুর্কুমাররা হচ্ছেন জ্ঞানীর দৃষ্টান্ত।

মহারাজ উত্তানপাদের দুই পত্নী ছিল। তাদের মধ্যে সুনীতী ছিলেন ধ্রুব মহারাজের মা। ধ্রুব'র বয়স তখন ৫ বছর। সে সিংহাসনে উপবিষ্ট তার পিতার কোলে বসেছিল। ঈর্ষাপরায়ণ সৎমা তাকে অপমান করে, তার পিতার

কোল থেকে তাকে নামিয়ে দিল। ক্ষত্রিয়ের সন্তান ধ্রুবের এই অপমান সহ্য হল না। সে বুঝতে পারল তার সৎভাই ভবিষ্যতে সিংহাসন অধিকার করবে, সে রাজা হবে। মায়ের উপদেশ পেয়ে আরো বিরাট রাজ্য সম্পদ লাভের জন্য ভগবানের শরণাপন্ন হতে সে প্রয়াসী হল। ভগবান তাঁর প্রিয়ভক্ত নারদমুনি দ্বারা তাকে পরীক্ষা করলেন। দেখা গেল—ধ্রুব তার প্রচেষ্টায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। দেবর্ষি নারদ তাকে 'ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়' মন্ত্র জপ করতে উপদেশ দিলেন। কঠোর তপশ্চর্যায় মাত্র ৬ মাসের মধ্যেই ছোট্ট বালক ধ্রুব ভগবান শ্রীনারায়ণের দর্শন লাভ করলেন। ভগবান শ্রীনারায়ণ তাঁর মঙ্গল শঙ্খ দিয়ে ধ্রুবের শির স্পর্শ করলেন। তিনি ধ্রুবকে বর চাইতে বললেন। ধ্রুব শ্রীভগবানকে দর্শন করে দিব্য আনন্দে অভিভূত হলেন। ধ্রুব তাঁকে বললেন, 'কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে' অর্থাৎ আপনার দর্শন লাভ করে আমি কৃতার্থ হয়েছি; আমার জীবন আজ ধন্য, আমার জীবন আজ সার্থক হল। প্রভু, আমি আর কিছু চাই না। এইটি হচ্ছে ভগবৎ-দর্শনের ফল।

ভগবানের সনাতন ধাম ও তা প্রাপ্তির উপায়

মহারাজ ঋষভদেব বলেছেন,—

নায়ং দেহো দেহভাজাং নৃলোকে
কষ্টান্ কামানর্হতে বিড়্ভুজাং যে।
তপো দিব্যং পুত্রকা যেন সত্ত্বং
শুদ্ধ্যেদ্ যস্মাদ্ ব্রহ্মসৌখ্যং ত্বনন্তম্ ॥

(ভাগবত ৫/৫/১)

অর্থাৎ, "এই মনুষ্য জীবন অত্যন্ত মূল্যবান, তা বিষ্ঠাভোজী শুয়োর বা গাধার মত কঠোর পরিশ্রম করবার জন্য নয়, কষ্ট করবার জন্য নয়। হে পুত্র-গণ, এই মনুষ্য জীবন তপশ্চর্যার জন্য, কেন? কেননা এই তপশ্চর্যার ফলে অনন্ত চিন্ময় সুখ লাভ করা যায়।"

ঋষভদেব ছিলেন ভগবদবতার, তাঁর একশ পুত্র ছিল। সংসার জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করবার সময় তিনি তাঁর পুত্রদের সদুপদেশ দিচ্ছিলেন। এই উপদেশ মহামূল্যবান ভগবৎ-কথামৃত। কৃষ্ণকথা সকলের জীবনেই অত্যন্ত মূল্যবান। ভগবান ও ভগবানের কথা অভিন্ন, ভগবান চিন্ময়, তাঁর কথাও চিন্ময়—অপ্রাকৃত। তাঁর কথা শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণ করে আমরা আজও ভগবৎ-সঙ্গ করতে পারি। ভগবান হচ্ছেন 'পবিত্রম্ পরমম্'—তিনি পরম পবিত্র, তাই তাঁর সান্নিধ্যে আমাদের সমস্ত অশুদ্ধতা দূরীভূত হবে, আমরা শুদ্ধ ও পবিত্র হব। ভগবৎ-কথা শ্রবণ-কীর্তন, স্মরণাদি নবধা ভক্তি অনুশীলন করে আমরা ভগবৎ-ভাবনাময় হব, কৃষ্ণভাবনাময় হব। শ্রীল রূপ গোস্বামী ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন—

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ॥

এই শ্লোকের মাধ্যমে শ্রীল রূপ গোস্বামী জীবের পরম প্রয়োজন ভগবৎ-প্রেম লাভের পূর্বের স্তরগুলি বর্ণনা করেছেন। এইগুলি কি? পূর্ব সুকৃতির ফলে শ্রদ্ধা লাভ হয়, শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি সাধুর মুখ-নিঃসৃত হরিকথা শ্রবণের মাধ্যমে কৃষ্ণভক্ত সঙ্গ করেন। তারপর কৃষ্ণভক্ত সাধুর আনুগত্যে কৃষ্ণানুশীলন করেন। ক্রমে ক্রমে তার সমস্ত অনর্থ দূর হয়। অনর্থ যত দূর হয় কৃষ্ণ ভজনে তার নিষ্ঠা তত দৃঢ় হয়। নিষ্ঠা ক্রমে ঘনীভূত হয়ে তা রুচিতে পরিণত অবস্থা প্রাপ্ত হলে তখন কৃষ্ণ-কথায় আসক্তির উদয় হয়। এই আসক্তি ঘনীভূত অবস্থায় 'ভাব' এ পরিণত হয়। 'ভাব' বা 'রতি' থেকে ভগবৎ-প্রেমের উদয় হয়। এই ভগবৎ-প্রেম বা কৃষ্ণপ্রেমই মানব জীবনের পরম প্রয়োজন।

ভগবান কপিলদেবও তাঁর মাতা দেবহূতিকে বলেছেন—

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।

অর্থাৎ, "শুদ্ধভক্ত সান্নিধ্যে ভগবানের বীর্যবতী কথা যেমন শ্রুতিমধুর তেমনি হৃদয়েও বিমল চিন্ময় আনন্দ দান করে। এইভাবে কৃষ্ণভক্তি অনুশীলন করে অপবর্গ বা সংসার মুক্তি লাভ হয়।" সংসার বন্ধন মোচন হলে, তার ভগবদ্ভক্তি দৃঢ় হয়। তারপরই অনন্য শুদ্ধ ভগবদ্ভজন শুরু হয়। কৃষ্ণ ভজনে উন্নতির জন্য শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তদের সঙ্গ করা চাই বা যারা শুদ্ধভাবে ভজন করছেন তার সান্নিধ্যে কৃষ্ণ ভজন করতে হবে। সেই সময় বিষয়ীদের সঙ্গও একেবারে ত্যাগ করতে হবে। একমাত্র শুদ্ধ ভক্তদের সান্নিধ্যেই কৃষ্ণ ও কৃষ্ণলীলা বুঝা

সম্ভব। সাধারণত অধিকাংশ লোকই মায়াবাদী, অধিকাংশ লোকই জানে না যে ভগবান একজন ব্যক্তি। ভক্তরাই জানে যে ভগবান একজন ব্যক্তি তাই কৃষ্ণভক্তদের সান্নিধ্যেই ভগবানের ব্যক্তিত্ব ও তাঁর দিব্য লীলাবিলাস সমূহ জানা যায়।

শ্রীঈশোপনিষদে ভগবানের ব্যক্তিত্বের উল্লেখ আছে—

হিরন্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তৎ ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে॥

অর্থাৎ, "ভগবানের কাছে আবেদন করা হচ্ছে—তিনি যেন তাঁর নিঃসৃত দিব্য ব্রহ্মজ্যোতি সংবরণ করেন, তা হলে শুদ্ধ ভক্ত তাঁর শ্রীমুখ দর্শন করবার সৌভাগ্য লাভ করবে, অর্থাৎ ভগবানের মুখ আছে, মায়াবাদীদের মতবাদ অনুযায়ী তিনি নির্বিশেষ নন, তিনি সবিশেষ, তিনি একজন ব্যক্তি।"

ব্রহ্মসংহিতাতে এই বিষয়ে বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সৃষ্টির প্রথম জীব ব্রহ্মা সুদীর্ঘকাল ভগবদ্ভজনের পর ভগবান ও তাঁর ধাম দর্শন করেন। তারপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গুণ কীর্তন করে তা বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্॥

অর্থাৎ, "কৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর। তিনি সনাতন, চিন্ময় ও আনন্দঘন তাঁর অপ্রাকৃত দেহ হচ্ছে দিব্য। তিনি আদি, তাঁর পূর্বে কিছুই ছিল না, এবং তিনি সকল কারণের কারণ।" সেই গোবিন্দকে ব্রহ্মা আরাধনা করেন।

ভগবান গোবিন্দের সেই পরম ধাম চিন্তামণিময় ও কল্পবৃক্ষে সেই স্থান পরিপূর্ণ। তিনি সেখানে সুরভি গাভীদের পালন করেন। ১৭৩ সহস্র গোপীরা সম্ভ্রমে সেখানে তাঁর সেবা করেন। এইখানে 'চিন্তামণি' শব্দদ্বারা এক দিব্য, অপ্রাকৃত মণির উল্লেখ করা হয়েছে। জড় জগৎ যেমন ভূমি, জল, আগুণ, বায়ু ও আকাশ এই পাঁচটি ভৌতিক পদার্থে তৈরি হয়েছে, সেই রকম অপ্রাকৃত মণি দিয়ে ভগবদ্ধাম তৈরি। জড়া-প্রকৃতি যেমন জড় জগৎ সৃষ্টি করেছে, সেই রকম 'চিৎ' শক্তি চিন্ময় জগৎ সৃষ্টি করেছে। জড় জগতের 'পরশমণি' বা ঐ জাতীয় আমাদের ধারণার কোন মণি নয় এই 'চিন্তামণি'।

আমাদের ধারণার 'কল্পবৃক্ষ' ধন, পুণ্য-কর্ম ফলাদি থেকে শুরু করে মুক্তি পর্যন্ত সকল জড় কামনা বাসনা পূর্ণ করে। কিন্তু ভগবদ্ধামে কল্পবৃক্ষ 'ভগবৎ-প্রেম' রূপ দিব্য ফল দান করে। আর ভগবদ্ধামের সুরভি অর্থাৎ কামধেনুরা

ভগবৎ-প্রেমরূপ যে দিব্য আনন্দ দান করে, তার ফলে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত জড় জাগতিক ক্ষুধা-তৃষ্ণা থেকে মুক্ত হয়।

যাঁর আয়ত চক্ষু পূর্ণ প্রস্ফুটিত কমলের মত, যাঁর অঙ্গকান্তি শ্যাম জলধরের মত, যিনি সবসময় তাঁর বংশী বাদন দ্বারা নিখিল জীবকুলের হৃদয় আকর্ষণ করছেন, যার শিরদেশ ময়ুরপুচ্ছ শোভিত সেই গোবিন্দের অনন্য, অনুপম সৌন্দর্য সৃষ্টির প্রথম জীব ব্রহ্মার মনের কল্পনা নয়, কৃষ্ণের এই দিব্য রূপ চিন্ময়। শুদ্ধ ভগবদ্ভজনের সময় 'ভাব' সমাধিতে ব্রহ্মা কৃষ্ণের এই অপ্রাকৃত রূপ দর্শন করেন। পদ্মের পাপড়ির মত কৃষ্ণের চোখদুটি তাঁর মুখচন্দ্রিমার অসীম সৌন্দর্য সুষমা প্রকাশ করে। এইভাবে ব্রহ্মাজী ভগবান ও তাঁর অপ্রাকৃত ধামের বর্ণনা করেছেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যখন দিব্য জ্ঞান দান করেছিলেন, তখন তার নিত্য ধামের কথাও সেখানে উল্লেখ করেছিলেন, তিনি বলেছিলেন—

ন তদ্ ভাসয়তে সূর্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্ গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥

ভগবানের ধামে সূর্যের আলো, চন্দ্রের আলো বা বৈদুতিক আলোর কোন প্রয়োজন নেই। এই স্থানকে 'পরমধাম' বলেছেন ভগবান; যে একবার সেখানে যায়, সে আর এই দুঃখ-দুর্দশাপূর্ণ জড় জগতে ফিরে আসে না।

কখনও কখনও ভগবদ্গীতায় ভগবান কৃষ্ণ তাঁর নিত্য ধামকে মদ্‌ধাম বা সনাতন ধাম বলেও উল্লেখ করেছেন। এই সংসারে, এই জড় জগতে কেউই উদ্বেগ-শূন্য নয়, কিন্তু এই জগতের মত ভগবদ্ধাম নয়। সেখানে উদ্বেগ নেই, ভয় নেই, শোক নেই, দুঃখ নেই, দুর্দশার লেশমাত্র নেই—এই জন্য ভগবানের এই ধামকে 'বৈকুণ্ঠ' বলে।

ভগবান যখন নববপু ধারণ করে জগতে আবির্ভূত হন ও দিব্য-লীলা বিলাস করেন, তাঁর ভক্তদের অফুরন্ত আনন্দ দান করেন—সেই অপ্রাকৃত লীলাবিলাস সমূহই তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ লীলা। ভগবদবতার শ্রীল ব্যাসদেব তা শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে বর্ণনা করেছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সবচেয়ে রহস্যময় এই দিব্য লীলাসমূহ কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ 'লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ' গ্রন্থে তা লিপিবদ্ধ করেছেন। এই 'গ্রন্থকে' শ্রীল প্রভুপাদ ভগবদ্ধাম দর্শনের জানালা বলে বর্ণনা করেছেন। জীবের অন্তিম লক্ষ্য ভগবদ্ধাম। কোন লক্ষ্যে পৌছতে হলে প্রথমে সেই স্থান সম্বন্ধে কিছু জানা প্রয়োজন। তাই শ্রীল প্রভুপাদের এই গ্রন্থ পাঠ করে আমরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর দিব্য ধাম সম্বন্ধে জানতে পারি।

এক সময় আমরা, জীবকুল কৃষ্ণভাবনাময় ছিলাম। আজ কৃষ্ণ ও কৃষ্ণের ধামের কথা শুদ্ধভক্ত শ্রীল প্রভুপাদের কাছে জানতে পেরে, আমরা আমাদের অন্তিম লক্ষ্য, সেই ভগবদ্ধাম প্রাপ্তির জন্য অনুপ্রাণিত হতে পারি এবং এইভাবে কৃষ্ণভাবনা অনুশীলন করে সহজেই ভগবদ্ধামে চলে যেতে পারি। ভগবানের ধাম অবাস্তব নয়, কল্পনাপ্রসূত নয়। তাই ভগবদ্গীতায় ভগবান স্বয়ং বলেছেন—

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃণ্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্ ॥

অর্থাৎ, "বিভিন্ন দেবতার উপাসকরা সেই সেই দেবলোক প্রাপ্ত হয়, পিতৃলোক উপাসক, ভূতাদির উপাসক সেই সেই লোক প্রাপ্ত হয় কিন্তু যে আমার উপাসনা করে, সে আমার সঙ্গে আমার লোকে বসবাস করে।" শ্রীল জীব গোস্বামী কৃষ্ণ সন্দর্ভে ভগবানের ধামের আলোচনা করেছেন। কৃষ্ণলোকের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে, তিনি স্কন্ধপুরাণ থেকে উল্লেখ করে লিখেছেন ঃ

যা যথা ভুবিবর্তন্তে পুরয়ো ভগবতাঃ প্রিয়াঃ।
তা তথা সন্তি বৈকুণ্ঠে তৎ তৎ লীলার্থামাদৃতাঃ ॥

অর্থাৎ, "জড় জগতে ভগবানের ধামের অবস্থান হচ্ছে দ্বারকা, মথুরা ও গোকুলে। এই ধামগুলি জড় সৃষ্টির অতীত।" স্বয়ম্ভুবতন্ত্রের শিব-পার্বতীর কথোপকথনে এর সমর্থন পাওয়া যায়।

নানা কল্পলতাকীর্ণং বৈকুণ্ঠং ব্যাপকং স্মরেৎ।
অধঃ সাম্যং গুণানাং চ প্রকৃতিঃ সর্বকারণাৎ ॥

অর্থাৎ, চতুর্দশাক্ষর একটি মন্ত্র জপ করবার সময় সর্ববাঞ্ছাপূর্ণকারী কল্পবৃক্ষপূর্ণ বিশাল বিস্তৃর্ণ বৈকুণ্ঠলোক সর্বদা স্মরণ করা উচিত।" বৈকুণ্ঠলোকের নিচেই জড় জগতের উৎস গুণময়ী জড়া প্রকৃতির অবস্থান।

বৃন্দাবন বা গোকুল গোলোক নামেও অভিহিত হয়, ব্রহ্মসংহিতায় বলা হয়েছে, এই স্থান ভগবদ্ধামের সর্বোচ্চে অবস্থিত। এই গোকুলকে সহস্র কমল দলের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এই কমলের চতুর্ভুজাকার বহির্ভাগকে শ্বেতদ্বীপ বলে। এই গোকুলের অন্তর্দেশে কৃষ্ণের নিত্য পার্ষদ নন্দ-যশোদাদি সহ তাঁর নিত্য আবাসের ব্যাপক আয়োজন রয়েছে।

জীব গোস্বামীর মতে 'বৈকুণ্ঠ'কে কখনও কখনও ব্রহ্মলোকও বলা হয়। নারদ পঞ্চরাত্রে এইভাবে ভগবদ্ধামের উল্লেখ আছে—

তৎ সর্বোপরি গোলোকে তত্র লোকোপরি স্বয়ম্ ।
বিহারেৎ পরমানন্দী গোবিন্দ তুলনায়ক ॥

অর্থাৎ, "গোপীদের অতুলনীয় নায়ক গোবিন্দ পরব্যোমের সর্বোচ্চ গোলোকধামে পরমানন্দে লীলাবিলাস করেন।" মহান বৈষ্ণবাচার্য নরোত্তম দাস ঠাকুর গান গেয়েছেন—

বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন।
কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন ॥

অর্থাৎ, "আমরা বিষয়ভোগ বাসনা যত ত্যাগ করব, আমরা সেই পরিমাণে শুদ্ধ হব। তখন দিব্য দৃষ্টির মাধ্যমে এক সময় আমাদের ধাম দর্শনের সৌভাগ্য হবে।"

স্বরূপতঃ জীব নিত্য ও চিন্ময়, তাই অনন্ত বৈকুণ্ঠলোকে বসবাস করলেই তার জীবন আনন্দময় হতে পারে, এই অনিত্য সংসারে নিত্য জীব কখনও সুখী হতে পারে না। জড় জগতে অবস্থিত দ্বারকা, মথুরা, বৃন্দাবন আদি ভগবদ্ধাম আর চিৎ-জগতের মূল ধামগুলির মধ্যে কোন বিভেদমূলক দৃষ্টিতে দেখা উচিত নয়। কেননা ভগবান যখন এই জড় জগতে আবির্ভূত হন, তখন সর্বশক্তিমান ভগবানের ইচ্ছায় সেই ধামগুলিও এই জগতে আবির্ভূত হয়। তাই শুধু চিজ্জগতের ধামগুলিই চিন্ময় আর এই জগতের ধামগুলি জড়—এই রকম বিবেচনা করা উচিত নয়।

জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধিময় ভবরোগকে কেউ জয় করতে পারে না। যতই কঠোর সংগ্রাম করা যাক না, কেউ প্রকৃতির নিয়মকে অতিক্রম করতে পারে না। সকলকেই একদিন মরতে হবে। তাই এই সংসার-দুঃখ মোচন করে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া আমাদের অন্তিম লক্ষ্য হওয়া উচিত, আর তা একমাত্র শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তের আনুগত্যে শ্রবণ-কীর্তনাদি হরি ভজনের মাধ্যমেই সম্ভব। এই জন্য ঋষভদেব তাঁর পুত্রদের বিষয়ভোগের জন্য কঠোর সংগ্রাম করতে নিষেধ করেছেন। অনন্ত চিন্ময় সুখকর ভগবদ্ভজনের উপদেশ দিয়েছেন, যার ফলে তারা শাশ্বত জীবন লাভ করতে পারে, অনন্ত জীবন লাভ করতে পারে, যে জীবন জ্ঞানময় ও নিত্য আনন্দে পরিপূর্ণ।

প্রকৃতপক্ষে জীবকুলকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য, তাদের জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য কি হওয়া উচিত তা জানাবার জন্য এবং সেই সঙ্গে লক্ষ্যে পৌছাবার পন্থা অর্থাৎ কৃষ্ণভাবনা অনুশীলনের কথাও তিনি বলেছেন। তাই মহাভাগবতদের নির্দেশ মত ভগবানের ব্যক্তিত্ব ও তাঁর ধাম সম্বন্ধে জেনে আমরা যেন আমাদের অন্তিম গতি ভগবদ্ধাম লাভের জন্য অনুপ্রাণিত হই।

ভগবান ভক্তদের সাথে লীলা করেন

ভগবান ভক্তদের সাথে লীলা করেন। সেই জন্য ভক্তিটা হল চিদ্‌তত্ত্ব। চিদ্ মানে চেতন জগতের। শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন 'লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ' বইটা যে পড়বে এবং আকৃষ্ট হবে তাতে সে ভক্ত হবে। কৃষ্ণ বইটা হল চিদ্ জগতের জানালা। যে জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে কৃষ্ণ গরু চরাতে যাচ্ছে কোনদিন তালবন, কোনদিন বৃন্দাবন, কোনদিন বেলবন, কোনদিন মধুবন। এক এক জায়গার এক একরকম বৈচিত্র্য আছে, কোন জায়গায় আমলকী গাছ, কোথাও বা বেলগাছ। কৃষ্ণ আমলকী ও বেল নিয়ে খেলা করছে বন্ধুদের সাথে। কৃষ্ণ বলরাম ও তার সহপাঠীরা কখনো কখনো রাজা রাজা খেলছে। তাদের সহপাঠীরা সুদাম, শ্রীদাম, বসুদাম, আরো অনেকে। কখনো কখনো এদের মধ্যে আবার ঝগড়াঝাটি হয়ও। শ্রীদাম বলে কৃষ্ণ এসব হবে না। কৃষ্ণ বলছে—আমি রাজার ছেলে আমি রাজার পাঠ করব। এক সখা বলে—না, না কৃষ্ণ কোথায় তুমি রাজা, তোমার বাড়ীতে নন্দ রাজা আছে সেখানে গিয়ে রাজাগিরি দেখাও। এখানে আমাদের সাথে চলবে না। কিন্তু কৃষ্ণ হয়ত বা বড়ো গলায় বলতে শুরু করে—না আমি রাজার ছেলে। আবার কখনো কখনো কৃষ্ণের গুরুদেবের ছেলে মধুমঙ্গল বলে—এই আমি ব্রাহ্মণ, অভিশাপ দিব তোমাদেরকে, ঠিকমতো তোরা যদি আমার সাথে ব্যবহার না করিস। তারা বলে—কিসের তুমি ব্রাহ্মণ?

আবার কখনো হয়ত বা মধুমঙ্গলের খাবার থলিটাতে খুব ভাল খাবার আছে। সবাই মিলে যুক্তি করল আমরা চোর চোর খেলব। কানামাছি খেলব। বলরাম বলল—ওর চোখ টিপে ধর। তখন তার মনে হল আমাকে কেন করল। এত সবাই থাকতো তখন সে তার খাবার থলিটা খোঁজ করতে শুরু করল এবং রাগে ও অহংকারে বলল—আমার বাবার বহু শিষ্য আছে জেনে রেখো। আমারও এই রকম বহু শিষ্য আছে। কারণ সে বহু খাবার পেয়ে থাকে। বলরাম থলিটা লুকিয়ে রেখেছে রাধারাণীর ভাই শ্রীদাম এর কাছে। এবং তারা চুপিচুপি বলতে শুরু করছে—এই দেখ কি আছে। তখন মধুমঙ্গল বলল—কি কৃষ্ণ, আমি কিন্তু বুঝতে পারছি আমার খাবার চুরি করছে এরা।'

এই রকম ভারি মজা হয়। এবং তাতে আমাদের আকৃষ্ট হওয়া উচিত। তাহলে কৃষ্ণভক্তি লাভ করা সহজ হবে। আমি কৃষ্ণের সাথে নাচব, খেলব

এবং ঐ অঘাসুরকে বধ করে ওর মুখের মধ্যে খেলব এভাবে প্রলুব্ধ হলে খুব দ্রুত আমরা ভক্তির পথে উন্নতি লাভ করব।

কৃষ্ণের বদলে যদি আমরা আকৃষ্ট হই অন্য কোথাও ভাল খাব ভাল পরব এবং ভাল করে জগৎকে ভোগ করব, তাহলে দেহাত্ম বুদ্ধির ফলে এই জড় জগতে পতিত থাকতে হবে।

কোন একদিন রাধারাণী এক স্বপ্ন দেখে কৃষ্ণকে বলছেন, আমি দেখছি একজন উন্মত্ত হয়ে কখনো গান গাইছে আবার নাচছে, তার গায়ের রং অনেকটা আমার মতো। ইনি কে? আমি বুঝতে পারছি না। কৃষ্ণ একটু হাসলেন, এবং বুঝতে পারলেন। রাধারাণী বললেন আমি স্বপ্ন দেখলাম মুখে খালি 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলছেন তোমার মতো ভাব করছে। কৃষ্ণ জানেন এবং বুঝতে পেরেছেন আমি এক সময় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রূপে জন্মগ্রহণ করব। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রাধাকৃষ্ণের মিলিত তনু। বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন এই রকম লীলা কাহিনী। সেই জন্য ভক্তিটাকে বলে চিদ্ তত্ত্ব। চিদ্ তত্ত্ব মানে এটা চেতন জগতের ব্যাপার। তাই যারা উন্নত ভক্ত তারা এখানে থেকেও বুঝতে পারে রাধাকৃষ্ণ কি করছে, এমনকি দেখতেও পারে।

কৃষ্ণ রাধারাণীর সাথে মজা করবার জন্য কি করছে সে দেখতে পায়। রাধা স্বভাবে লাজুক আবার কৃষ্ণের সৌন্দর্যে আকৃষ্ট। মাঝে মাঝে কৃষ্ণের কাছে কি জানি চায়, কদমফুল। তবে কদমফুল একটু উপরে আছে কৃষ্ণ রাধারাণীকে তুলে ধরল ফুল পাড়ার জন্য। ঐ সময় রাধারাণী ফুল ধরল এবং কৃষ্ণ তখন রাধারাণীকে ছেড়ে দিল এবং তখন রাধারাণী গাছের ডালে ঝুলছে। এই রকম অবস্থা দেখে রূপ গোস্বামী হাসছেন। সেই সময় একজন লোক রূপ গোস্বামীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। সে দেখল যে, রূপ গোস্বামী হাসছে। সে ভাবল, "আমি এসেছি কিছু জিজ্ঞাসা করব তাঁকে, অথচ আমাকে দেখে উপেক্ষা করল, পরিহাস করল।' ঐ অবস্থায় মনের দুঃখে চলে গেল। পরে জানতে পারল যে, উনি আমাকে দেখে হাসেননি। ভক্ত ভগবানের চিন্তায় তন্ময় থাকেন। ভগবানের চিন্তায় গভীরভাবে তন্ময় হলে ভগবান তখন তাঁর সাথে লীলা করেন। এই লীলা করবার সময় ভক্তকে যোগমায়া সাহায্য করেন।

শ্রীল প্রভুপাদের 'লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ' বইটা হল এই রকম। যে, এই জগতের একটা জানালা খুলে দেখাচ্ছে। কৃষ্ণ কতকি করছে তাঁর অন্তরঙ্গা ভক্তদের সাথে। কৃষ্ণ মাঝে মাঝে গাভী চরাতে যাচ্ছে, কখনো কখনো বাড়ী ফিরতে খুব দেরী করছে।

তখন মাতা যশোদা বলছেন নন্দমহারাজকে—ছেলেটা এখনও আসছে না, যাও দেখ আসছে না কেন। বহুবার বলার পর নন্দমহারাজ ছাদে উঠে দেখলেন প্রথমে মাথার চূড়াটা, পরে অন্যান্য অংশ দেখা গেল। যাই হোক কৃষ্ণ বৃন্দাবনের ধুলোবালি মেখে সখাদের সাথে নৃত্য করতে করতে বাঁশি বাজাতে বাজাতে আসছে বাড়ির দিকে। নন্দমহারাজের গোশালাতে বিভিন্ন নামে ৯ লক্ষ ৩০ হাজার গাভী আছে। কৃষ্ণ বাঁশি বাজিয়ে গাভীদের ডাকত এবং গাভীরাও বুঝতে পারত কৃষ্ণ তাদের কাকে ডাকছে। গাভীদের নাম—শ্যামলী, ধবলী ইত্যাদি। বহু গরু আছে তাদের মধ্যে ১০৮ প্রকার শ্রেণীভাগ আছে। একটা গরু পাওয়া না গেলে কৃষ্ণ তাঁকে খুঁজে বের করতেন। কৃষ্ণের বহু লীলা আছে আচার্যরা মাঝে মাঝে একটু আধটু বলেন। এইসব শুনে বৈধীমার্গের ভক্তরা হয়ত চিন্তা করে এমন দিন আমার কবে হবে যে, আমিও ভগবানের সাথে এইরকম করতে পারব। একে বলে চিদ্ বিলাস। ভক্ত ও ভগবানের সাথে ভাবের আদান-প্রদান। শুদ্ধ ভক্ত ভগবানের সেবা করছেন, আবার ভগবান সুযোগ খোঁজেন কখন আমি ভক্তের সেবা করব।

ভগবান ভক্তের কাছে খুব নীচ ধরনের কার্য পর্যন্ত করতে পারেন। যেমন কৃষ্ণ হয়েছিলেন কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধে অর্জুনের রথের সারথি।

অর্জুন জানেন ইনি হচ্ছে ভগবান, কিন্তু তার সঙ্গে এমন একটা সম্পর্ক যে, অর্জুন বলতেও পারে, কৃষ্ণ তুমি আমার রথটা চালাবে। কৃষ্ণ বলেছিলেন হ্যাঁ। একবার অর্জুনদের দূত হয়ে গিয়েছিলেন দুর্যোধনের কাছে। দুর্যোধন কৃষ্ণকে অপমান করল এবং বন্দী করার জন্য আদেশ দিল।

নরোত্তম দাস ঠাকুর ভাবছেন—মহাপ্রভু অপ্রকট হলেন; নিত্যানন্দ প্রভু অপ্রকট হলেন কিন্তু কি দুর্ভাগ্য আমি তাঁদের দেখতে পাচ্ছি না। এই রকম চিন্তা করতে করতে তিনি নিত্যানন্দধামে গিয়েছিলেন, চোখ দিয়ে জল এল, হায়! কোথায় নিত্যানন্দ লীলাস্মৃতি! হঠাৎ গ্রামের কাছে দেখছেন একটা বৃদ্ধ লোক দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—কি ব্যাপার তুমি কাঁদছো কেন? কোথা থেকে এলে? তুমি গৌড়ীয় ভক্ত? নরোত্তম দাস ঠাকুর বলেছেন—হ্যাঁ, আমার দুর্ভাগ্য যে, নিত্যানন্দ প্রভুকে দেখতে পেলাম না, এখন তাঁর লীলা স্থান দেখতে পারবো না ভালো করে। বৃদ্ধ বলছেন—চলো এখন আমি তোমাকে দেখাবো।

নরোত্তম দাস ঠাকুর তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন—আপনি তো খুব বৃদ্ধ হয়ে গেছেন।

বৃদ্ধ বললেন—আমি সব জানি কোথায় কেমন লীলা হয়েছে।

নিত্যানন্দ এইখানে এই গাছের তলায় বালকদের সাথে নানাপ্রকার রামলীলা ও অন্যান্য লীলাভিনয় করেছিলেন। এখানে কৃষ্ণের বিগ্রহ পেয়েছেন, বাঁকারায় বিগ্রহ। দেখাতে দেখাতে যখন শেষ হয়ে গেল, হঠাৎ তার মনে হল বৃদ্ধ গেল কোথায়। তখন মনে হল উনি তো সাধারণ লোক নয়। উনাকে আবার দেখলে ভালো হত। এইরকম চিন্তা করায় বৃদ্ধটি আবার এলেন। একটু পরে আবার বৃদ্ধ চলে গেলেন তখন এমন একটা চিহ্ন রেখে গেলেন যে, নরোত্তম দাস ঠাকুর ভাবে এবং ভক্তিতে মুগ্ধ হয়ে আনন্দে ক্রন্দন করলেন। ভাবের উল্লাসে বুঝতে পারলেন যে, পরম করুণ নিত্যানন্দ প্রভু তাঁর প্রতি কত কৃপাময়!

কিন্তু বর্তমানে আমরা এত অপরাধ করছি যে, আমাদের হৃদয়টা কঠিন হয়ে গেছে। যদি আমরা ঐ রকম যোগ্যতা অর্জন করি তাহলে আমরাও দেখতে পাব।

শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর শিষ্যদেরকে উদ্দেশ্য করে বলছেন—মায়াপুর, এই জায়গা ছেড়ে তোমরা কেউ যেও না। দেখবে এখানে কত লোক আসবে। শ্রীল প্রভুপাদ এই সবকিছু দেখতে পেতেন। যারা সাধনায় উন্নত তাঁরা ত্রিকালজ্ঞ হয়ে যান। গৌরকিশোর দাস বাবাজী, ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এবং ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর এই ব্যাপারে বহু কিছু বলেছেন। ভালোও বলেছেন আবার খারাপও। যাঁরা তাঁদের সান্নিধ্য পেয়েছেন তাঁরা লিখে রেখেছেন। ভক্তরা আনন্দ পায় ভগবানের সান্নিধ্যে। সেই জন্য শ্রীল প্রভুপাদ এবং তাঁর পূর্ব পূর্ব আচার্যরাও বলে গেছেন ভক্ত এই জগতে নেই। একজন ব্যক্তি ঘুমিয়ে থাকলে তার শরীরটা ঐ স্থানে থাকে কিন্তু সেই ব্যক্তি কি সেইখানে আছে? ঠিক সেইরকম ভক্ত তন্ময় থাকে 'মচ্চিত্ত মদ্‌গতপ্রাণা' তার মন, প্রাণ, শরীর, ভগবানের সেবায় উৎসর্গীকৃত থাকে। 'বোধয়ন্ত পরস্পরম্' ভগবানের কথা আলোচনা করে। 'কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যম্'। ২৪ ঘণ্টা ভগবানের কথা ছাড়া অন্যকথা বলে না।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন যদি তোমরা আমাকে প্রীত কর এবং চাও আমি এখানে থাকি, তাহলে, কৃষ্ণকথা ছাড়া অন্য কথা বলো না। এটাই আদর্শ। এটাই সাধনা।

আমরা পারি না। চেষ্টা করতে হবে। শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন ইসকন মানে তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে ওঠ, তাড়াতাড়ি স্নান করে মঙ্গল আরতিতে যোগ দাও।

জপ শেষ কর। মঙ্গল আরতির পূর্বে জপ শেষ করতে পারলে আরো ভাল। ১৬ মালা কমপক্ষে খুব ভাল করে শেষ করতে হবে। না হলে বিপদ আছে। হঠাৎ মায়ার আক্রমণের বেগ সহ্য করতে পারবে। হরিকথা শোন এবং সংকীর্তনে যাও। প্রত্যেক সকাল সন্ধ্যার সময় মন্দিরে নৃত্য-কীর্তন কর। Krishna Consciousness মানে শ্রবণ, কীর্তনের আনন্দে যুক্ত থাকবে। বাকী সময় রাস্তায় গিয়ে সংকীর্তন কর, Book distribution কর এবং প্রসাদ বিতরণ কর। আমি জানি আমাদের Society মানে হচ্ছে তাই। কিন্তু দেখ কোন ভক্তের চরণে অপরাধ না হয়। ভক্তের মনে আঘাত দিও না। তা হলে এক জীবনেই ভগবদ্ধামে চলে যাবে।

হরেকৃষ্ণ মন্ত্রকে বলা হয় মহামন্ত্র। একজন ভক্ত শ্রীল প্রভুপাদকে বলেছেন—সবাইকেই কি ব্রাহ্মণ-দীক্ষা নিতে হবে? শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন—না, সবাইকেই ব্রাহ্মণ দীক্ষা নিতে হবে—তার কোন কারণ দেখছি না; মহামন্ত্রের মধ্যে সবকিছু আছে, কিন্তু কেউ যদি খুব গুরুত্বপূর্ণভাবে ভক্তিজীবনটাকে গ্রহণ করে পূজারীর কাজ করে এবং বিশেষ ক্ষেত্রে যজ্ঞ করলে তাকে ব্রাহ্মণদীক্ষা দেওয়া হবে। ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা করা উচিত—আমাকে আপনি গ্রহণ করুন এবং আপনার দাস বলে স্বীকার করুন এবং আপনার সেবায় নিয়োজিত করুন।

কে কতটা কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদির বেগ থেকে মুক্ত হয়েছে। 'তদারজস্তমো ভাবাঃ কামলোভাদয়শ্চ যে।' আমি কতটা কাম ক্রোধ থেকে মুক্ত হয়েছি। শুদ্ধ হলে সাত্ত্বিক গুণ এবং বিশুদ্ধ শুদ্ধ হলে আরো ভাল। শুদ্ধভক্ত বিশুদ্ধ সত্ত্বে স্থিত। সেটা বলতে গেলে চিদ্ জগৎ। চিদ্ জগতে আছে বিশুদ্ধ সত্ত্ব স্তর। ভগবান বিশুদ্ধ সত্ত্বের মূর্তিমান বিগ্রহ। এই জগতে বেশী দেখতে পাওয়া যায় না বিশুদ্ধ সত্ত্বের ব্যক্তি। 'সত্ত্ব বিশুদ্ধং বসুদেব শব্দিতম্'।

ভগবান বসুদেবের হৃদয় থেকে দেবকীর হৃদয়ে গেলেন। তেমনি বিশুদ্ধ সত্ত্বে অধিষ্ঠিত হলে গুরুর হৃদয় থেকে শিষ্যের হৃদয়ে ভক্তি সঞ্চারিত হয়। 'দেবকী' কথার অর্থ সে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে স্বামীর কাছে নিবেদন করেছে। শিষ্য মানে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে গুরুর কাছে নিবেদন করা।

অর্থাৎ, গুরুদেবের কথামতো চললে মায়ার হাত থেকে মুক্তি পাবে। অর্থাৎ, গুরুদেবের আদেশ মতো ২৪ ঘণ্টা ভগবানের সেবা করছে। নিজের চেষ্টায় করলে তাহলে মায়াবাদী হয়ে গেল। মায়াবাদী নিজের বিদ্যাবুদ্ধির দ্বারা ভগবানকে জেনে নেওয়ার, ভগবানকে দেখে নেওয়ার এবং সাফল্য অর্জন

করার অভিমান করে। যতক্ষণ না আমি আচার্যদের কৃপাদৃষ্টি পাচ্ছি ততক্ষণ ভগবানের কৃপা লাভ করা সম্ভব নয়। তাঁর কথামতো চলা খুব কঠিন, সেটাই সাধনা।

'চেতোদর্পণ মার্জনম্' চিত্তদর্পণটাকে পরিষ্কার কর, হরিনাম মহামন্ত্র উচ্চারণ করবার মাধ্যমে। জীবকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি গুণ্ডিচা মার্জন লীলা করলেন। ভগবান যাহা কিছু করেন গভীর অর্থপূর্ণ, আমাদের শিক্ষাদানের জন্য, হৃদয়ের গভীরে কত প্রকার কামনা বাসনা আছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দেখিয়ে গেছেন কিভাবে এই হৃদয়ে অবস্থিত ময়লা দূর করা যায়। সবাই মিলে যত ময়লা আনল, তিনি একা তাদের সমান ময়লা আনলেন তারপর আবার সকলে জল দিয়ে ধুচ্ছে, কলসী কলসী জল নিয়ে এল মন্দির মার্জন করবার জন্য।

কিছু কিছু যেমন পাথরে দাগ থাকে তেমন আমাদের হৃদয়েও আছে প্রতিষ্ঠা, কনক-কামিনী, যদিও বা কনক কামিনী যায় তথাপিও প্রতিষ্ঠার আশা সহজে যায় না।

আমাদের দর্শন সম্পর্কে শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন কৃষ্ণ হচ্ছেন সকলের প্রভু, জীবমাত্রই কৃষ্ণের দাস এটাই জগৎবাসীকে শিক্ষা দিতে হবে। আমাদের উদ্দেশ্য হল ২৪ ঘণ্টা কেবল মাত্র কৃষ্ণের সুখের জন্য যত্ন করা। এটাই ইসকনের দর্শন।

জঙ্গলে আগুন লাগলে বনের পশু পাখি সব সময় উদ্বিগ্ন থাকে, সংসার মানেই তাই। 'সংসার দাবানল লীড় লোক' কারণ এই দেহটাকে 'আমি' ভেবে দেহের সুখের জন্য অনেক ক্লেশ স্বীকার করছি। আমি জপে আনন্দ পেলে দেহাত্ম বুদ্ধি চলে যাবে। কৃষ্ণ সেবায় আনন্দ পেয়ে যে, ২৪ ঘণ্টা কৃষ্ণের সুখের জন্য সেবা করছে সে অবশ্যই কৃষ্ণকে অনুভব করবে সবসময়।

গোস্বামীরা আমাদের আদর্শ। এত কৃষ্ণসেবায় ব্যস্ত যে মাত্র ২ ঘণ্টা ঘুমের জন্য ব্যবহার করছেন, রঘুনাথ দাস গোস্বামী। তাঁরা ভগবানের পার্ষদ, তাদের চিন্ময় তনু, আমাদের তা নয়। কিন্তু করতে করতে হবে। ভগবান হচ্ছেন সমস্ত আনন্দের উৎস। তার সেবা করে যদি আমরা আনন্দ পাই, তা হলে দেহের আকর্ষণ, বিশেষতঃ খাওয়া, ঘুমটা কমে যাবে। না হলে এর বিপরীতটাই হবে যা তমোগুণের লক্ষণ।

চায় না কেউ দুঃখ দুর্দশা, উদ্বেগ, কিন্তু সংসার মানে তাই। এবং বদ্ধ জীবের জীবনযাত্রা মানে তাই। সংসার মানে কুণ্ঠা ধর্ম। ভগবানের সেবা

করলে বৈকুণ্ঠ ধর্ম। কেবলমাত্র ভগবানের ভজন করবার মাধ্যমে এই বৈকুণ্ঠে কুণ্ঠাহীনভাবে বসবাস করতে পারবে। তাহা না হলে দাবাগ্নি উপভোগ করতে হবে এই বদ্ধ জীবনে।

আমাদের জীবন মানে ভবমহাদাবাগ্নি। একবার বদ্রীনাথের পথে যেতে যেতে আমি দেখছিলাম গাছে গাছে ঘর্ষণে আগুণ ধরে গিয়েছে। এই আগুন নেভানো কষ্টকর। কিন্তু যদি কেউ বালতি বালতি জল ঢালে তাও নেভানো সম্ভব নয়। যদি ভগবানের বিশেষ কৃপায় প্রবল বর্ষণ হয় তাহলে আগুন নিভবে।

ভগবান বা ভগবানের প্রতিনিধি শ্রীগুরুদেব সংসার দাবানল নেভাতে পারেন। কিন্তু তাঁর কথা না শুনলে কি করে হবে। ভগবানের কথামতো যে আচরণ করছে সে সংসারের সমস্ত দুঃখ ভয় হতে মুক্ত হচ্ছে।

সাধারণত উপযুক্ত শিষ্য ও উপযুক্ত গুরু না হলে কি লাভ হবে। 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে'।

আমাদের লক্ষ্য করা উচিত দিন দিন আমার কি আনন্দ বর্ধন হচ্ছে কি হরির লীলায়। এই আনন্দ জড় নয়। ভগবদ্ভক্তির আনন্দ ক্রম বর্ধমান। পবিত্র হরিনামের মাধ্যমে।

শ্রীল প্রভুপাদের এক শিষ্য শ্রীল প্রভুপাদকে লিখেছেন যে, প্রভুপাদ আপনি কৃষ্ণের অর্থ লিখেছেন কিন্তু রাধারাণীর অর্থ তো লিখেন নি। উত্তরে প্রভুপাদ বলেছেন—রাধারাণী আরাধনা। আরাধনার মূর্ত প্রকাশ রাধা। তার মতো কেউ ভগবানের সেবা করতে পারে না। যত ভালই সেবা করুক না কেন রাধারাণীর মতো তুমি পারবে না। রাধারাণীর খুব প্রিয় নাম গান্ধর্বিকা। এই গান্ধর্বিকা নাম বলতে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চোখ দিয়ে জল পড়ত। রাধারাণীর কৃষ্ণের প্রীতি বিধান করবার জন্য ভাল নাচ-গান সমস্ত করেন। যদি কেউ কোন সেবা ভাল করে, তাহলে সে রাধারাণীর কৃপা পেতে পারে।

শুদ্ধ সাত্ত্বিক হওয়ার সহজ পন্থা

ব্রাহ্মণ বলে পরিচিত অনেকেই আছেন। ব্রাহ্মণত্ব হল পারমার্থিক জীবনের প্রথম সোপান; অন্তত এটা জানতে হবে যে, 'আমি দেহ নই।' শম, বিশেষ করে মনকে, ইন্দ্রিয়কে সংযত করতে হবে। হরিকথা বললে মন শুদ্ধ হয়, যারা শুনছে তারাও শুদ্ধ হয়। যে সব সময় ভগবানকে স্মরণ করছে, তার বাইরেটা শুদ্ধ হয়, অন্তরও শুদ্ধ হয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন—'তোমাদের বদ্রিকা আশ্রমে গিয়ে ঠাণ্ডায় গলা পর্যন্ত জলে ডুবে তপস্যা করার দরকার নেই বা চারিদিকে আগুন জ্বালিয়ে প্রচণ্ড গরমেও তপস্যা করার দরকার নেই'—এসব আগে করা হত; তিনি বলেছেন, যুক্ত বৈরাগ্য অভ্যাস করতে, সব কিছুই যতটা সহ্য হয়, সেই মতো করতে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

শ্রীল প্রভুপাদ আমাদের বলেছেন, সাড়ে চারটায় মঙ্গল আরতির জন্য সাড়ে তিনটায় উঠে ঠাণ্ডা জলে স্নান—এটা করলেই চলবে। অনেকে উঠতে চায় না সেই সময়ে। তপস্যা করলে আমাদের যে অস্তিত্ব, সত্ত্ব—সেটা শুদ্ধ হয়। আমরা যদি পবিত্র না হই, তা হলে ভগবান আমাদের সেবা কেন গ্রহণ করবেন? এই জন্য আমরা সাত্ত্বিক আহার করি—সাত্ত্বিকের চেয়েও বেশি, কারণ যা সাত্ত্বিক, তা ভগবানকে নিবেদন করলে বিশুদ্ধ সত্ত্ব বা নির্গুণ হয়।

বৈষ্ণবদের মধ্যে শ্রীল প্রভুপাদ দু'টি জিনিস প্রধান কর্তব্য বলে দিয়েছেন—প্রসাদ বিতরণ আর গ্রন্থ দিয়ে হরিকথা শোনানো; এমনি শোনালে লোকে ভুলে যায়। যদি সত্যি কেউ সাধুসঙ্গ করতে চায়, তবে প্রভুপাদের গ্রন্থ, যা ভক্তরা বিতরণ করছে, তার কয়েকটা বাড়ি নিয়ে যেতে হবে। কত পয়সা লোকে নষ্ট করে। এই বইগুলি স্পর্শ করলেও কল্যাণের খনি উদ্‌ঘাটিত হবে, আর পড়লে তো আপনার সব ইচ্ছা পূরণ হয়ে যাবে।

শ্রীমদ্ভাগবতে (৪/৭) বর্ণিত দক্ষযজ্ঞের কাহিনীতে দক্ষ শিবকে অপমান করায় শিব কুপিত হয়ে যজ্ঞের সব কিছু উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন। তারপর শিব যখন তুষ্ট হলেন, আবার যজ্ঞের অনুষ্ঠান হল। তখন তিনি ব্যক্ত করছেন যে, তাঁর মন যেহেতু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নিবিষ্ট আছে, তাই তিনি তাঁর সমালোচনায় বিচলিত বা চঞ্চল হচ্ছেন না। সব থেকে বড় বিচার্য হচ্ছে—আমি কি বৈষ্ণব হয়েছি, শুদ্ধ ভক্ত হয়েছি?

রামায়ণে জটায়ু পাখি শকুনি ছিল। যুদ্ধে তার ডানা কেটে গেল, কিন্তু সে ভগবানের কথা চিন্তা করতে ভুলল না; ভগবান নিজে এসে তাকে উদ্ধার করে নিলেন—কত ভাগ্যবান! আর আমরা দুর্লভ মনুষ্য-জন্ম পেয়েও এর সুযোগ নিতে পারব না? না নিলে এর থেকে দুর্ভাগ্যের আর কি আছে?

ভক্তের লক্ষণ হচ্ছে, সে নিজেকে দীন হীন বলে মনে করে। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর একটা গান লিখেছেন—

"আমার জীবন, সদা পাপে রত,
নাহিক পুণ্যের লেশ।"

—জীবনে কত পাপ করেছি, অন্যের দোষ খুঁজে বেড়িয়েছি, নিজের দোষ দেখিনি। অন্যে অসুখী হলে আমি আনন্দ পাই। আসলে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর নিজে তো আর তা নন, তিনি আমাদের শিক্ষা দিচ্ছেন।

যেমন, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীপাদ বলেছেন, 'দার্শনিকেরা এইরকম চিন্তা করে যে, শূকরেরা বিষ্ঠা খাচ্ছে আর আমি রাবড়ি রসমালাই খাচ্ছি, কেন? সক্রেটিসকে যখন রাজার লোকেরা ধরেছে তারা বলেছিল, এই লোকটা নতুন জিনিস প্রচার করছে, লোকে এর কথা শুনছে, আমাদের ক্ষমতা যদি কমে যায়? তখন তারা রাজাকে গিয়ে বলল, তারা তাঁকে বিষ খাওয়াতে এল।

পৃথিবীর ৯৯.৯ শতাংশ লোক আসল জিনিস দেখতে পায় না, কাম ক্রোধে মত্ত থাকে। সক্রেটিস বলেছিলেন, 'আগে তো ধরুন আমাকে, তবে তো বিষ পান করাবেন।' সাধারণ লোক এই কথার মর্ম বুঝতে পারল না। উনি বলতে চেয়েছিলেন—আমি তো দেহ নই, আমি আত্মা।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলতেন, দিনরাত আমরা কৃষ্ণকথা আলোচনা করি, লোকে আমাদের পাগল ভাবতে পারে। দুনিয়ার বেশির ভাগ লোকই তো পাগল, কেউ টাকার প্রতি, কেউ স্ত্রীলোকের প্রতি, কেউ নাম-যশ-প্রতিপত্তির প্রতি। কিন্তু সে-ই বুদ্ধিমান, যে কৃষ্ণের প্রতি পাগল। 'হে কৃষ্ণ, আমাকে আপনার সেবায় নিন।' সত্যিকারের ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের কাছে সেবা চায়—তার সবই ভগবান করে দেন।

পৃথিবীর লোকেরা কত মানসিক শারীরিক দুঃখ পাচ্ছে, জ্ঞানীরও রেহাই নেই, কি ইন্দিরা গান্ধী, কি মহাত্মা গান্ধী। কিন্তু 'রাখে কৃষ্ণ মারে কে, মারে কৃষ্ণ রাখে কে?' পাণ্ডবদের দৃষ্টান্তেই আমরা দেখতে পাই, কতবার দুর্যোধনের কত রকম কুমতলব থেকে তাঁরা রক্ষা পেয়েছেন।

'বিপদে মধুসূদন।' তা বলে সারা জীবন পাপ করব আর শ্রীকৃষ্ণ রক্ষা করবেন? আপনি বাবার কথামতো চলছেন না, আর একজন হয়তো কথামতো চলছে, বাবা খেতে দেবে পরতে দেবে, কিন্তু আপনাকে সিন্দুকের চাবিটা দেবে না। এই যদি হয় সাধারণ ক্ষেত্রে, ভগবানের ক্ষেত্রেও তাই হওয়াটা স্বাভাবিক। বাড়িতে আগুন লাগলে একেবারে যারা শিশু তারা অসহায়, ছোট ছেলেমেয়েরা হয়ত পালিয়ে যাবে।

ভক্তরাও সেই রকম, তাঁরা কেবল ভগবানের উপর নির্ভর করে থাকেন, বলেন—'ভগবান, আমার বুদ্ধি নেই, চিত্তবৃত্তি নেই, তুমি আমাকে রক্ষা কর।' সত্যি তাই। তাই যখন বিপদ হয়, ভগবান আগে তাঁকে রক্ষা করেন।

বিষয়ী ব্যক্তিদের যদিও অর্থ আছে, বল আছে, তবুও তারা ভগবানকে দিতে চায় না। ভারতে কিন্তু এখনও দেখা যায় ধনী ব্যক্তি ভারতের শ্রেষ্ঠ শিল্পপতি বিরাট বিষ্ণুমন্দির করে দিলেন, অপূর্ব সাজসজ্জা, চমৎকার বিগ্রহ, চমৎকার গহনা। আমার গুরু মহারাজ তাই ছিলেন—কি সুন্দর শ্রীকৃষ্ণকে সাজিয়েছে, এদেশী ও বিদেশী ছেলেমেয়েরা, শ্রীল প্রভুপাদ শিখিয়েছেন, শ্রীকৃষ্ণ কি পছন্দ করে জানতে হবে, কি করলে শ্রীকৃষ্ণকে আরও ভালো দেখাবে—এসব লেখা আছে শাস্ত্রে। যার অর্থ নেই, সে হাতে কাজ করে দিচ্ছে, আর যার অর্থ আছে, সে অর্থ সাহায্য দিয়ে সেবা করছে।

মহান আচার্যরা যা বলেছেন, আমাদের তা শিখে নিতে হবে—লোভ মোহ মদ মাৎসর্য ত্যাগ। কত ধনী লোকের ছেলেরা মদ-মাংস খাচ্ছে, তারা জানে না—মাম্ স—আজকে যাকে তুমি খাচ্ছ, একদিন তোমাকে সে-ই খাবে।

মহাজনদের উপলব্ধি বুঝতে সময় লাগে। এখন সাধু-বৈষ্ণব জনের সেবা করতে হবে, যার সেবা করব তার গুণ আমাদের মধ্যে চলে আসবে। ভগবানের সেবক হলে ভগবানের গুণ আমাদের মধ্যে পাব।

এখানে রাশিয়ানরা এদেশের মতো অন্ন সুক্তো ডাল চচ্চড়ি খাচ্ছে। কিন্তু আমাদের ভাতের বদলে কেবলই স্যাণ্ডউইচ্ খেতে বললে খাবেন? একদিন দু'দিন—তার বেশি চলবে না। তারা নিশ্চয়ই কিছু পেয়েছে, যার কাছে এই ত্যাগ তুচ্ছ! নতুন সাত্ত্বিক জীবনধারা মেনে নিয়েছে।

উপনিষদে আছে, ভগবান বৈকুণ্ঠে আছেন কোটি কোটি মাইল দূরে, আবার আমাদের অন্তরেও আছেন। ভক্তের বিপদ হলে তিনি এক মুহূর্তে তাঁকে রক্ষা করতে পারেন। এত জেনেও আমাদের দেশের অনেকে বলে, হরেকৃষ্ণ বললে আমার পেট চলবে? একবার মহাপ্রভুকে একজন অমেধ্য (অপবিত্র) কিছু দ্রব্য

'প্রসাদ' বলে দিয়ে গেল, কোথা থেকে একটা চিল এসে সেই সমস্তই ছোঁ মেরে নিয়ে চলে গেল, আর যে লোকটা মহাপ্রভুকে আজেবাজে জিনিস খেতে দিয়েছিল, তার গা-টা আঁচড়ে কামড়ে দিল। ভগবানের দ্বারা সুরক্ষার এই রকম বাস্তব অভিজ্ঞতা ভক্তদেরও আছে।

দুর্বাসা মুনি একবার ভক্ত অম্বরীষ মহারাজের কাছে অকারণে অপরাধ করায় সুদর্শন চক্রের কোপে পড়েছিলেন। ব্রহ্মা, শিব সকলের কাছে তিনি আশ্রয় প্রার্থনা করতে করতে ছুটছিলেন; শেষে নারায়ণ বললেন, 'দেখ, কেউ আমার ভক্তের সাথে খারাপ ব্যবহার করলে আমিও তাকে রক্ষা করতে পারি না। যার কাছে তুমি অপরাধ করেছ, তিনি নিজে ক্ষমা করলে, তবেই নিস্তার পাবে।'

ভগবানের পাদপদ্ম এমন জিনিস যে, রুক্মিণীদেবী একবার শ্রীকৃষ্ণকে বলেছেন, 'তোমার পাদপদ্মে যে কি জাদু আছে, তা তুমি নিজেই জান না।' যখন প্রলয় হয়, ছোট্ট গোপাল কৃষ্ণ বট পাতার ওপর শুয়ে শিশুসুলভ ভাবে পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ চোষেন। তাঁর পায়ের মধ্যে এমনই মাধুর্য আছে যে, ভগবান নিজে পর্যন্ত লোভ সামলাতে পারেন না তাঁর নিজের পায়ের ওপর।

তাই রুক্মিণীদেবীর মন্তব্যে শ্রীকৃষ্ণ বিস্ময় প্রকাশ করে ভাবলেন, 'আমিও একবার ভক্ত হয়ে এসে দেখব।' তখন তিনি শ্রীচৈতন্যদেব হয়ে এলেন, ভক্তের রূপ নিয়ে দেখালেন—ভগবানকে কেমন করে ভক্তি করতে হয়, এবং ভগবানের শুদ্ধ ভক্তদেরও কিভাবে শ্রদ্ধা করে চলতে হয় আর তাঁদের চরণে ন্যূনতম অপরাধ করার সম্ভাবনা থেকেও নিরস্ত থাকতে হয়।

একবার শ্রীকৃষ্ণের সেবা করলেই তিনি আমাদের মনে রাখবেন

শ্রীকৃষ্ণ নিজে ভগবদ্‌গীতায় বলছেন যে, বহু বহু জন্ম পরে, যে ব্যক্তি প্রকৃত জ্ঞান প্রাপ্ত হতে পারেন তিনি আমার প্রতি আত্মসমর্পণ করেন। এই জ্ঞানটি হল—বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণই হলেন সমস্ত কিছু। অথর্ব বেদে একথা উল্লেখ আছে।

জন্ম জন্ম ধরে জ্ঞানের সন্ধানে কঠোর তপশ্চর্যা করে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করা যায়—তখন তাকে জ্ঞানী বলা হয়। অবশেষে জ্ঞানী যখন জানতে পারে যে,

পরম জ্ঞানটি হল—বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণই সব কিছু তখন সে আত্মসমর্পণ করতে চায় এবং ভক্তে পরিণত হয়। 'ভক্ত' মানে, যে আত্মসমর্পিত।

একবার যে আত্মসমর্পণ করে, শ্রীকৃষ্ণ তার নিষ্ঠা দেখে তাকে সমস্ত জ্ঞান দান করেন। সেই রকম ব্যক্তির লক্ষণ হল 'মচ্চিত্ত মদ্‌গতপ্রাণ'—তাঁর মন সব সময়ে শ্রীকৃষ্ণে নিবিষ্ট এবং জীবন সম্পূর্ণ রূপে শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিয়োজিত। এই রকম ভক্তের চব্বিশ ঘণ্টা নিজেদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের আলোচনা করে পরস্পর উদ্দীপ্ত বোধ করেন। সময়, স্থান বা পরিস্থিতির বিচার তাঁদের থাকে না। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এই রকম ভক্তিপূর্ণ ভালবাসার দরুন হৃদয়ের অভ্যন্তর থেকে শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের বুদ্ধি প্রদান করেন যাতে তাঁরা তাঁর কাছে ফিরে আসতে পারেন।

সেইটিই আমাদের উদ্দেশ্য। কিন্তু যারা কেবলই তপশ্চর্যা অনুশীলন করে অথচ আত্মসমর্পণ করতে জানে না, শ্রীকৃষ্ণ তাদের প্রতি অতটা কৃপা প্রদর্শন করেন না। কারণ একটি পর্যায়ে পৌঁছে তারা ভাববে—আমি একজন সাধক, পরম শক্তির অধিকারী আমি।

মায়াবাদীরা ভাবে, ব্রহ্মই পরম সত্য। জীবের প্রকৃতিগত অবস্থা যেহেতু ভগবানের দাসরূপে, এবং তিনিই হলেন পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ, তাই ভগবানের সেবা, ভক্ত এবং শ্রীকৃষ্ণ—এই তিনটি বস্তু নিত্য, চিরশাশ্বত।

যারা ভগবানের চরণকমলের সেবা করে না, তারা ব্রহ্মজ্যোতি প্রাপ্ত হতে পারলেও ভগবানের সেবায় অবহেলা করার ফলে আবার পতিত হয়।

অতএব সর্ব প্রথম নিজেকে সঠিক স্থানে বসাতে হবে যে, আমি ভগবানের নিত্যদাস। জগতের অনিত্য সব কিছু ভগবানের আনন্দ বর্ধনের জন্য কাজে লাগানো ছাড়া এখানে আমার আর কোনও কাজ নেই। এইভাবে সম্পূর্ণরূপে শ্রীকৃষ্ণের আনন্দের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হতে পারলে নির্মল হওয়া যায়। অর্থাৎ, ইন্দ্রিয়গুলিকে ইন্দ্রিয়ের মালিক হৃষীকেশের আনন্দ উৎপাদনের জন্য নিয়োগ করতে হবে—এটিই ভক্তি।

প্রকৃত জ্ঞান লাভ করলে সব কিছু সঠিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দর্শন করা যায়, এবং তখন দেখা যায় যে, সকলে নিদ্রামগ্ন। দ্বিজমণি গৌরাঙ্গদেব বলেছেন—'জীব জাগো জীব জাগো (গোরাচাঁদ বলে) কত নিদ্রা যাও মায়া-পিশাচীর কোলে"—'কোল' বলতে স্নেহ মমতা বোঝায়।

লোকে ভাবে—খাচ্ছি দাচ্ছি আমি তো বেশ আছি। কিন্তু এটা হল জড় অস্তিত্ব। আধ্যাত্মিক বা দিব্য অস্তিত্ব মানে হল ইন্দ্রিয়কে সংযত করা, ইন্দ্রিয়

ভোগ বন্ধ করা, তবেই সে আলোক প্রাপ্ত হতে পারবে। যে ভক্তিমূলক সেবা চর্চা করে, তার প্রকৃত জ্ঞান রয়েছে। সে জানে শ্রীকৃষ্ণ হলেন প্রভু, আর সকলেই তাঁর সেবক এবং তাঁদের কর্তব্য তাঁর সেবা করা। যখন আমি এই দেহ এবং এই জগৎ ত্যাগ করব, আমাকে অন্য কোথাও যেতে হবে।

গজেন্দ্র-র কাহিনীতে আমরা দেখি, গত জন্মে সে পারমার্থিক ক্রিয়াকলাপ অনুশীলন করত। তাই এই জন্মে বিশাল হাতির দেহ পেয়ে সে হাতিদের রাজা হয়েছিল। ত্রিকূট পাহাড়ের কাছে মনোরম এক পদ্ম সরোবরে সে সঙ্গিনীদের নিয়ে খেলা করছিল। সকলেই তার নিজের নিজের স্থান মর্যাদা অনুসারে আনন্দ উপভোগ করতে চায়, এবং একটা সময় আসেই, যখন অনেক দুঃখ-দুর্দশা নেমে আসে। গত জন্মে যদি কিছু সেবা করা থাকে, তা হলে ভগবান তাকে মনে রাখেন। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, কেউ যদি অল্প মাত্রও তাঁর সেবা করে, তিনি তা ভুলেন না।

তাই জলের মধ্যে ক্রীড়ারত হাতিটি হঠাৎ টের পেল-সে এক কুমিরের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। জলের মধ্যে কুমিরের ক্ষমতা অসীম। কথায় আছে—'জলে থেকে কুমিরের সাথে ঝগড়া করা চলে না', কারণ জলই তার অংশ। হাতিও খুব বলশালী, কিন্তু সেটা ডাঙায়।

তবে, যে মুহূর্তে আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি শ্রীশ্রীরাধামাধবের সেবায় কাজে লাগাই, তখনি আমরা আধ্যাত্মিক চিন্ময় স্তরে পৌঁছে যাই। এই প্রসঙ্গে বৈষ্ণব-শিরোমণি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন—সেই চিন্ময় স্তরে কোনও ভয়, কোনও দুঃখ থাকবে না, সব কিছু আনন্দময়, প্রতি মুহূর্ত অমৃতময় মনে হবে।

যাই হোক, সেই হাতিটি যখন কুমিরের সাথে যুদ্ধ করছিল, তার কোনও সঙ্গিনী হাতি তাকে সাহায্য করতে এল না। জড় জগৎ এই রকমই, আমাদের তথাকথিত নিকট-আপনজনেরা আমাদের সাহায্য করতে পারে না। কিন্তু আমরা যদি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কোনও সেবা করে থাকি, তবে তিনি আমাদের মনে রাখবেন; এবং আমরা যদি তাঁকে আত্মসমর্পণ করি, তিনি আমাদের সাহায্য করবেন।

এইভাবে গজেন্দ্র খুবই দুর্দশায় পড়েছিল, কুমিরটা তার রক্ত খেয়ে আরও শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল, হাতিটি খানিক পরে ক্রমশই নিস্তেজ হয়ে আসছিল। জড়জাগতিক অস্তিত্বে এমনটিই হয়। আমরা বুদ্ধিমত্তা দিয়ে শক্তি, ক্ষমতা, সঞ্চয় দিয়ে যুঝে চলি। বার বার পরিকল্পনা করি জড়জাগতিক নিয়মে বার বার তা অসফল হয়ে যায়। আমরা হতাশ হয়ে পড়ি, সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়।

গজেন্দ্রের পরিস্থিতি এমনই হয়েছিল—আর্তবন্ধু। কে হতাশায় ভোগে না? সকলেই ভোগে। কিন্তু বন্ধুটি কে? পরম পুরুষোত্তম ভগবান—শ্রীকৃষ্ণ। তিনি আমাদের পরম শুভাকাঙ্ক্ষী। এই সমস্ত যে বিশ্বাস করতে পারে, সে তখনই শান্তি বোধ করে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণই সব কিছুর পরম ভোক্তা, সমস্ত ভোগের একমাত্র অধিকারী। আমাদের বিশ্বাসও আনুগত্য অনুসারে সেই উপলব্ধি আসে, যেটা খুবই জরুরী। তাই বিপদের মাঝেও আমরা কৃষ্ণভাবনায় ভরসা রেখে নির্বিঘ্নে সব কাজ করতে পারি।

অবশেষে তার অতীত জীবনের কথা গজেন্দ্রের স্মরণে এল—যখন সে পূজা প্রার্থনা করত; এবং তাই পদ্মের পরিপূর্ণ স্নিগ্ধ সরোবর থেকে একটি পদ্মফুল শুঁড়ে করে তুলে নিয়ে সে ভগবানকে নিবেদন করল।

ভগবান বলেছেন—কেউ যদি ভালবাসা ও ভক্তি সহকারে একটি পত্র, পুষ্প, ফল বা জল আমাকে অর্পণ করে, তা আমি গ্রহণ করি সেটা আমার কাছে খুব প্রিয়। আমরা সেইটাই অনুশীলন করছি—সেটা এমনিতেই আমাদের ভেতরে রয়েছে কারণ স্বরূপে আমাদের স্থানটাই ঐ রকম। আমরা ভুলে গেছি, তাই অন্ধকারে নিদ্রামগ্ন হয়ে আছি। কিন্তু যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে আত্মসমর্পণ করি এবং তিনি দেখেন যে, আমরা নিষ্ঠাবান হতে চেষ্টা করছি, তখন তিনি আমাদের যথার্থ শুদ্ধ জ্ঞান প্রদান করে অন্ধকার দূর করেন। যতক্ষণ ঘুমিয়ে থাকব, ততক্ষণ জানতে পারব না আমাদের কি করা কর্তব্য। অন্ধ লোকের কাছে দিন আর রাতের তফাৎ কি? বেদে বলা হয়েছে—উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত—জেগে ওঠ, তোমার লক্ষ্যে পৌছাবার জন্য সচেষ্ট হও। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু একই কথা বলেছেন—

"জীব জাগো জীব জাগো গোরাচাঁদ বলে।
কত নিদ্রা যাও মায়াপিশাচীর কোলে ॥
এনেছি ওষধি মায়া নাশিবার লাগি।
হরিনাম মহামন্ত্র লও তুমি মাগি ॥"

মহাবদান্য শ্রীগৌরাঙ্গ

যুগে যুগে ভগবান ভক্তদের পরিত্রাণ এবং অসুর ও ভগবদ্বিদ্বেষীদের বিনাশ—এই দুটি কাজ করেন। কিন্তু কলিযুগে ভগবান গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর অবতরণের এক বিশেষ অবদান আছে—যা অন্য কোন অবতারে ভগবান দেননি।

ভগবান কৃষ্ণ সকলকে তাঁর শরণাগত হতে বললেন। তিনি ভগবদ্গীতায় বললেন,—"সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।" একমাত্র তাঁর অর্থাৎ, কৃষ্ণের শ্রীচরণে আশ্রয় নিতে বললেন, সঙ্গে সঙ্গে তিনি কিন্তু সর্ত আরোপ করলেন, সবরকম ধর্ম ত্যাগ কর আগে। আর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জগৎকে কি শিক্ষা দিলেন?—বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ শিক্ষা। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কৃষ্ণের মত কোন সর্ত আরোপ করেন নি, যদিও তিনি কৃষ্ণের মত একই কথা বলেছেন—নাচ গাও ভক্ত সঙ্গে কর সংকীর্তন; এগুলি বড়ই মধুর কথা। শ্রীচৈতন্য মহপ্রভুর কথায় সারা ভারত কৃষ্ণপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হল। সকলে আগে ভেবেছিল, কৃষ্ণ শুধু নিজের কথা বলছেন, কৃষ্ণের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে বলছেন। মহাপ্রভুও কৃষ্ণই, কিন্তু তিনি কৃষ্ণভক্তের ভূমিকা গ্রহণ করলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও সকলকে কৃষ্ণের জন্যই জীবন, কর্ম সকলই নিবেদন করতে উপদেশ দিলেন।

তাঁর শিক্ষা হচ্ছে—কর্মী হতে হবে না, জ্ঞানীও হতে হবে না, যোগী হওয়ার দরকার নেই, শুধু কৃষ্ণের দাস হওয়া চাই। মহাপ্রভু বলেছেন, "জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।" কৃষ্ণ অনুশীলনকারী কর্মফল কামনা করেন না। জ্ঞানের ফল হচ্ছে মুক্তি, ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া; আর যোগ অনুশীলনের ফল—অনিমা, লঘিমা, আদি যৌগিক ঐশ্বর্যও ভগবদনুশীলনকারীর কাম্য নয়।

শ্রীল লোচন দাস ঠাকুর গান গেয়েছেন—

গোরা প্রভু না ভজিয়া মৈনু
সৎসঙ্গ ছাড়ি কইনু অসতে বিলাস,
তে কারণে লাগিল মোর কর্মবন্ধ ফাঁস।

অর্থাৎ, ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সেবা না করায়, আমার জীবনটাই ব্যর্থ হয়ে গেল। আমরা শাস্ত্র থেকে মহাজন, আচার্য ও তত্ত্বদর্শীদের জানতে পারি

যে, মানব জীবন হচ্ছে 'অর্থদম্'—এই মানব জীবনের একটি অর্থ আছে, এইটির এক উদ্দেশ্য রয়েছে, এই জীবন অত্যন্ত দুর্লভ। শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে, 'লব্ধা সুদুর্লভং ইদং বপু সম্ভবন্তি'; ৮৪ লক্ষ যোনি সম্ভূত জীবদেহ প্রাপ্তির পর এই মানবদেহ লাভ হয়; তার মধ্যে ৪ লক্ষ রকম মনুষ্য দেহ রয়েছে। মায়িক ব্রহ্মাণ্ডগত অনন্ত জীবগণ যে ৮৪ লক্ষ যোনিতে ভ্রমণ করছে, শাস্ত্রে তার নিম্নরূপ তালিকা প্রদত্ত হয়েছে—

জলজা নবলক্ষানি স্থাবরা লক্ষবিংশতি।
কৃময়ো রুদ্রসংখ্যকা পক্ষিণাং দশলক্ষকম্।
ত্রিংশল্লক্ষানি পশব চতুর্লক্ষানি মানবাঃ ॥

অর্থাৎ, জলজ প্রাণীরূপে নব লক্ষবার, স্থাবর জন্ম বিশ লক্ষবার, ক্রিমিকীটরূপে এগার লক্ষবার, পক্ষী জন্ম দশ লক্ষবার, পশুরূপে ত্রিশ লক্ষবার, মনুষ্যজন্ম চারি লক্ষবার। এই ৮৪ লক্ষ জন্ম-মৃত্যু প্রবাহে অখিল ব্রহ্মাণ্ডগত বদ্ধজীবসমূহ প্রতিনিয়ত নিমজ্জিত হচ্ছে। শবর, পুলিন্দ, খস, অন্ধ্র, কিরাত, হুণ, সভ্য, অর্ধসভ্য বহু রকম মানুষ আছে। ভক্তশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদ মহারাজ বলেছেন মানব জীবন অনিত্য, অনিশ্চিত—কেউ জানে না তার আয়ু কত দিন। তাছাড়া এই জীবনে বহু বাধা-বিপদ রয়েছে পদে পদে। তাই সাধু-গুরু-শাস্ত্রের নির্দেশ মত এই মানব জীবনের অর্থপূর্ণ উদ্দেশ্য সাধনে কেউ যখন সচেষ্ট হয়—এদের বলা হয় ব্রাহ্মণ; আর যারা এই বহু মূল্য মানব জীবন, এই পরম সম্পদ, উপযুক্ত সদ্ব্যবহার করল না, তাদের বলা হয় কৃপণ; কেননা কৃপণের বহু সম্পদ থাকলেও, সে দেখে শুনেও মূল্যবান সম্পদের কিছুই সদ্ব্যবহার করে না।

তাহলে মানব জীবনের সেই অর্থটা কি? উদ্দেশ্যটা কি? সেই অর্থটা হচ্ছে, সেই উদ্দেশ্য হচ্ছে—এই জন্ম-মৃত্যুর হাত থেকে মুক্ত হয়ে, ভগবৎ-ভজন করে ভগবানের কাছে, কৃষ্ণের কাছে ফিরে যাওয়া।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গান গেয়েছেন—

"জীব কৃষ্ণদাস এ বিশ্বাস, করলে তো আর দুঃখ নাই।"

বাস্তবিক যে কোন উপায়েই হোক, আমাদের যদি দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে কৃষ্ণের প্রীতিময়ী সেবাই আমাদের জীবন, আমাদের প্রাণ, তাহলে আমাদের জীবনে দুঃখ-দুর্দশার লেশও থাকবে না।

তাই শাস্ত্র বলছে—আমাদের প্রকৃত স্বার্থ হচ্ছে, ভগবান যিনি সর্বব্যাপ্ত—সেই বিষ্ণু বা কৃষ্ণকে তুষ্ট করা, তাহলেই পরমব্রহ্ম ভগবান শ্রীহরি তুষ্ট হবেন, তখন সব কাজই সফল হবে। যজ্ঞ দ্বারা ভগবান তুষ্ট হন,

বিশেষভাবে কলিযুগে, 'যজ্ঞৈঃ সংকীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ।' অর্থাৎ, সকলে নয়, যারা মেধাসম্পন্ন, যারা সবচেয়ে বুদ্ধিমান তারা ভগবানের সম্যক্ গুণকীর্তন করে, তাঁরা যজ্ঞ করেন। তাঁরা ভগবানের দিব্য নাম, রূপ, গুণ, লীলা, পরিকর, বৈশিষ্ট্যাদি কীর্তন করেন, অর্থাৎ, কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণরূপ, কৃষ্ণগুণ, কৃষ্ণলীলাদি সর্বদাই কীর্তনীয়। 'শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণম্'—কৃষ্ণনাম শ্রবণ হলে, কৃষ্ণকীর্তন হবে, তখন স্বতই কৃষ্ণ স্মরণ হবে। ভগবৎ-ভজন এর অর্থ হচ্ছে মনটাকে জড় জাগতিক বিষয় থেকে তুলে নিয়ে ভগবান কৃষ্ণের পাদপদ্মে অর্পণ করা। শাস্ত্রে বলেছেন—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ ন্যাস্তেব ন্যাস্তেব ন্যাস্তেব গতিরন্যথা ॥

কিন্তু কিভাবে ভগবান শ্রীহরির নাম করতে হবে? নিরপরাধে হরিনাম করতে হবে, নিষ্কপটে ও সম্বন্ধ জ্ঞানের সঙ্গে ভগবন্নাম করা চাই, নামাপরাধ ত্যাগ করতে হবে, সেবাপরাধ ত্যাগ করতে হবে, ধামাপরাধও বর্জন করতে হবে, নিষ্পাপ হওয়া চাই, জীব-হিংসারূপ আমিষাহার, অবৈধসঙ্গ, দ্যূতক্রীড়া ও আসব পানাদি বর্জন করা উচিত, এইগুলি পাপ জীবনের স্তম্ভ স্বরূপ। আমাদের জীবন হওয়া উচিত সহজ ও সরল, আমাদের মনোভাব হওয়া উচিত—'সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম এইমাত্র চাই', যিনি কৃষ্ণভক্ত তিনিই সাধু, কৃষ্ণভক্তের সঙ্গ প্রভাবে যে কেউ কৃষ্ণভক্ত হতে পারেন এবং ভগবান কৃষ্ণের ধাম প্রাপ্ত হতে পারেন। শাস্ত্রে এই কথা রয়েছে—'ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্ত সঙ্গেন পরিজায়তে।' এমনকি এইভাবে ক্ষণিকের সাধুসঙ্গের প্রভাবে সর্বসিদ্ধি লাভ হয়। মহাপ্রভু মহাপাপী, পতিতদের সবচেয়ে কৃপা করেছেন, তাদের কৃষ্ণভক্তি দান করেছেন।

পাপীতাপী যত ছিল, হরিনামে উদ্ধারিল।
তার সাক্ষী জগাই আর মাধাই ॥

চাঁদকাজী ও জগাই-মাধাই উদ্ধার লীলার কাহিনীর সঙ্গে সকলেই পরিচিত। পাঠান বিজুলী খানকে তিনি ভগবদ্ভক্তে পরিণত করেছিলেন। এই কাহিনী শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে উল্লেখ আছে।

বলভদ্র ভট্টাচার্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে বৃন্দাবন থেকে প্রয়াগে নিয়ে যাচ্ছিলেন, মহাপ্রভুর সঙ্গে রাজপুত কৃষ্ণদাস বলভদ্র সহ আরো দুজন ব্রাহ্মণ ছিল। পথে এক গাছের নীচে যখন তাঁরা বিশ্রাম করছিলেন, সেখানে হঠাৎ এক গোপের বংশীধ্বনি শুনে মহাপ্রভু ভগবৎ-প্রেমে মুর্চ্ছিত হওয়ার লীলা করলেন।

ঠিক সেই সময় বিজলী খাঁন অশ্বারোহীদের নিয়ে সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিল। সাধুর ধন লুট করে, মহাপ্রভুকে হত্যা করবার অভিযোগ করে বিজলী খাঁন সঙ্গী চারজনকে বন্দী করে। অচিরেই মহাপ্রভুর চৈতন্যোদয় হল। 'হরি, হরি,' বলে, হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন মহাপ্রভু। বিজলী খাঁ তৎক্ষণাৎ চারজনের বন্ধন মোচন করে দিল। মহাপ্রভুও বিজলী খাঁকে তাঁদের পরিচয় দিলেন। পাঠানদের মধ্যে মৌলবীর সঙ্গে শাস্ত্রালোচনায় মহাপ্রভু কোরাণ উল্লেখ করে ভগবদ্ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করলেন। তখন বিজলী খাঁন ও তার অশ্বারোহীরা মহাপ্রভুর চরণ আশ্রয় করে কৃষ্ণভক্ত হলেন। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তার সম্বন্ধে লিখেছেন—

'পাঠান-বৈষ্ণব' বলি' হৈল তাঁর খ্যাতি।
সর্বত্র গাহিয়া বুলে মহাপ্রভুর কীর্তি ॥
সেই বিজলী-খাঁন হৈল 'মহাভাগবত'।
সর্বতীর্থে হৈল তাঁর পরম-মহত্ত্ব ॥

মহাপ্রভুর অপ্রকট লীলার পর আজ সারা বিশ্বে সব জায়গায় লোকেরা অত্যন্ত পতিত। মাংসাহার, মদ্যপান, অবৈধ সঙ্গ ও জুয়াখেলা জন-জীবনের এক সাধারণ অভ্যাস। তাই এইসব পাপকর্ম থেকে মুক্ত করে, মহাপ্রভুর শিক্ষার আদর্শে অনুপ্রাণিত করবার জন্য ভগবানের শুদ্ধভক্ত কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীশ্রীমৎ অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ সারা বিশ্বে শুদ্ধ হরিনাম বিতরণ করেছেন। সকলকে মহাপ্রভু ও কৃষ্ণপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করেছেন। তাঁর অনুপ্রেরণায় আজ বিশ্বের সর্বত্র কীর্তন হচ্ছে—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ।
শ্রীঅদ্বৈত গধাদর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ ॥
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

সুকৃতিবান আর্তের ভগবৎ প্রাপ্তি

ভগবদ্গীতায় (৭/১৬) ভগবান কৃষ্ণ বলেছেন—চার রকম লোক ভগবানের কাছে শরণাপন্ন হয়—তারা হচ্ছে আর্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানী। তিনি আরো বলেছেন—

চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জুন।
আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥

সাধারণত কেউই ভগবদ্ সেবা বা কৃষ্ণানুশীলনে আগ্রহী নয়। তবু সুকৃতিবান ব্যক্তি কৃষ্ণানুশীনে আগ্রহ প্রদর্শন করে।

এই জগৎ দুঃখ ও দুর্দশায় পূর্ণ, কেউ দুঃখ চায় না, প্রত্যেক জীবকেই দুঃখ পেতে হয়। জীবনে শোকাকুল হয়নি—একথা কেউ বলতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, 'দুঃখালয়ম্', জীব কখন সুখ লাভ করে, কখন আবার দুঃখও পায়, কিন্তু এই সবই অনিত্য। আত্মা নিত্য, ভগবান নিত্য, আর ভগবৎ সেবাও নিত্য কালই রয়েছে। আমরা সকলে এই জড় শরীর লাভ করেছি, অর্থাৎ এই জড় শরীর প্রাপ্তি মানেই হচ্ছে, আমাদের প্রকৃতির শাসনের অধীনে থাকতে হবে, তা আমরা চাই, আর না চাই—তবুও, এই জগৎটা একটা কারাগারের মত। কারাগারের কয়েকদিকে অনেক সময় রজ্জু দিয়ে বাঁধা হয়, আমাদের বেঁধে রেখেছে প্রকৃতি, কিন্তু কিভাবে?—অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে, বিশেষভাবে সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণ দিয়ে। তাই আমরা দেখি জীবকুলে প্রায় সকলেই রজ ও তমোগুণে আবদ্ধ। তমোগুণের লক্ষণ অজ্ঞতা, নিদ্রা, মোহ, রজোগুণের লক্ষণ প্রবল কর্মোদ্যম এবং কাম ও লোভে তাড়িত হয়ে জগৎ ও জড় জাগতিক বিষয় ভোগের তৃষ্ণা, তাছাড়া অনেকে সত্ত্বগুণে আবদ্ধ হয়ে থাকে—তথাকথিত কবি, সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী ও জনকল্যাণকামীরা মানব দেহের সুখ শান্তির উদ্দেশ্যে কাজ করে ও নিজেকে অন্যের কল্যাণকামী ভেবে নিজেরা সুখ অনুভব করে—এইভাবে সে সত্ত্বগুণে আবদ্ধ হয়। সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে শাস্ত্রের দৃষ্টিতে সকলেই এই অনিত্য জগৎরূপ কারাগারে আবদ্ধ হয়ে থাকে। এই কারাগারের প্রধানা হচ্ছেন দুর্গাদেবী—কেননা এই জগৎকে শাস্ত্রে বলা হয়েছে দুর্গ। তাই এখান থেকে বের হওয়া অত্যন্ত কঠিন ও কষ্টকর। জগৎ সংসারে প্রবেশ করলে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।

অর্থাৎ, জন্ম হলে জীবের মৃত্যু হবেই, এবং মৃত্যুর পূর্বে আবার এই জগতে তার জন্মও অনিবার্য—এই হচ্ছে প্রকৃতির নিয়ম। কৃষ্ণশরণাগতি, কৃষ্ণানুশীলন ও কৃষ্ণভজন না করলে সকলকেই এই গতি লাভ করতে হবে, তাছাড়া এই জীবন কালের মধ্যে জরা, ব্যাধি, রোগ-শোক তো আছেই, কেউই এর হাত থেকে রেহাই পায় না—যতক্ষণ না সে কৃষ্ণ সেবা করে ভগবদ্ ভজনে নিয়োজিত হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—'মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।' অর্থাৎ, কৃষ্ণের শ্রীচরণে শরণাগত হলেই জন্ম-মৃত্যুময় সংসার থেকে উদ্ধার হয়। শাস্ত্রে বলা হয়েছে—

কৃষ্ণভজন বিনা আর সব মিছে।
পালাইতে পথ নাই যম আছে পিছে ॥

কৃষ্ণ শব্দের অর্থ হচ্ছে—যিনি সকলকে আকর্ষণ করেন, যিনি জন্ম ও মৃত্যুকে রোধ করেন, ও যিনি পরম আনন্দময়।

তাই জীবনকে পূর্ণ করতে হলে, সফল ও সার্থক করতে হলে, জীবনমাত্রই কৃষ্ণভজন কাম্য। কৃষ্ণকথা শ্রবণ, কৃষ্ণকীর্তন, কৃষ্ণস্মরণ, কৃষ্ণবন্দন, কৃষ্ণপূজন, কৃষ্ণ দাস্য, কৃষ্ণের পাদসেবন ও কৃষ্ণে আত্মনিবেদন—সংক্ষেপে এই ন'রকম ভাবে ভগবদনুশীলন করা যায়। তাছাড়া কৃষ্ণই একমাত্র ঈশ্বর, আর সবাই তাঁর ভৃত্য, তাই কৃষ্ণভজন করলে মায়া বা দুর্গাদেবীর শাসন থেকে উদ্ধার লাভ করা যায়।

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ভগবৎ শরণাগতির আসন্ন লক্ষণের বর্ণনা করে বলেছেন—

অশোক, অভয়, অমৃতের আধার
তোমার চরণদ্বয়।
তাহাতে এখন বিশ্রাম লভিয়া,
ছাড়িনু ভবের ভয় ॥

সকলেই উত্তম আহার, নিদ্রা, জীবনযাত্রার মান রক্ষা ও বংশ রক্ষার জন্য কঠোর পরিশ্রম করে চলেছে, ঘোড়াও গাড়ি টেনে প্রচণ্ড পরিশ্রম করে চলে—তখন সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তার মুখ দিয়ে ফেনা বের হয়, মানুষও কঠোর পরিশ্রমের ফলে রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়, তারপর রোগ প্রবল হলে মৃত্যু ভয়ে সে তখন ভীত হয়ে পড়ে। এইভাবে অনিত্য সুখের জন্য জীবন সংগ্রাম করে চলে সকল মানুষ, কৃষ্ণ ভজনের অভাবে তার জীবন বিফলে যায়। কিন্তু কৃষ্ণানুশীলনের ফলে, কৃষ্ণেশরণাগতির ফলে জীবের জীবনকে শোক স্পর্শ করতে পারে না। তখন সে হয় নির্ভিক, এবং তার জীবন দিব্য আনন্দের ধারায় প্লাবিত হয়।

১৯৬৫ সালের শেষের দিকে কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী শ্রীল প্রভুপাদ আমেরিকায় যান, টম্‌কিন স্কোয়ারে একটি গাছের তলায় তিনি প্রতিদিন মহামন্ত্র কীর্তন করতেন—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

অনেক তরুণ-তরুণীই একসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদের কীর্তনে যোগ দিত ও নাচতো, তারা সকলেই প্রভুপাদের মুখ থেকে হরিকথা শুনতো—ভগবদ্গীতা শুনে প্রশ্ন করতো—সন্তুষ্ট হয়ে বন্ধুদের ডেকে নিয়ে আসতো শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তকে দর্শনের জন্য। যারা নিয়মিতভাবে সাধুসঙ্গ করছিল, পারমার্থিক জীবন সম্বন্ধে সেই আগ্রহীদের তিনি সদাচার পালন ও শুদ্ধ জীবন যাপনের গুরুত্বের কথা বললেন। ভগবান কৃষ্ণ হচ্ছেন 'পবিত্রম্ পরমম্', পবিত্র না হলে ভগবান কেন তার সেবা গ্রহণ করবেন? 'যেষাং ত্বন্তগতং পাপং'—অর্থাৎ, নিষ্পাপ হওয়া চাই, তবে তো কৃষ্ণভজনে দৃঢ়ব্রত হওয়া যাবে, পাপজীবনের স্তম্ভগুলি হচ্ছে—জীব-হিংসা, অবৈধ সঙ্গ, দ্যূতক্রীড়া ও আসবপান। তিনি তাদের বললেন যে মাছ, মাংস, ডিম আদি আমিষাহার ত্যাগ করতে হবে, বন্ধু-বান্ধবীর একসঙ্গে জীবন যাপন করা চলবে না, গাঁজা, চরস, সিগারেট, মদ,—এসব পান করা বর্জন করতে হবে, সঙ্গে সঙ্গে আজে-বাজে চলচ্চিত্র, নাটক দেখা ও জুয়া খেলা সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করা চাই, এইভাবে নিষ্পাপ হয়ে কৃষ্ণানুশীলন করতে হবে। তাদের মধ্যে যারা ঐকান্তিকভাবেই ভগবানকে জানতে চেয়েছিল, বুঝতে চেয়েছিল, যারা কৃষ্ণানুশীলন করে, ভগবদ্ভাবনাময় হতে আগ্রহী ছিল, তারা সকলেই এইসব সদাচার পালন করেছিল। তাছাড়া ব্রহ্মমুহূর্তে শয্যাত্যাগ করে স্নান, বৈষ্ণব তিলক চিহ্ন ধারণ ও পরিচ্ছন্ন পোষাকে শ্রীশ্রীপঞ্চতত্ত্ব, গৌর-নিতাই, শ্রীজগন্নাথ, বলদেব ও সুভদ্রা দেবী বা শ্রীশ্রীরাধামাধবের শ্রীবিগ্রহের সামনে কীর্তন, নর্তন করে মঙ্গল আরতিতে উপস্থিত হওয়া, প্রতিদিন ১৬ মালা মহামন্ত্র জপ করা, শ্রীমদ্ভাগবত আদি বৈষ্ণব শাস্ত্র পাঠ ও শ্রবণ করা, একমাত্র কৃষ্ণপ্রসাদ গ্রহণ করা ও হরিনাম সংকীর্তন করে কৃষ্ণপ্রসাদ ও বৈষ্ণবশাস্ত্রাদি বিতরণ করার শিক্ষা শ্রীল প্রভুপাদ সকলকে দিয়েছিলেন। এইভাবে শুদ্ধ ও পবিত্র করে, তিনি তাদের মহাপ্রভুর শিক্ষায় গড়ে তুলেছিলেন।

তাই এইসব ভক্তরা যখন একসঙ্গে মৃদঙ্গ, করতাল বাজিয়ে হরিনাম সংকীর্তন করে, তখন সকলে খুব আনন্দ পান, কিন্তু পেশাদারী কীর্তনীয়া, অথবা ভাড়াটে কীর্তনকারীর দল যতই সুর, তাল দিয়ে তা করুক না কেন, তা জনগণের মনে তেমন রেখাপাত করে না, তাদের তেমন আনন্দ দান করে না।

কেননা একটা হচ্ছে জীবিকার জন্য কীর্তন গান, যেখানে শুদ্ধতা নেই, সদাচার নেই, তা কখনো কৃষ্ণকে তুষ্ট করে না। আর যারা বাবা-মা, ঘর-বাড়ি সবকিছু ত্যাগ করেছে, কৃষ্ণের সুখের জন্য সবকিছু উৎসর্গ করেছে, শুদ্ধদেহে, শুদ্ধমনে, শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তের আনুগত্যে কৃষ্ণানুশীলন করছে, তাদের কীর্তনে কি সকলে বিমল আনন্দ পাবে না? তাদের সেবা কি ভগবান গ্রহণ করবেন না?—শুদ্ধ কৃষ্ণভক্ত তুষ্ট হলেই ভগবান তুষ্ট হবেন। সদ্‌গুরু গ্রহণ করলে, ভগবানও তা গ্রহণ করবেন, তিনি কৃপা করলে তবেই ভগবানের কৃপা লাভ হবে। তাই শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন—'যস্য প্রসাদাৎ ভগবৎপ্রসাদো', এইভাবে শুদ্ধ কৃষ্ণভক্ত গুরুদেবের কৃপায় কৃষ্ণানুশীলনকারী ভগবান শ্রীহরির কৃপা লাভ করে।

আর্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানী ভগবদ্ শরণাগতির মাধ্যমে ভগবানের পাদপদ্ম লাভ করে ও ভগবান শ্রীহরির ধামে চলে যান। এইভাবেই আর্ত গজেন্দ্র, অর্থার্থী ধ্রুব মহারাজ, জিজ্ঞাসু শৌনকাদি ঋষি ও জ্ঞানি চতুঃসন ভগবান শ্রীহরির পদকমল লাভ করেছিলেন।

বৈদিক শাস্ত্রে এইসব কাহিনীর বর্ণনা পাওয়া যায়। ক্ষীর সমুদ্রে ত্রিকূট নামে এক সুউচ্চ পর্বত আছে, বরুণদেবের তৈরি ঋতুমৎ নামে এক সুন্দর উদ্যান আছে। এই উচ্চ পর্বতের উপত্যকায় সেখানে পদ্মফুলেপূর্ণ এক চমৎকার সরোবরে গজেন্দ্র তার হস্তিনীদের নিয়ে এক সময় স্নান ও তাদের সঙ্গে জলক্রীড়া উপভোগ করছিল। তারফলে জলচর জীবেরা বিরক্ত হয় এবং তাদের প্রধান একটি বলবান কুমীর গজেন্দ্রকে আক্রমণ করে। এইভাবে গজেন্দ্র ও কুমীরের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। প্রায় হাজার বছর ধরে তাদের মধ্যে এই যুদ্ধ চলতে থাকে, কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ পরাজিত হয় না।

গজেন্দ্র বলশালী হলেও সে জলের কুমীরের সঙ্গে পারবে কেন? সেখানে কুমীরই বলবান। গজেন্দ্রের বল ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে এলো, সে ক্রমশঃ দুর্বলতা অনুভব করল। কুমীরের প্রাধান্য বেড়ে গেল এই যুদ্ধে। তখন অসহায় অবস্থায়, গজেন্দ্র শ্রীভগবানের চরণকমলে আশ্রয় নেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় দেখল না।

বিশেষ বিবেচনার পরই গজেন্দ্র এই সঠিক সিদ্ধান্ত করেছিল। ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে সুকৃতিবান জীবই বিপদে ভগবানের শরণাগত হয়। তাই বিপন্ন গজেন্দ্র ভগবানের প্রপত্তি করেছিল। আর ভগবানও তাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করেছিলেন।

এই গজেন্দ্রের পূর্ব জীবন ছিল সুকৃতিপূর্ণ, সে ছিল একজন সুকৃতিবান রাজা, তার নাম ছিল ইন্দ্রদ্যুম্ন। সংসার ত্যাগ করে, তিনি একসময় বনে গভীরভাবে ভগবচ্চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন। ঠিক সেই সময় মহামুনি অগস্ত্য শিষ্যগণকে নিয়ে সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। রাজা এইরকম অবস্থায় মুনি ও তাঁর শিষ্যদের সাদর অভ্যর্থনা করেন নি, তখন মহামুনি রাজাকে অভিশাপ দিলেন—আর রাজা এইভাবে হাতিতে পরিণত হয়েছিলেন।

মুনির এই অভিশাপ পরোক্ষভাবে আশীর্বাদই বলতে হবে, কেননা এক জীবন গজেন্দ্ররূপে অতিবাহিত করে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন পূর্বে সকল পাপ কর্মের ফল থেকে নির্মুক্ত হলেন, হাতীর জীবন অবসান হওয়া মাত্রই তিনি ভগবদ্ধাম বৈকুণ্ঠ লাভ করলেন এবং পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণের পার্ষদত্ব প্রাপ্ত হলেন।

এই জগতে জীবমাত্রই তার দেহকে স্বরূপ বলে মনে করছে, তাই আহার-নিদ্রা-আত্মরক্ষা ও বংশবৃদ্ধিই জড় জীবনের মুখ্য লক্ষ্য হয়ে উঠেছে, এটি পশুর লক্ষ্য। তাই প্রত্যেকেই প্রায় পশুতুল্য। গজেন্দ্রকে কুমীর আক্রমণ করেছিল, তার জীবন বিপন্ন হয়েছিল, আর আমাদের জীবনও জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি প্রভৃতি দ্বারা বিপন্ন; এইভাবে সংসার বন্ধনে আবদ্ধ আমরাও একমাত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হয়ে ভববন্ধন মুক্ত হয়ে ভগবদ্ধামে চলে যেতে পারি।

বৈদিক শাস্ত্রের আলোকে জন্মান্তরবাদ

শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ একদিন এক প্রশ্ন করেছিলেন ভারতের কোন এক প্রদেশের শিক্ষামন্ত্রীকে। দুর্ভাগ্যবশত তার কাছ থেকে কোন উত্তর পান নি তিনি। তখন সাক্ষাৎকার প্রার্থী ঐ ব্যক্তির কাছে শ্রীল প্রভুপাদ ভগবদ্গীতার কথা বলছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের কাছে আত্মতত্ত্ব বিশ্লেষণ করছিলেন এইভাবে, শ্রীকৃষ্ণ আজ থেকে প্রায় ৫০০০ বছর আগে যে শিক্ষা অর্জুনকে দিয়েছিলেন, তা হচ্ছে—

দেহিনোহস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা ।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥

(গীতা ২/১৩)

'দেহ' ও 'দেহী'—দু'টো কথা আছে এখানে। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা, এই দেহকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। কিন্তু স্বরূপতঃ আমরা কি এই দেহ? ভগবান কৃষ্ণের শিক্ষা থেকে আমরা জানতে পারি যে আমরা দেহ নই, দেহের ভেতরে যে আছে সে-ই হচ্ছি আমি, আমি হচ্ছি দেহী। দেহস্থিত সচেতন সত্তা।

মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর প্রথমে আমার একটি শিশুর দেহ ছিল। সেই দেহটি এখন নেই, তা ধ্বংস হয়ে গেছে। তারপর আমার বালকের দেহ ছিল, তারপর আমি এক কিশোরের দেহ পেয়েছিলাম, সেই দেহটির বিনাশ হয়েছে। কিন্তু আমি তখনও ছিলাম, তারপর আমি যুবক দেহ পেলাম। বর্তমান যুগের চিকিৎসা বিজ্ঞান স্বীকার করে নিয়েছেন যে প্রতিমুহূর্তে আমাদের দেহের কোষগুলি ধ্বংস হচ্ছে, এবং আমরা নতুন দেহ পাচ্ছি। প্রতি সাত বছর পর, আমাদের দেহের আমূল পরিবর্তন ঘটছে, তখন আমি এক সম্পূর্ণ নতুন দেহ লাভ করছি।

কানাডার 'মন্ট্রিল গেজেট' নামে পত্রিকায় 'আত্মা সম্বন্ধে হৃদ্‌রোগ বিশেষজ্ঞের জিজ্ঞাসা' এই শিরোনামায় এক সংবাদ বের হয়। এই প্রবন্ধে বিশ্ববিখ্যাত ডাক্তার উইল ফ্রেড. জি. বিগোলো সুশৃঙ্খলভাবে আত্মার স্বরূপ ও তার উৎস সম্বন্ধে গবেষণা করবার জন্য অনুরোধ করেছেন বিজ্ঞানীদের কাছে। শ্রীল এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ তাকে এই বিষয়ে একটি চিঠি লেখেন, এবং আত্মতত্ত্ব সম্পর্কে বৈদিক শাস্ত্রের অভ্রান্ত প্রমাণ দেন। কার্যকর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এই চিৎকণা আত্মাকে জানা যায়। এই চেতন কণাটি আমাদের দেহকে জীবন দান করে, এবং বস্তুত এই চিৎকণার অস্তিত্বের জন্য আবার আমরা অন্য দেহে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখি। এসব তথ্য তিনি বিশ্লেষণ করেছেন—তাঁর ঐ চিঠিতে।

ডঃ বিগোলো টরেন্টো ছিলেন জেনারেল হাসপাতালের হৃদ্‌রোগের শল্যচিকিৎসা বিভাগের প্রধান। তিনি তার বহু অভিজ্ঞতা থেকে জানাচ্ছেন যে কোন কোন ক্ষেত্রে রোগী এক জীবন্ত অবস্থা থেকে প্রাণহীন, নির্জীব অবস্থায় যাওয়ার সময় রোগীর মধ্যে এক রহস্যময় পরিবর্তন ঘটতে দেখা যায়। সেই দৃশ্যটির বিজ্ঞান-ভিত্তিক প্রমাণ দেওয়া খুবই কঠিন। সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় যে ঐ অবস্থায় রোগীর চোখে ঔজ্জ্বল্যের অভাব দেখা যায়। তার চোখের মধ্যে এক প্রাণহীনতার ভাব ফুটে উঠে। দীর্ঘ ৩০ বছরের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি নিশ্চিত যে 'আত্মা' বলে কিছু একটি দেহের মধ্যে রয়েছে।

বহুকাল থেকেই পৃথিবীর বহু বিখ্যাত দার্শনিক, কবি, সাহিত্যিকেরা এই সচেতন সত্তার বা আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাদের বিশ্বাসের কথা জানিয়েছেন। যেমন গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিস, ভবিষ্যতের জীবনের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাসের কথা ব্যক্ত করেছেন। দেহের বিনাশের পর চেতন সত্তা, আত্মা বিরাজিত থাকে বলে, তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর জীবনের একটি ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তখনকার দিনে গ্রীকদেশে তাঁর দার্শনিক মতবাদ জনমানসে বিশেষতঃ যুবসমাজে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। প্রাচীন পন্থী সমাজনেতাদের চক্রান্তে দেশের কর্তৃপক্ষ তাঁকে বন্দী করে রাখে। বন্দী অবস্থায় জেলের ভেতর মৃত্যু বরণ করবার জন্য তাঁকে বিষপান করতে দেওয়া হয়। বিষপান করবার আগে আত্মতত্ত্বে বিশ্বাসী দার্শনিক সক্রেটীস এইসব মূঢ় বিষদাতাদের বলেছিলেন—'আগে আমি কে?—তাকে ধরবার চেষ্টা কর।' কিন্তু ঐ মূর্খরা তার কথার গূঢ় অর্থ বুঝতে পারে নি। তিনি আত্মার কথা বলছিলেন। তিনি তো 'দেহ' নন্, তিনি একটি চেতন সত্তা, একটি চিৎকণা জীবাত্মা—এ সব তত্ত্ব মূর্খ লোকগুলো জানতো না। তাই দার্শনিক সক্রেটীসকে তারা বুঝতে অসমর্থ হয়ে পাগল ভেবেছিল।

শুধু সক্রেটীসই নয়, টলস্টয়, হারমন হেস, এমারসন্ আদি বিশ্বের অনেক দার্শনিক, কবি, বিজ্ঞানী ও সাহিত্যিক আত্মা ও তার কার্যাবলীতে দৃঢ় বিশ্বাস প্রকাশ করেছেন। আর বিশ্বের সবচেয়ে পুরানো শাস্ত্র গ্রন্থাবলী অর্থাৎ, বৈদিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, 'অহম্ ব্রহ্মাস্মি'—অর্থাৎ, আমি জড় দেহ নই, আমি ব্রহ্ম, আমি এক চেতন সত্ত্বা—আত্মা। বিশ্বের অন্যান্য অনেক শাস্ত্রেও আমাদের দেহস্থিত এই চেতন সত্তা, আত্মার কথা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে বৈদিক শাস্ত্রে আত্মার অস্তিত্বের বিবরণ সবচেয়ে বিস্তৃতভাবে দেওয়া হয়েছে।

স্মরণাতীত কাল থেকে ভারতে আত্মতত্ত্ব চর্চা চলে আসছে, তাই ব্রহ্মসূত্র থেকে শুরু হয়েছে এই বিষয় নিয়ে আলোচনা। সেখানে বলা হয়েছে 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা'। জড় জাগতিক বিচারে একজন বিরাট পণ্ডিত হলেও, তাঁর পূর্ব আশ্রমে বাংলার নবাবের মন্ত্রী শ্রীল সনাতন গোস্বামী মহাপ্রভুকে প্রশ্ন করেছিলেন, "কে আমি?" এইটি যথার্থ বুদ্ধিমানের প্রশ্ন।

এই আত্মার বিষয়ে অনেকে যা বলে তা আশ্চর্যজনক;

আশ্চর্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনম্
আশ্চর্যবদ্ বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি
শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ ॥

(গীতা ২/২৯)

কিন্তু গীতায় দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান কৃষ্ণ আত্মা সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করেছেন—'দেহী নিত্যমবধ্যোহয়ম্'—অর্থাৎ, এই দেহে বসবাসকারী বা দেহী নিত্য ও অবধ্য। এইভাবে আত্মার অবিনশ্বতার কথা বলা হয়েছে। অন্যত্র বৈদিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে আত্মা জ্ঞানময় ও আনন্দপূর্ণ। ভগবদ্গীতায় এই দেহকে একটি যন্ত্র বলা হয়েছে। জীব এই যন্ত্রে আরোহণ করে (যন্ত্রারূঢ়ানি) বহুকাল ভ্রমণ করে চলেছে—৮৪ লক্ষ রকম জীবদেহের মধ্যে দিয়ে। ৯ লক্ষ জল যোনি, ১১ লক্ষ ক্রিমি যোনি, ১০ লক্ষ পক্ষী যোনি, ২০ লক্ষ বৃক্ষ যোনি, ৩০ লক্ষ পশু যোনি এবং ৪ লক্ষ মনুষ্য যোনি আছে। এইসব তথ্য বৈদিক শাস্ত্রে রয়েছে। ভগবদ্গীতায় জীবকে ভগবান কৃষ্ণ 'সর্বগত' বলেছেন, তাই সে ব্রহ্মলোক থেকে পাতাললোক পর্যন্ত বিভিন্ন জীবদেহ লাভ করে জন্ম-মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আবর্তিত হয়ে চলেছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান ব্যাসদেব বলেছেন—'লব্ধা সুদুর্লভং ইদং বহু সম্ভবন্তে'—বহু বহু জন্মের পর জীব এই অত্যন্ত দুর্লভ মনুষ্য জন্ম, মানবদেহ লাভ করে। মানবদেহ অনিশ্চিত (অধ্রুবম্) কিন্তু সেই সঙ্গে 'অর্থদম্।' এই মানবদেহেই একজন জীবনের অর্থ প্রাপ্তি হয়। তাই এই দেহের মূল্য অপরিসীম। কেননা এই জীবনেই একজন তত্ত্ব জিজ্ঞাসু হতে পারে। উপযুক্ত সদ্গুরু, শুদ্ধবৈষ্ণবের কাছ থেকে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়ে সে পরম-তত্ত্ব লাভ করতে পারে, এবং ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারে।

জীব জগতের বৈচিত্রের বিশেষ ব্যাখ্যা আমরা একমাত্র বৈদিক শাস্ত্রে সুন্দরভাবে আছে দেখতে পাই। 'কর্মণা দৈবনেত্রেন অন্তর্দেহোপপদ্যতে'—প্রত্যেক মানবের কর্মসকল ওপরওয়ালা দেবতারা দেখেন (কর্মণা দৈবনেত্রেন) এখানকার কর্মসকল বিচার করেন তাঁরা, এবং মানবের কর্ম ও আসক্তি অনুযায়ী প্রকৃতি তাদের বিভিন্ন জীবদেহ দান করে। এমন একটি দেহ দেয় যা দ্বারা সে তার কামনা-বাসনা চরিতার্থ করতে পারে ও তার কর্মফল ভোগ করতে পারে। মনুষ্যেতর জীবকুল নিম্নযোনি থেকে উত্তরোত্তর উচ্চযোনি প্রাপ্ত হয়। কেননা মানুষের মত তাদের চেতন উন্নত স্তরের নয়, তাই তাদের কর্মফল নেই।

বৈদিক শাস্ত্রে জীবের বিভিন্ন জীবদেহ লাভের বা পুনর্জন্মের বহু উদাহরণ রয়েছে। রাজা নৃগ ব্রাহ্মণদের অসন্তোষের কারণ হওয়ায় পরবর্তী জন্মে গিরগিটি দেহ প্রাপ্ত হন, রাজা ইন্দ্রদুম্ন অগস্ত্য মুনিকে অভ্যর্থনা করতে অবহেলা করায়, তাঁর অভিশাপে হস্তীদেহ লাভ করেন, রাজা ভরত একটি হরিণশাবকের প্রতি আসক্ত হওয়ার ফলে পরবর্তী জীবনে হরিণ দেহ প্রাপ্ত হন। দেবরাজ ইন্দ্র দেবগুরু বৃহস্পতির নিকট অপরাধের ফলে শূকর দেহ প্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং নারদ মুনির সঙ্গে দুর্ব্যবহারের জন্য নলকুবের ও মণিগ্রীব বৃক্ষযোনি প্রাপ্ত হন। এই রকম দেহান্তর প্রাপ্তির বহু বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় বৈদিক শাস্ত্রে।

এক সময় স্বর্গের ধনভাণ্ডার রক্ষক কুবেরের দুই পুত্র, নলকুবের ও মণিগ্রীব, কৈলাসে সুন্দর মন্দাকিনীর জলে সুন্দরী অপ্সরাদের নিয়ে জলক্রীড়া উপভোগ করছিল। তারা স্বর্গীয় মদিরা পান করেছিল। তাই উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল, এই রকম অবস্থায় তাদের সামাজিক বিধিনিষেধ জ্ঞান ছিল না। তাই তারা ও অপ্সরারা বসনহীন অবস্থায় পরস্পর সঙ্গ উপভোগ করছিল। হঠাৎ নারদ মুনি সেই পথ নিয়ে যাচ্ছিলেন। নারদ মুনিকে দেখে অপ্সরারা নিজ নিজ বসন পরেছিল, কিন্তু মদিরায় আচ্ছন্ন কুবের পুত্র দুটি মুনির প্রতি অসম্মান যাতে না হয় তা ভাবল না—তারা তাদের পোষাক-পরিচ্ছদ পরল না। তখন নারদ মুনি তাদের এই দুর্ব্যবহারে দুঃখিত হলেন। তাই তাদের দু'জনকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়ার জন্য বৃক্ষযোনি লাভ করবার অভিশাপ দিলেন। এইভাবে তারা দুটি অর্জুন বৃক্ষরূপে বহুকাল বৃন্দাবনে অবস্থান করেছিল। ভগবান কৃষ্ণ তাদের এই বৃক্ষযোনি থেকে উদ্ধার করেছিলেন।

আর একসময় মহারাজ ইন্দ্রদুম্ন ভগবৎ চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন, সেই সময় শিষ্যদের নিয়ে অগস্ত্য মুনি সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। মুনিকে সাদর অভ্যর্থনা না করায় তিনি ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। তাঁর জড়তা লক্ষ্য করে অগস্ত্য মুনি মহারাজ ইন্দ্রদুম্নকে হস্তিযোনি লাভের অভিশাপ দেন। ফলে ইন্দ্রদুম্ন হস্তিদেহ লাভ করে ও পরবর্তীকালে ভগবান শ্রীবিষ্ণু হস্তীযোনি থেকে মহারাজ ইন্দ্রদুম্নকে উদ্ধার করেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে রাজা চিত্রকেতু ও তার সন্তানের কাহিনী থেকে আত্মার নিত্যত্ব ও পুনর্জন্মের বৈদিক ইতিহাসের বর্ণনা পাওয়া যায়। বহুকাল আগে চিত্রকেতু নামে এক রাজা ছিলেন। তার বহু সুন্দরী পত্নী ছিল। কিন্তু তারা সকলেই ছিল বন্ধ্যা। তাই রাজার কোন সন্তান ছিল না। তার মনে শান্তিও ছিল না।

একদিন অঙ্গিরা ঋষি রাজার প্রাসাদে যান। রাজা সসম্মানে ঋষিকে গ্রহণ করেন। চিত্রকেতু পুত্রহীন, তাই বিশাল সাম্রাজ্য ও অতুল সম্পদের অধিকারী হলেও, প্রকৃত সম্পদ সন্তান না থাকায় সে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ছিল। পুত্রলাভে সাহায্য করে, প্রকৃত সুখী করবার জন্য রাজা অঙ্গিরা ঋষিকে অনুরোধ করলেন। ঋষি রাজার প্রতি সদয় হলেন ও তাঁকে দেবতাদের উদ্দেশ্যে এক বিশেষ যজ্ঞ করতে নির্দেশ দিলেন। যজ্ঞের অবশিষ্ট প্রসাদ প্রধানা মহিষী কৃতদ্যুতিকে দেওয়া হল। ঋষি বললেন, 'মহারাজ, এইবার আপনি এক পুত্র লাভ করবেন, এই পুত্র আপনার আনন্দ ও দুঃখ উভয়ের কারণ হবে।' রাজার কাছে কোন উত্তরের অপেক্ষা না করেই, ঋষি অন্তর্হিত হলেন।

কালক্রমে রাণী কৃতদ্যুতি গর্ভবতী হলেন, তার এক পুত্র হল। রাজ্যের সকলেই আনন্দে উৎফুল্ল হল, রাজা চিত্রকেতুর আনন্দের শেষ নেই, পুত্রও মহারাণীর চোখের মণি হয়ে উঠল।

পুত্রবতী হওয়ায়, কৃতদ্যুতির প্রতি মহারাজ চিত্রকেতুর অনুরাগ দিন দিন বেড়েই চলল। এদিকে বন্ধ্যা হওয়ায়, অন্যান্য রাণীদের প্রতি মহারাজ উদাসীন হয়ে পড়ল, ফলে রাণীরা ক্রমে ক্রমে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। পরে তারা ভীষণ ঈর্ষাপরায়ন হয়ে উঠল, কৃতদ্যুতির অনুপস্থিতিতে তারা সকলে পূর্ব পরিকল্পনা মত রাজপুত্রকে বিষ প্রয়োগ করে হত্যা করে। পুত্রশোকে রাণী মূর্ছিত হয়ে পড়ল। রাজাও ক্রন্দন করে পাগলের মত হয়ে উঠল। রাজ্যের সকলেই যখন শোকাকুল, তখন বন্ধু নারদমুনিকে সঙ্গে নিয়ে অঙ্গিরা ঋষি রাজা চিত্রকেতুর কাছে গেলেন। ঋষি রাজাকে উপদেশ দিলেন, 'মোহ ত্যাগ কর, তুমি তো অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে আছ, আত্মা কর্ম অনুযায়ী জীবদেহ লাভ করে, সমুদ্র-উপকূলের বালুকণা যেমন বায়ু তাড়িত হয়ে পরস্পর মিলিত হয়, আবার কখনো কখনো সেগুলি বিছিন্ন হয়ে যায়, বিভিন্ন জীবাত্মাও এইভাবে পরস্পর মিলিত হয় ও একদিন তাদের মধ্যে বিচ্ছেদও ঘটে। সেই রকম এই মৃত পুত্রের সঙ্গে তোমার দৈহিক সম্বন্ধও ক্ষনিক ও অনিত্য—যদিও আমি তোমাকে প্রথমে দিব্য জ্ঞান দিতে এসেছিলাম, তোমার জড় অভিনিবেশ দেখে, তোমাকে এক পুত্র দান করেছি। এই পুত্র তোমার আনন্দ ও দুঃখের কারণ হয়েছে। এই স্ত্রী, পুত্র ও সম্পদ—সবই স্বপ্নের মত—প্রায় অলীক। তোমার স্বরূপ কি? কোথা থেকে তুমি এলে? দেহাবসানে কোথায় তুমি যাবে? তুমি শোকাভিভূত হচ্ছ কেন? এই সব চিন্তা কর ও বুঝবার চেষ্টা কর।'

তখন নারদ মুনি যোগ-বলে সকলের সামনেই মৃত রাজকুমারের আত্মাকে সেখানে আহ্বান করলেন। মৃত পুত্রটিকে তখন প্রাণবন্ত দেখা গেল। নারদ মুনি ঐ শিশুকে উদ্দেশ্য করে তত্ত্বকথা বললেন, 'হে জীব, তোমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হোক, তোমার অকাল মৃত্যুতে স্বজনরা সকলেই শোকাকুল, তোমার অবশিষ্ট জীবনকাল এই দেহে প্রবেশ করে স্বজন-বন্ধুদের সান্নিধ্যে জীবন উপভোগ কর, পরে পিতৃদত্ত সিংহাসন ও রাজৈশ্বর্য ভোগ কর।'

তখন সেই শিশুদেহধারী জীব একজন মুক্তাত্মা জ্ঞানীর মত বলতে লাগল, 'আমরা কর্মফল অনুযায়ী এক জীব দেহ ত্যাগ করে অন্য জীব দেহ গ্রহণ করি। এইভাবে কখন দেবদেহ, কখন ইতর পশু-দেহ, কখন গুল্ম-লতা দেহ, কখন বা মানব দেহ লাভ করি। কোন জন্মে এঁরা দু'জন আমার পিতা-মাতা ছিলেন? আমি লক্ষ লক্ষ বার জন্মগ্রহণ করেছি। এদের দুজনকে কিভাবে আমি একা পিতামাতা রূপে গ্রহণ করি?'

এই সব কথা বলতে বলতে এক সময় শুদ্ধ আত্মা সেই দেহত্যাগ করল। তখন হতবাক্ চিত্রকেতু পুত্র-স্নেহ ত্যাগ করল, তার শোক-মোহ দূর হল। সে জন্মান্তর জ্ঞান লাভ করল আত্মতত্ত্ববিদ্ হল।

জন্মে জন্মে জীব বহু পিতা-মাতা লাভ করে, তারা সকলেই অনিত্য। নিত্যকালের পিতা লাভ করা অনেক সৌভাগ্যে হয়। দুর্লভ মানব জীবন লাভ করে আসল নিত্য-পিতা, সদগুরুর সন্ধান করা কর্তব্য। তাঁর চরণাশ্রয় করে, কৃষ্ণানুশীলন করে, জন্মান্তরের আবর্ত থেকে মুক্ত হয়ে, ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়াই প্রত্যেক মানুষের একমাত্র কর্তব্য।

হরেকৃষ্ণ!